শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ অনুধ্যান

(প্রথম ভাগ)

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Bhagavat Puran* before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Vivekananda University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

ভারতের অন্যতম সর্বজন সমাদৃত ধর্মগ্রন্থ, উচ্চাঙ্গ কাব্যিক রস ও অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ গ্রন্থের নাম শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ। গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ হওয়ার দরুন শ্রীমদ্ভাগবত একটি অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র। জনমানসে একটি প্রচলিত মত যে, বড় বড় পণ্ডিতরা তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেছে নেন। ভাগবতে এসেই সব পণ্ডিতদের আসল পরীক্ষা হয়ে যায়। আমরা সেই ভাগবতের অনুধ্যানে এখন নিমগ্ন হতে যাচ্ছি। ভাগবত যেহেতু পুরাণ-ধর্মী শাস্ত্র সেই হেতু ভাগবত অনুধ্যানের সুবিধার্থে প্রথমে পুরাণ-ধর্মী শাস্ত্রের কিছু মূল বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে হিন্দু ধর্মে পুরাণের প্রভাব এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে পুরাণের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

পুরাতন হয়েও যে জিনিষ চিরদিন নতুনের মত মনে হয় তাকেই পুরাণ বলা হয়। যখন কোন ঘটনাকে ভগবানের সঙ্গে বা দেবতার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কাহিনীর মাধ্যমে মানুষের মনের গভীরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের একটা রূপরেখা অঙ্কিত করে ভগবানের প্রতি ভক্তি ভাবকে জাগ্রত করে দেয় তখনই সেই কাহিনীকে বলা হয় পুরাণ বা *mythology*। ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি আমাদের ১৮টি পুরাণ আছে, যেখানে নানান রকম মজার মজার পৌরাণিক কাহিনীর আড়ালে লুকিয়ে আছে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার অমূল্য তত্ত্ব সমূহ। এই আঠারোটি পুরাণের যে কোন একটিকেই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপ বলা যেতে পারে, কারণ যে কোন ধর্মকে দাঁড়াতে হলে যা যা বৈশিষ্ট্যের দরকার প্রত্যেকটি পুরাণে তার সব কটিই কম-বেশী পাওয়া যাবে।

ধর্মের চারটি অঙ্গ ও তার প্রয়োগ

যে কোন ধর্মকে সুষ্ঠু ভাবে, স্থির ভাবে চলতে গেলে, ধর্মকে শক্তিমান হতে গেলে চারটি অঙ্গের দরকার, এই চারটি অঙ্গ হল – ১) দর্শন, ২) পুরাণ ৩) তন্ত্র বা পূজা উপাচার ও ৪) স্মৃতি। উপনিষদ হিন্দু ধর্মের দর্শনের কথা বলছে, তন্ত্র থেকে পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মের পূজা-উপাচার, পুরাণে ভগবান ও অবতারদের লীলা কাহিনী আর স্মৃতিগ্রন্থে হিন্দুদের সামাজিক ও পারিবারিক আচার আচরণ বিধির আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিভাগই যে যার নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ। অন্য দিকে ধর্মের এই চারটি অঙ্গই ভাগবতে পাওয়া যাবে। পৌরাণিক কাহিনী এর ভিত্তি হলেও ভাগবতেও আমরা হিন্দু দর্শনের অনেক কিছুই পেয়ে যাই। আবার ভগবানকে কিভাবে পূজা, প্রার্থনা করতে হবে তারও বর্ণনা আছে, আর মানুষকে সমাজে ও পরিবারে থাকতে গেলে কি ধরণের আচার ব্যবহার করতে হবে তাও বলা আছে। কেউ যদি মনে করে আমি সারা জীবন শুধু ভাগবতই অধ্যয়ন করে যাব আর একেই অনুসরণ কর চলব তা হলেও সে ভাগবতের মধ্যেই হিন্দু ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ রূপে পেয়ে যাবে, তাকে আর আলাদা করে উপনিষদ বা স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করার প্রয়োজন হবে না।

মাঝে একটা রব উঠেছিল মানবিকতাই ধর্ম, মানুষকে ভালোবাসাই ধর্ম। আরেকটা রব উঠেছিল বিজ্ঞানই ধর্ম। পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাবিদরা যখনই কোন কিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তখন তারা সেই বিষয়ের অনেক গভীরে চলে যান। আমাদের আগেকার ঋষিরা যাঁরা ছিলেন তাঁরাও সব কিছুর গভীরে গিয়ে তার সার তত্ত্বটাকে উদ্ধার করে আনতেন। কিন্তু ইদানিং কালে আমাদের পণ্ডিতদের মধ্যে সেই গভীরে যাওয়ার ব্যাপারটা দেখা যায় না। এই কারণেই ভারতে কেউ নোবেল প্রাইজ পায় না। বিজ্ঞানে না হয় পাশ্চাত্য জগৎ অনেক এগিয়ে আছে কিন্তু সাহিত্যেও একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নোবেল প্রাইজ পেলেন না। অথচ ভারতীয়দের নামে একটা খুব সুনাম, তাদের মত উপদেশ, জ্ঞান দেওয়ার মত লোক নাকি সারা পৃথিবীতে নেই, আসলে এটা অপবাদ বা প্রশংসা কিনা বলা যায় না। কিন্তু এটা ঠিকই যে ভারতীয়রা শুধু কথাই বলে, রাস্থা-ঘাটে, ট্রেনে বাসে সবাই কথা বলা যাচ্ছে, সবাই সাহিত্য রচনা করে যাচ্ছে। তার কারণ হল

এখন কারুর মধ্যে সেই গভীর চিন্তনটা নেই। যেখানে একটা বিষয়ে আপনি প্রভুত্ব করবেন, যার জন্য জগৎ আপনার দিকে বিস্ময় চোখে তাকিয়ে দেখবে, তার জন্য যে গভীর চিন্তন দরকার সেটাই ইদানিং কালে আমাদের হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঋষিরা যে বিষয়কে বেছে নিলেন সেই বিষয়ের উপরই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। কোন কিছুর জন্য জীবনকে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দেওয়ার এই মনোভাবটা ভারত থেকে এখন প্রায় উঠেই গেছে। আমাদের সব কিছুই এখন ভাসা ভাসা, ওপর ওপর দিয়ে যা কিছু করার করে যাচ্ছে। বিদেশীরা যারা ধর্ম জানে না, ধর্ম বোঝে না, তারাও ধর্মকে নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করছে, সেই তুলনায় আমাদের দেশের এখন কেউই তেমন কিছু চিন্তা-ভাবনা করছে না। ভারতে এখন যুক্তিবাদীরা নানা রকম মতবাদ নিয়ে আসছে। যখন বলছে যুক্তিবাদটাই ধর্ম, তার আগে বলতে হবে ধর্ম জিনিষটা কি। আপনি বলবেন আমি ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছি। নতুন ব্যাখ্যা দিতে হলে তার শব্দটাও নতুন দিতে হবে, তখন 'ধর্ম' না বলে অন্য কোন শব্দ বলতে হবে। কারণ হাজার হাজার বছর ধরে শব্দের যে পরিভাষা পরম্পরাতে চলে আসছে সেটাকে কারুর খামখেয়ালীতে পাল্টে দেওয়া যায় না।

আসলে ধর্ম কি? ধর্ম একটি বিচার। যার জন্য বেশ কয়েকটি জিনিষের দরকার। প্রথম দরকার ধর্মকে একটা জীবন দর্শন দিতে হবে, জীবনের সত্যটা কি বলতে হবে। কোন পথে চলতে চলতে একদিন সেই সত্যে পৌঁছাতে পারবে, সেটাও বলতে হবে। যেমন বেদান্ত বলছে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিকোণ দিয়ে কোন মুসলমান বলবে আল্লাই আছেন, আল্লা ছাড়া কিছু নেই, আল্লাই সত্য। দর্শন শুধু আমাকে তত্ত্বটা জানিয়ে দিচ্ছে, সত্যটা কি বলে দিচ্ছে। কিন্তু সেই তত্ত্বে পৌঁছানোর প্রথম পথ হল বিচার, আমাকে বিচার করে করে এগোতে হবে। দ্বিতীয় পথ হল অর্চনা, উপাচার। আমি যদি অর্চনা, পূজা উপাচার করি তাহলে এই উপাচার পদ্ধতি আমাকে সেই সত্যে পৌঁছে দেবে যেখানে বিচার করে পৌঁছান যাচ্ছে। তৃতীয় পথ, সামাজিক যে আচার আচরণ বিধি পালন করার কথা ধর্মশাস্ত্র বলে দিয়েছে শুধু সেগুলোকে পালন করেও আমি সেই সত্যে পৌঁছে যেতে পারি। আর চতুর্থ হল, পুরাণের ভগবানের লীলা কথা এবং অন্যান্য শাস্ত্রে ভগবানকে নিয়ে যে কথা-কাহিনী আছে তার অনুচিন্তন করেও আমি সেই সত্যে পৌঁছে যেতে পারি। বিজ্ঞানকেই যাঁরা ধর্ম বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা খুব হলে বলবেন এণার্জিই শেষ কথা। কিন্তু তারপর এণার্জির পর কি আছে বলতে পারবেন না। এণার্জিই শেষ কথা খুব ভালো। এবার ওখানে পৌঁছানর জন্য আমার আচার, উপাচার আর আমার সামাজিক আচরণ বিধি কি হবে, যা পালন করে আমি ওই এণার্জি লেভেলে পৌঁছতে পারবো? এসব প্রশ্নের কোন উত্তর বিজ্ঞানের কাছে নেই।

আমাদের মনে হতে পারে সব কটি পথই একটি থেকে আরেকটি সম্পূর্ণ আলাদা। আসলে তা নয়, সব পথই একে অপরের সাথে মিলে মিশে রয়েছে, তবে বিশেষ একটি শাস্ত্র বিশেষ একটি পথের উপর বেশী জোর দিয়েছে। যেমন উপনিষদ ও বেদান্ত বিচারের উপর বেশী জোর দিচ্ছে। কিন্তু উপনিষদেও কথা-কাহিনী পাওয়া যাবে, উপনিষদও বলছে ধ্যান কিভাবে করবে, হাল্কা কোথাও কোথাও এক আধটা উপাচারের কথাও বলছে, যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঞ্চযজ্ঞের কথা আছে। হিন্দু ধর্মের বেশীর ভাগ উপাচার তন্ত্র থেকে এসেছে, আবার পুরাণ থেকেও অনেক উপাচার এসেছে। কিন্তু সেখানেও লক্ষ্য কি, সামাজিক আচরণ বিধি কেমন হবে বলে দিচ্ছে। মনুস্মৃতিতেও আমরা দর্শনের অনেক তত্ত্ব পাই, উপাচারের কথা পাই কিন্তু মূল জোরটা দেওয়া হয়েছে মানুষের আচরণ বিধির উপর। আঠারোটি পুরাণ হল আমাদের ঠিক ঠিক পুরাণ শাস্ত্র। এর সাথে যুক্ত হয় বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুটোকে তাই বলা হয় ইতিহাস পুরাণ।

ঋষিদের মত ছিল যে, ধর্মের এই চারটে অঙ্গকে যদি ঠিক ঠিক অধ্যয়ন করা যায় তাহলে সনাতন হিন্দু ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ রূপে জানা যাবে। আর জীবন-যাপনের অঙ্গ হিসাবে কেউ যদি কোন একটা মতকে অবলম্বন করে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে তাতেও সে একই ফল পাবে। হিউয়েন সাং চীনের খুব বিরাট পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের বিচার মার্গের সাধক। ভারতে এসে তিনি পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করছেন, বিচার করছেন। একবার অযোধ্যার কাছে ডাকাতরা তাঁকে বন্দী করেছে। ডাকাতরা যখন

তাঁকে কেটে ফেলবে বলে ঠিক করে নিয়েছে তখন তিনি ডাকাতদের বলছেন 'তোমার আমার যা কিছু সব নিয়ে নাও, আমাকে প্রাণে মেরো না'। কিন্তু ডাকাতরা ছাড়বে না। তখন তিনি বললেন 'আমাকে তো তোমরা মেরেই ফেলবে ঠিক করেছ। কিন্তু মরার আগে আমাকে একটু ধ্যান করতে দাও'। তখন তিনি ধ্যানে বসে ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী ভাবের উপর ধ্যান করতে লাগলেন। এটাই ভক্তিমার্গের সাধনা। ধ্যানে বসার কিছুক্ষণ পর এমন ঝড় উঠেছে যে, সবারই প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ডাকাতরা তখন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করছে লোকটি কে? যখন শুনল উনি একজন সাধু, তখন সবাই ক্ষমা চেয়ে তাঁকে ছেড়ে দিল। হিউয়েন সাংএর এই ঘটনাকে মজা করে পরে লেখা হল, যে লোকটি সারা জীবন জ্ঞানমার্গের সাধনা করে গেলেন, শুধু যুক্তি তর্ক বিচার নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু মৃত্যু যখন শিয়রে এসে ধাক্কা মারল তখন শরণাগতি, মানে ভক্তির আশ্রয় নিলেন। মূল কথা হল জ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়, ভক্তিও সেখানেই নিয়ে যায়। যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন আর ভক্ত দেখেন ঈশ্বরই সব হয়েছেন। যিনি খুব উচ্চকোটির মুসলমান তিনি দেখেন যা কিছু আছে সব আল্লাই হয়েছেন, খ্রীশ্চানরাও বলেন গডই সব কিছু হয়েছেন।

শরণাগতীর ভাবই ভক্তকে জ্ঞানী থেকে আলাদা করে

খ্রীশ্চান, মুসলমান আর হিন্দু সবাইকে এক করে নিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, জ্ঞানী আর ভক্তের তফাৎটা কোথায়? তফাৎটা হয় শরণাগতিতে, জ্ঞানীরা শরণাগত হন না, ভক্ত চাইলে শরণাগতির অনুশীলন করতে পারে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ*, আমার যে শরণাগত হয় আমি তাকে এই জন্ম-মৃত্যুর সাগর থেকে তুলে নিয়ে আসি। শরণাগতির ভাব ভক্তিমার্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদ্দেশ্য কিন্তু দুজনের একই, উদ্দেশ্য হল কাঁচা আমির নাশ করা। জ্ঞানী দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন, এখানে 'আমি' কোথাও আসছে না আবার ভক্ত দেখেন তিনিই সব হয়েছেন, এখানেও সেই কাঁচা আমির নাশ। ভক্তের যিনি ইষ্ট, যিনি ভক্তের আদর্শ, ভক্ত ইচ্ছে করলে তাঁর শরণাগত হতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গে জ্ঞানী সেইভাবে শরণাগত হন না। জ্ঞানীর মধ্যে যে জ্ঞান আসে সেটা সেইভাবেই আসে। কঠোপনিষদে ঠিক এই কথাই যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন সেই এই জ্ঞান লাভ করতে পারে, আত্মা যাঁকে বরণ না করেন সে কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করতে পারে না। এখানে শরণাগতির কোন ব্যাপারই আসছে না। শরণাগতি একমাত্র ভক্তিমার্গেই হয়। আমরা হিউয়েন সাং এর ঘটনা বললাম, সেখানে তিনি পরিষ্কার শরণাগত হয়ে গেছেন, শরণাগত হওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন পথ ছিল না। যখন দেখেন শরণাগত হওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই, ভগবান তখন তাকে কৃপা করেন। এই যে যাঁরা ঈশ্বরের শরণাগত তাঁরা যেভাবে শরণাগতি লাভ করেন, যে পরিস্থিতি তাঁকে শরণাগত হতে প্রেরণা দিচ্ছে এই সব কাহিনী ও তার সাথে যাঁর শরণাগত হচ্ছেন তাঁর লীলা কাহিনী যেখানে বর্ণনা করা হয় তাকেই পুরাণধর্মী শাস্ত্র রূপে গণ্য করা হয়।

পুরাণধর্মী শাস্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

পুরাণের প্রথম শর্তই হল পুরাণকে ভক্তিমার্গ হতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই তাই জ্ঞানমার্গীদের জন্য পুরাণ নয়। জ্ঞানীরা পুরাণের কথা মানবেই না, কারণ তারা ভগবানের কোন সাকার রূপকে স্বীকারই করে না। ভক্তের ভগবান সব সময়ই সগুণ সাকার, তার সাধনার পথ শরণাগতি। প্রথম হল, ভক্তিমার্গে ভক্ত যেখানে পৌঁছায় জ্ঞানমার্গে জ্ঞানীও সেখানে পৌঁছায়। দ্বিতীয় ভক্তের ভগবান সগুণ সাকার। তৃতীয়, সেই কারণেই ভক্ত শরণাগত হন। চতুর্থ, শরণাগত এবং শরণদাতার কাহিনীই পুরাণ। ইতিহাস পুরাণেও একই জিনিষ কিন্তু পুরাণের মত ইতিহাসে শরণাগতীর উপর এতটা জোর দেওয়া হয়নি। বাল্মীকি রামায়ণ থেকে যখনই অধ্যাত্ম রামায়ণে যাবো তখনই সেখানে পদে পদে শরণাগতির কথাই পাওয়া যাবে, যেখানে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হচ্ছেন, বিশ্বামিত্র ভগবানের শরণাগত হচ্ছেন, ঋষিরা ভগবানের শরণাগত হচ্ছেন, রাক্ষসরাও ভগবানের শরণাগত। শরণাগত, শরণদাতা আর শরণাগতি এই তিনটেকে মিলিয়ে যে কাহিনী তৈরী হয় সেটাই মিথকের রূপ নিয়ে নেয়। এই কারণে বাল্মীকি রামায়ণকে পুরাণের মধ্যে গণ্য করা যায় না। অন্য দিকে

অধ্যাত্ম রামায়ণ পুরোপুরি পুরাণধর্মী। উপনিষদ যে কথা বলছে, গীতা যে কথা বলছে, ভাগবতও কিন্তু সেই একই কথা বলছে, কিন্তু তিনটেই দর্শনধর্মী আর পুরাণধর্মী পৃথক শাস্ত্র রূপে গণ্য হচ্ছে। যদিও আমরা বলছি, যাঁরা শরণাগত হয়েছিলেন, যাঁর শরণাগত হয়েছিলেন আর যে পথে শরণাগত হয়েছিলেন এই তিনটেকে মিলিয়ে যে কাহিনী সেটাই আস্তে আস্তে পুরাণের রূপ নেয়, কিন্তু পুরাণের ঠিক ঠিক পরিভাষা আলাদা, যেটা একটু পরেই আমাদের আলোচনাতে আসবে। তবে যে কোন ধর্মে যে মিথক তৈরী হয় সেটা ঠিক এভাবেই তৈরী হয়।

আগেকার দিনে সমাজে একমাত্র যাঁরা বিদ্বদ্ ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁরাই শুধু বেদ উপনিষদ চর্চা করতেন। বেদেও প্রচুর পৌরাণিক কাহিনী থাকলেও বেদের ব্রাহ্মণরা পুরাণের দ্বারস্থ হতেন না। বর্তমান ভারতের জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশেরও কম ব্রাহ্মণ, এই দশ শতাংশ ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজন জ্ঞানী বিদ্বজ্জন ব্রাহ্মণ। এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছাড়া ভারতের বাকী সবাই পুরাণধর্মী শাস্ত্রের অনুগামী। এদের ধর্মই হল পুরাণ। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগেও ভারতে পুরাণধর্মী শাস্ত্রের এত প্রভাব ছিল যে মুসলমান নেতাদের মনেও ভয় ঢুকে গিয়েছিল। তারা দেখল, যেভাবে হিন্দু ধর্ম সব কিছুকে ভগবানের বিগ্রহ বানিয়ে দিয়ে পূজা করে, কদিন পর দেখা যাবে আল্লাকেও এরা একটা কোন বিগ্রহ বানিয়ে নিয়েছে আর মহম্মদকে একজন অবতার রূপে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মুসলমান ধর্মকে হিন্দু ধর্মেরই একটা অঙ্গ তৈরী করে দিয়েছে। যার জন্য পরবর্তি কালে মুসলমানরা নিজেদের হিন্দুদের থেকে আলাদা প্রমাণ করার জন্য দেওবান্দ থেকে নানা রকমের ফতোয় দিতে শুরু করল। এমনিতেই প্রচার ও বিস্তারে পুরাণ ভারতে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, মনে হত পুরাণ মানেই হিন্দু ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম মানেই পুরাণ। তার কারণ, হিন্দুদের পুরাণধর্মী শাস্ত্র যে কোন ধর্মের যে কোন কাহিনী, যে কোন দেবতা, যে কোন বিগ্রহকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে নেওয়ার ক্ষমতা ধরে। বলে, ভারতের গরু যা পায় সব খেয়ে নেয়, কাগজ পেলে কাগজ খেয়ে নেয়, কাপড় পড়ে থাকলে সেটাও খেয়ে নেয়, আবর্জনা থাকলে সেটাও খেয়ে নিয়ে দুধ তৈরী করে বার করে দেয়। বলা হয় হিন্দু ধর্মও ঠিক সেই রকম, বিশ্বের যত রকম ধর্ম আছে সব কটাকে হিন্দু ধর্ম গিলে নিজের মত আত্মসাৎ করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আগামীকাল যদি জানা যায় মঙ্গল গ্রহে মানুষ আছে, তাদের একটা বিচিত্র ধর্ম আছে যেটা আমাদের কল্পনার বাইরে, ওই ধর্মটাকে যদি ভারতে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে দুদিন পর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে একটা নতুন কিছু বার করে দেবে। এই আত্মীকরণটা সম্ভব হচ্ছে একমাত্র পুরাণের সৌজন্যে।

যদিও নতুন করে আর পুরাণ লেখা হচ্ছে না, কিন্তু এখন পর্যন্ত পুরাণের যত কাহিনী বা পুরাণ কথা আমাদের সামনে আছে, বিশেষ করে ভাগবত পুরাণ প্রথম যখনই লেখা হয়ে থাকুক কিন্তু বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় পাচ্ছি সেটা পণ্ডিতদের মতে অষ্টম শতাব্দীতে শেষ রূপ পেয়েছে। ইতিহাসবিদরা নান রকম যুক্তিতর্ক দিয়ে এই দিনকাল গুলো খুঁজে বার করেন। ভাগবত পুরাণের পরবর্তি পুরাণ গুলো আরও পরের দিকে রচিত হয়েছে। ভবিষ্য পুরাণে মুসলিম রাজাদের বর্ণনাও পাওয়া যায়, যেখানে বলা হচ্ছে ভারতে এই এই মুসলমানরা রাজত্ব করবে। এতদূর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতো কারুর তখন থাকার কথা নয়, নিশ্চয়ই তাঁরা মুসলমানদের রাজত্ব দেখেছিলেন। সমস্ত পুরাণের শেষ সংস্করণ মোটামুটি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দিতে এসে করা হয়েছে। এখন ছাপাখানা এসে গেছে, নিজের থেকে পাতা যোগ করে দেওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে।

পুরাণ হল ঠিক ঠিক জনগণের ধর্ম। বেদ-উপনিষদের ধর্ম মুষ্টিমাত্র কয়েকজন অধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মুষ্টিমাত্র কয়েকজনের জন্য ছিল বলেই হিন্দু ধর্ম এখনও তার স্বকীয়তাকে ধরে রেখে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – যে ধর্মের নিজস্ব কোন শাস্ত্র গ্রন্থ আছে সেই ধর্মই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, বাকী ধর্মগুলো হারিয়ে যাবে। এই ধর্মগুলো হল – জুহুদি, পার্সি যা কিনা পরের দিকে খ্রীশ্চান আর মুসলমানদের সঙ্গে মিশে যায় এবং হিন্দুধর্ম। এই ধর্মগুলো নিজেদের গ্রন্থকে ঠিক ঠিক ভাবে ধরে রেখেছে। ধর্মগ্রন্থের আরেকটি শর্ত হল, এর একটি শব্দেরও যেন পরিবর্তন না হয়। যদি কয়েকজন পণ্ডিত মিলে কোন

ধর্মগ্রন্থে দশটা পাতা যোগ করে দেয় বা দশটি পাতা সরিয়ে দেয় তাহলে ওই ধর্ম আর টিকে থাকতে পারবে না। ছোটখাটো অনেক ধর্ম উঠেছে, কিছু দিন থেকেছে পরে একটা সময় হারিয়ে গেছে, তার কারণ তাদের নিজস্ব কোন ধর্মগ্রন্থ ছিল না।

বেদের পরে ভারতে দুটো ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল – জৈনধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম। এদের মধ্যে জৈনধর্ম একটা বিশেষ গোষ্টির মধ্যে আবদ্ধ থেকে গেল। কারণ এমন এমন কঠোর তপস্যার কথা জৈনধর্মে বলা হয়েছে যেগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে পালন করা অসম্ভব ছিল। তবে জৈনরা নিজের ধর্মের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং গোঁড়া। জৈনদের প্রচুর আচার বিধি আবার হিন্দুদের সাথে এমন ভাবে মিলে মিশে গেছে যে মাঝে মাঝে দুটোকে আলাদা করা খুব কঠিন হয়ে যায়। অন্য দিকে জৈনরা অহিংসা ব্রত অনুশীলন করার জন্য অনেক ধরণের কাজ করে না, কৃষিকাজ করবে না, সৈন্য বাহিনীতে কাজ করবে না। সেইজন্য তারা একমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের পেশাকেই অবলম্বন করে জীবন ধারণ করে। অহিংসাব্রত, নিরামিশ খাওয়া এই জিনিষগুলো জৈনদের কাছে খুব গুরত্বপূর্ণ অনুশীলন। যার জন্য জৈনধর্ম কোন দিন সাধারণের ধর্ম হতে পারলো না।

অন্য দিকে বৌদ্ধধর্ম রাতারাতি সাধারণের ধর্ম হয়ে গিয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের তিনশ বছর পর সম্রাট অশোকের আবির্ভাবের সময় সারা ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের এই প্রসার ও জনপ্রিয়তার স্থায়িত্ব সম্রাট হর্ষবর্ধন পর্যন্ত বজায় ছিল। প্রায় হাজার বছর যাবৎ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ভারতকে গ্রাস করে রেখেছিল। বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু দুর্বলতার মধ্যে প্রধান দুর্বলতা ছিল বৌদ্ধধর্ম পুরোপুরি সন্ন্যাসীদের, সাধারণ মানুষের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ জানে একটু তুলসী পাতা, মহাপ্রসাদ খেয়ে, গঙ্গাজল পান করে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম করেই আমার সব ধর্ম পালন হয়ে যাবে আর আমিও শান্তি পেয়ে যাব, কে বাবা অত ত্যাগ বৈরাগ্য আর শাস্ত্রের যুক্তি বিচার করতে যাবে! শান্তি যদি চাও তো অত শাস্ত্র পাঠের কোন প্রয়োজন নেই, শুধু এই ভাবে ধর্মাচরণ করে যাও তাতেই শান্তি পাবে। সাধারণ মানুষ এটাই চায়। অনেকে বলবেন – ঠাকুরও তো এই কথা বলছেন। ঠাকুর গল্প করছেন, একজন পণ্ডিতকে মাঝি নৌকা করে পার করে দিচ্ছে। পণ্ডিত মাঝিকে জিজ্ঞেস করছে 'কি গো! তোমার শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়া আছে? ষড়দর্শন কিছু পড়া আছে?' মাঝি বলছে 'না ঠাকুর আমার কিছুই পড়া নেই'। 'তাহলে তো তোমার এই জীবনটা বৃথাই গেল'। কিছু পরে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। মাঝি তখন পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করছে 'ঠাকুরমশাই! আপনি সাঁতার জানেন তো?' 'আমি তো সাঁতার জানি না'। 'তাহলে তো আপনার পুরো জীবনটাই গেল'। কিন্তু ঠাকুর সাঁতার জানার কথা যেটা বলছেন এখানে তিনি আধ্যাত্মিকতার কথা বলছেন। তোমার শাস্ত্রজ্ঞান থাকতে পারে কিন্তু তুমি আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে কতটা জেনেছ সেটা নিয়েই ঠাকুর বলছেন, গঙ্গাজল পান করা, তুলসী পাতা খাওয়া নিয়ে বলছেন না। এগুলো ধর্মই, কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু এই ধর্ম পণ্ডিতের শাস্ত্রজ্ঞান থেকে অনেক নিকৃষ্ট। মাঝি ঠিকই বলছে, তোমার পুরো জীবনটাই গেল। কিন্তু যারা তুলসী পাতা খেয়ে আর গঙ্গাজল পান করে, খিচুড়ি ভোগ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে তারা ওই পণ্ডিতের থেকে আরও অধম। রাস্থার কুকুর তো কত আনন্দে আছে, এখান থেকে ওখান থেকে কত রকম খাওয়ার পেয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলেরা আবার আদর করে খাওয়চ্ছে। কত আনন্দে আছে। আমরা কি এই আনন্দ নিয়ে জীবন কাটাতে চাইব? কখনই নয়। পপুলার রিলিজিয়ান মানেই তাই, পপুলার রিলিজিয়ানে বলবে তুমি তুলসীপাতা খেয়ে যাও আর গঙ্গাজল পান করে যাও, তাতেই শান্তি, কোন শাস্ত্র পাঠ করতে হবে না, কোন বিচার করতে হবে না।

বৌদ্ধ ধর্ম একদিকে হয়ে গেল পপুলার রিলিজিয়ান, কিন্তু পপুলার রিলিজিয়ান হওয়ার উপকরণ বৌদ্ধ ধর্মে ছিল না। ভগবান বুদ্ধ গৃহস্থদের জন্যও অনেক কিছু বলে দিলেন, গৃহস্থকেও চিন্তন মনন করতে হবে, তাদের চেতনাকে সব সময় জাগ্রত রাখতে হবে। কিন্তু গৃহস্থ এত চিন্তন মনন করবে কিভাবে! তার মাথায় তো আগে থাকতেই দশ মন চিন্তাতে ভরে আছে। চিন্তন মনন যদি করতে পারতো তাহলে তো উপনিষদই ছিল, উপনিষদের দর্শনকে ধারণা করতে পারছে না বলেই তো তারা বৌদ্ধ ধর্মের দিকে ঝুঁকল। ভগবান বুদ্ধকে যখন চোখের সামনে পেয়ে গেল সবাই তার অনুগামী হয়ে গেল। যখন মুসলমান ফকির বাবারা ভারতে এলেন তখন

অনেক হিন্দুরা তাঁদের শিষ্য হয়ে গেল। রজনীশ, সাঁইবাবাদের আবার অনেক মুসলমান শিষ্যও আছে। এর কারণ হলে ভারতের মানুষ যখনই কোন সাধুবাবাকে কাছে পেয়ে যায় তখনই তারা মনে করে আমার জীবনের সমস্যা সমাধানের সহজ পথ ইনিই বলে দিতে পারবেন। কিন্তু সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ভগবানের বুদ্ধের পথ সহজ পথ ছিল না।

বৌদ্ধ ধর্ম পরবর্তি কালে যখন মানুষের জন্য সহজ পথ দেওয়া শুরু করল, তখনই বৌদ্ধ ধর্মের পতন হতে শুরু করল। ওরা প্রথমেই খুলে দিল তন্ত্র সাধনার রাস্থা। বৌদ্ধ ধর্মের তন্ত্র সাধনায় মহানির্বাণ তন্ত্রের কোন কিছু ছিল না, বৌদ্ধ মতের তন্ত্রে শুধু নোংরামি আর ব্যাভিচার। বৌদ্ধ ধর্ম প্রথমে যেটা ভুল করল তা হল অধিকারী বিচার না করে সবার জন্য সন্ন্যাসের রাস্থা খুলে দিল। নিজের ছেলেকে কোন রকমে সন্ন্যাস দিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুক বানিয়ে দিতে পারলেই সব বাবা-মায়েরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করত। সন্ন্যাস করে দিলেই তো বৈরাগ্য এসে যাবে না। তার ভেতরে ভোগ বাসনা গিজ্ গিজ্ করছে। এদের কারুরই সেই ধরণের কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন নেই, চিন্তন মনন নেই। কিছু দিন যেতে না যেতেই এরাই হয়ে গেল গুরু। এরা এবার শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি মাংস-ভাত খেয়ে বেড়াতে শুরু করল আর তন্ত্রের নামে অনাচার চালিয়ে যেতে আরম্ভ করল। এইভাবে ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম শেষ হয়ে গেল। বৌদ্ধ ধর্মের দুটো রূপ একটা মূল ধর্ম আরেকটি প্রচলিত ধর্ম। হিন্দু ধর্মেও মূল ধর্ম ও প্রচলিত ধর্ম আছে, হিন্দু ধর্মের মূল হল উপনিষদ। সব ধর্মের মূল ধর্ম কিন্তু এক। কিন্তু সব ধর্মের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায় প্রচলিত ধর্মে এসে। ঠাকুর যখন বলছেন সব ধর্মই এক জায়গায় নিয়ে যায় তখন ঠাকুর প্রচলিত ধর্ম নিয়ে বলছেন না, তিনি মূল ধর্মের ব্যাপারেই বলছেন। স্বামীজী বলছেন – আমাদের সবারই পুরাণের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা দরকার, কারণ পুরাণ আমাদের হিন্দু ধর্মের সারমর্মকে, হিন্দু ধর্মের আগে পেছনে যা কিছু আছে সব কিছুকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। কেউ যদি ভাগবত পুরাণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব নিষ্ঠা নিয়ে অধ্যয়ন করেন তাহলে তিনি হিন্দু ধর্মের সারটা জেনে যাবেন। ঠাকুর কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ খুব মন দিয়ে শুনেছিলেন, যার মধ্যে ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, মহানির্বাণতন্ত্র এই গ্রন্থগুলো ছিল। এই বইগুলোর বাইরে তিনি বেদান্তের উপর কিছু কিছু বই যেমন মুক্তি ও তার উপায়, জীবনমুক্তি বিবেক, অষ্টাবক্র সংহিতা এই বইগুলোও শুনতেন। এর ধরণের কিছু কিছু বই ঠাকুরের ঘরেই থাকত।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলিত ধর্ম ভারতকে যে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, পুরাণ সেই পতন থেকে ভারতকে রক্ষা করেছিল। শুধু রক্ষা করেই পুরাণ তার দায়ীত্ব শেষ করে দেয়নি, সাথে সাথে সাধারণ মানুষের জন্য অতি সুন্দর একটা প্রাণবন্ত কার্যকরী ধর্ম দিয়ে দিল, যে ধর্মের মধ্যে সমগ্র হিন্দু ধর্মের সারকে স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। জনপ্রিয় ধর্ম হয়েও পুরাণ সুকৌশলে মানুষের কাছে ধর্মের সার তত্ত্বকে পৌঁছে দেওয়ার কাজে সফল হয়েছিল। ছোট্ট ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গীতা জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু গীতার অর্থ ও ভাবকে সাধারণের পক্ষে বোঝা ও ধারণা করা অত্যন্ত দুরুহ। একদিকে খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবার অন্য দিকে এই তত্ত্বকেই কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে খুব সহজ প্রচলিত প্রথায় অথচ এক উন্নত কাব্যিক শৈলীতে পরিবেশন করাই পুরাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ তত্ত্বকে কল্পনা জগতের কাহিনী দিয়ে পরিবেশন করার মুন্সিয়ানা পুরাণ ছাড়া বিশ্বের আর কোন ধর্মগ্রন্থ দেখাতে পারেনি। সাধারণ মানুষ তত্ত্ব কথা সরাসরি শুনতে চায় না, তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তত্ত্ব কথা শোনা আর ধারণা করার জন্য চাই বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উন্নত মস্তিষ্ক।

মেঘনাদবধ কাব্যকে কি আমরা পুরাণ বলতে পারি? সবাই স্বীকার করবেন মেঘনাদবধ কাব্য খুবই উচ্চমানের সাহিত্য আর কাব্যিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাব ও তত্ত্বের অনুপস্থিতির জন্য পুরাণের মত সম্মান মেঘনাদবধ কাব্য কোন দিন পাবে না। পুরাণে যে শুধু কাহিনী আর উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বই আছে তা নয়, পুরাণে সব কিছুই আছে। পুরাণে উপাচার, সামাজিক আচার আচরণ বিধির কথা সবটাই মিলে মিশে রয়েছে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ভারতের জনগণ যা কিছু কর্ম করে তার সব কর্মই বেদের কর্মকাণ্ড থেকে এসেছে, কিন্তু তারা কেউ বেদের কর্মকাণ্ডকে অনুসরণ করে না, বেশীর ভাগ লোকই যে কোন কর্ম করার

সময় অনুসরণ করে পুরাণ আর তন্ত্রকে। ঠাকুরও বলছেন কলিতে বেদ মত চলে না। কারণ বেদ মতে কর্মকাণ্ড করতে গেলে যে উপকরণের প্রয়োজন সেগুলো এখন আর কেউ জোগাড়ই করতে পারবে না, কর্মকাণ্ডের বিচিত্র নিয়মাবলীও কেউ পালন করতে পারবে না। এখনও কিছু কিছু ব্রাহ্মণরা যে টুকটাক বেদের কর্মকাণ্ড করেন সেখানেও দেখা যায় তাঁরা কর্মকাণ্ডের বাইরে গিয়ে এমন কিছু কিছু উপাচার পালন করছেন, যে উপাচার গুলো তাঁরা বেদ মতে করছেন না, তন্ত্র মতে বা পুরাণ মতেই করছেন। পুরাণের তাই এত বেশী সম্মান। স্বামীজীও বলছেন, ভারতের আজ যে ধর্ম, আমরা যা কিছু ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা করি সবই পুরাণ মতে।

এটা ঠিক যে মহাভারত হিন্দু ধর্মকে একটা মজবুত ভিত্তি দিয়েছে কিন্তু হিন্দু ধর্মের আচার উপাচারের ক্ষেত্রে মহাভারতের অবদান খুবই সামান্য। আবার মহাভারতের কাহিনী বেশীর ভাগই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবেশিত হওয়ার ফলে ইতিহাসের প্রাধান্যটা বেশী এসে গেছে। কিন্তু পুরাণে ঐতিহাসিকতার কোন স্থান নেই। যার জন্য মহাভারতে ঈশ্বরীয় ভক্তি শ্রদ্ধার ভাবটা কম পাওয়া যাবে আর পুরাণ পাঠকদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ভাবটাই জেগে ওঠে।

'পুরাণ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল যে জিনিষ পুরনো হয়েও নতুনের মত তাকেই পুরাণ বলা হয়। পুরাণের কাহিনীগুলোকেই পুরাণ বলা হয়, এই কাহিনীগুলো অনেক পুরনো কিন্তু এখনও শুনলে নতুনের মত মনে হয়, তাই এর নাম পুরাণ। পুরাণের কাহিনী যতই পাঠ করা হোক না কেন বা শ্রবণ করা হোক না কেন কখনই একঘেঁয়েমি আসবে না। পুরাণের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে কোন উপন্যাস একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বারও পড়তে খারাপ লাগবে না, কিন্তু তৃতীয়বার পড়তে আর ইচ্ছে করবে না। কিন্তু পুরাণের কাহিনী যত বারই শোনা হোক না কেন কখনই ক্লান্তি আসবে না। ভারতে অগণিত গৃহস্থের ঘরে ঘরে বংশ পরম্পরায় নিত্য রামচরিত মানস, ভাগবত পাঠ হয়েই চলেছে, কখনই কারুর মনে কোন ক্লান্তি আসে না। পুরাণ বা আধ্যাত্মিকতার সাথে অন্যান্য সাধারণ সাহিত্যের এটাই তফাৎ। জাগতিক ভাব অর্থাৎ সাংসারিক ভাব যে সাহিত্যের মধ্যে থাকবে সেই সাহিত্য একবারের বেশী পড়লেই ক্লান্তি আসবে কিন্তু আধ্যাত্মিক রচনা অর্থাৎ পুরাণ কথা মানুষকে কখনই একঘেঁয়েমি দেবে না।

পুরাণ দুটি ভাগে বিভক্ত, একটা হল পুরাণ অন্যটি উপপুরাণ। অনেক সময় দুটোকে এক সাথে মিলিয়ে মহাপুরাণও বলা হয়। পুরাণের সংখ্যা আঠারোটি। এই আঠারোটিকে কেন পুরাণ বা উপপুরাণ বলা হবে যদি কেউ প্রশ্ন করে তাহলে এর কোন উত্তর নেই। এই বিষয়ে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করব।

পুরাণের পৌরাণিক কাহিনীগুলো প্রত্যেক হিন্দুর রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। ঈশ্বর, দেবতা, দিব্য জিনিষ বলতে যা কিছু বোঝায় সবই আমরা পুরাণ থেকেই পাই। যখন বলছি নারায়ণই ভগবান তখন এই ধারণাটা পুরাণ থেকেই নেওয়া হচ্ছে। যখন সাধারণ দেবতার কথা বলছি তখন তাও পুরাণ থেকে নিয়েই বলছি। দৈবী পুরুষ এবং অবতারের ধারণা পুরাণ থেকেই এসেছে। মহাভারতেও আমরা দেবতার কথা পাই, বিষ্ণুর কথাও এসেছে, হাল্কা দূর্গার উল্লেখও আছে, কিন্তু মহাভারত পড়লে বোঝা যায় এর মধ্যে কিছু কিছু কথা যেন পরের দিকে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু পুরাণ পুরোপুরি নিজেকে ভগবান, দেবতা, দৈবী, অবতার, উপাচার আর আচারের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। তবে একটি মাত্র পুরাণ থেকেই সব কিছু আসছে না, কারণ পুরাণ আঠারোটি আর উপপুরাণও আঠারোটি, মোট ছত্রিশটা পুরাণ গ্রন্থে হিন্দু ধর্মের যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আঠারোটি পুরাণ মিলিয়ে মোট সাড়ে পাঁচ লক্ষ শ্লোক। আবার আঠারোটি যে উপপুরাণ আছে তাতেও প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্লোক রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় দশ লক্ষ শ্লোক। মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ, তাতেই গীতা প্রেসকে ছটি খণ্ডে প্রকাশ করতে হয়েছে। ষাট খানা ঐ রকম যদি খণ্ড থাকে তবেই পুরাণের সব কিছু এক জায়গায় করা যাবে।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে পুরাণ হল শরণাগত, শরণদাতা আর শরণাগতির কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যেই কোথাও পাওয়া যাবে হিন্দুদের সমস্ত দেবী-দেবতা, উপদেবতার বর্ণনা। দ্বিতীয় ধ্রুব, প্রহ্লাদ

এই ধরণের শরণাগত ভক্তদের কাহিনী সব পুরাণেই পাওয়া যাবে। যখন আমাদের বলা হয় ভগবানে ভক্তি কর, তখন মহাভারতের কোন চরিত্রের কথা বলা হয় না। কার মত ভক্তি করবে? প্রহ্লাদের মত, ধ্রুবের মত ভক্তি কর। আমার তো বয়স হয়ে গেছে এখন প্রহ্লাদ, ধ্রুবের মত কি করে ভক্তি করব? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি অজামিলের মত ভক্তি কর। আমি খুব জঘন্য চরিত্রের লোক আমার মধ্যে কি করে ভক্তি আসবে? ভাগবতের শুরুই হয় ধুন্ধুকারীর কাহিনী দিয়ে। তুমি শান্ত, শিষ্ট স্বভাবের, তুমি প্রহ্লাদ বা ধ্রুবের মত হও। তোমার বয়স হয়ে গেছে? তাহলে তুমি অজামিলের মত হও। তুমি বদমাইশ লম্পট চরিত্রের? তাহলে তুমি ধুন্ধুকারীর মত হও। এই ভাবে হাজার হাজার চরিত্রের সমাবেশ করা হয়েছে, এর মধ্যে যে কোন একটা চরিত্রকে তুমি অবলম্বন করে ভগবানে ভক্তি করে যাও। তুমি তোমার বউ ছেলে থেকে খুব নির্যাতিত? তাহলে তুমি সমাধি বৈশ্যের মত সাধনা কর, শ্রীশ্রীচণ্ডী আমাদের এই কাহিনী বলছে, যা মার্কেণ্ডয় পুরাণের অন্তর্গত। তোমার কি রাজ্যপাট চলে গেছে, তুমি কি রাজ্য থেকে বিতাড়িত? তাহলে তুমি সুরথ রাজার পথ অনুসরণ কর। এই ধরণের সব কাহিনী পুরাণেরই অন্তর্গত। তেত্রিশ কোটি দেবতার কথাও পুরাণ থেকেই এসেছে। এর সাথে সৃষ্টি প্রকরণ, সৃষ্টি কিভাবে হয় পুরাণে তার প্রচুর বর্ণনা করা হয়েছে।

সাধারণতঃ পুরাণের কাহিনী শুরু হয় কোন ঋষির মুখ থেকে। কোন ঋষি হয়তো কোন রাজাকে বা তাঁর শিষ্যদের অথবা অন্য ঋষিরা একত্র হয়েছেন সেখানে কোন একটা কাহিনী শোনাচ্ছেন। পুরাণের বেশীর ভাগ কাহিনী সূতদের মুখ থেকেই শুরু হয়। স্বামী ব্রাহ্মণ আর স্ত্রী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সন্তানদের সূত বলা হত। অথবা মা ব্রাহ্মণ আর বাবা অন্য বর্ণের হলে তাদের সন্তানকেও সূত বলা হত। সূতদের বেদের কর্মের অধিকার দেওয়া হত না। কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্মণ সন্তান তাদের তাই পুরাণের কথা ও কাহিনী শোনাতে পারতো। আমাদের পরম্পরাতে দুজন খুব নামকরা সূত ছিলেন, একজন হলেন রোমহর্ষণ আর অন্যজন হলেন উগ্রশ্রবা। পুরাণ কথা যখন বলা হয় তখন সব সময় তার একজন প্রধান শ্রোতা থাকতে হবে। পুরাণের এই প্রধান শ্রোতার ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। উপনিষদে গুরু শিষ্যকে বলে যাচ্ছেন। মহাভারতও একজন বলে যাচ্ছেন আর বাকিরা সবাই শুনছেন। পুরাণ কিন্তু এভাবে হবে না। পুরাণের একজন প্রধান শ্রোতা থাকতে হবে। প্রধান শ্রোতাকে অনেক নিয়ম পালন করতে হবে, উপবাস করে থাকতে হবে, স্নান করে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে আসনে স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে, হাতে দক্ষিণা স্বরূপ কিছু রাখতে হবে, ইত্যাদি। বাকি শ্রোতাদের এত কিছু নিয়ম পালন করতে হতো না। অন্যান্য শাস্ত্রে বক্তার যেমন একটা আলাদা গুরুত্ব আছে, পুরাণে বক্তার যেমন গুরুত্ব আছে ঠিক তেমনি শ্রোতারও আলাদা একটা গুরুত্ব আছে। শুধু পুরাণের ক্ষেত্রেই প্রধান শ্রোতার ব্যাপারটা পাওয়া যাবে। তন্ত্রে শিব যখন পার্বতীকে উপদেশ দিচ্ছেন সেখানে তখন অন্য কোন শ্রোতা নেই। উপনিষদে গুরু যখন শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন সেখানেও তখন অন্য কোন শ্রোতা নেই। পুরাণ সব সময় একটা সভায় বা যজ্ঞ চলাকালীন পাঠ হত, সেই সভাতে অনেকেই আছে কিন্তু তার একজন প্রধান শ্রোতা থাকতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ভগবান নিজেই কাহিনী বলছেন। সেখানেও এই একই নিয়ম, একজন প্রধান শ্রোতা আছেন। সভা থাকতেও পারে আবার সভা নাও থাকতে পারে কিন্তু প্রধান শ্রোতা সব সময় থাকবে। এটিও পুরাণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পুরাণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, পুরাণের যা কিছুর বর্ণনা করা হয়েছে তার সবই দিব্য ব্যাপার। মহাভারতে যেমন আমরা আঠারো দিনের লড়াইয়ের বর্ণনা পাই, পুরাণের এই ধরণের কোন লড়াইয়ের বর্ণনা নেই। যা কিছু আছে সবই দিব্য, লড়াই যেটা হচ্ছে সেটাও দিব্য লড়াই।

পুরাণের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল – যখনই কোন জিনিষের বর্ণনা করা হয় তখন সেটা দু ভাবে বর্ণনা করা হয়। একটা হল যেমনটি হয়েছে ঠিক তেমনটি বর্ণনা করা। আরেকটি হল যেমনটি হয়েছে তার উপর রঙ চড়িয়ে অতিরঞ্জিত করে বলা – ইংলিশে প্রথমটাকে বলে exactness আর দ্বিতীয়টাকে বলে exageration। পুরাণের বর্ণনাতে exactness বলে কিছু নেই। মহাভারতে পাণ্ডবদের তপস্যার কথা বলার

সময় বলা হচ্ছে পাণ্ডবরা জঙ্গলে বারো বছর তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু পুরাণে এই বারোর পরে আরো কয়েকটি শূন্য বসিয়ে দেবে, কোটির নীচে কোন কথাই বলবে না।

পুরাণে যে শুধু নানা রকমের পৌরাণিক কাহিনীই আছে তা নয়, পুরাণে অনেক প্রচলিত লোকগাথাও পাওয়া যাবে। যে লোকগাথার মাধ্যমে বড় বড় মহাপুরুষদের কাহিনী আমাদের ঐতিহ্যে জায়গা করে নিয়েছে। এসবের বাইরে পরম্পরার অনেক কথা, দর্শন, নানান ধরণের সামাজিক ব্যাপার, কার কি কর্তব্য ও কি আচার, উপাচার, বিশেষ বিশেষ দিনে কি কি উৎসব করতে হবে, উৎসাবাদি কিভাবে করতে হবে, দৈনন্দিন জীবনে কি কি করণীয়, প্রায়শ্চিত্ত কত রকম হতে পারে, কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এই ধরণের অনেক কিছু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই কেউ যদি সারা জীবন শুধু ভাগবত পুরাণই অধ্যয়ন করে যায়, তাহলে তাকে আর অন্য কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার প্রয়োজন হবে না। কারণ পুরাণের মধ্যেই সে উপনিষদের দর্শন পেয়ে যাবে, তন্ত্রের উপাচার পদ্ধতি পেয়ে যাবে আর স্মৃতির আচার আচরণ বিধিও পেয়ে যাবে। আবার বিভিন্ন পুরাণ থেকে কোন ছোট্ট অংশকে নিয়ে হিন্দু ধর্মে অনেক প্রচলিত স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থ বেরিয়ে এসেছে, যেমন শ্রীশ্রীচণ্ডী, অধ্যাত্ম রামায়ণ, ললিতা সহস্রনাম। অধ্যাত্ম রামায়ণ যেমন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটা ছোট্ট অংশ, ঠিক তেমনি শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কেণ্ডয় পুরাণের ছোট্ট একটি অংশ।

সব কটি পুরাণের পেছনে একটা সত্য আছে আর তার সাথে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে। কিছু সত্য আর কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে কেন্দ্র করে চারিদিকে একটা কাহিনীর আবরণ তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। যেমন আম গাছের কাছে তার ফলের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু আমাদের কাছে ফলটা গুরুত্ব আর আম গাছের কাছে আমের বীজটা গুরুত্ব। বীজটা যাতে ছড়াতে পারে তার জন্য বীজের উপরে পুরু শাঁস ও শক্ত চামড়া দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। পাখি, মানুষ আমের শাঁসটাই চাইছে। তারা আমটাকে পেড়ে নিয়ে দূরে দূরে চলে যাবে, সার অংশটা খাওয়ার পর বীজটাকে ফেলে দেবে, সেখান থেকে আবার একটা গাছ দাঁড়িয়ে যাবে। প্রত্যেক প্রজাতি এভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেইজন্য ফলের বীজটার উপর চামড়া আর শাঁস দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে আচ্ছাদিত করে দেয়। আমাদের উপনিষদের কোন চামড়া আর শাঁস নেই, শুধু বীজটুকুই আছে। আমড়া যেমন পুরোটাই বীজ, উপরের দিকে হাল্কা একটু চামড়া। আবার অনেক বীজ আছে যার বীজের অংশটুকু খুব সামান্য আর পুরোটাই শাঁস। পুরাণ হল শাঁসযুক্ত বীজ। বীজটা যাতে ভালো করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার জন্য বীজের উপরে ভালো করে শাঁস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরাণের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম শরণাগত, শরণাগতী আর শরণদাতা এই তিনটেকে কেন্দ্র করে যে শাস্ত্র আলোচনা করে সেটাই পুরাণ। জ্ঞানমার্গ যেখানে নিয়ে যায় ভক্তিমার্গ সেখানেই নিয়ে যায়, গীতায় ভগবান একই কথা বলছেন – *যৎ সাংখ্যৈ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে*। জ্ঞান যেখানে নিয়ে যাচ্ছে ভক্তিও সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তো জ্ঞান আর ভক্তির কোন তফাৎ রইল না। কিন্তু না, একটা জায়গায় তফাৎ আছে। তফাৎ হল শরণাগতিতে। শরণাগতি ভাবের জন্য দুজনকে দরকার, একজন হলেন যিনি শরণাগত হচ্ছেন আর দ্বিতীয় জন যাঁর কাছে শরণ নেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য যত শাস্ত্র আছে তাতে শরণাগত, শরণাগতি আর শরণদাতা এই তিনিটের আলোচনা কম থাকে, যেমন উপনিষদ, এখানে শরণাগতির কোন ব্যাপারই নেই। যোগেও শরণাগতির কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু পুরাণ পুরোপুরি এই তিনটেকে কেন্দ্র করে এগিয়ে গেছে। এগুলো আমরা এর আগে আলোচনা করে নিয়েছি।

পুরাণের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হল, যেটা এর আগে আমরা হাল্কা একটু আলোচনা করেছি, কোথাও একটা সত্য রয়েছে, সেটাকে কেন্দ্র করে একটা মিথ্ দাঁড় করানো। এই যে মিথ্, যাকে আমরা মাইথলজি বলছি, অনেক সময় একে মিথকও বলা হয়, এটাই পুরাণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারত হল ঠিক ঠিক কাব্যিক বর্ণনা, এই দুটোতে আমরা মিথ্ পাই না। যেমন কালিদাস একটি নারী চরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নারীর সৌন্দর্যকে এমন একটা রূপ দিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন, যে সৌন্দর্য আমার বাস্তবে কোথাও খুঁজে পাবো না, কিন্তু তাকে আমরা মিথ্ বলতে পারবো না,

তখন তা একটা কাব্যিক বর্ণনা হয়ে যাবে। মাইথলজিতে সাধারণ মানুষের কল্পনাকে পুরোপুরি ছাড়িয়ে যায়। মানুষের সৌন্দর্য বোধের একটা ধারণা আছে, সেই মানুষই নিজে চিন্তা ভাবনা করছে, কল্পনার জগতে বিচরণ করছে, আর এভাবেই সে তখন এই সৌন্দর্য বোধের ধারণাকে আদর্শ রূপে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই সৌন্দর্য থেকে যখন তার শরীরের কোন অঙ্গকে সরিয়ে দেবে, তার মানবীয় গুণকে বাদ দিয়ে দেবে অথচ কোথাও একটা মানব বা মানবীর আকার থেকে যাবে, তখনই তা মিথ্ হয়ে যাবে, তখন সেই মানবী হয়ে যাবে অপ্সরা। যখনই অপ্সরা হয়ে গেলে তখনই তা মাইথলজিতে চলে গেল, কারণ অপ্সরার মধ্যে সাধারণ নারীর সৌন্দর্য থাকল না। আবার ভীম, অর্জুন এই ধরণের অনেক চরিত্র আছে যাদের মধ্যে অনেক রকম গুণ ও ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, বীর, রণকৌশলে নিপুণ ইত্যাদি তখনও এই চরিত্রগুলো মাইথলজিতে যাবে না, কাব্যিক বর্ণনার মধ্যেই থেকে যাবে। কিন্তু যখন মা দূর্গা, মা চামুণ্ডা যিনি হুঙ্কারেই লক্ষ লক্ষ দৈত্য দানব নাশ করে দিচ্ছেন তখন এটাই মাইথলজির পর্যায় চলে যাচ্ছে। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে যবে থেকে সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছে তার আগে থেকেই মানুষের মধ্যে মাইথলজির উপাদান রয়েছে। তাই প্রাচীন কাল থেকে সাহিত্যে কিছুটা কাব্যিক কিছুট মিথ্ মিশিয়ে কাহিনী তৈরী হয়ে আসছে।

পুরাণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলে পুরাণের কাহিনীতে অতিপ্রাকৃতি চরিত্রের প্রচুর সমাবেশ থাকবে। দেবী, দেবতা, অসুর, ভগবানের কথা যদি কোন সাহিত্যে না থাকে অথচ পৌরাণিক ভাব-ধারাকে বজায় রাখছে, তাহলে সেটাকে পুরাণ না বলে অন্য নামে বলা হবে। ছোটবেলা আমরা অনেকেই সিণ্ডরেলার কাহিনী পড়েছি। সিণ্ডরেলাকে পুরোপুরি কাব্যিক বর্ণনা বলা যাবে না, আবার এর মধ্যে মাইথলজির অনেক উপাদান পাওয়া যাবে। এই ধরণের কাহিনী আমাদের ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাবে না বা তাতে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে কিছু নেই, সেইজন্য এই কাহিনীগুলিকে বলা হয় কল্প কাহিনী।

বর্তমান যুগের নিউরো বিজ্ঞানীরা বলছেন মানুষের মস্তিষ্ক এমন ভাবে গঠন করা হয়েছে যে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে মিথসের দিকে একটা প্রবণতা থাকে। কার্ল জুঙ নামে একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিক ছিলেন। তিনি প্রথমের দিকে যদিও ফ্রয়েডের অনুগামী ছিলেন কিন্তু পরবর্তি কালে তিনি যখন দেখলেন ফ্রয়েডের থিয়োরী গুলো খুব অসঙ্গতি আর গোলমালে ভরা, তখন তিনি সেখান থেকে সরে এলেন। এরপর তিনি নানান রকম থিয়োরী বার করলেন, যার মধ্যে ওনার বিখ্যাত একটা থিয়োরী হল 'থিয়োরী অফ্ মিথ্'। এই থিয়োরি অনুযায়ী কার্ল জুঙের সিদ্ধান্ত হল, প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু না কিছু মিথ্ থাকবে। বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি নিজেকে কি মনে কর? তখন আমি বলব, আমি হলাম দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট একটি ব্যক্তি। কার্ল জুঙের থিয়োরি অনুযায়ী, এটাই তোমার মিথ্। তুমি যে দেহ বা তুমি যে মন, তুমি যে বুদ্ধি বা এই সব কটির সমন্বয়ে যে তোমার একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তৈরী হচ্ছে, আর তুমি যে এই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে চিন্তা করছ, এটাই তোমার নিজস্ব মিথ্। ঠিক তেমনি 'ভারতের মত দেশ হয় না' এই ধারণাকে আশ্রয় করে যারা কাজ করে যাচ্ছে তারাও একটা মিথ্ অনুসরণ করছে। আন্না হাজারে বলছেন অনশন করে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে, এখানেও একটা মিথের ভূমিকা কাজ করছে। কার্ল জুঙ বলছেন, যে মানুষের জীবনে যত বেশী মিথ্ থাকবে সেই মানুষ তত মহৎ। অথচ আমাদের ধারণা পুরো উল্টো, আমরা বলছি পুরাণের যত সব আজগুবি গপ্পো, সব মিথ্, তাই পুরাণকে ফেলে দাও। কিন্তু কখনই পুরাণকে ফেলে দেওয়া যাবে না, এর অন্য একটা মূল্যবান দিক আছে।

যে মানুষের জীবনে যত বেশী মিথ্ সেই মানুষ তত মহৎ, এই থিয়োরীকে আমরা অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে আলোচনা করছি। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – যে মানুষ একটা আদর্শ পালন করতে গিয়ে যেখানে দশটা ভুল করে, সেখানে আদর্শহীন মানুষ একশটা ভুল করবে। আমি যখন একটা আদর্শকে সামনে রেখে এগোব তখন আমার হয়তো দশবার পদস্খলন হতে পারে, লোক হাসবে, বলবে 'এই তো আদর্শ পালন করতে পারলো না'। কিন্তু যার কোন আদর্শই নেই সে যে কোথায় ছিটকে পড়বে, পরে কোথাও তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। পাশ্চাত্য জাতির কাছে মিথ্ একটাই, কি করে মিষ্টি কথা বলে নিজের কাজ হাসিল করা যাবে

আর টাকা বানানো যাবে। কিন্তু সেই প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয়দের মনোভাব সম্পূর্ণ এর বিপরীত। কোন আদি অনন্ত কাল থেকে ভারতের ঘরে ঘরে রামায়ণ ও মহাভারত বংশ পরম্পরায় পাঠ হয়ে চলেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ভারতীয় মনস্কতায় একটা বিশেষ প্রতিফলন দেখা যায়। ভারতীয়রা মনে করে আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের মত হতে হবে, আমাকে হনুমানের মত ভক্ত হতে হবে। স্বামীজী ভারতীয় নারীদের উদ্দেশ্যে বলছেন – তোমার আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। সীতাও মিথ্, সাবিত্রীও মিথ্ আর দময়ন্তীও মিথ্। এখন যাঁরা উইমেনস লিবে আছেন তাঁরা বলবেন ফেলে দাও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, আমাদের মুক্তি চাই, নারী স্বাধীনতা চাই। নাও মুক্তি কেউ বাধা দিতে যাবে না, আজ বিয়ে করে কালই ডিভোর্স দিয়ে দাও। তুমি বিয়ে করে একই স্বামীকে নিয়ে সারা জীবন কাটাবে, নাকি বছরে বছরে বিয়ে করবে আর ডিভোর্স দেবে সেটা তোমার ব্যাপার, কেউ বাধা দেবে না। তখন বলবে এটাই ইদানিং সমাজের চেহারা। এখানে ভালো-মন্দের বিচার করা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে তুমি যেমনটি বেছে নেবে সেই অনুসারে তোমার জীবনের পরিকাঠামোটা পাল্টে যাবে। তুমি বলছ নারীমুক্তি চাই, তার জন্য নারী আন্দোলন চাই, এটাও একটা মিথ্। যখন তুমি বলছ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী তোমার আদর্শ তখন এটাও একটা মিথ্। কোন্ মিথ্ তুমি অনুসরণ করবে সেটা তুমি ঠিক করো। যে মিথ্ তুমি বেছে নেবে সেই অনুসারে তোমার জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতও সেই ভাবে আসবে যাবে।

আধ্যাত্মিক পুরুষদের কাছে সাধারণ মানুষ নানা রকমের প্রশ্ন নিয়ে হাজির হত। জগৎ কোথা থেকে এসেছে? জগৎ কোথায় যাবে? আমি কোথা থেকে এলাম? আমি কোথায় যাব? ঋষিরা যখন সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে এই সব প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন না তখনই তাঁরা মিথ্ তৈরী করে তাদের মানসিকতার উপযোগী করে এমন ভাবে একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিতেন, তাতেই সাধারণ মানুষের মনের চাহিদা পূরণ হয়ে যেত। যেমন সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হল, ব্রহ্মার যখন জন্ম হল তিনি ভাবতে শুরু করলেন আমি কেন জন্ম নিলাম, আমি কোথায় আছি, আমি কেনই বা আছি। তখন তিনি দেখলেন আমার জীবনের একটা কোন উদ্দেশ্য আছে। যারই জন্ম হয় তারই একটা উদ্দেশ্য থাকে। ব্রহ্মা তখন বুঝলেন আমাকে সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে সৃষ্টি করা যাক। সৃষ্টি কিভাবে হবে? তখন তিনি ধ্যানে বসে গেলেন। ধ্যানে তিনি আদেশ পেলেন এর আগের কল্পে সৃষ্টি যেভাবে হয়েছিল, সেই একই ভাবে সৃষ্টি করতে হবে। ব্রহ্মা সব বুঝে নিয়ে এবার সৃষ্টির কার্যে নেমে পড়লেন। সৃষ্টির ব্যাপারে এটাই একটা মিথ্ তৈরী হয়ে গেল।

সৃষ্টির ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক মিথ্ হল, অনেক কোটি বছর আগে বিগ ব্যাঙ হয়েছিল সেখান থেকে এই সৃষ্টি চলছে। আমাদের ধর্মীয় মিথ্ হল ব্রহ্মা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এবার মানুষ কোনটা বিশ্বাস করবে! বিজ্ঞানীরা কিছু দিন আগে বললেন চাঁদকে আমরা যত পুরনো ভেবেছিলাম তত পুরনো নয়, চাঁদ খুবই শিশু। তাহলে এত দিন চাঁদের জন্ম নিয়ে বিজ্ঞানীরা যেটা বলে এসেছিল সেটা বৈজ্ঞানিক মিথ্। আর আগামীকাল বিজ্ঞানীরা যে এই মতকে পাল্টাবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই, সবটাই তো মিথ্এর উপর দিয়ে চলছে। শুধু কয়েকটা ব্যাপারে যেখানে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে সেখানে আর ভুল হয় না। কিন্তু নিশ্চিত হবেটা কিভাবে? তার জন্য ওই জায়গাতে তার থাকা আবশ্যক। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনার বাবার নাম কি? আমি বললাম আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত অমুক। কিন্তু সেটাও তো মিথ্। আপনার মা মিথ্যে বলছেন না তার কি গ্যারান্টি আছে। সব কিছুই মিথ্। নিজের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেটা অনুভব করছি তার বাইরে সবটাই মিথ্। কিন্তু আমরা মানতে চাই না। কার বুকের পাটা আছে যে বলতে যাবে, আমার মা বলেছে উনি আমার বাবা কিন্তু আমি জানি না। আমরা সবাই জন্মদিন খুব ধুমধাম করে পালন করি, কিন্তু আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন যে আপনার ওই দিনেই জন্ম হয়েছিল? না, আমার বাবা-মা বলে দিয়েছেন। কিন্তু এটাও তো জনশ্রুতি। এখন আপনি প্রত্যেক ব্যাপারে ডিএনএ পরীক্ষা করতে থাকুন। কিন্তু ডিএনএ পরীক্ষাতে বাবা-মা ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু জন্ম তারিখ তো জানা যাবে না।

বেদান্ত ঠিক এই কথাই বলে আসছে। তোমার এই জীবন যেটা দেখছ এটাই মিথ্। তুমি যে ভাবছ, তুমি শরীর, তুমি মন, তুমি বুদ্ধি এটাই মিথ্। যতক্ষণ ইন্দ্রিয় দিয়ে না জানছ তখন সবটাই মিথ্। একমাত্র

ভগবানই হলেন সেই বস্তু যাঁকে জানা যায় না। যদিও ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না, কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি দিয়ে ভগবানকে জানা যায়। তুমি যখন ধ্যানে বসবে তখন তুমি তোমার ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়েই ধ্যানের গভীরে এগোবে। মনকে যত তুমি বশে নিয়ে আসতে থাকবে তত তুমি তাঁকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর দেখতে থাকবে। একটা জায়গায় গিয়ে তোমার মন থেমে যাবে। কিন্তু থামার আগে মন তোমাকে একটা অনুভূতি করিয়ে দেবে। সারাদিন কাজ করার পর রাত্রিতে মানুষ যখন শয়ন করে তখন গভীর নিদ্রায় যাবার আগে একবার ঘুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে আবার সেই ঘুমের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে। ঘুমের মধ্যে একবার ঢুকছে আবার বেরিয়ে আসছে, বলে এখানে নাকি খুব আনন্দের আভাস পাওয়া যায়। ভাসতে ভাসতে একবার ঘুমের মধ্যে ঢুকছে আবার ভাসতে ভাসতে ঘুম থেকে বেরিয়ে আসছে, এইভাবে আসল ঘুমে ঢুকে পড়ে। আবার যখন সকালে ঘুম ভাঙে তখন এই একই প্রক্রিয়ার পুনারবৃত্তি হতে থাকে। সমাধিতে যাওয়ার আগে ঠিক এই অবস্থা চলে, এই সমাধিতে ঢুকছে। কোথায় ঢুকছে? যেখানে মনের নাশ হয়ে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, মন যেন একটু থেকে গেছে। সুষুপ্তিতে যেমন হয়, সুষুপ্তি আসে স্বপ্নের পরে। কিন্তু সুষুপ্তিতে যাওয়ার আগে স্বপ্ন আর সুষুপ্তির মধ্যে বাচ খেলা চলতে থাকে। তারপর যখন পুরোপুরি সুষুপ্তিতে চলে যায় তখন তার আর কোন হুঁশ থাকে না। সমাধিতেও ঠিক তাই হয়, তার কোন হুঁশ থাকে না। কিন্তু এই যে একবার করে যাচ্ছে একবার করে আসছে, হয়তো মুহুর্তের জন্য এই জিনিষগুলো চলছে কিন্তু মনের ওই ছাপটা থেকে যায়। তাই বলছেন মানুষ যখন সমাধি অবস্থায় যেটা উপলব্ধি করে তখন বলে এই উপলব্ধিটাই একমাত্র সত্য। এর বাইরে এত দিন যা কিছু করে এসেছি সবটাই মিথ্। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে পঞ্চশ ধরণের প্রশ্ন থাকে। বাড়িতে বাচ্চাদের প্রশ্নের শেষ নেই, মা গ্লাশটা বাঁ দিকে কেন রাখলে? আমি যদি ডান দিকে গ্লাশটা রাখি তাতে কি অসুবিধা হবে? কিন্তু এই প্রশ্নই যখন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে করবে তখন মা কোথা থেকে উত্তর দেবে! জগৎ কে করেছে? ভগবান করেছেন। ভগবানকে কে সৃষ্টি করেছেন? মা হয়তো বলল সুপার ভগবান করেছেন। কিন্তু মা এইভাবে কত দূর ঠেলে নিয়ে যাবে!

কোন শিশু যদি তার মাকে প্রশ্ন করে খাওয়ার আগে কেন স্নান করতে হবে, খাওয়ার পরে স্নান করলে কি ক্ষতি? মা হয়তো অত কিছু বোঝে না, মা তখন বলে একটা চড় লাগালে বুঝতে পারবি খাওয়ার আগে কেন স্নান করতে বলা হয়। একটা কোম্পানীতে গ্রুপ ইনসিওরেন্স চালু করার কথা হয়েছে। কোম্পানীর একজন কর্মচারী কিছুতেই সই করবে না। একজন যদি সই না করে তাহলে এই স্কিম কোম্পানীতে চালু করা যাবে না। এমডির কাছে যখন ফাইল গেছে, তখন দেখলেন একজনই শুধু সই করেনি। তিনি সেই কর্মচারীকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকতেই এমডি সরাসরি তাকে বলে দিলেন, এক্ষুণি সই কর তা নাহলে আজকেই তোমার চাকরী চলে যাবে। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সই করে দিল। এমডির চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার পর বাকি কর্মচারীরা জিজ্ঞেস করছে, ভাই! এত দিন তুমি সই করছিলে না কেন? লোকটি বলছে, এত পরিষ্কার ভাবে ব্যাপারটা আমাকে কেউ বোঝাতে পারেনি। কিন্তু সবাইকে তো এইভাবে বোঝান সম্ভব নয়।

ইসলামে একটা খুব নামকরা মিথ্ আছে। মাউন্ট হীরাতে মহম্মদ যখন ধ্যান করছিলেন তখন গ্যাব্রিয়াল এসে মহম্মদকে হীরক নামে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে উড়িয়ে আল্লার কাছে নিয়ে গেলেন। আকবর বাদশা তিনি নিজে মুসলমান, ইসলামের সব কিছুই মানতেন কিন্তু মহম্মদকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে উড়িয়ে আল্লার কাছে নিয়ে যাওয়াকে কিছুতেই মানতে চাইতেন না। এতো খুবই স্বাভাবিক, ঘোড়া তো ওড়ার জন্য নয়, ঘোড়ার কাজ হল মাটিতে দৌড়ান। ঘোড়া যদি উড়িয়ে আল্লার কাছে মহম্মদকে নিয়ে যায় তাহলে তা তো ঘোড়া নাম না হয়ে অন্য সেই রকম কিছু নাম হবে যেটা উড়তে পারে। সাইকেলেরও চাকা আছে এ্যারোপ্লেনেরও চাকা আছে, কিন্তু সাইকেল তো আর উড়ে যায় না, চাকা নিয়ে যখন উড়ে যায় তখন সেটাকে আমরা এ্যারোপ্লেন বলছি সাইকেল কখনই বলছি না, সেই রকম ঘোড়া না বলে অন্য কিছু বলুন। এখন ঘোড়া না বলে অন্য কিছু বললে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। মহম্মদ যে আল্লার কাছে তিরিশ দিন ধরে গেছেন, সেটা সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে! একটা কিছু তো বলতে হবে। সাধারণ মানুষ ঘোড়া চেনে, উট চেনে, গাধা চেনে। এখন ঘোড়াই কেন বাছা হল? এই জায়গাতেই মাইথলজির ভূমিকা। সব কিছুর ব্যাখ্যা থাকবে না,

একটা কিছু বেছে নিতে হবে, তাই ঘোড়াকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এবার ঘোড়ার রঙ দিতে হবে। মহম্মদ আল্লার কাছে যাচ্ছেন তাই লাল রঙ, কালো রঙ তো চলবে না, কারণ লাল আর কালো রঙ সব সময় অশুভের প্রতীক। তাই ধবধবে সাদা ঘোড়া হতে হবে। মহম্মদ কি রঙের পোশাক পড়েছিলেন? তিনিও ধবধবে সাদা বস্ত্র পরিধাণ করেছিলেন। কারণ সাদা শুদ্ধতার প্রতীক। মাইথলজি তৈরী হয়ে গেল। সৃজনশীল কবি বা সাহিত্যিকদের যদি বুদ্ধি ও প্রতিভা থাকে তাহলে তাঁরা চলতে ফিরতে সব জিনিষকে ডান দিক বাম দিক করে দিতে পারেন। এতে মানুষের মনের নানা রকম সংশয় জিজ্ঞাসা শান্ত হয়ে যায়।

আমাদের খুব নামকরা মাইথলজি হল পুরীর জগন্নাথ দেবের দারুমুর্তি, বলা হয় বিশ্বকর্মা এই মূর্তি তৈরী করেছিলেন। সত্যিই কি বিশ্বকর্মা বানিয়ে ছিলেন কিনা কে জানে! আর বিশ্বকর্মা বলে আদৌ কোন দেবতা আছেন কিনা আমরা কি করে বলব! এখন আমি যদি বলি বিশ্বকর্মা বলে কিছু নেই। কিন্তু বিশ্বকর্মা বলে কোন দেবতা নেই বলার আগে আমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে বিশ্বকর্মা বলে কেউ নেই। আমি কি ভালো করে খতিয়ে দেখেছি বিশ্বকর্মা বলে কেউ নেই, আমি কি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে, সব অন্দরমহল ঘুরে ঘুরে দেখেছি স্বর্গ বলে কিছু নেই? যেমন 'হ্যাঁ'র প্রমাণ আছে তেমন 'না' এরও প্রমাণ আছে। গণিত শাস্ত্রে 'না'র প্রমাণকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুধু না বলে দিলেই গণিতজ্ঞ মানবেন না। তার জন্য আপনাকে নেগেট করতে হবে। আমি বললাম এটা বোতল, আরেকজন বলল না না, এটা বোতল নয়, এটা পিরামিড। তখন তাকে প্রমাণ করতে হবে যে এটা বোতল নয়, কারণ আমি দেখছি পিরামিডের যে সংজ্ঞা সেই অনুযায়ী এর সাথে খাপ খাচ্ছে না। আপনি একটা জিনিষ দেখেননি, তাই বলে সেই জিনিষটা নেই বলে প্রমাণিত করা যাবে না। আপনি বলছেন আপনার যে যুক্তি তার সাথে এটা মিলছে না। কিন্তু আপনার যুক্তিই যে চূড়ান্ত যুক্তি হবে তা তো হতে পারে না।

ভারতের একশ কুড়ি কোটি জনসংখ্যার মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষও মানুষ পাওয়া যাবে না যারা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক সচেতন। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ কি নিয়ে থাকবে! এদের পুরাণ ছাড়া আর কোন অবলম্বন নেই। এই কারণেই ভারতে পুরাণ এত জনপ্রিয়। আঠারোটি পুরাণে যা কিছু মাল-মশলা আছে এই দিয়েই পুরো ভারতের মানসিক চাহিদার পূরণ হয়ে যাচ্ছে। পৌরাণিক ভাবধারা যে ভারতেই আছে তা নয়, বিশ্বের যেখানে যেখানে ধর্ম আছে সেখানেই পৌরাণিক ভাবধারা থাকতে বাধ্য, আর এই ভাবধারা দিয়েই তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির সব কিছু পুষ্টি লাভ করছে। এমনকি যে বৌদ্ধ ধর্ম নিজেকে খুব যুক্তিবাদী বলে, তাদেরও এত মাইথলজি আছে যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সাক্ষাৎ ভগবান বুদ্ধের জীবনকে নিয়ে কত যে মাইথলজি তৈরী হয়েছে ভাবাই যায় না, তিনি এখানে এই অলৌকিক কাজ করেছিলেন, সেখানে এই চমৎকারী দেখিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধের যখন জন্ম হল তখন নাকি সাদা হাতি করে ইন্দ্র এসেছিলেন ইত্যাদি। কারণ মানুষ মিথ্ ছাড়া বাঁচতেই পারে না, আর যারা ধর্মজীবন পালন করছেন তাদের পক্ষে তো মিথ্ ছাড়া বাঁচা অসম্ভব।

অনেকের মত বিদেশীরা যে অর্থে মিথ্ বলে আমাদের পুরাণ সেই অর্থে মিথ্ নয়। এটা যে একেবারেই ভুল বলছেন তা নয়। সাহিত্য, শিল্প নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা বলেন সাহিত্য ও শিল্পে অনেক ধরণের শৈলী আছে। যেমন পিকাসো, ভ্যান গগ্ বা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মত যত বিখ্যাত শিল্পী আছেন তাঁদের প্রত্যেকের সৃষ্টিতেই নিজস্ব একটা শৈলী আছে। মজার ব্যাপারে হল প্রথম দিকে সাহেবরা ভারতে এসে অজন্তা ইলোরা এবং অন্যান্য মন্দির গাত্রে যত চারুকলা ও পাথরের মুর্তি ছিল তার খুব নিন্দা করতে শুরু করল। এমনকি ভারতের বিখ্যাত নটরাজের মুর্তি ও পার্বতীর মুর্তির শিল্পকলাকে এমন নিন্দা করতে শুরু করল যেন এগুলো কোন শিল্পকর্মের মধ্যেই গণ্য করা যায় না। এই নিয়ে পরে অনেক গবেষণাদির পর পাশ্চাত্যের অনেক শিল্পীর বক্তব্য হল ভারতের শিল্প কলাই প্রকৃত চারুশিল্প। এক সময় পাশ্চাত্যে Realistic Art এর খুব চল হয়েছিল, Realistic Art মানে একটি মানুষকে যেমনটি দেখতে ঠিক তেমনটি তার ছবি আঁকা হল, এরপর বিচার হবে ছবিটি কত ভালো হয়েছে। ভারতে কখনই এই জিনিষকে আর্ট বলা হত না। ভারতের কিছু

শিল্পী আবার Realistic Art কেই কদর করে গেছেন। স্বামীজী Realistic Art একেবারেই পছন্দ করতেন না, তাঁর মতে এটা কোন আর্টই নয়।

তাহলে চারুকলা বলতে আমরা কোন্ শিল্পকে বলব? কোন মানুষ বা দেব-দেবীর মুর্তি বা ছবি যখন তৈরী করা হয় তখন তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটুকু আছে সেটাকে তুলে নিয়ে ছবি বা ভাস্কর্য শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। যেমন যখন নারীর চোখের সৌন্দর্যের কথা বলা হয় তখন নারীর চোখকে হরিণের চোখের সাথে তুলনা করে বলা হয় তার হরিণের মত চোখ। কোন শিল্পী যখন নারীর চোখের এই সৌন্দর্যকে ছবি বা মুর্তির মধ্যে ফুটিয়ে এমন একটা ভাবকে তুলে ধরেন যা কিনা বাস্তবে ওই চোখ কোন নারীর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের যত দেব-দেবীর রূপের মাধুর্যকে মুর্তি বা ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ওই রূপ কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে না। দেব-দেবীর মুর্তি বা ছবির মধ্যে যে রূপ আমরা পাই, সেই রূপটা হল সৌন্দর্যের একটা আদর্শ প্রতীক। পুরাণ হল ঠিক তাই। মানব জীবনের দৈনন্দীন স্বাভাবিক ঘটনাগুলোকে নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয় সেই সাহিত্য পাঠক একবার পড়ে নেওয়ার পর ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। উপনিষদে ঠিক একই সমস্যা হয়, যদিও এখানে সত্যকে অন্য দিক দিয়ে দেখান হয়। আধ্যাত্মিক সত্যগুলো যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি উপনিষদে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সত্যগুলোর উপর তাঁরা যে একটু রঙ চড়াবেন, এদিকটা একটু বাড়িয়ে দেবেন, ওই দিকটা একটু টেনে ছোট করে দেবেন, এই জিনিষগুলো তাঁরা কোথাও এতটুকু কিছু করেননি। ইতিহাস যেমন অনেকরই পছন্দের নয় কিন্তু সেই ইতিহাসকে যখন কাহিনীর পর কাহিনী সাজিয়ে বলা হয় তখন সবাই সেটাই খুব আগ্রহ সহকারে পাঠ করে।

উপনিষদ বা গীতাতে ঠিক একই সমস্যা হয়। সামাজিক, ব্যক্তি ও পরিবারের স্বাভাবিক ঘটনা যেমনটি আছে তেমনটি ভাবে উপস্থাপনার দ্বারা কখনই সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্য না হয়ে সেটা হয়ে যায় একটা পাঠ্য। ঠিক তেমনি উপনিষদ বা গীতা হল আধ্যাত্মিক জগতের পাঠ্য পুস্তক, যে রকমটি আছে ঠিক সেই রকমটি দিয়ে দেওয়া হল। এর মধ্যে জাগতিক উপাদান না থাকার জন্য এবং চিন্তন জগতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চমানের হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ গীতা উপনিষদের থেকে দূরে দূরেই থেকে গেছে। গীতা উপনিষদের গভীর তত্ত্বকে ধারণা করার জন্য চাই মননশীল মস্তিষ্ক এবং ধ্যানমুখী ও কর্মময় জীবনের সমন্বয়। সাধারণ মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক সত্যকে তাহলে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যাবে? তখন আমাদের ঋষিরা আধ্যাত্মিক এই সত্যগুলোকে নিয়ে মিথস্ তৈরী করলেন। আধ্যাত্মিক সত্যের সাথে তাঁরা কোথাও আপোষ না করে আর্টের মাধ্যমে সেই সত্যকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গেলেন। আর্টের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের মিথস্ তৈরী করতে হচ্ছে, আর মিথস্ যখন তৈরী করলেন তখন তার মধ্যে কাব্যের যত ধরণের রসবোধ হতে পারে, বীরত্বের রস, সৌন্দর্যের রস, ভয়ের রস, ঘৃণার রস, ক্রোধাত্মক রস, এই রসগুলোকে নিয়ে একটা ব্যক্তির মধ্যে স্থাপন করে সেই রসকে তত দূর ঠেলতে থাকলেন যত দূর পর্যন্ত মানুষ গ্রহণ করতে পারবে। এইভাবে ঠেলার পর তার উপর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পোশাক চাপিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে দিলেন।

যেমন আধ্যাত্মিক সত্য বলছে জ্ঞান ও বৈরাগ্য না থাকলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হবে না। ভাগবতের আলোচনার প্রথমেই আমরা একটা কাহিনী পাই যেখানে এই সত্যটাকেই একটা সুন্দর কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়েছে। ভক্তিকে একটি নারীর মূর্ত রূপ দিয়ে দেওয়া হল, আর তাঁকে দুটি সন্তানও দিয়ে দেওয়া হল, এদের নাম জ্ঞান আর বৈরাগ্য। কলিযুগের মানুষ যেখানে ঈশ্বরের প্রতিই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে সেখানে তাদের ভক্তি আসবে কোথা থেকে! তাই দেখান হচ্ছে ভক্তি যুবতী মেয়ে অথচ তার সন্তান দুটি ঘাটের মড়ার মত পড়ে আছে। ভক্তি সন্তানের জন্য কেঁদেই চলছে, নারদ এসে সব শোনার পর ভক্তিকে বললেন আমি তোমার ঘাটের মড়া এই দুটি সন্তানকে সতেজ করে দেব। এরপর নারদ এদের বেদ বেদান্তের কথা বলতে শুরু করেছেন, কিন্তু কিছু প্রতিক্রিয়া হল না। পরে সনৎকুমার এসে নারদকে বললেন 'কিছু না শুনিয়ে এদের তুমি ভাগবত শোনাও'। এই জায়গাতেই পুরাণের মূল সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। নারদ বলছেন 'ভাগবতে তো শুধু সেই কথাই আছে বেদ, বেদান্ত আর গীতাতে যা আছে, আমি সেই কথাই এদের শুনিয়েছি

কিন্তু তাতেও তো কিছুই হল না'। সনৎকুমার তখন বললেন 'তুমি ঠিকই বলেছ ভাগবতে যা আছে, বেদ, বেদান্ত ও গীতাতেও একই কথা আছে, কিন্তু ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে, শ্রীকৃষ্ণের কথা মানে ভক্তির কথা, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির কথা শুনলেই এরা আবার হারানো বল ফিরে পাবে'। এখানে মূল কথা হল, পুরাণের যা বক্তব্য ঠিক সেই একই বক্তব্য বেদ-বেদান্তেও পাওয়া যাবে। কিন্তু পুরাণে এসে বক্তব্যর পরিবেশনটা পদ্ধতিগত ভাবে পাল্টে যাবে। এটাই মিথ্। সাধারণ মানুষ মিথ্ খুব মন দিয়ে শোনে। কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিতাপের যে, পুরাণের আধ্যাত্মিক সত্যগুলোকে নিয়ে ভাগবত কথাকাররা কখনই আলোচনা করেন না, তাঁরা কাহিনীর উপর বেশী জোর দেন। যেমন রাসলীলা পাঠের সময় গোপীদের বর্ণনাই শুধু করে যাবেন। স্বামীজী মজা করে বলছেন, এই বোষ্টমগুলো খুব করে মালপো খায় আর হজম করার জন্য খুব করে নাচতে থাকে। দ্বিতীয় মজা করে বলছেন, কীর্তন করতে করতে যে চোখের জল বেরোয় আসলে তখন নিজেদের স্ত্রীদের কথা মনে করে চোখের জল বেরোতে থাকে। স্বামীজী এই ধরণের আবেগকে কতটা অপছন্দ করতেন এগুলো তারই নমুনা। সাধারণ মানুষের এটাই সমস্যা। যখন তারা ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের নানা রকম লীলাকথা শুনছে তখন তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতি মন না গিয়ে তাদের অপূর্ণ কামনা-বাসনার দিকে মনটা চলে যাচ্ছে। অথচ যত পুরাণ আছে সব পুরাণের উদ্দেশ্য হল সহজ সরল কাহিনীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্বগুলোকে সাধারণ মানুষের মাথার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া।

ফরাসী শিল্পী রোঁদা এক সময় ভারতে এসেছিলেন। রোঁদাকে ভারতের লোক খুব বেশী জানতো না। একবার চেন্নাইয়ের একটি সংগ্রহশালায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা নটরাজের মুর্তির দিকে তাঁর দৃষ্টি চলে যায়। তিনি ওই নটরাজের মুর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই তিনি একটা ভাবের অবস্থায় চলে যান। তারপর দেখা গেলে তিনি ঠিক নটরাজের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন সাহেব নটরাজের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে এই দৃশ্য দেখে সংগ্রহশালায় যত দর্শক এসেছিল সবাই তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হৈ চৈ শুনে ওখানকার কিউরেটার, যিনি একজন বৃটিশ নাগরিক ছিলেন, দৌড়ে এসে রোঁদাকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। পরে তিনি দেখেন – আরে ইনি তো রোঁদা, পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পী। পরে রোঁদা নিজের একটি লেখাতে নটরাজ মুর্তি সম্বন্ধে বলছেন This is the best sculpture in the world। ভাস্কর্য বলতে কি বোঝায় নটরাজ হল তাই। নটরাজের শিল্পের উপর যত প্রবন্ধ লেখা হয়েছে অন্য কোন ভাস্কর্যের উপর তা হয়নি। একটা গভীর ভাবকে কিভাবে ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে নটরাজের মুর্তি সেটাকে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মানুষ নটরাজ মুর্তির বাইরের আঙ্গিক রূপটাকেই দেখে ছেড়ে দেয়। এইভাবে একটা শিল্পকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সেইজন্য পুরাণাদি পাঠ করে তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যকে ধারণা করা খুব কঠিন কাজ। কাহিনীর মাধ্যমে পুরাণ কি আধ্যাত্মিক সত্যকে বলতে চাইছে যতক্ষণ না ধরতে পারা যাবে ততক্ষণ পুরাণ পাঠের কোন সার্থকতা থাকবে না।

পুরাণ রচয়িতারা যে কাহিনীগুলো রচনা করেছিলেন, সেই কাহিনীগুলো আগে থাকতেই সমাজে প্রচলিত ছিল। প্রচলিত কাহিনীর যে চরিত্রগুলোকে তাঁরা সামনে পেলেন, সে যে অবস্থাতেই পেয়ে থাকুন, ভালো মন্দ যাই হোক, সেখানে তাঁদের কল্পনাকে এমনভাবে প্রয়োগ করলেন যে দেখা গেল যাকে ভালো করবেন তাকে সব ভালো জিনিষগুলো উজার করে ঢেলে দিলেন আর যাকে খারাপ করতে চাইলেন তার মধ্যে যত খারাপ গুণ হতে পারে সব খারাপ গুণ ঢেলে দিলেন। ধরুন শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ কোন একটা চরিত্র ছিল, পুরাণ রচয়িতারা এখন তাঁর মধ্যে যত রকমের ভালো গুণের কল্পনা করা যেতে পারে সব ঢেলে দিয়ে গেছেন। ঠিক তেমনি কংস বা রাবণের মত চরিত্রের ক্ষেত্রে খারাপ গুণ যা কিছু কল্পনা করা যেতে পারে তার সব কিছু ঢেলে গেছেন। এটাই হচ্ছে পুরাণের বিশেষত্ব।

ইতিহাস মূলক শাস্ত্র বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের চরিত্রে যেমন অনেক দুর্গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে সাথে রাবণের অনেক ভালো গুণের বর্ণনা করতে বাল্মীকি কার্পণ্য করেননি। পুরাণে এই জিনিষ কখনই দেখা যাবে না। এখানে ভিলেন ভিলেনই, ভিলেনের মধ্যে ভালো গুণ কিছু থাকতেই পারেনা। মানবিক চরিত্রের

বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সাদা কালো মেশানো, কিন্তু পুরাণে সব চরিত্রই হয় পুরো সাদা নয়তো পুরো কালো, হয় তুমি বিরাট, নয়তো তুমি বরবাদ। সেইজন্য পুরাণকে কখনই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য বলা যেতে পারে না। এই কারণে যাঁদের একটু বিদ্যা বুদ্ধি আছে তাঁরা পৌরাণিক চরিত্রগুলোকে অত আক্ষরিক ভাবে নেন না। অন্য দিকে সাধারণ মানুষের এত তুলনাত্মমূলক বিচার করার ক্ষমতা নেই। সাধারণ মানুষের মন স্থূল চিন্তা জগতেই ঘোরাফেরা করে। সাধারণ মনকে যখন কিছু বলা হয় তখন কোন দাগ কাটে না, সেইজন্য জোর গুঁতো মারতে হয়। গুঁতো মারাটা কি রকম? হয় তাকে পুরোটা সাদা করে দিয়ে বলো নয়তো পুরোটাই কালো করে দিয়ে বলো। তখন সে মনে করবে হ্যাঁ এইবারে একটা কিছু হচ্ছে কিন্তু যদি সাদা-কালো মিশিয়ে বলে দেওয়া হয় তখন সেটাকে বুঝতে যে বিচার বুদ্ধি দরকার সেই ক্ষমতাই তার নেই। এই কারণে প্রায়ই অনেকে প্রশ্ন করে – আচ্ছা রাম কেন সীতাকে বনে পাঠিয়েছিলেন? রামচন্দ্র বালিকে কেন লুকিয়ে বধ করলেন? কারণ সাধারণ মানুষ মানতেই চায় না যে মানুষের চরিত্র সব সময় সাদা-কালোতে মেশানো থাকে। পুরাণে শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান রূপে দেখানো হয়েছে, ভগবানের কোন দোষ থাকতে পারে সাধারণ মানুষ মানতেই চাইবে না। এই কারণে পুরাণের কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে এত জনপ্রিয়।

পুরাণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাকে নিয়ে পুরাণ তার কাহিনীগুলোকে দাঁড় করিয়েছে। যেমন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। বিজ্ঞানের সুবাদে আজ আমরা জানি বিদ্যুৎ কেন চমকায়। কিন্তু তখন বিজ্ঞানের এত কিছু কেউ জানতেন না, বিদ্যুতের এই ঘটনাকে তাঁরা দেবতা, ভগবান, স্বর্গের সাথে জুড়ে দিয়ে কল্পনার জালবুনে একটা কাহিনীকে দাঁড় করিয়ে মানুষের মনকে ধর্ম ও ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দিলেন। আলোচনার শুরুতেই আমরা উল্লেখ করেছি যখন কোন ঘটনাকে ভগবানের সঙ্গে বা দেবতার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে আধ্যাত্মিক রূপ দেওয়া হয় তখনই সেই কাহিনীকে বলা হয় পুরাণ বা ***mythology***। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যদি আধ্যাত্মিকতা, দেবতা ও ঈশ্বরের মেলবন্ধন না থাকে তাহলে সেই কাহিনীকে কল্প-কাহিনী বা রূপকথার গল্প বলা হবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিক্রমাদিত্যের বেতাল-পঞ্চবিংশতির কাহিনীতে অনেক অপ্রাকৃতিক জগতের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সবই ভূতে-প্রেত এইসব নিয়ে, এগুলো সবই কল্প-কাহিনী। কিন্তু যখনই ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি দেবতাদের নিয়ে অপ্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে একটা কাহিনীর আকারে রূপ দিয়ে মানুষকে ধর্মের দিকে নিয়ে যাবে তখনই সেই কাহিনীকে পৌরাণিক কাহিনী আখ্যা দেওয়া হবে। বহুল সমাদৃত ধর্ম তখনই হবে যখন দর্শনের সাথে পৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশ হবে, যে ধর্ম শুধু মাত্র দর্শনের কথাই বলে সেই ধর্মের জনপ্রিয়তা কখনই হয় না। হিন্দু ধর্মের এটি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বেদের সময় থেকেই দর্শন আর পুরাণকে সম্পূর্ণ আলাদ করে রাখা হয়েছিল। সেই থেকে উপনিষদ আর বেদান্তকে ধর্মের প্রধান অঙ্গ রূপে দেখা হত, যেখানে হিন্দুধর্মের মূল দর্শন সুরক্ষিত ছিল। উপনিষদই হল হিন্দুধর্মের মূল দর্শন, আর পুরাণ থেকে উপনিষদকে অনেক দূরেই রাখা হয়েছিল। কিন্তু দর্শনকে যখন পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে নিয়ে আসা হল তখনই সেই ধর্ম বেশি জনপ্রিয়তা পেয়ে গেল। দর্শন যদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয় তাহলে পুরাণ হিন্দী সিনেমার ক্লাসিক গান। তবে এটাই আশ্চর্যের যে, পৃথিবীর সব ধর্মই এখন জনপ্রিয় ধর্মের পর্যায়ে চলে গেছে, একমাত্র হিন্দুধর্ম ছাড়া। অন্যান্য ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ পৌরাণিক কাহিনীর সাথে মিশে গেছে, আর যে মুহূর্তে ধর্মের সারতত্ত্বকে পুরাণের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে তখনই সেই ধর্মের জনসমাদর প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে যাবে। স্বামীজীও বলছেন বেদান্তের সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কোন ধর্মগ্রন্থ আজ পর্যন্ত কোন ধর্মেই পাওয়া যাবে না, খ্রীশ্চান, এমনকি বৌদ্ধধর্মও বেদান্ত উপনিষদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এটা বলার এই উদ্দেশ্য নয় যে খ্রীশ্চান বা বৌদ্ধ ধর্ম যা বলছে উপনিষদ অন্য কথা বলছে, সবাই একই কথা বলছে, কিন্তু উপনিষদের উপস্থাপনার শৈলী, তার বক্তব্যের বলিষ্ঠতার কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

পুরাণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল কোন পুরাণেই তার অধ্যায়ের মাঝখানে কেউ কিছু সংযোজন করবেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এই ব্যাপারে ভারতীয় পণ্ডিতদের সততার খুব প্রশংসা করেন। তাঁরা যখনই পুরাণে কোন নতুন কিছু সংযোজন করতেন সব সময়ই হয় শুরুতে নয়তো একেবারে শেষে করতেন। অনেক মনে করেন সূতরাই পুরাণে অনেক কিছু সংযোজন করে গেছেন। কিন্তু এই মতটা ঠিক নয়। সংযোজনের এই কাজটা

তাঁরাই করতেন যাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্যের সাথে সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল আর তাঁর কাছে পুরাণের একটি পাণ্ডুলিপিও থাকা চাই।

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ

পাঁচটি লক্ষণ দিয়ে নির্ধারিত হয় এই শাস্ত্রগুলো পুরাণ আর এই শাস্ত্রগুলো পুরাণ নয়। অমরকোষ নামে একটা সংস্কৃতের অভিধান আছে, যেখানে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যে কোন পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ থাকতে হবে। প্রথম লক্ষণ সর্গ – প্রত্যেকটি পুরাণে মূল সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তার বর্ণনা থাকবে। মূল সৃষ্টি বলতে বোঝায় ভগবান বিষ্ণু বা ব্রহ্মা কিভাবে সব কিছু সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় লক্ষণ প্রতিসর্গ – সৃষ্টির সংহার কিভাবে হয়। সব পুরাণেই এই সংহারের বর্ণনা থাকবে। তৃতীয় লক্ষণ মন্বন্তর – একটা মূল সৃষ্টি আছে, এই মূল সৃষ্টির মধ্যে আবার কোথাও কোথাও ছোট ছোট সৃষ্টি হচ্ছে আবার সংহার হচ্ছে। যেমন মানুষ একশ বছর পর্যন্ত বাঁচে। ঠিক তেমনি মানুষের একশ বছরে দেবতাদের একটি দিন। দেবতাদের একটি রাতও সেই হিসাবে মানুষের একশ বছর। এইভাবে দেবতারা একশ বছর বাঁচবে। দেবতাদের এই একশ বছরে ব্রহ্মার একটা দিন। ব্রহ্মা তাঁর একটা দিনে সারা দিন কাজ করে রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়েন, তখন দেবতা, মানুষ থেকে শুরু করে সব জীবের লয় হয়ে যায়। এই লয় হওয়াটা একটা ছোট্ট সংহার। এইভাবে ব্রহ্মা একশ বছর বেঁচে থাকার পর একটা মূল সংহার হয়ে যায়। এখানে দুই ধরণের লয় হচ্ছে, একটা সাময়িক লয় আরেকটা চূড়ান্ত লয়। সমস্ত পুরাণে এই দুটো লয়ের বর্ণনা থাকবে। ব্রহ্মা যখন প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে একবার করে জাগ্রত হচ্ছেন, তার কিছু দিন পর একজন মনু এসে সৃষ্টির সব কিছুর দায়ীত্ব গ্রহণ করেন। বলা হয় সৃষ্টির একটি সাময়িক চক্রে একজন মনু হলেন সৃষ্টির ঠিক ঠিক রাজা। এইভাবে একটা মূল সৃষ্টিতে নাকি চৌদ্দজন মনু হন। প্রত্যেক মনুকে নিয়ে যে কাহিনী তৈরী হয়েছে সেই কাহিনীকে বলা হয় মন্বন্তর। আমার এখন অষ্টম মন্বন্তরে আছি। এরপর আরও ছটি মন্বন্তর বাকি আছে, এরপর সৃষ্টির মূল সংহার হয়ে যাবে। এনাদের সব হিসাব করা আছে এত দিন পরে সংহার হবে, তারপর আবার এত দিন পর থেকে আবার সৃষ্টি শুরু হবে।

কি ভাবে এর হিসাব করা হয় আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ছেলে বাপের জন্মের কথা কি করে বলবে, কারণ বাবার জন্মের পর ছেলের জন্ম হয়েছে। সেইজন্য বেদের নাসদীয়সূক্তে ঋষি বলছেন *কো অদ্ধঃ বেদা*, তখন দেবতাদের জন্ম হয়নি, ঋষিদের জন্ম হয়নি তাহলে মানুষ কি করে বলবে কবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে বলছেন, তোমার তখন জন্মই হয়নি তুমি কি করে জানবে সৃষ্টির আগে কি ছিল, সৃষ্টি কবে শুরু হল! সেইজন্য কি করতে বলছেন? পুরাণে যখন একবার যেটা বলে দেওয়া হয়েছে ওটাকে মেনে নাও, এরপর আর বেশী চিন্তা করে মাথা খারাপ করতে যেও না। এনারা দেখছেন মানুষ যখন রাত্রিবেলা রোজ ঘুমিয়ে পড়ে তখন সেদিনের সব কিছু যেন শেষ হয়ে গেল। পরের দিন যখন আবার ঘুম থেকে উঠছে তখন আবার নতুন করে যেন সব শুরু হল। ঠিক তেমনি ব্রহ্মা যখন ঘুমিয়ে পড়লেন তখন পুরো প্রকৃতিও যেন নিদ্রায় চলে গেল। কিছু দিন আগে সৃষ্টির উপর গবেষণালব্ধ একটি বিজ্ঞানের বইতে বলছে সৃষ্টির ব্যাপারে পৌরাণিক সময়গুলো যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কোথায় যেন সেই সময়গুলো হিসাবে মিলে যাচ্ছে। অবশ্য বিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস রাখা যায় না, আজকে যেটা ওরা বলবে আগামীকাল আরেকটা থিয়োরী এনে আগের থিয়োরীটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে। তবে সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দুদের এত থিয়োরী রয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা যত রকম থিয়োরীই নিয়ে আসুন না কেন, সব কটিই পুরাণের কোন না কোন একটা থিয়োরীর সাথে মিলে যাবে। আগামীকাল যদি বিজ্ঞান বলে দেয় সৃষ্টি বলে আদৌ কিছু নেই, তখন আমাদের পণ্ডিতরা বলবেন মাণ্ডুক্যকারিকাতে পাঁচ হাজার বছর আগেই এই কথা বলে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুরা একটাই বিজ্ঞানীদের থিয়োরী মানবে না, সেটা হল বিজ্ঞানীরা বলছেন সৃষ্টি যেটা হয়েছে সেটা চিরন্তন। কিছু দিন আগে বিজ্ঞানে Steady and Stay নামে একটা থিয়োরী এসেছিল, তাতে বলছে এই সৃষ্টি চলতেই থাকবে, কোন দিন এর নাশ হবে না। আইনস্টানেরও একটা নিজস্ব মত ছিল যেখানে তিনি বলছেন, এই সৃষ্টি ভগবানের কিনা, তাই এর নাশ হতে পারে না, সৃষ্টি সব সময় steady। হিন্দুরা এই মত কখনই

গ্রহণ করবে না। হিন্দুরা বলবে যার জন্ম আছে তার মৃত্যু অবশ্যই হবে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি যখন হয়েছে, তখন এর লয় হবেই। হিন্দুদের সৃষ্টির লয়কে যদি মেনে নেওয়া হয়, এরপর যে যা থিয়োরী নিয়ে আসুক সব হিন্দুদের কাছে আগে থাকতেই আছে। শুধু সৃষ্টিকে চিরন্তন হিন্দুরা কখনই মানবে না।

মন্বন্তর হল পিরিয়ডিক্যাল সৃষ্টি আর তার লয়। মনে করুন এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে থেকে একজন এই সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি দেখছেন ব্রহ্মার একটা দিন শেষ হয়ে রাত্রি এল, তারপর হঠাৎ দেখলেন ব্রহ্মা রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়তেই পুরো সৃষ্টিটা তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। আবার ব্রহ্মার একটা রাত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যখন তিনি ঘুম থেকে উঠলেন তখন দেখছেন আবার সৃষ্টিটা জেগে উঠল। গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান periodic creationএর ঠিক এই ধারণাটা নিয়ে এসেছেন – *ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*। আর ব্রহ্মার যখন একশ বছর হয়ে যাবে তখন মূল প্রলয় হয়ে যাবে। তারপরে আবার ব্রহ্মা কবে আসবেন সেটা আর পুরাণ বলছে না। মানুষের বছর হিসাবে ব্রহ্মার আয়ু হল তিরিশ সংখ্যার পর তেরোটা শূন্য বসালে যত সংখ্যা হবে তত বছর (৩০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০)। এটা গেল মন্বন্তর।

চতুর্থ লক্ষণ হল বংশ। ভারতে দুটো খুব নামকরা বংশ প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এই দুটো বংশকে প্রধান বংশ বলে মনে করা হয় – সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ। সূর্যবংশের খুব নামকরা ব্যক্তিত্ব হলেন শ্রীরামচন্দ্র আর চন্দ্রবংশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হলেন শ্রীকৃষ্ণ। এখানে ছোট বড় কিছু নেই, দুটো বংশেরই নিজস্ব কতকগুলো ধারা আছে। পুরাণ এই দুটো বংশের বর্ণনা করে। বাল্মীকি রামায়ণে সূর্যবংশেরই বেশী বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য দিকে মহাভারতে চন্দ্রবংশের আলোচনা বেশী করা হলেও সূর্যবংশেরও কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পুরাণে পুরো তালিকা দেওয়া আছে, ব্রহ্মা থেকে কিভাবে কিভাবে সৃষ্টি হয়ে হয়ে কোন জায়গায় এসে সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশ আলাদা হয়ে গেল। কিভাবে চন্দ্র ও বুধের মিলন হল, তারপর সেখান থেকে কিভাবে সৃষ্টি এগোল এসবের বিশাল বর্ণনা করা হয়েছে। যে কোন পুরাণকে এই দুটো বংশের তালিকা দিতে হবে।

পঞ্চম লক্ষণ হল বংশানুচরিত। পুরাণে কিছু কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রের বর্ণনা থাকবে। যেমন রাজা পরীক্ষিৎ, রাজা পরীক্ষিৎকে আমরা কখনই পৌরাণিক চরিত্র বলতে পারি না। অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির এনারাও ঐতিহাসিক চরিত্র। হিন্দুরা কখনই এদের পৌরাণিক চরিত্র বলবে না, এনারা হলেন একেবারে রক্তমাংসের মানুষ। পুরাণে এই ধরণের কিছু চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্র্যাজিপ্টর নামে নামকরা একজন ইতিহাসবিদ্ পুরাণকে আধার করে একটা লেখাতে তিনি পুরো তালিকা তৈরী করে দেখিয়েছেন কোন ঘটনা কবে হয়েছে, যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ কবে হয়েছে, মহাভারতের যুদ্ধ কবে হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনা গুলিকে একবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পঞ্চাশ কি একশ বছর আগেকার ইতিহাসবিদরা পুরাণের এই ঘটনাগুলোকে মানতেন না। কিন্তু বর্তমান কালের ইতিহাসবিদরা পুরাণকে পুরোপুরি না নিলেও একেবারে উড়িয়েও দেন না। যখন দেখেন পুরাণের এই ঘটনা ইতিহাসের সাথে মিলে যাচ্ছে তখন সেই ঘটনাকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। যদি না মেলে তখন খতিয়ে দেখেন কেন মিলছে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ওনারা মানছেন না কিন্তু পুরাণের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে ওনারা মানবেন।

পুরাণ বংশ নিয়ে আলোচনা করতে করতে একেবারে চলে যাবে মাইথলজিতে, যেখানে আর কোন ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার সেখান থেকে নামিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। যেমন ধরুন আমি কোন ভাবে খুব বিখ্যাত কোন ব্যক্তিত্ব হয়ে গেলাম। এবার কেউ হয়তো আমার জীবনী লিখতে বসেছে। আমার জীবনী লিখতে তার কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। শুরুতে আমার বংশের কথা লিখতে গিয়ে হয়তো আমার বাবা-মা পর্যন্ত যাবে, তা নাহলে খুব জোর আমার ঠাকুর্দা পর্যন্ত যাবে। আর আমার বংশে অনেক পুরুষ আগে যদি কেউ বিখ্যাত হয়ে থাকেন, তখন না হয় সেখান থেকে লেখা শুরু হবে। এটাই যখন পুরাণে রূপান্তরিত হবে তখন শুরু করতে হবে ভগবান থেকে। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি মন থেকে এই সৃষ্টি করলেন। সেই সৃষ্টি থেকে অমুক ঋষির জন্ম হল, সেই ঋষি থেকে অমুক বংশের সৃষ্টি হল, সেই হয়ে হয়ে নিয়ে এনে ফেলবে আমার জন্ম

কিভাবে হল। সেইজন্য কোথায় যে বংশ শুরু হচ্ছে আবার কোথা থেকে যে বংশানুচরিত শুরু হচ্ছে দুটোকে আলাদা করে ধরা খুব মুশকিল হয়ে যায়। আমার অস্তিত্বকে আমি দেখছি, আমার বাবা-মার কথা, আমার দাদু-ঠাকুরমার কথা সেটাও সত্য। কিন্তু এইভাবে টেনে কিছু দূর যাবার পর হারিয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু এখন যারা আছে তাদের সবারই আট থেকে দশ হাজার প্রজন্ম আছে, এটাও সত্য। ঠেলতে ঠেলতে যদি কেউ আট হাজার প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে যান তখন তাঁরা হয়তো কেউ খুব উন্নত ছিলেন বা উন্নত নাও হতে পারেন। শ্রীরামচন্দ্রের পর লব-কুশ হয়েছেন, কিন্তু লব-কুশের পর কারা এসেছিলেন তার কোন বিবরণ নেই। তাঁদেরই মধ্যে পরে হয়তো ক্ষত্রিয় বংশে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। এগুলো বলা খুব মুশকিল। কিন্তু পুরাণ যখন লিখবে তখন পুরো বংশ আর বংশনুচরিতকে মিলিয়ে লিখবে। মূল বংশানুচরিত অর্থাৎ আসল চরিত্রগুলোকে নিয়ে আসা হবে কিন্তু তার সাথে তাঁর বংশটাও বলে দেবে। হয়তো বংশের কিছুই জানেন না। কিন্তু এই বংশের ধারাগুলোকে তাঁরা আগে থাকতেই যে পৌরাণিক গাঁথা সমাজে মানুষের মুখে মুখে চলে আসছিল, সেইখান থেকে এর উপাদানগুলোকে নিয়ে আসেন। কাহিনীর শুরু হবে একেবারে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করেছিলেন সেইখান থেকে। এটি পুরাণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাল্মীকি রামায়ণে এত কিছুর বর্ণনা দেওয়া হয় না, মহাভারতে যদিও এই ধরণের কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যাবে কিন্তু পুরাণের মত এত বিশদ বর্ণনা আর কোথাও নেই।

পুরাণের উৎস

পুরাণের মূল উৎসটা কোথায় আমাদের খুব জানা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে আমাদের দুটো মত কাজ করে। একটা হল আমাদের পরম্পরা মত আর দ্বিতীয় হল আধুনিক পণ্ডিতদের মত। অনেকেই মনে করেন যে এগুলো নিয়ে বিচার করা অর্থহীন, কারণ কোন একটা যুক্তিকে দিয়ে কখনই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাবে না। সেই কারণে এনারা উপদেশ দেন পরম্পরাতে যেটা বলা হচ্ছে সেটাকেই মেনে নিতে। পরম্পরাতে বলা হয় ব্যাসদেব এই আঠারোটি পুরাণের রচয়িতা। ব্যাসদেব নিজে তাঁর সমগ্র জীবনে একা এত কিছু রচনা করেছেন চিন্তা করলেই আমাদের পরম্পরার মতের বাস্তবতার উপর একটু সন্দেহ আসে। এমনও হতে পারে ব্যাসদেব আঠারোটি পুরাণের মধ্যে কিছু শ্লোক, হয়ত আড়াইশ থেকে চারশোর মত শ্লোকে কিছু কাহিনী রচনা করে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ব্যাসদেবের পরে পরে তাঁর যাঁরা শিষ্যরা এসেছিলেন, তাঁরা এর মধ্যে অনেক কিছু সংযোজন করে গেছেন। যেমন ভাগবত পুরাণে কিছু কিছু অধ্যায় দেখলেই বোঝা যায় এগুলো পরের দিকে সংযোজিত করা হয়েছে। শুকদেবের অধ্যায়কে যদি আমরা এর মধ্যে নিয়ে নিই তাহলেও আরও দুটো তিনটে অধ্যায় আছে যেগুলো পরের দিকে ভাগবত পুরাণে যোগ হয়েছে। কারণ ব্যাসদেব যেটা শুরু করছেন সেটা অনেক পরে শুরু হচ্ছে। প্রথমে সূতরা বলছেন, পরে শুকদেব বলছেন। ব্যাসদেব যখন লিখবেন তখন তিনি তো বলবেন না যে, শুকদেব এই রকম বলছেন। আর শুকদেব পরীক্ষিৎএর অনেক আগের। তাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে পরের দিকে অনেক কিছু সংযোজন করা হয়েছে।

আধুনিক পণ্ডিতদের মত হল – প্রায় পাঁচশ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই পুরাণ সমূহ রচনা হতে শুরু হয়। আর আজকে আমরা যে ভাগবত গ্রন্থ পাচ্ছি এই ভাগবত আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে মোটামুটি এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে আবার ভবিষ্য পুরাণ আছে, যেখানে মোঘল রাজাদের বর্ণনা করে বলে দিয়ে গেছে যে ভবিষ্যতে এই রকম হবে। এবার আমরা মনে করতে পারি, ঋষিরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন বলে এত দূর পর্যন্ত বলতে পেরেছেন। কিন্তু ভারতের যে স্বাধীনতা আসবে সেই পর্যন্ত দৃষ্টিটা পৌঁছাতে পারেনি, কারণ তখন আবার ছাপাখানা খুলে গিয়েছিল বলে পরে যে পাতাগুলো সংযোজন করবে, সেটা আর সম্ভব হয়নি। আমাদের পণ্ডিতদের পুরাণে পাতার পর পাতা সংযোজন করার একটা প্রবণতা ছিল। বেদ উপনিষদে সংযোজন করার সুযোগ একেবারেই ছিল না, সেইজন্য এই কাজের জন্য পুরাণকেই তাঁরা উপযুক্ত মনে করে প্রচুর সংযোজন করে গেলেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্ আল বেরুনি তিনিও লিখে গেছেন – এখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যে জিনিষগুলো মুখস্ত করিয়ে দেওয়া হত সেখানে তাঁরা একটি অক্ষরও পাল্টাতেন না, কিন্তু লিখতে যদি কিছু দিয়ে দেওয়া হয় সেখানে তাঁর পাণ্ডিত্যকে জাহির করবেনই। আল বেরুনি বলছেন – আমি যদি কিছু লিখে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কপি করতে বলি, এরপর তিনি যখন কপি করে নিয়ে আসবেন তখন আমিই বুঝতে

পারবো না যে এটা আমার লেখা। এই ব্যাপারে ভারতীয় পণ্ডিতদের একেবারেই ভরসা করা যায় না। কিন্তু ওনারা মূল গ্রন্থের মাঝখানে কিছু সংযোজন করতেন না, তার সাথে মূল বক্তব্যকেও কখনই পাল্টাতেন না। যা কিছু ঢোকাবার হত তখন হয় সামনের দিকে নয়তো পেছনের দিকে এমন সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিতেন যে পরে কেউ বুঝতেই পারতেন যে এর মধ্যে কোনটা মূল আর কোনটা পরে ঢোকান হয়েছে।

সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য শঙ্কর তাঁর যে বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন সেখানে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পুরাণ থেকে প্রচুর শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এমনকি গীতা ভাষ্য শুরুই করছেন পুরাণের শ্লোক দিয়ে। এতেই বোঝা যায় আচার্যের সময়েই পণ্ডিতদের কাছে পুরাণের কত সম্মান ছিল। দ্বিতীয় আরও একটি মজার ব্যাপার হল 'পুরাণ' এই শব্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদেই এসে গিয়েছিল, অথর্ব বেদেও পুরাণ শব্দ এসেছে। পুরাণের সংজ্ঞা, যেটা আমরা পরম্পরাতে পাই, তা হল পুরনো হয়েও যেটা নতুনের মত সেটাই পুরাণ। এর আগে ভাস্কর্য, চিত্রকলা নিয়ে যখন আলোচনা করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যে, বস্তুর বিশেষ সৌন্দর্য রসটাকে ধরে নিয়ে সেই সৌন্দর্যের উপর রঙ রূপ চাপিয়ে চাপিয়ে ওই রসবোধকে অনেক দূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়ার পর যখন দেখেন একটা সীমার পর এই রসবোধকে আর ঠেলা যাচ্ছে না, তখন ওই অবস্থায় গিয়ে শিল্পী তাঁর ভাস্কর্য বা চিত্রকলাকে শেষ টান দিয়ে ছেড়ে দেন। এরপর এই সৃজনশীল সৃষ্টিটা আর কোন দিন পুরনো হবে না, যখনই কেউ এই শিল্প কর্মের দিকে দৃষ্টি দেবে তখন সে মনে করবে একেবারে নতুন কিছু যেন দেখছি। অথচ কোন হিরো হিরোইনের ছবি ঘরে লাগাবার পর রোজ রোজ একই ছবি দেখতে দেখতে বিরক্তি এসে যাবে। কিন্তু একটা নটরাজের মুর্তি ঘরে বছরের পর বছর, বংশের পর বংশ রাখা আছে, কেউ কখন বিরক্তি প্রকাশ করছে না। নটরাজের মুর্তিটা পুরনো কিন্তু তার মিথ্‌টা সব সময় নতুন। শুধু একজন দেখছে না, সবাই এই একই জিনিষ দেখছে। ঠিক এই কারণেই পুরাণের কথা গুলো অতি পুরনো কিন্তু যখনই শোনা হয় তখনই নতুনের মত লাগে।

ভারতের দুটি মহাকাব্য বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতে 'পুরাণ' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, আর দুটি মহাকাব্যের মধ্যে মহাভারতে 'পুরাণ' শব্দের ব্যবহার তুলনায় বেশী করা হয়েছে। তাই পুরাণ আমাদের পরম্পরাতে নতুন কিছু নয়, আমাদের যত প্রাচীন সাহিত্য আছে সেখানে 'পুরাণ' শব্দের ব্যবহার আগে থেকেই চলে আসছে। আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি যে, ধর্মের চারটি স্তম্ভের মধ্যে পুরাণ হল একটি অন্যতম স্তম্ভ। আমাদের পরম্পরাতে যত পৌরাণিক কাহিনীগুলো আগে থাকতেই বিভিন্ন সাহিত্যে, লোকের মুখে ছড়িয়ে ছিল সেগুলোকেই একটা জায়গায় একত্রিত করে সংগ্রহিত করে রাখা হল। এর মধ্যে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, কেউ যদি তার চিন্তা ভাবনা প্রসূত নতুন কিছু তত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিত সমাজে হাজির হয় তখন পণ্ডিতরা প্রথমেই বলবে – তোমার এই তত্ত্ব এর আগে কোথাও আছে কিনা দেখাতে হবে। বেদ-উপনিষদে যদি না থাকে তাহলে তোমার বক্তব্যকে মানা যাবে না। এখন সব কিছুই এগিয়ে যাচ্ছে, নিউরো বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে, বায়োলজি এগিয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন তথ্য আসছে। কেউ যদি ঠিক করে এগুলোকে আমি ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে নিয়ে আসব। উপনিষদে নতুন কিছু ঢোকান যাবে না, গীতাতেও নতুন কিছু সংযোজন করা যাবে না। এনারা তখন নতুন নতুন সব চিন্তা-ভাবনাকে পুরাণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। যার ফলে একদিকে কিছু লোক পুরাণের সব কথা মানবে, অন্য দিকে অনেকে পুরোপুরি মানবে না। একদিকে পুরাণের উপর সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড ভাবে নির্ভর করত আবার অন্য দিকে বলা হত পুরাণের সাথে বেদ বা উপনিষদের মধ্যে যদি কোথাও বিরোধ হয় তখন সেখানে পুরাণের কথা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ বেদ উপনিষদ হল প্রভু সংহিতা অন্য দিকে পুরানাদি হল সুহৃৎ সংহিতা। পুরাণ তোমার বন্ধুর মত, বন্ধুর কথা শুনতেও পার আবার নাও শুনতে পার। বেদ কিন্তু প্রভু, সবারই মালিক, প্রভুর কথা কখনই অমান্য করা যাবে না। ঠিক এই জায়গা থেকেই জন্মাদস্য দিয়ে ভাগবতের কথা শুরু হয়, সেটা মূল ভাগবতের আলোচনায় করার সময় ব্যাখ্যা করা হবে।

আঠারোটি পুরাণ কি ব্যাসদেবের একক রচনা?

ভারতের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি হিন্দু ধর্মকে যেন একা হাতে দাঁড় করিয়ে গেছেন। তিনি বেদকে বিভাজন করে গেছেন, ব্রহ্মসূত্র রচনা করে হিন্দু ধর্মের দর্শনকে একটা যৌক্তিক তত্ত্বের মধ্যে বেঁধে দিয়ে গেছেন, মহাভারত তাঁরই রচনা, আঠারোটা পুরাণ তাঁরই রচিত। তাই আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করতে সত্যিই কষ্ট হয় যে একজন লোকের পক্ষে একটি মানব জীবনে এত কিছু রচনা করা কি করে আদৌ সম্ভব? দ্বিতীয়তঃ এও সন্দেহ যে, মহাভারতের ভাষা খুবই সহজ, যার জন্য সাধারণ মানুষ অতি সহজে মহাভারতকে গ্রহণ করতে পেরেছে। অন্য দিকে পুরাণের ভাষা অত্যন্ত কঠিন। সংস্কৃতের যাঁরা বড় বড় পণ্ডিত তাঁরাও ভাগবতের সংস্কৃত অর্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাবুডুবু খান। আমাদের পক্ষে তো অনুবাদ ছাড়া ভাগবত পাঠ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, শুধু মাত্র অনুবাদ দিয়েও বোঝা যাবে না যদি না কোন ভালো আচার্যের ভাষ্য নিয়ে পড়া হয়। মহাভারত যাঁর রচনা, সেই কবিই এত কঠিণ ভাষায় লিখবেন এই ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। একটা মতে বলা হয় ব্যাসদেব নাকি একটি পুরাণই রচনা করেছিলেন, পরবর্তিকালে তাঁর শিষ্যরা ঐ একটি পুরাণের মধ্যে আরও কিছু সংযোজন করে আঠারোটি পুরাণে ভাগ করে দিলেন। যেমন বলা হয় যে বেদ আগে একটিই ছিল, ব্যাসদেব ওই একটি বেদকে ভেঙ্গে চারটি বেদে বিভাজন করেছেন। ঠিক সেই রকম ব্যাসদেবের শিষ্যরা পুরাণের ক্ষেত্রেও তাই করলেন, একটি পুরাণকেই টেনে টেনে আঠারোটা পুরাণে নিয়ে গেলেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, বেদ ও বেদের নারাসামসির মত অংশ শুধু মাত্র ব্রাহ্মণরাই পাঠ করতে পারতেন। কারণ বেদ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ পাঠ করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ বাবা আর ক্ষত্রিয় মা অথবা ক্ষত্রিয় বাবা ও ব্রাহ্মণ মা, এদের যে সন্তান হত তাদেরকে বলা হত সূত। সূতদের একটা আলাদা জাতি হিসাবে গণ্য করা হত। এদের বেদের অধিকার থাকতো না। তাহলে এদের খাওয়া পড়া চলবে কি করে? তাই বলে দেওয়া হল তোমরা পৌরাণিক আখ্যায়িকা গুলো লোকেদের কাছে পাঠ করে শোনাবে। যদি ব্রাহ্মণরা পুরাণকেও নিয়ে নেয় তাহলে ওরা বাঁচবে কি করে আর করবেইটা বা কি, আর তারাও তো ঋষির সন্তান, তাই তাদের পুরাণ পাঠের কাজটা দেওয়া হল। সেখান থেকে তারা ধীরে ধীরে পুরাণকে পুরোপুরি নিয়ে নিল। পরবর্তি কালে এই সূতেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।

পুরাণ প্রভাবিত পরিবর্তিত হিন্দু ধর্ম

পুরাণের সাথে ভারতে একটা নতুন ধর্ম দাঁড়িয়েছে। প্রায়শই একটা মন্তব্য শোনা যায় যে – হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই নয়। কারণ খ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, জুরুথ্রুষ্ট, জুদাইজিমের ধর্ম, সব ধর্মেরই সব কিছু নির্দিষ্ট করা আছে। ধর্মের কে প্রতিষ্ঠাতা, ধর্মের কি গ্রন্থ, ধর্মের কি কি উপাচার এগুলো সব নির্দিষ্ট করা আছে, সেদিক থেকে হিন্দু ধর্মের সব কিছুই খুব খোলামেলা। এই নিয়ে অনেক আপত্তি ওঠে, অনেক প্রশ্ন হয়। ইদানিং কালের অনেক পণ্ডিতরাও মনে করছেন ধর্ম খোলামেলা হওয়া উচিৎ। খোলামেলা হলে ধর্মে নানান রকমের ভাব, চিন্তাধারা এসে ধর্মকে আরও সঞ্জীবিত করার সুযোগ পায়। হিন্দু ধর্ম কখনই একটি বিশেষ ভাব ও চিন্তাকে নিয়ে কখনই আবদ্ধ থাকেনি। বেদ উপনিষদের সময় যে ভাবধারায় ধর্ম এগিয়ে গিয়েছিল, বাল্মীকি রামায়ণে এসে সেই ধর্মই অন্য ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেখান থেকে মহাভারতে আবার ধর্মের ভাবধারায় একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

বেদ উপনিষদের পর থেকে বাল্মীকি রামায়ণ আর বাল্মীকি রামায়ণের পর থেকে মহাভারতের সময়ে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা হল, বেদ উপনিষদে যখনই দৈবী শক্তির কথা বলা হয়েছে তখনই মনে হয় যেন এই দৈবী শক্তি কোন স্বর্গলোকের জিনিষ, দেবতা, ভগবান এনারা যেন অন্য জগতের, পৃথিবীলোকের জীব নন। বেদে যত রকমের কথা কাহিনী আছে সেখানে মহত্ত্ব বলতে যা বোঝায় তা সব সময় অন্য লোকের বাসিন্দাদের দেওয়া হয়েছে। অন্য লোক মানে যত স্বর্গলোক, দেবলোক, সিদ্ধলোক আছে, এইসব লোকের বাসিন্দাদেরই সব মহত্ত্ব উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে সেই মহত্ত্বকে কখনই দেখানো হয়নি। কিন্তু যখন বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে নেমে আসি তখন দেখা যায় এখানে মানুষকে মহৎ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। কিন্তু দিব্য বলতে যাদের বোঝায় তাঁরা এখানেও স্বর্গলোক বা দেবলোকের

বাসিন্দারাই আছেন। বাল্মীকি রামায়ণ বা মহাভারতে যদিও কোন কোন দেবতাকে অনেক উঁচুতে তুলে দেওয়া হয়েছে আবার সেই সাথে ইন্দ্রকে অনেক নীচেও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে তো ইন্দ্রের সম্মান একেবারে ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরাণ এসে একটা নতুন ভাবের জন্ম দিল। মহত্ত্বের ধারণাটা পুরাণ আমূল পাল্টে দিয়েছে। পুরাণকে আমরা কিছুটা বলতে পারি বেদ উপনিষদের সাথে বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতের ভাবের সমন্বয়। মহাভারতে যেগুলোকে মানবীয় গুণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যে গুণগুলির জন্য মানুষকে মহৎ বলা যায়, পুরাণ সেই মহৎ মানুষের মধ্যেই মিশিয়ে দিচ্ছে দিব্য শক্তিকে। যে দিব্য শক্তির জন্য দেবতারা দেবতা হয়েছেন, পুরাণ সেই দিব্য শক্তিকে নিয়ে এসে মানুষের মানবীয় গুণের সাথে সংযোজন করে তাঁকে আরও মহৎ করে দিয়েছে। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে শৌর্য, তেজ, যুদ্ধ করার অসীম ক্ষমতা, পৌরুষত্ব এই গুণগুলোকে প্রচুর পরিমাণে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে একই জিনিষ করা হয়েছে কিন্তু এখানে তিন চারজনের মধ্যে গুণগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মের ভাব যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এসেছে, শ্রীরামচন্দ্রের অস্ত্র নিপুণতা ও কুশলতা অর্জুনের মধ্যে প্রকাশ হয়েছে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে বলতে হয় যে লেখক হয়তো শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে পরিষ্কার নন, তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না কিভাবে চরিত্রটাকে নিয়ে যাবেন। আর তা নাহলে বলতে হয়, একাধিক লোকের দ্বারা মহাভারত রচিত হয়েছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে কোথাও অতিপ্রাকৃতিক চরিত্র রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে আবার কোথাও ভীষ্মের মুখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার রূপে নিয়ে আসা হয়েছে। ভাগবত এসে এই সমস্যাটাকে পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এখানে আর কোন সংশয় নেই। ভাগবত কি করল? বেদের দেবতাদের দিব্যগুণ গুলোকে নিয়ে মানুষের মধ্যে যে মানবীয় গুণ গুলো আছে তার সাথে মিশিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মত একটা চরিত্রের সৃষ্টি করল। শ্রীকৃষ্ণের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীকে আধার করে এক নতুন ধর্ম শুরু হয়ে আজকের বর্তমান হিন্দু ধর্মে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের যে বর্তমান হিন্দু ধর্ম এটা ঠিক ঠিক এই আকৃতি পেয়েছে পুরাণ থেকে।

আঠারোটি পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই ভারতে বেশী প্রচলিত। কারণ খুব সহজে এর কাহিনীর সাথে যে কেউ নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে, অন্য দিকে বেদের দেবতাদের সমস্ত দৈবীগুণ সমূহ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন বেদে পুরুষসূক্তমে যে পুরুষের কথা বলা হয়েছে, যে পুরুষকে পরে উপনিষদে এসে ব্রহ্ম রূপে সম্বোধন করা হয়েছে, ভাগবৎকার বলছেন পুরুষসূক্তমের সেই পুরুষেরই মূর্ত রূপ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। অন্য দিকে উপনিষদে আত্মজ্ঞানীর যে লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তার সব লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানী আর ব্রহ্ম কখনই এক নয়, যদিও উপনিষদ বলছেন *ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি*, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই ব্রহ্ম, ঠিকই বলছেন, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রহ্ম বলতে আমরা একটু অন্য রকম বুঝি। যখন বলা হয় *ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি* তখন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা সব এক হয়ে যায়। কারণ ব্রহ্ম কোন বস্তু নন। আমি আর জলের এই বোতলটা আলাদা। আমি এই বোতলকে জানি, বোতলটা আমার থেকে এই দূরত্বে আছে আর এই জানার পেছনে আছে একটা প্রক্রিয়া। প্রথম আলোর মাধ্যমে চোখে একটা ছবি আসছে, বোতলের একটা আকার আমার মধ্যে তৈরী হচ্ছে, মস্তিষ্কে কোথাও নিউরো ফায়ার করছে, সেখান থেকে একটা আইডিয়া তৈরী হয়ে বলছে এই বোতলটা আছে। তার সঙ্গে এই আইডিয়াটাও থাকছে আমি আলাদা আর এই বোতলটা আলাদা। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা কখন হয় না। প্রায় সবাই মনে করে ঈশ্বর দর্শন মানে আমি এখানে বসে থাকব আর শ্রীকৃষ্ণ এখানে এসে মূর্তিমান হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। এটা কোন ঈশ্বর দর্শনই নয়, আর এইভাবে কখন ঈশ্বর দর্শন হয়ও না। যিনি জ্ঞাতা আর যিনি জ্ঞেয় এই দুজন এক হয়ে যাওয়াটাই ঈশ্বর দর্শনের মূল। আর এর মাঝখানে যত রকম কর্ম আছে, যাকে বলছেন জ্ঞান, সেটাও যতক্ষণ না এক হয়ে যাবে ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানা যায় না। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এই তিনটে যখন এক হয়ে যায় তখনই ঈশ্বর দর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান হয়। সেইজন্য ব্রহ্মবিৎ যিনি তিনিই ব্রহ্ম, কারণ জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় এক হয়ে গেছেন। তাহলেও আমাদের সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ব্রহ্মবোধ আর ব্রহ্মজ্ঞানীর বোধে একটা তফাৎ থেকে যায়।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বরূপ দুটোকেই যুগপৎ দেখানো হয়েছে। আবার ব্যক্তির যে বৈশিষ্ট্য ও গুণের জন্য সমাজ যাঁকে আদর্শ পুরুষ রূপে গণ্য করে, সেই বৈশিষ্ট্য ও গুণ সমূহ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁকে একজন আদর্শ পুরুষ রূপেও দেখানো হয়েছে। এইভাবে তিনটে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে এসে মিশেছে। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে না, সেখানে তিনি একজন বীরপুরুষ। আবার যখন পরবর্তিকালে যত রামকথা রচিত হচ্ছে, যেমন যখন অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হচ্ছে বা তুলসীদাস যখন রামচরিত মানস লিখছেন কিংবা বাংলার কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ লিখছেন তখন তাঁরা সবাই পুরাণের ভাবকে শ্রীরামচন্দ্রের উপর আরোপ করে দিচ্ছেন, যাঁর মধ্যে এই তিনটে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এসে যাচ্ছে, মহৎ পুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানী আর তার সাথে সাক্ষাৎ ভগবান। পুরাণের মূল চরিত্রে এই তিনটে বৈশিষ্ট্য এক সঙ্গে চলে। সেইজন্য সাধারণ মানুষের ধর্ম বলতে যা বোঝায়, ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যগুলো পুরাণের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই কারণে ভারতে আপামর জনসাধারণ, সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে একেবারে গ্রামের অজ্ঞ কোন বধূর কাছে ব্যাসদেবের এত সম্মান। তিনি একদিকে মহাভারতের মধ্যে যে যে ভাবনা চিন্তা দিয়েছেন সেই ভাবগুলোই ভারতের রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। ভারতের বর্তমান সামাজিক যে পরিকাঠামো, সেটা এসেছে মহাভারত থেকে, কিন্তু তার ধর্মীয় পরিকাঠামো এসেছে পুরাণ থেকে। যদিও বলা হয় সব কিছুর আধার বেদ, কিন্তু এই দুটো ব্যাপারে মহাভারত আর পুরাণের ভূমিকাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

বেদ উপনিষদের ধর্ম আর মহাভারতের ধর্মের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ধরা পড়ে না। মহাভারত থেকে যদি কিছু অংশকে সরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে যেখানে অবতার রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে কিংবা গীতাকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মহাভারত একটা সামাজিক চিত্র আর বেদ উপনিষদের প্রতিচ্ছবি এই দুটোর মাঝামাঝি অবস্থায় দাঁড়িয়ে যায়। পুরাণের ব্যাপারে কিন্তু এই ধরণের কোন কিছু বলার সুযোগ পাওয়া যাবে না। প্রথম লাইন থেকে মানুষ, দেবতা আর ভগবানকে একেবারে অভেদ রূপে কল্পনা করে পুরাণ একটা বাস্তবতার রূপ তৈরী করে বেরিয়ে গেছে।

পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতে যে নতুন একটা ধর্ম তৈরী হল, তার মধ্যে আমরা দেখার চেষ্টা করব নতুন ধর্ম কি কি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। প্রথম যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তা হল, পুরাণ রচিত হওয়ার আগে ভারতে অবতারবাদের কোন ধারণাই ছিল না। এখানে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, যেহেতু ভারত কখনই কোন অবস্থাতেই বেদের বাইরে যাবে না, তাহলে কি করে পুরাণের অবতারবাদকে ভারত মেনে নিয়েছে? ইদানিং কালে অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা নতুন নতুন অনেক কথাই বলছেন, তাতে মানুষ এরপর বেদকে কতটা সম্মান দেবে আমরা বলতে পারবো না। কিন্তু ঠাকুর বলছেন – ঋষিদের সনাতন ধর্মই থাকবে, বাকি সব ধর্ম আসবে যাবে। তার মানে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ আসবে, ইদানিং কালের অনেক বাবাজীরা আসবেন, কিন্তু সবাই আসবে আর যাবে, কিছু করার নেই। কিন্তু একটা ধর্মই থাকবে তাহলে বেদের সনাতন ধর্ম। ঠাকুর নিজে এটা বলছেন। স্বামীজী বার বার বলছেন হিন্দু ধর্ম মানে বেদের ধর্ম। তাহলে এখানে যে বলা হল, পুরাণ হিন্দু ধর্মে একটা নতুন ধারণা অবতারবাদ নিয়ে এল, যে ধারণার কথা বেদে নেই সেই ধারণাকে হঠাৎ করে নিয়ে আসার পর হিন্দুরা কেন মেনে নিলেন? কিন্তু তা নয়, আসলে হিন্দু ধর্মে যা কিছু আছে তার সব কিছু বেদে আগে থেকেই আছে, বেদের বাইরে হিন্দুরা কখনই যাবে না। তবে হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু ভাব-ধারণার কথা বেদে বড় করে না থাকলেও হাল্কা করে কোথাও কোথাও বলা আছে। সেই ভাবটাকে নিয়েই পরে কোন ঋষি আরেকটু বিস্তার করে ব্যাখ্যা করে ধারণার মধ্যে একটু নতুনত্ব নিয়ে এলেন। একেবারে নতুন কিছু যে নিয়ে আসছেন তা নয়। বেদে না থাকলে হিন্দুরা তা নিতেই পারবে না। ঠিক তেমনি এই অবতারবাদ পুরাণ নতুন কিছু নিয়ে আসছে না, বেদেই আছে ইন্দ্র তাঁর নিজের মায়াকে আশ্রয় করে নানান রূপ ধারণ করেন। এই কথার মধ্যেই অবতারবাদের ধারণাটা বীজাকারে সুপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু এই ধারণাকে বিস্তৃত করে সামনে নিয়ে আসা হয়নি।

কেনোপনিষদে আছে, দেবতা ও অসুরের সংগ্রামে দেবতাদের বিজয় লাভ করার পর তাদের মনে অহঙ্কার হয়েছে, আমরা আমাদের শক্তিতেই অসুরদের পরাস্ত করেছি। ব্রহ্ম দেবতাদের মঙ্গলার্থে একটা শিক্ষা দিতে নিজেকে দেবতাদের ইন্দ্রিয়গোচর করলেন। দেবতারা হঠাৎ দেখেন তাঁদের সামনে একটা আজব বস্তু। দেবতারা বুঝতে পারছেন না, বস্তুটা কি। জানার জন্য এক এক করে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র গেলেন। তখন উমা হৈমবতী দেবতাদের মাঝখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন – *সা ব্রহ্মেতি হোবাচ*, ইনিই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মের শক্তিতেই তোমাদের এই বিজয়। এখানে ব্রহ্ম একটা অন্য রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়ে দেবতাদের ইন্দ্রিয়গোচর হলেন। বলা হচ্ছে তাঁর শক্তিতেই দেবতারা জয়লাভ করেছেন। তাহলে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন একটা রূপ ধারণ করতে পারেন, এমন কি দেবতাদের সামনে তিনি এমন একটা রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন যে দেবতারা তাঁকে চিনতেই পারছেন না। এই ভাবে অবতারবাদের ধারণা বেদে আগে থেকেই সুপ্তাকারে ছিল, এই ধারণাটাই পরবর্তিকালে অবতারবাদ নামে একটি নতুন বাদ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে।

কঠোপনিষদেও ঠিক একই ভাব পাই, যেখানে বলছেন *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*, তাঁর ভয়েই জগতের সব কিছু ঠিক ঠিক চলছে। এই যে সব কিছুর উপর অধ্যক্ষতা করার ক্ষমতা, যিনি ব্রহ্ম তাঁর এই ক্ষমতাটা আছে। এই ধারণাগুলোকে নিয়ে পুরাণ পুরো উদ্যমে এগিয়ে গিয়ে যাওয়ার ফলে একটা ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন ধরণের শাস্ত্র রচিত হল। যে ধারণাকে বেদে একটি কি দুটি বাক্যে বলে দেওয়া হয়েছে, সেই ধারণাকে অবলম্বন করে ওনারা আঠারো খানা বই লিখে দিলেন। তাই পুরাণ কখনই বেদকে পার করে বেদের বাইরের কোন ভাব নিয়ে আসছে না। যেমন জিউসরা ওল্ড টেস্টামেন্টকে অতিক্রম করবে না, খ্রীশ্চানরা কখনই বাইবেলকে অতিক্রম করবে না, মুসলমানরা কখনই কোরানকে অতিক্রম করবে না, ঠিক তেমনি হিন্দুরা কখনই বেদের বাইরে কিছু বলবে না। একদিকে বলা হয় হিন্দু ধর্মে হাজার রকমের ধারণা ভেসে বেড়াচ্ছে, হাজার কেন লক্ষ লক্ষ ধারণা হিন্দু ধর্মে ভেসে বেড়াক কিন্তু তারা কখন মূলটাকে ছাড়বে না। কোন কিছু প্রশ্ন হলেই বলবে, আগে দেখো বেদে কি বলছে, বেদে আছে কিনা আগে দেখে নাও। ভারতে তো ইদানিং ব্যাঙের ছাতার মত কত বাবাজীরা কত রকম কথা বলে যাচ্ছেন, সাধারণ মানুষ এই নিয়ে কত মাতামাতি করছে, কিন্তু আমাদের পণ্ডিত সমাজ কখনই তাঁদের মান্যতা দেবেন না। যদি বলেন, আমার কথা বেদের অমুক জায়গায় আছে, তখন বলবে এবার দেখুন তো গীতা উপনিষদ আর ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে আপনার কথা মিলছে কিনা।

গীতাকে সরিয়ে রেখে, বেদ উপনিষদের থেকে পুরাণের পৃথক বিশেষত্ব হল অবতারবাদ। গীতাতে অবতারবাদ পুরোদমে এসে গিয়েছিল। সেইজন্য অনেক পণ্ডিতদের মত হল গীতা যদিও মহাভারতের অন্তর্গত কিন্তু গীতা আর মহাভারতের ধর্মের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। গীতার ধর্মকে বলা হয় ভাগবত ধর্ম। গীতা যে ভাবে ঈশ্বরের ধারণা হিন্দু ধর্মকে দিয়েছে, ভাগবত একেবারে ঠিক সেই একই ভাবকে কাহিনী আর কাব্যিক শৈলীর দ্বারা পুষ্টি দিয়েছে। গীতার এই ঈশ্বরের ধারণা মহাভারতের বাকী অংশে সেইভাবে পাওয়া যাবে না। গীতার আবার সব কিছু উপনিষদের সাথে কাঁটায় কাঁটায় মিলবে না। তবে যাই হোক না কেন, গীতা বলুন, ভাগবত বলুন আর ঠাকুরের কথামৃতই বলুন, এনারা নতুন কথা কখনই কিছু বলতে পারবেন না, সম্ভবই নয়। ঠাকুর যদি বলতেন আমি এটা নতুন কথা বলছি, তাহলে হিন্দু সমাজ সেই কথাকে কখনই মান্যতা দেবে না, তার মানে আপনি বেদকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। বেদকে অতিক্রম করা মানে, আমি যে আধারের উপর দাঁড়িয়ে নতুন কথা বলছি সেই আধারটাই মিথ্যা হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন, মাকে আমি সব অর্পণ করে দিলুম, মা এই নাও তোমার ধর্ম এই নাও তোমার অধর্ম, এই নাও তোমার পূণ্য এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার শুচি এই নাও তোমার অশুচি কিন্তু বলতে পারলুম না এই নাও তোমার মিথ্যা এই নাও তোমার সত্য। কারণ সত্যটাই আধার। সত্যকে আধার করেই এই কথাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সত্যটাকে যদি ফেলে দেওয়া হয় তাহলে সবটাই তো মিথ্যা হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন সত্যই কলিযুগের তপস্যা। বেদকে অতিক্রম করা মানে, যার উপর আমাদের ধর্মটা দাঁড়িয়ে আছে সেটাই চলে গেল।

মাধ্বাচার্য যেমন একটা নতুন কথা নিয়ে এলেন, যারা শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী তারা চিরদিনের জন্য নরকে যাবে। অনেকের অনুমান যে, চিরদিনের জন্য নরকে যাওয়ার এই ধারণাটা মাধ্বাচার্য ইসলাম থেকে নিয়েছেন। কারণ ইসলাম ধর্মে চিরদিনের জন্য নরকের কথা আছে। ইসলামে আবার এই ধারণাটা এসেছিল খ্রীশ্চান ধর্ম থেকে। মাধ্বাচার্যের এই নতুন মত ভারতে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই প্রত্যাখ্যিত হয়ে গিয়েছিল, কারণ এটা বেদ মত নয়। বেদে চিরদিনের জন্য কিছু হয় না। বেদের কিছু মৌলিক ধারণা আছে। যদি কেউ বলে আমি ভগবান মানছি না, কিন্তু আমি আধ্যাত্মিক হব। বেদ বলবে তোমার আধ্যাত্মিক হওয়া কখনই হবে না। এখন তুমি ভগবানকে কি রূপে নিচ্ছ সেটা কোন ব্যাপার নয়, তুমি বলতে পার আত্মাই সব, তুমি বলতে পার ভগবানই সব, ঈশ্বর, আল্লা, গড্ যা খুশী তুমি বল। কিন্তু তুমি যদি বল আমি আধ্যাত্মিক হব, সেই আধ্যাত্মিকতটা কি? শূন্য, ভগবান বুদ্ধ যেটা বলছেন, কিন্তু ভগবান বুদ্ধ শূন্য বলেননি তিনি বলছেন নির্বাণ, যেখানে কিছু নেই। হিন্দু ধর্ম বলবে তাহলেও তোমাকে আমরা মানবো না। বেদের নিজস্ব কিছু কিছু সিদ্ধান্ত আছে, সেই সিদ্ধান্তকে কখনই কাউকে অতিক্রম করতে দেওয়া যাবে না। যদি কেউ এই সিদ্ধান্ত গুলিকে অতিক্রম করে তাহলে তাকে বলে দেওয়া হবে তুমি আর বেদের ধর্মে নেই, তুমি বেদের বাইরে। যারা বেদের বাইরে চলে যায় তাদের দর্শনকে বলা হয় নাস্তিক দর্শন। যাদের ভগবানের বিশ্বাস নেই তাদের নাস্তিক বলছেন না, যারা বেদকে মানে না তারাই নাস্তিক। হিন্দুদের প্রথম দর্শন সাংখ্যই ভগবান মানে না। কিন্তু তারা চৈতন্য সত্তাকে বিশ্বাস করছে। চৈতন্য সত্তা পুরুষকে মেনে নিলে বেদের তখন আর কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু বিজ্ঞান বলছে জড় সত্তা থেকেই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। বিজ্ঞানকে তাই বলবে বেদ তোমার জন্য নয়। তুমি যদি বল সব কিছু শূন্য থেকে এসেছে, তাহলে তোমার জন্যও বেদ নয়। বেদের একটা নিজস্ব কাঠামো আছে, সেই কাঠামো বিশাল ভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে, যার জন্য তার মধ্যে এত সুযোগ আছে যে, যে কেউ যা খুশী তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবে। তাই বলে সব কিছু ঢোকাতে পারবেন না। যেমন চিরকালের জন্য স্বর্গ বা চিরকালের জন্য নরক এই জিনিষকে বেদের কাঠামোর মধ্যে কখনই ঢোকান যাবে না। যদি কোন দর্শন বলে আত্মা বলে কিছু নেই, চৈতন্য বলে কিছু নেই, এই ধরণের দর্শনও বেদের কাঠামোয় স্থান পাবে না।

সেইজন্য পুরাণ হিন্দু ধর্মে অবতারবাদ নিয়ে এসেছে ঠিকই বলা হচ্ছে, তাই বলে এই নয় যে অবতারবাদ নতুন কিছু, এই মত বেদে আগে থেকেই আছে, শ্বেতাশ্বেতাশ্বরোপনিষদেও অবতারবাদের কথা এসে গিয়েছিল, কিন্তু ছোট্ট করে একটু বলে দেওয়া হয়েছে। কথামৃতে ঠাকুর অবতারতত্ত্ব প্রসঙ্গ একাধিকবার নিয়ে এসেছেন, কারণ মানুষ অবতারবাদ সহজে মানতে চায় না, আবার যারা মানে তারা অবতারবাদ ধারণা করতে পারে না। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভক্ত পরিবারের বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে বাড়িতে ঠাকুরের পূজা হচ্ছে, বাড়ির সবাই জানে ঠাকুর ভগবান, বাচ্চারাও ছোটবেলা থেকে জানে ঠাকুর ভগবান। হিন্দু বাড়ির বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে জানে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তাহলে তারা কি সবাই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেল নাকি! কিন্তু না, স্বরূপ লক্ষণ যদি বোধে বোধ না হয়, সাক্ষাৎ দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ এই জানার কোন দাম নেই, এগুলো সব মুখের কথা। ভগবান স্বয়ং মানুষ হয়ে আসতে পারেন এ জিনিষ মানুষের মন সহজে মেনে নিতে পারে না। সেইজন্য দেখা যায় খ্রীশ্চান ধর্মে যে কত মত আছে ঠিক নেই, আমরা মনে করে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান এই দুটো মত, কিন্তু তা নয়, হাজার হাজার মত আছে। তাদের কেউ মনে করে যিশু হলেন ভগবানের সন্তান, তাঁকে ভগবান কয়েকটি কথা বলে দিয়েছেন। কেউ মনে করে যিশু ভগবানের সন্তান ঠিকই কিন্তু তিনি ভগবানের সাথে এক। কেউ আবার মনে করে ভগবানই যিশু হয়ে এসেছেন। ইসলাম কিন্তু এই ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিল, কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক কিছু ধারণা করা খুব কঠিন হয়ে যায়। মহম্মদ তাই বললেন আমি হলাম পয়গম্বর, আমি ভগবানের দূত হয়ে এসেছি, তিনি আমাকে যা যা কথা বলেছেন সেই কথাই আমি তোমাদের বলছি। যার ফলে ইসলামের পক্ষে হিন্দুদের গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, কারণ হিন্দুদের কাছে অবতার কোন দূত নন, ভগবান নিজেই মানব শরীর ধারণ করে এসেছেন। সেই কারণে ইসলামের পক্ষে খ্রীশ্চানদের গ্রহণ করা সম্ভব। ভগবান মানুষ হয়ে আসতে পারেন এই ধারণা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। আর ভগবান মানুষ না হয়ে এলেও তিনি তাঁর সন্তানকে

পাঠিয়েছেন সেটাও মুসলমানরা মানতে পারবে না। মহম্মদ পরিষ্কার এই কথাই বলছেন। তাহলে যিশু কি ছিলেন? ইসলাম বলবে যিশুও পয়গম্বর ছিলেন, কিন্তু মহম্মদ হলেন শেষ পয়গম্বর। অবতারবাদ হিন্দুদের একটি অনুপম ধারণা, যার কৃতিত্ব পুরোপুরি পুরাণের। পুরাণে একবার যখন অবতারবাদ এসে গেছে তখন সারা দেশে অবতারবাদ ছড়িয়ে গেছে। অবতারবাদ মানে না অথচ নিজেকে হিন্দু বলছে, এ জিনিষ এখন আর হিন্দু ধর্মে পাওয়া যাবে না। একমাত্র যাঁরা কট্টর বেদান্তী, যাঁরা জগৎকেই উড়িয়ে দেন, তাঁদের ছাড়া হিন্দু ধর্মের সবাই অবতারবাদকে মেনে নিয়েছে। এখানে আমরা যখন পুরাণের কথা বলছি তার সাথে গীতাকেও ধরা আছে, কারণ অবতারবাদের ব্যাপারে গীতার ভাব পুরাণের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায়।

বেদে শুধু নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের বর্ণনাই করা হয়েছে, নির্গুণ ঈশ্বরের বাইরে যাঁদের কথা আছে তাঁরা হলেন দেবতা, যদিও তাঁদের গুণ, কার্য, বৈশিষ্ট্য আলাদা। পুরাণে এসে সেই নির্গুণ নিরাকার ভগবানই সগুণ সাকার হয়ে যাচ্ছেন। একবার যখন নির্গুণ নিরাকার ভগবানকে সগুণ সাকার করে দেওয়া যায়, এরপর অবতারে নামিয়ে আনার জন্য শুধু একটা ধাপ বাকি থেকে যায়। বেদের অমূর্ত ভগবানকে পুরাণে মূর্ত করে দেওয়া হল। একবার মূর্ত করে দেওয়ার পর ভগবানের রূপ বার বার পাল্টাতেও কোন বাধা থাকবে না।

পুরাণে এসে বৈদিক ধর্মের আরেকটি খুব বড় পরিবর্তন হল, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্রাদি যত বেদের মুখ্য দেবতা ছিলেন পুরাণে সেই দেবতারা একবারে গৌণ হয়ে গেলেন। এই পরিবর্তনটা মহাভারতেই অনেকটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণু বেদে যিনি একজন খুব ছোট্ট যজ্ঞের দেবতা রূপে ছিলেন এবং অনেক সময় কৃষিকার্যের দেবতা রূপেও গণ্য করা হত, পুরাণ সেই বিষ্ণুকে সরাসরি ভগবান বানিয়ে বিরাট গুরুত্ব দিয়ে দিল। মহাভারতে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সাথে শ্রীকৃষ্ণের কিছু লড়াইয়ের বর্ণনা এসেছে কিন্তু ভাগবতে তো শ্রীকৃষ্ণের সাথে ইন্দ্রের লড়াই খুব ভালো মত জায়গা করে নিয়েছে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিয়ে পুরাণ হিন্দু ধর্মে ত্রিমূর্তির ধারণা নিয়ে এসেছে। ভগবানেরই তিনটে রূপ এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। মহাভারতেও এই ত্রিমুর্তির ধারণা এসে গিয়েছিল কিন্তু পুরাণের মত এত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মজার ব্যাপার হল এই ত্রিমূর্তির ধারণা বেদেও ছিল, বেদে এই ত্রিমূর্তি হলেন অগ্নি, বায়ু আর সূর্য। আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার, সারা ভারতে ব্রহ্মার জনপ্রিয়তাটা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, একমাত্র পুস্কর ছাড়া কোথাও ব্রহ্মার মন্দির আছে বলে আমাদের জানা নেই। ব্রহ্মার পূজা দেশ থেকে বলতে গেলে উঠেই গেছে। কিন্তু ত্রিমূর্তির ধারণাটা দেশে থেকে গেল। ত্রিমূর্তির ব্রহ্মা চলে গেলেন, থেকে গেলেন বিষ্ণু আর মহেশ। তাহলে তৃতীয় নতুন কাকে ব্রহ্মার জায়গায় নেওয়া যেতে পারে? এনারা পরে সেখানে শক্তিকে নিয়ে এলেন। আজকে দেশে বিভিন্ন রূপে এই তিনজনেরই পূজা হয়, বিষ্ণু, মহেশ্বর আর শক্তি। এই ত্রিমূর্তি বেদে একভাবে ছিল, মহাভারত একভাবে নিয়ে এসেছে আর পুরাণে আসার পর এটাই ভালো ভাবে সারা দেশে স্থায়ী ভাবে বসে গেল। কিন্তু পূজা করার সময় আবার পাল্টে গেল। বিষ্ণু, শিব আর শক্তিরই পূজা এখন সারা দেশে হচ্ছে, শুধু ব্রহ্মাকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় এলেন শক্তি।

উপনিষদে, বিশেষ করে ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা উপাসনার কথা পাই। কিভাবে উপাসনা করা হবে তার বর্ণনা ছান্দোগ্য উপনিষদের একটা জায়গায় করা হয়েছে। উপনিষদের এই উপাসনাই পুরাণে এসে ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ভক্তিমার্গ পুরাণে একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে, সেইজন্য অনেকে পুরাণকে ভক্তিশাস্ত্রও বলেন, যদিও গীতার কয়েকটি অধ্যায়ে ভক্তির উপর অনেক মূল্যবান আলোচনা আছে। দেবতাদের অর্চনা করা, ধ্যান করা, উপাসনা করা এগুলো বেদ উপনিষদেই আছে, কিন্তু আজকে আমরা ভক্তিকে যে ভাবে পাচ্ছি এটা পুরোপুরি পুরাণ সাহিত্যের অবদান।

পুরাণ আরেকটি নতুন ধারণা নিয়ে এল সেটা হল, ইষ্টদেবতার ধারণা। আমাদের সবারই একজন ইষ্টদেবতা আছেন, আমার একজন ইষ্টদেবতা, আপনার একজন ইষ্টদেবতা, এই ধারণাটা পুরোপুরি পুরাণ থেকে এসেছে। ইষ্টদেবতা ছাড়া মূর্তি পূজার ধারণাও পুরাণ থেকে এসেছে। বাল্মীকি রামায়ণে মূর্তি পূজার

কোন উল্লেখ নেই, মহাভারতে কোথাও কোথাও হাল্কা করে বলা হয়েছে, বোঝা যায় যে পরম্পরার মধ্যে মূর্তি পূজার প্রথা আসতে শুরু হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে কয়েকবার 'চৈত' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চৈত মানে কোন মন্দির নয় বরঞ্চ সভাগৃহ বলতে যা বোঝায় চৈত ঠিক অনেকটা সেই রকম, একটা জায়গায় সবাই সমবেত হয়ে উপাসনা করবেন বা প্রবচন শুনবেন। এই চৈতীই আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হয়ে পাল্টে গেল মন্দিরে। তারপর ইষ্টদেবতার ধারণাটাই মূর্তি পূজাতে চলে গেল। সেইজন্য সচারচর দেখা যায় ভারতে যত দেবী-দেবতার মূর্তি আছে বেশীর ভাগ মূর্তিই একশ কি দুশো বছর খ্রীষ্টপূর্বের তৈরী।

হিন্দু ধর্মের পরিবর্তনে পুরাণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল – উপনিষদে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল মুক্তি, কিন্তু পৌরাণিক সাহিত্যে উদ্দেশ্যটা পরিবর্তিত হয়ে এসে গেল সেবা, লোকসংগ্রহ। লোকসংগ্রহ মানে, ভগবানের কথা দশজনকে শোনানো। ভগবানের কথা দশজনকে শোনানও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে। এখানে মুক্তিটা আর উদ্দেশ্য থাকলো না, কিন্তু পুরাণ বলবে সেবা বা লোকসংগ্রহ এটাই তোমার মুক্তি। উপনিষদের বাইরে পুরাণ আবার তিন রকম মুক্তির কথা নিয়ে এল — সারূপ্য, সামীপ্য আর সালোক্য। মুক্তি সাধারণতঃ চার রকমের বলা হয় – একটা হল সাযুজ্য, যেখানে সাধক ভগবানের সাথে এক হয়ে যায়। বেদান্তে মুক্তি বলতে এই সাযুজ্যের কথাই বলা হয়, সাযুজ্য মানে ব্রহ্মের সাথে লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু পুরাণে এসে এনারা আরও তিনটে জিনিষকে যোগ করে দিলেন – সালোক্য, ভগবান যে লোকে আছেন সাধক সেই একই লোকে গিয়ে বাস করছেন। দ্বিতীয় সারূপ্য, ভগবানের যে সাকার রূপ নিয়ে সাধক সাধনা করেছেন তিনি ভগবানের সেই উজ্জ্বল সাকার রূপটা পেয়ে গেলেন, ভগবানের দিব্য রূপ নিয়ে সে ভগবানের সাথেই থাকেন। আর শেষে সামীপ্য, সাধক ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকেন।

ঈশ্বরের প্রতি যাদের সেবা ভাব আছে তারা এগুলোকে এভাবে দেখেন – তোমার যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে তুমি ভগবানের সাথে একই লোকে বাস করবে। ভক্তি যদি তোমার আরেকটু বেশী থাকে তাহলে তোমার রূপটাই ভগবানের রূপ হয়ে যাবে। আর ভক্তি যদি আরও গভীর হয় তাহলে তুমি ভগবানের কাছে কাছেই সব সময় থাকবে। কিন্তু পুরাণের ভক্ত কখন সাযুজ্য চাইবে না। সে বলবে আমি চিনি আস্বাদ করতে চাই চিনি হতে চাই না। আমি ভগবানের রূপ দর্শন করব, আমি ভগবানের লীলা আস্বাদ করব। এই সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সারূপ্য এই ভাবগুলো যে কত গভীর আর এগুলো বোঝার জন্য মনের ভাবভক্তির গভীরতা যে কত দরকার সেই ধারণাই আমরা করতে পারবো না। আমরা কিছু না বুঝে সহজেই একটা মতামত দিয়ে দিই — সাযুজ্যই ভালো, কিংবা সালোক্যই তো ভালো। কিন্তু এভাবে এগুলোকে বিশ্লেষণ করা যায় না। যাঁরা এই পথে সাধনা করেন, সাধনা করে তাঁদের মনে ভাবের যে গভীরতা আসে সেটা অন্য ধরণের। তাঁরা যখন এই ধরণের কথা বলেন তখন এগুলোর একটা তাৎপর্য থাকে। আমাদের কাছে এগুলো শব্দ মাত্র।

স্মৃতিশাস্ত্রে মানুষের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হয়। সাধারণ ধর্ম মানে যে ধর্ম সবারই করণীয়। আপনি হিন্দু না মুসলমান, আপনি ব্রাহ্মণ না শূদ্র তাতে কিছু আসে যায় না, এই ধর্মগুলো সার্বভৌম ধর্ম, সবাইকে এই ধর্ম পালন করতে হবে। পুরাণ স্মৃতিশাস্ত্রের এই সাধারণ ধর্মকে স্বধর্ম বানিয়ে দিল। পুরাণের এটি একটি বড় রকম পরিবর্তন। যেমন অহিংসা, অহিংসা পালন করাটা সর্বসাধারণের আবশ্যক। এবার বলছেন, তুমি যদি শুধু অহিংসার অনুশীলন করে যাও তাহলে এই অহিংসা দিয়েই তোমার ঈশ্বর লাভ হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি সত্য, কোন ধর্মই বলে না যে মিথ্যে কথা বলবে, সত্য কথা বলা সবারই জন্য। সত্য কথা বলা সাধারণ ধর্ম। এখন কেউ যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সে সেই সত্যকে দিয়ে ঈশ্বরকেও লাভ করতে পারবে। বেদ উপনিষদে এই জিনিষ কখন এভাবে আসেনি। পুরাণে সাধারণ ধর্মটাই ধীরে ধীরে পাল্টে গেল স্বধর্মে। আর স্বধর্মটাই সাধনা। গীতাতে যখন স্বধর্মের কথা বলা হচ্ছে তখন নানা রকমের শর্ত নিয়ে আসা হচ্ছে। যেমন বলছেন তোমার যে বর্ণাশ্রমের ধর্ম, সেই বর্ণাশ্রম ধর্মে তোমার যে কর্তব্য কর্মগুলো করা হচ্ছে, সেটাই তোমার ধর্ম, সেই ধর্ম পালনে তুমি জোর দাও। গীতার এই তত্ত্ব থেকে পুরাণ সরে এসে বলছে – তুমি ভুলে যাও তোমার স্বধর্ম কি, তুমি যে কোন একটা ধর্মকে বেছে নাও, তুমি হয় অহিংসাকে বেছে নাও, বা

শৌচকে বেছে নাও, এবার সেই ধর্মে তুমি প্রতিষ্ঠিত থাক, এতেই তোমার সব কিছু হয়ে যাবে। এইভাবে পুরণ হিন্দু ধর্মে অনেক কিছুর পরিবর্তন নিয়ে এসেছে আর আজকের দিনে হিন্দু ধর্ম যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে এটাই পুরাণের ধর্ম।

পুরাণ ও উপপুরাণ

আমরা প্রথমেই বলেছি আমাদের পরম্পরাতে আঠারোটি পুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় এই আঠারোটিকেই কেন পুরাণ বলা হয়? আঠারো না হয়ে ষোলটা কেন হল না বা কুড়িটা কেন হল না? এই প্রশ্নগুলি অতি সাধারণ মনে হলেও এর অনেক গুরুত্ব আছে। তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কিভাবে দেবো, অর্থাৎ এগুলোকেই কেন পুরাণ বলা হবে আর এগুলোকে কেন পুরাণ বলা যাবে না, এটা নির্ধারণ করা হবে কি পদ্ধতিতে? যদিও আমরা জানি পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ, যে পাঁচটি লক্ষণ দিয়ে বোঝা যাবে এটা পুরাণ। কিন্তু এই পাঁচটি লক্ষণ উপপুরাণেও আছে আর মহাভারতেও আছে। আসলে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই, আমাদের পরম্পরাতে যেটা চলে আসছে সেটাই সবাই মেনে নিয়েছে। এই আঠারোটিকেই কেন পুরাণ বলছি? আমাদের পরম্পরাতে এগুলো পুরাণ বলেই চলে আসছে। কোন এক সময় কোন ঋষি বা গুরু বলে দিয়েছেন এগুলো পুরাণ আর এগুলো উপপুরাণ। ব্যস্! সেই থেকে সবাই মেনে আসছে। অন্য এক প্রসঙ্গে ঠিক এই জিনিষটাই কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – মা ছেলেকে বলে দিয়েছে ও তোর দাদা, এখন সে ছুতোরের ছেলে হোক আর যাই হোক ছেলে জানে এ আমার দাদা, কারণ মা বলে দিয়েছে। এটাকেই বলা হয় শ্রুতি বাক্য। শ্রুতি-প্রমাণ মানে আমি শুনেছি সেটাই প্রমাণ। বেদ আমাদের শেষ কথা, বেদ যেটা বলে দিয়েছে সেটাই শ্রুতি-প্রমাণ। মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়। ছেলে এখন ততদিন ওকেই দাদা বলে জানবে যত দিন না অন্য রকম কোন তথ্য সে প্রমাণ রূপে পাচ্ছে, তাও সেটা অনেক পরের ব্যাপার। কিন্তু গ্রাম দেশের কোন বাচ্চাকে তার মা কোন নীচু জাতির ছেলেকে দেখিয়ে বলে দেয় ও তোর দাদা, বাচ্চা কিন্তু চিরদিন তাকে দাদা বলেই গ্রহণ করে আসবে। ঠিক তেমনি কোন একটা সময়ে কোন ঋষি বলে দিয়েছেন পুরাণ আঠারোটি, এই গ্রন্থগুলো পুরাণ, এই গ্রন্থগুলো পুরাণ নয়। গুরু বলে দিয়েছেন, সেই থেকে আমরা মেনে আসছি আমাদের আঠারোটি পুরাণ, এগুলো পুরাণ আর এগুলো পুরাণ নয়। কোন্ গুরু বলে দিয়েছেন এই প্রশ্ন যদি করা হয়, তাহলে এর কোন উত্তর দেওয়া যাবে না।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা এখানে এসেই সব গোলমাল করে বসেন। তাঁরা দশ রকম প্রশ্ন করবেন, আমাদের ঋষিরা বলবেন দেখো বাপু, এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমার মা যখন বলে দিয়েছে উনি আমার দাদা হন, তখন উনিই আমার দাদা। মজার ব্যাপার হল পুরাণ গ্রন্থের অনেক জায়গায় পুরাণের যে তালিকা পাওয়া যায়, সেই তালিকাগুলো মেলালে পুরাণের সংখ্যা কুড়ি হয়ে যায়। কিন্তু পুরাণ সব সময়ই আঠারোটি বলা হয়, শ্লোকেই আছে *অষ্টাদশ পুরাণেষু* ইত্যাদি। মৎস্য পুরাণে পুরাণকে আবার তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে – সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক। কেন এইভাবে ভাগ করা হয়েছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই, আর এগুলোর অত গুরুত্বও নেই। আবার একটা মতে পুরাণকে তিন ভাবে ভাগ করা যায় – ব্রহ্মাপুরাণ, শিবপুরাণ আর বিষ্ণুপুরাণ। এই তিনটের প্রত্যেকটিতে ছয়টি করে পুরাণ আছে। অনেক পণ্ডিতদের মতে ব্রহ্মাপুরাণের কিছু পুরাণ, যেখানে ব্রহ্মার কথা বেশী বলা হয়েছে, যখন শৈবদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী হয়ে গেল তখন তারা সেই পুরাণে কায়দা করে কয়েকটা শ্লোক ঢুকিয়ে সেটাকে শিবপুরাণে পাল্টে দিয়েছে। এই ধরণের নানান রকমের মত আছে।

ব্রহ্মাপুরাণে একটা পুরাণ আছে যার নাম ভবিষ্যপুরাণ, যার কথা আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। এর মধ্যে চোদ্দ হাজার শ্লোক আছে। এখানে সূর্য্য যেন মনুকে উপদেশ দিচ্ছেন। ভবিষ্যপুরাণের ভবিষ্যতের অনেক ঘটনার কথা ভবিষ্যদ্বাণীর মত করে বলা আছে। তার মধ্যে নাদীর শা'র কথা আছে, আকবরের কথা আছে, পৃথ্বিরাজের কথা আছে, শঙ্করাচার্য, রামানুজ এনাদের কথা বলা আছে। মজার ব্যাপার হল, বৃটিশদের অধীনে ভারতে যে শাসন কায়েম হবে তারও ভবিষদ্বাণী করা আছে। এমন কি কলকাতা

শহরের নামও দেওয়া হয়েছে। তেমনি আরেকটি পুরাণের নাম ব্রহ্মপুরাণ, যাতে পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে। ব্রহ্মপুরাণে সাধারণতঃ সৃষ্টির কথা, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, ব্রহ্মাণ্ড কি এবং ব্রহ্মাণ্ড কেমন, এগুলোর সব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যাঁরা পরের দিকে নতুন পুরাণ লিখছিলেন তখন তাঁরা অন্য পুরাণ থেকে একটা অংশকে টেনে পুরোটাই বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন মহাভারতে রামকথা নামে একটা বিরাট বড় অধ্যায়ই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মহাভারত তার মধ্যে রামকথাকে এত বিরাট জায়গা ছেড়ে দেবে, এটা ঠিক জমে না। পাণ্ডবরা যখন বনবাসে আছেন, খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছেন, সবারই মনের মধ্যে সংশয় আমরা সৎ পথে থেকেও সহায় সম্বলহীন হয়ে কেন আমাদের এত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে। যুধিষ্ঠিরকে তখন মহাভারতে রামকথা শোনান হয়েছিল। রামকথা একটা আলাদ বিশাল গ্রন্থ। সৌভাগ্য বশতঃ মহাভারতের রামকথা অন্য কোন রামকথার সাথে মেলে না, মহাভারতের রামকথা একটা পুরো স্বতন্ত্র রচনা। কিন্তু পুরাণে পণ্ডিতরা একেবারে পুরো অধ্যায়টাকে তুলে হুবহু বসিয়ে দিয়েছেন – কম্প্যুটারের কপি এ্যণ্ড পেস্টের মত। এই কপি এ্যণ্ড পেস্ট অনেক পুরাণেই পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ অনেক প্রাচীন পুরাণ, যার জন্য এই পুরাণের কাজ গুলো একেবারে original হওয়াতে এর আরেকটা নাম আদিপুরাণ। ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতিকে উপদেশ দিচ্ছেন। যদিও আদিপুরাণ বলা হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যেও কোনারকের সূর্য মন্দিরের নাম এসে গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন কোনারক মন্দির আজ থেকে প্রায় সাত আটশ বছর আগে তৈরী হয়েছিল, কিন্তু দুম্ করে ব্রহ্মপুরাণে ঢুকে গেছে, এবার সবাই ব্রহ্মপুরাণের প্রাচীনত্ব নিয়ে হিসাব করতে বসে গেলেন। একদিকে বলা হয় ব্রহ্মপুরাণ সব থেকে প্রাচীন, কম করে না হলেও প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী খ্রীষ্টপূর্বের লেখা। অথচ তার পনের'শ বছর পরের তৈরী কোনারক মন্দিরের নাম ব্রহ্মপুরাণে জায়গা করে নিয়েছে। পণ্ডিতরা তাই একটা সন্দেহ করেন যে, পুরাণের এই কাজগুলো খুবই প্রাচীন এতে কোন সংশয় নেই, কিন্তু এই পুরাণগুলো বিভিন্ন পণ্ডিতদের কাছে ছিল, তাঁদের কারুর মনে হল কোনারকের সূর্য মন্দিরের মাহাত্ম্য একটু দিতে হবে, তখন নিজে থেকেই একটা অধ্যায়কে ব্রহ্মপুরাণে ঢুকিয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষ জানল পুরাণে কোনারক সূর্য মন্দিরের বর্ণনা আছে, সবাই এখন কোনারক ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। কিছু কিছু পণ্ডিতরা দায়ীত্ব নিয়ে এই কাজটা করে গেছেন। অন্য দিকে এ সবের জন্য অনেক সমস্যাও হয়ে যেত। বেদ উপনিষদকে একেবারে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, ওখানে কারুর ক্ষমতা নেই যে একটা চন্দ্রবিন্দু পাল্টাবে। বলা হয় শাস্ত্রে কোন আঁচড় পর্যন্ত যদি কাটা হয় তাহলে তার গুরুহত্যার পাপ লাগে। তাই বেদ উপনিষদ যেমন ছিল তেমনটিই থেকে গেছে। পুরাণে এসে কিন্তু সেই সুযোগ পেয়ে গেছে, তাই বলে যা খুশী পাল্টে দেবে বা ঢুকিয়ে দেবে তা নয়, এখানেও গুরু-শিষ্য পরম্পরা চলছে। কিন্তু মাঝে মাঝে দু-চারটে পাতা কায়দা করে ঢুকিয়ে দিত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও সৃষ্টির অনেক কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, বিশেষ করে সুবর্ণ অণ্ডের কথা, যেখান থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্লোক সংখ্যা বারো হাজার। এর মধ্যে দুটি খুব নামকরা কাজ আছে, একটা ললিতা-সহস্র নাম আর অধ্যাত্ম রামায়ণ। নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কিন্তু তার মধ্যে এসে গেছে অধ্যাত্ম রামায়ণ। এই রকম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কেণ্ডয় পুরাণ আর বামন পুরাণ, এগুলো সব ব্রহ্মাপুরাণের অন্তর্গত।

বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণ খুব নামকরা। বিষ্ণুপুরাণ গুলিতে বিষ্ণুকে বেশী গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভাগবত পুরাণের পর গরুড় পুরাণ বিষ্ণুপুরাণের খুব নামকরা পুরাণ। গরুড় পুরাণে ভগবান বিষ্ণু গরুড়কে উপদেশ দিচ্ছেন, এতে উনিশ হাজারের মত শ্লোক আছে। আমাদের যত স্বর্গ নরকের বর্ণনা আছে এর সব গরুড় পুরাণে পাওয়া যাবে। কি কি পাপ কাজ করলে কোন্ কোন্ নরকে যাবে তার সব কথা এখানে দেওয়া আছে। অন্য দিকে গরুড় পুরাণ একটা যেন জ্ঞানভাণ্ডার, এখানে সব রকম কিছুর বর্ণনা পাওয়া যাবে, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যকরণ, জীবন চালনার জন্য যা কিছু দরকার সব এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বরাহপুরাণ এগুলো সব বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে রয়েছে।

শিবপুরাণ অর্থাৎ যেখানে শিবের মাহাত্ম্য দেওয়া আছে সেগুলো হল কূর্মপুরাণ যাতে আট হাজার শ্লোক আছে। লিঙ্গপুরাণে বারো হাজার শ্লোক, শিবের যতগুলো পবিত্র স্থান আছে সেইসব স্থানের বর্ণনা এই

লিঙ্গপুরাণে করা হয়েছে। এছাড়া শিবের আটাশটা আলাদা রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্নিপুরাণে অগ্নিদেবতা বশিষ্ঠ মুনিকে উপদেশ দিচ্ছেন। এর বারো হাজার শ্লোকের মধ্যে বিষ্ণুর কথা, শিবলিঙ্গের বর্ণনা, দূর্গার কথা বলা হয়েছে। অগ্নিপুরাণ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি নেওয়া হয়, অথচ অগ্নিপুরাণ নিজে কিন্তু original কাজ নয়। অগ্নিপুরাণের সব কিছু বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা, পরিষ্কার বোঝা যায় বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি থেকে অনেক কিছু পুরোপুরি তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। ভগবান বিষ্ণু মৎস্যাবতারে যত কীর্তি করেছিলেন তার বর্ণনা মৎস্যপুরাণে দেওয়া হয়েছে। প্রথমের দিকে মৎস্যপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু পরবর্তি কালে শৈবরা শিবের কিছু মহিমাকে মৎস্যপুরাণের মধ্যে সংযোজন করে এটাকে শিবপুরাণের মধ্যে নিয়ে এসেছে। এছাড়া স্কন্দপুরাণ আর বায়ুপুরাণও শিবপুরাণের মধ্যে আসছে। বায়ুপুরাণে অনেক রকম সৃষ্টির কথা আছে। সৃষ্টির অনেক কথা বলতে বলতে একটা জায়গাতে এসে তখনকার দিনের রাজাদের কথা বলতে শুরু করে দেয়। আবার রাজাদের কথা বলতে বলতে গুপ্ত যুগের চন্দ্রগুপ্ত রাজার বর্ণনাও এসে গেছে। চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত এসে রাজাদের বর্ণনা শেষ হয়ে যায়। তার থেকে এটা বলা যেতে পারে চন্দ্রগুপ্তের কোন সময়ে বায়ুপুরাণ রচিত হয়েছিল। মোটামুটি এই হল আঠারোটি পুরাণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ ভাগবত পুরাণে শিবপুরাণের কথা আছে। কিন্তু অন্যান্য পুরাণগুলো শিবপুরাণকে মূল পুরাণের মধ্যে ধরে নেয়। এইভাবে আঠারোটি পুরাণ নির্ধারিত হওয়ার পর দেখা গেল এর বাইরেও আরও কিছু গ্রন্থ থেকে গেছে, বা মূল পুরাণেরও কয়েকটি শাখা পাওয়া গেল। তখন এই গ্রন্থগুলোর নাম দিয়ে দেওয়া হল উপপুরাণ। উপপুরাণের ঠিক ঠিক সংখ্যা নির্ধারিত না হলেও বলা হয় এই রকম আঠারোটি উপপুরাণ আছে। উপপুরাণের বিভিন্ন নামগুলো সব তখনকার দিনের ঋষিদের নামে যেমন সনৎকুমার, নরসিংহ, দুর্বাসা, কপিল, বামন ইত্যাদি। আবার হংসপুরাণ আছে, যদিও পুরাণ বলা হচ্ছে কিন্তু আসলে এটিও উপপুরাণ। এগুলো বেশীর ভাগই কোন না কোন পুরাণের অংশ থেকে বেরিয়েছে। এমনিতে উপপুরাণের সব বৈশিষ্ট্য পুরাণের মতই। কিন্তু যেহেতু হংসপুরাণ পুরাণের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায় না বলে পুরাণ হিসাবে গণ্য করা হয় না।

পুরাণের সৃষ্টি তত্ত্ব

পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে অন্যতম লক্ষণ হল সর্গ। সর্গ মানে সৃষ্টি কিভাবে হয়। সব পুরাণেই সৃষ্টির ব্যাপারটা খুব বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। আমরা এর আগেও অনেক বার আলোচনা করেছি যে, হিন্দু ধর্মের যে কোন শাস্ত্র কখনই বেদের বাইরে কিছু বলবে না। যে জিনিষের বর্ণনা বেদে করা হয়ে আছে, সেই জিনিষকে এনারা কোন ভাবেই পাল্টাতে পারবে না। যে জায়গাটায় বেদ কোন কিছুর ব্যাপারে সূত্রাকারে হাল্কা ভাবে কিছু বলে বেরিয়ে গেছেন, সেই জায়গাতেই পরবর্তিকালের ঋষিরা বা পণ্ডিতরা নিজেদের চিন্তা ভাবনাকে প্রয়োগ করে অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছেন। আর যে জায়গাতে বেদ নীরব সেই জায়গাতে এনারা তাঁদের সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তিকে পুরোপুরি লাগিয়ে দিয়েছেন। আমাদের পরম্পরাতে বেদের ঋষিদের প্রচণ্ড সম্মান দেওয়া হয়, এমনকি এও বলা হয় যে, ঋষিরা দেহত্যাগের পর সিদ্ধলোকের মত অনেক উচ্চলোকে গিয়ে বাস করেন। বেদের এই সম্মানীয় ঋষিরাও সৃষ্টির ব্যাপারে কিছু মত ব্যক্ত করে গেছেন। সৃষ্টির ব্যাপারে বেদে মোটামুটি দুটো মত পাওয়া যায় – একটি নাসদীয় সূক্তম্ আরেকটি মত পুরুষসূক্তম্।

নাসদীয় সূক্তমে সৃষ্টি তত্ত্বের পুরোটাই বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে প্রথমে যেন কিছুই ছিল না। যেন বলা হচ্ছে মানে, মনে করা যাক একজন লোক সৃষ্টির আগের মুহুর্তে দেখছে কি আছে, সে দেখছে কোথাও কিছু নেই। তারপরেই সেখান থেকে যেন আকাশ ও প্রাণের সৃষ্টি হল। আকাশ মানে পদার্থ, পদার্থ মানে খুব সূক্ষ্ম কণা আর প্রাণ মানে শক্তি। প্রাণ আকাশের উপর যেন আঘাত করতে শুরু করল। পদার্থের উপর প্রাণের আঘাত হতেই সেই পদার্থের মধ্যে গতির সঞ্চার হয়, গতি পাওয়ার পর থেকে সেই পদার্থ গুলো এক অপরের সাথে সংমিশ্রণের ফলে আরও অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে থাকে। এই ভাবটা বিজ্ঞানের ইদানিং বিগ্ ব্যাঙ তত্ত্বের কিছুটা কাছাকাছি যায়। বিজ্ঞানের মতে প্রথমে শুধু পিওর এণার্জি থাকে।

এই পিওর এণার্জিই যখন কিছু মৌলিক পদার্থের পার্টিকেলসে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন এই পিওর এণার্জিই এই পদার্থের উপর আঘাত করতে থাকে। সেই থেকে আবার আরও বৃহৎ পদার্থের সৃষ্টি হয়। এইভাবে শেষ ইলেক্ট্রন, নিউট্রন, প্রোটনের অবস্থায় আসে। সেই ইলেক্ট্রনাদি থেকে আবার হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদির সৃষ্টি হচ্ছে। সেখান থেকে সৃষ্টি এগোতে থাকে। ঠিক এই মতটাই নাসদীয় সূক্তমে দেখান হয়েছে। তবে নাসদীয় সূক্তমের বিশেষত্ব হল, যেটা কোন ধর্মে বলা হয় না, সেটা হল, নাসদীয় সূক্তমে সব কিছু বর্ণনা করার পর বলছে 'কে জানে বাপু! এগুলো সব ঠিক কিনা'। কারণ সৃষ্টির সময় তো কেউ ছিলেন না। দেবতারা দূরে থাক, ঋষিরাও তখন ছিলেন না। যখন সৃষ্টিটা কেউ দেখেইনি তখন সবার অনুভব এর বাইরেই হবে, তাই কে বলতে যাবে সৃষ্টি এইভাবে হয়েছে! এর মূল অর্থ হল সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে বলা যায় না। কোন ধর্ম, কোন বিজ্ঞানের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে একটা ধারণা দিয়ে বলে দিলেন সৃষ্টি যেন এভাবেই হয়। এটা গেলে একটা মত। কিন্তু তাঁরা এই মতের পেছনে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন লাগিয়ে রেখে ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

সৃষ্টির ব্যাপারে বেদের দ্বিতীয় মত হল পুরুষসূক্তম্। পুরুষসূক্তমে সৃষ্টিকে পুরাণের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পুরাণ আবার তার নিজস্ব সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে নাসদীয় সূক্তমের ভাব আর পুরুষসূক্তমের সৃষ্টি তত্ত্বকে কোথাও যেন দুটোকে এক করে মিলিয়ে দিয়েছে। পুরুষসূক্তমের ভাব হল, সৃষ্টির আগে প্রথমে ভগবানই ছিলেন, কারণ ভগবান ছাড়া কোথাও কিছু নেই। আমরা পরে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের আলোচনা করব। চতুঃশ্লোকী ভাগবত মানে, যে চারটি শ্লোকে পুরো ভাগবতের বিষয় বস্তুকে বলে দেওয়া যায়। যার মূল বক্তব্য হল, ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলছেন 'সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম, সৃষ্টি যেটা হল সেটাও আমি আর সৃষ্টির বাইরে যা আছে, যাকে দেখা যায় না সেটাও আমি এবং সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যাবে তখনও আমিই থাকব। আর এটা জেনে রাখ, যে জিনিষের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই সেই জিনিষটা অলীক মাত্র, ওই জিনিষ বলে কিছু নেই। আমাকে ছাড়া কোন বস্তুর কল্পনাই করা যায় না'। এটাই ভাগবতের মত।

আমরা এখন 'ভগবান' নামে যে শব্দ ব্যবহার করি, বেদে এই 'ভগবান' শব্দ ছিল না, বেদে বলা হত আদি পুরুষ। পুরুষসুক্তমে এই আদি পুরুষকেই নিয়ে আসা হয়েছে। এই আদি পুরুষ ছাড়া কিছু নেই। তিনি ঠিক করলেন সৃষ্টি করতে হবে। কোন কিছু সৃষ্টি করতে গেলে যজ্ঞ করতে হবে। যজ্ঞ করার জন্য সেই আদি পুরুষ নিজেই যজ্ঞের পশু হলেন। তিনি ছাড়া তো তখন কিছু নেই, তাই তাঁকেই যজ্ঞের পশু হতে হল। তারপর তাঁকে বলি দেওয়া হল। যিনি বলি দিচ্ছেন তিনিও সেই আদি পুরুষ। যজ্ঞের পশুকে যখন বলি দেওয়া হল তখন সেই আদি পুরুষের শরীর থেকে নানান জিনিষের সৃষ্টি হয়ে গেল। বেদে যজ্ঞকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তাই সেখানেও দেখানো হচ্ছে ভগবানও যখন সৃষ্টি করতে চাইছেন তখন তাঁকে যজ্ঞ করতে হয়েছে। জীবনে তুমি যা কিছু করবে সবটাই যজ্ঞ। তুমি জন্ম নেবে সেটাও যজ্ঞ, তুমি বিয়ে করবে সেটাও যজ্ঞ, তুমি সন্তানোৎপাদন করবে সেটাও যজ্ঞ, তুমি মারা যাবে সেটাও যজ্ঞ, তোমার জীবনের সব কিছুই যজ্ঞ, কারণ সৃষ্টিটাই যজ্ঞ। তাহলে সৃষ্টির আগে কি ছিল, সৃষ্টিটা কোথা থেকে এল? শুধুমাত্র ভগবানই ছিলেন, তিনিই নিজেকে যজ্ঞে আহুতি দিলেন। তারপর সেখান থেকে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদির জন্ম নিল, সেখান থেকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির জন্ম হল ইত্যাদি।

স্বামীজী আবার নাসদীয় সূক্তমের বেশী অনুরাগী ছিলেন। নাসদীয় সূক্তমে কোন কিছু কল্পনার স্থান নেই। পরিষ্কার যা ছিল তাই বলা হচ্ছে। আকাশ অর্থাৎ পদার্থ ছিল আর প্রাণ ছিল, এই আকাশ আর প্রাণের খেলা ছাড়া আর কিছু নাসদীয় সূক্তমে পাওয়া যাবে না। সব কিছুর বর্ণনা করার পরে শেষে উপসংহার টানছেন – কে জানে বাপু তখন কি হয়েছিল, কারণ তখন দেখার জন তো সেখানে কেউ ছিলই না। পুরাণ নাসদীয় সূক্তম্ আর পুরুষসূক্তম্ এই দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে মিলিয়ে দিয়েছে। মিলিয়ে দিয়ে বলবেন প্রথমে কিছুই ছিল না। যখন বলা হয় 'সেই সময় কিছুই ছিল না', তখন অনেকে ভুল করে ধারণা করতে পারে যে, কিছু ছিল না যখন বলছে তার মানে তাহলে তখন শূন্য ছিল। না, তখন শূন্য ছিল না। যখনই বলছেন তখন কিছুই ছিল না, এর অর্থ হল তখন স্থূল কিছু ছিল না, সূক্ষ্ম কিছু ছিল না, কারণ বলে কোন কিছু ছিল না। তাহলে কি ছিল?

শুধু মহাকারণ ছিল, যিনি বিশুদ্ধ, শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি সৎ তিনিই ছিলেন। তাঁকে কোন কিছু দিয়েই জানা যায় না, কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না, মন দিয়ে তাঁকে জানা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। যাঁকে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি কিছু দিয়েই জানা যায় না, তাহলে কি করে বলবে যে তখন তিনিই ছিলেন? তাই বলা হয় তখন কিছুই ছিল না। সেইজন্য উপনিষদে কখন কখন বলা হয় প্রথমে সৎই ছিল আবার কখন কখন বলা হয় প্রথমে অসৎই ছিল, এখানে অসৎ বলতে মায়াকে বোঝায়।

তাহলে কি দাঁড়াল? প্রথমে ভগবান ছিলেন, তখন তিনি মহাকারণ রূপে ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক তাঁর ইচ্ছে হল সৃষ্টি হোক। তিনি তখন চারিদিকে নিজের অনুভূতি দিয়ে অবলোকন করতে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি ছাড়া তো আর কিছু নেই, তখন point of reference বলে কোন কিছুই নেই। অনুভব করার জন্য কিছুই নেই, এখানে সন্দেহ হয় হয়তো তিনিও নেই। যখন তিনি ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, এই ইচ্ছা করতেই কোথা থেকে যেন একটা সুবর্ণময় ডিম্ব দাঁড়িয়ে গেল। কবির কল্পনা আর পুরুষসূক্তমের বর্ণনা এই সব কিছু মিলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করান হচ্ছে। কারণ বেদের কখনই বিরোধিতা করা যাবে না, আর এটাও সত্যিই দেখা যায় যা কিছুর জন্ম হচ্ছে সব ডিম থেকে হচ্ছে। এই দুটোকে পুরাণ মিলিয়ে দিয়েছে।

বলছেন এই সুবর্ণ ডিমের মাঝখান থেকে সেই বিশ্বরূপ আদি পুরুষ বেরিয়ে এলেন। আদি পুরুষ তো বেরিয়ে এলেন, কিন্তু উনি এখন থাকবেন কোথায়? কিছুই তো তখন নেই, স্থূল নেই, সূক্ষ্ম নেই। কিন্তু তিনি এখন সৃষ্টি করবেন বলে কারণ সলিলে অবস্থান করবেন। কারণ সূক্ষ্মেরও পেছনে, এখানে শুধু আনন্দ স্বরূপ। তিনি যেন সেই আনন্দ স্বরূপ কারণ সলিলে ভাসছেন। সেখান থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি। ব্রহ্মা সৃষ্টিতে এসে গেছেন, এবার সব কিছু পর পর সৃষ্টি হতে থাকবে। তার মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মারও শরীর আসার আগে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে গুণের জন্ম হয়ে যাচ্ছে। পুরাণ যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কারণ বিজ্ঞানে যখন কিছু বলা হয় তখন বিজ্ঞানীরা বলে দেন এটাই মত আর এটাই ঠিক, পুরাণ সেইভাবে কখন বলবে না। কারণ বেদের ঋষিরাই বলে গেছেন কে জানে বাপু এটা ঠিক হতেও পারে নাও হতে পারে। পুরাণের ঋষিরাও ঠিক এই পথেই এগিয়েছেন। বুদ্ধি দিয়ে যদি বিচার করা হয় তখন বলবেন এইভাবেই হওয়ার সম্ভবনা। এই যে প্রায়ই বলা হয়, যদি সব জিনিষ জানাই যেত তাহলে এত ঋষি কেন হলেন, আর এত ঋষির এত মত কেন হল। কোথাও একটা জায়গায় এসে মতটা থেমে যায়। এই সমস্যা সব দর্শনেই আছে। যেমন ইসলামে বলা হচ্ছে আল্লা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, এতে কারুরই কোন সন্দেহ নেই। আল্লা আর কি করেছেন? চাদর যেমন ছড়িয়ে দেওয়া হয় সেই ভাবে তিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, এখানেও ঠিক আছে। আর সেই আকাশে আল্লা তারাগুলোকে বসিয়ে দিয়েছেন। কিভাবে বসিয়েছেন? জামা-কাপড়ে যেভাবে নকশা করা হয় সেই ভাবে। এখানে এসে বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে একেবারেই মিলবে না। নক্ষত্রের যে গতি আছে, নক্ষত্রও যে চলে ইসলাম ধর্ম কিছুতেই মানবে না। বিজ্ঞান এক রকম কথা বলছে, ইসলাম অন্য রকম কথা বলছে। মোল্লারা তাই ফতোয় দিয়ে দিলেন, যে বিজ্ঞান এই কথা বলে সেই বিজ্ঞান পড়া বন্ধ করে দাও।

আবার এ্যরিস্টটলের দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে অবলম্বন করে পুরো খ্রীশ্চান ধর্ম এগিয়ে গেছে। এ্যরিস্টটলের বিজ্ঞানের যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনা থেকে বিজ্ঞান আজকে অনেক এগিয়ে গেছে, খ্রীশ্চানরা তাই কিছুতেই আধুনিক বিজ্ঞানের কোন কিছুকে মানতে পারছে না। এ্যরিস্টটল বললেন পুরুষদের বত্রিশটা দাঁত হয় আর মেয়েদের মুখে আটাশটা দাঁত হয়। এই নিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেল মজা করে লিখছেন – এ্যরিস্টটলকে এত বড় বিজ্ঞানী বলা হয়, তখনকার দিনে বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিলেন। মিসেস এ্যরিস্টটলের মুখটা হাঁ করে দাঁত গুণে নিলেই তো ঝামেলা মিটে যেত, দেখতেন বত্রিশটা দাঁত আছে কিনা। এখন যেমনি কেউ বলে দেবে ছেলে আর মেয়েদের দাঁতের সংখ্যা সমান তক্ষুণি খ্রীশ্চানরা তাকে বলে দেবে তুমি ভাই খ্রীশ্চান ধর্মের সিদ্ধান্তকে উল্লঙ্ঘন করছ, তোমার কিন্তু ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। যদি কোন স্বামী কোন খ্রীশ্চান পাদরীকে গিয়ে দেখায় এই দেখুন আমার স্ত্রীর বত্রিশটা দাঁত। পাদরী সঙ্গে সঙ্গে একটা ফতোয়া দিয়ে বলে

দেবেন – তাহলে তোমার মিসেস একটা ডাইনী। ডাইনীদের যা করা হয় তোমার মিসেসের ক্ষেত্রেও এখন তাই করতে হবে। একটা সময়ে পাশ্চাত্যে ডাইনী হলেই তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হত। আর এই সাহবদের চোখে ভারতীয়রা নাকি জংলী বর্বর। ভারতে সতীদাহ প্রথা যেটা ছিল সেটা এমন বিরাট কিছু ছিল না। খ্রীশ্চানরাই নিজেদের কলঙ্ককে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। বিশ্বে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশী, লেখাপড়া জানা মানুষ যা বলে দেয় তারা সেটাকে নিষ্ঠার সাথে মেনে নেয়।

পৌরাণিক ঋষিরা এই ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। নাসদীয় সূক্তমে যে বলছেন সৃষ্টির পূর্বে কি ছিল কে জানে বাপু, এই ব্যাপারটাকেও এনারা মাথায় রাখতেন। অন্য দিকে আবার সাধারণ মানুষকে কিছু একটা বলতে হবে, সব সময় যদি বলে দেন আমার তো বাপু এটা জানা নেই, এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন মানুষ তাঁর কাছে ধর্ম কথা শুনতে যাবে কেন! দুই ভাই ছিল। তারা দুজনেই গ্রামের মুখিয়া জাতীয় কোন কিছু ছিল। ছোট ভাই সারা দিন ক্ষেতে কাজ করত। বড় ভাই ক্ষেতের কাছে বসে সারা দিন গ্রামের লোকেদের লেকচার দিয়ে যেত। গ্রামের লোকরা সবাই বড় ভাইয়ের কাছে এসে তার লেকচার শুনতো আর তাকে খুব সম্মানও করত। ছোট ভাইয়ের মাথাটা একটু মোটা ছিল। একদিন সে দাদাকে রেগেমেগে বলছে 'দাদা! আমি সারা দিন ক্ষেতে গাধার মত পরিশ্রম করে যাচ্ছি আর তুমি সারা দিন বসে বসে হুঁকো টানছ আর লেকচার দিয়ে যাচ্ছ। এ ভারি অন্যায়'। বড় ভাই তখন বলল 'ঠিক আছে কাল থেকে আমি ক্ষেতে কাজ করব আর তুমি আমার জায়গায় বসে লেকচার দিয়ে যাবে। কারণ লেকচার দেওয়াটাও আমাদের কাজ, তা নাহলে লোকেরা আমাদের কাছে আসবে কি করতে! তারা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে, মামলা মোকদ্দমা নিয়ে আসে, আমাকে তার একটা সমাধান করে দিতে হয়'। এখন ছোট ভাই সারা জীবন ক্ষেতে কাজ করে এসেছে, মামলা মোকদ্দমার কিছুই সে জানে না। পরের দিন বড় ভাই ক্ষেতে কাজ করতে চলে গেছে আর ছোট ভাই লোকেদের লেকচার দেবে। গ্রামের অনেক লোক এসে গেছে। এত লোক দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ঠিক করে উঠতে পারছে না এদের কি বলবে! কিছু না ভেবেই হঠাৎ সে বলতে শুরু করে দিল 'আমি একদিন আকাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যেতে যেতে দেখলাম কয়েকটা কুকুরের বাচ্চা কাঁদছে'। সবাই ভাবছে আকাশে কুকুরের বাচ্চা কি করে কাঁদবে! একবার, দুবার করে প্রশ্ন করছে, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারছে না। সবাই বুঝে নিল ছোট ভাইটি একটা অপদার্থ। সবাই এক এক করে উঠে যে যার কাজে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দেখে সেখানে কেউ নেই। ছোট ভাইয়ের মন খারাপ। বড় ভাই বলল 'মন খারাপের কি আছে তুই তোর আগের কাজে লেগে যা, আমিও যা করছিলাম তাই করি'। পরের দিন আবার লোকজন জড়ো হয়েছে। বড় ভাই সেও সেদিন ওই একই কাহিনী শোনাচ্ছে – আকাশে কুকুরের বাচ্চারা কাঁদছে। ভাইকে তো ছোট করা যায় না। লোকেরা প্রশ্ন করছে এটা কি করে হতে পারে, আপনারা দুই ভাইই উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। বড় ভাই তখন আজগুবী গল্প শুরু করল 'এতে আশ্চর্যের কি আছে! একটা গরু মরেছিল। একটা কুকুর সেই মরা গরুর পেটের ভেতরে গিয়ে বাচ্চা দিয়েছে। এদিকে কিছু শকুন সেই মরা গরুটাকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেছে। আর বাচ্চাগুলো ভয়ে ক্যাঁই ক্যাঁই করতে শুরু করেছে। তখন আমি আকাশে কুকুরের বাচ্চার সেই কান্না শুনতে পেয়েছি'। সবাই তখন বলছে 'হ্যাঁ, তাতো হতেই পারে'। আসলে সবটাই লম্বা গালগপ্প। ছোট ভাই সততা দেখাতে গিয়ে গল্পটা সাজাতে পারলো না। আমাদের পুরাণের কাহিনীগুলো অনেকটা এই রকম। এগুলো তো কেউ জানে না, কোথায় কি হয়েছিল, কে দেখেছে কি দেখেনি তার কোন রেকর্ড নেই। ওনারা একটা যোগসূত্র নিয়ে আসছেন। এইসব কাহিনীর কিছু কিছু অনেক পুরনো, যা পরম্পরাতে লোকমুখে চলে আসছে।

যেমন ইসলামে বলা হয় আল্লা মহম্মদকে যা কিছু বলেছিলেন সব কোরানে নথিভুক্ত করা হয়েছে। বলা হয় কোরানেরও দুটো অংশ আছে। মহম্মদ মক্কাতে যত দিন ছিলেন, সেখানে তিনি আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে সাধারণ কিছু কথা বলেছিলেন। মহম্মদের মুখের সেই কথাকে কেউ কেউ লিখে রাখতেন। এরপর তিনি যখন মদিনা চলে এলেন, সেখানে মহম্মদকে এটা করা যায় কিনা, সেটা করা যায় কিনা এই ধরণের প্রশ্ন কেউ কেউ করত। মহম্মদ তক্ষুণি কোন উত্তর দিতেন না। দু-চারদিন পর হঠাৎ মহম্মদ একটা ভাবের ঘোরে বলতে শুরু

করতেন – আল্লা বললেন এটা করা যায়, আল্লা বললেন এটা করা যায় না ইত্যাদি। মহম্মদের এই কথাগুলোও অনেকে রেকর্ড করে রাখতেন। মক্কাতে তিনি আধ্যাত্মিকতার কথাই বেশী বলেছেন আর মদিনাতে কোন বিশেষ ব্যাপারের উপর বলেছেন, যেমন সম্পত্তি বিভাগ কিভাবে হবে, কটা বিয়ে করা যাবে, স্ত্রীর সাথে আচরণ কেমন হবে ইত্যাদি। মদিনাতেও অবশ্য কিছু আধ্যাত্মিকতার কথা আছে আবার মক্কাতেও আচার বিধির কিছু কথা আছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে মক্কার পরম্পরা এক রকম আর অন্য দিকে মদিনার পরম্পরা অন্য রকম। পরে যখন কোরান তৈরী হল তখন সব লেখগুলোকে একত্রিত করে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপর বড় বড় অংশগুলোকে প্রথম দিকে রেখে যেমন যেমন ছোট ছোট অংশ হয়েছে সেই ভাবে পর পর সাজিয়ে কোরান লেখা হয়েছে। এখন অতটুকু কোরানে তো সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। কারণ প্রতিদিনই নতুন নতুন ধরণের সমস্যা তৈরী হচ্ছে, দাঁত কিভাবে মাজবে, থুতু কোথায় ফেলবে, প্রস্বাব কিভাবে করবে ইত্যাদি নানান ধরণের প্রশ্ন আসতে শুরু করল। পয়গম্বরের শরীর যখন চলে গেল তখন তাঁর কাছে অনেকে ছিলেন, আলি বলে একজন ছিলেন, তাঁর স্ত্রী আয়েষা ছিলেন। এনারা বলছেন আমরা যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন পয়গম্বর এই উত্তর দিয়েছিলেন। এগুলোকে নিয়ে তৈর হল হাদিস্। তার সাথে আরেকটা হল, পয়গম্বর নিজে থেকে বলেননি কিন্তু তিনি এই রকমটি করেছিলেন। সেগুলোকেও লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হল। হাদিস্ হল ঠিক ঠিক মহম্মদের কথা, হয় তিনি এটা বলেছিলেন তা নাহলে তিনি এই রকমটি করেছিলেন। সমস্যা হল, পয়গম্বের কাছে দু-তিনজন তো শুধু ছিলেন না, শত শত লোক ছিল। এবার সবাই শুরু করে দিল, আমি এই রকম মহম্মদকে করতে দেখেছিলাম, আমাকে তিনি এই রকম করতে বলেছিলেন। এদের মধ্যে স্বার্থান্বেষী কিছু লোক ছিল। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক রকম কথা মহম্মদের নামে চালাতে শুরু করে দিল। যার ফলে অনেক কথার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়াতে নিজেদের মধ্যে অনেক ঝামেলাও শুরু হয়ে গেল।

যাই হোক, এগুলোকে বলা হয় Oral Tradition। আমাদের পুরাণাদি যত আছে সব Oral Traditionএর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই Oral Traditionকে কেউ অস্বীকার করে ফেলেও দিতে পারবে না আবার সব কিছুকে আক্ষরিক ভাবে নিতে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। হিন্দুদের পরম্পরাকে সব থেকে ভালো বোঝা যায় যখন মুসলিম পরম্পরার সাথে তুলনামূলক দৃষ্টিতে দেখা হয়। অন্য কোন ধর্ম দিয়ে এটাকে ঠিক বোঝান যায় না। হিন্দুদের পরম্পরা দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় মুসলিম পরম্পরাতে কোথায় একটা গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা তফাৎ হল হিন্দুদের যত পরম্পরা আছে সবটাই প্রাচীন ঋষিদের দ্বারা অনুমোদিত, তাঁরা প্রচুর তপস্যা করে বুঝতে পেরেছিলেন এটা এই রকম হলে ভালো হয়, আর সেইভাবে তখনকার মানুষদের বলে গেছেন। ইসলামে ঋষি-পরম্পরার অভাব। পয়গম্বরের কাছাকাছি যাঁরাই তখন ছিলেন সবাইকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তাঁরা বলতে পারেন, মহম্মদের সঙ্গে যাঁরা এত অশান্তি, এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন তাঁরা ঋষি নয়তো কি! ঠিকই বলছেন, তাঁরা ঋষি হলে আর তো কোন সমস্যাই থাকবে না। কিন্তু পরবর্তিকালে মহম্মদের সব থেকে বিশ্বস্ত আলি আর মহম্মদের স্ত্রী আয়েষা আলাদা হয়ে দুটো গোষ্টীর জন্ম দিলেন, আর তাদের মধ্যে সব সময় লড়াই লেগেই থাকত, যা কিনা ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর হয়ে আছে। এই দুজনের মধ্যে সারা জীবন ঝগড়া ছিল। শুধু ঝগড়াই ছিল না, একটা সময় আয়েষা উটের পিঠে বসে নিজের সৈন্য নিয়ে আলির সেনাকে আক্রমণ করেছিলেন। যাঁদের মধ্যে এত লড়াই, এত বিবাদ ছিল, যখন কোন সঙ্কট আসবে তখন সব সময় যে তাঁরা সত্যি কথাই বলছে কিনা বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এই করে হাদিসের কলেবর বেড়েই যেতে থাকল, থামার কোন লক্ষণই নেই। এটা কবে হচ্ছে? মহম্মদের শরীর যাবার প্রায় একশ বছর পর। যেমন একজন এসে বলল ঠাকুর একজনকে এই রকম কথা বলেছিলেন, তিনি যাকে বলেছিলেন সে আবার আরেকজনকে বলেছিল, সে আবার আমাকে বলেছে। ইতিমধ্যে ঠাকুরের শরীর চলে যাওয়ার পর একশ বছরের বেশী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন ঠাকুরের এই কথা আমরা মানবো কি মানবো না? এদের একজন কেউ যদি মিথ্যে বলে থাকে তাহলে পুরোটাই মিথ্যা হয়ে যাবে। সেইজন্য একটা সময়ে এসে ওনারা হাদিসের মধ্যে অন্য কোন কিছু ঢোকান বন্ধ করে দিলেন। কোরানের

ক্ষেত্রেও ঠিক এই সমস্যা হয়েছিল। তবে কোরান হল Written Tradition আর হাদিস্ হল Oral Tradition। Written Traditionএর উপর অতি সহজে চালাকি করা যায় না।

ঠিক সেই রকম বেদ হল হিন্দুদের মূল পরম্পরা। তবে মজার ব্যাপার হল বেদের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো হয়েছে। বেদ কখনই লেখা হত না, আর এটাই হিন্দুদের genuine tradition। তাই বেদের ব্যাপারে কোন কথা বলা চলবে না। এদিকে বেদে সৃষ্টির ব্যাপারে দুটো দর্শন নিয়ে আসা হয়েছে। একটা দর্শন বলছে আকাশের উপর প্রাণের আঘাত থেকেই সৃষ্টি, কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্বের সব ব্যাখ্যা করে শেষে বলছেন কে জানে বাপু কি হয়েছিল, তখন তো কেউ ছিলই না, কে দেখেছে সৃষ্টি হতে! পুরুষসূক্তম্ বলছে সেই আদি পুরুষ তিনি যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞ থেকে সৃষ্টি এগিয়ে গেছে। ভাগবত এই দুটোকেই সমন্বয় করে দিল। ভাগবতের রূপকাররা, তিনি যেই হোন, ব্যাসদেবই হয়ে থাকুন বা পরবর্তিকালের মুনি ঋষিরাই হয়ে থাকুন, তাঁরা ভালো করে জানতেন আমরা যে কাহিনী গুলো রচনা করেছি এগুলো সব মিথ্, একটা খুব জটিল বিষয়কে সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এই মিথের সাহায্য নিয়েছি। সেইজন্য ভাগবত অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। বিজ্ঞানে যেমন সব কিছু uniform চলে, পুরাণে এই জিনিষ কখন থাকবে না। কারণ, যদি বলে দেওয়া হয় এটা এই রকমই তখন সেটাই সত্য হয়ে যাবে। পুরাণের ঋষিরা এই ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন, তাঁরা জানতেন সৃষ্টির ব্যাপারে যত কিছুই বলা হোক না কেন তার কোনটাই দ্বন্দ্ব মুক্ত হবে না। সেইজন্য সব কিছুকে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যাতে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে। আরেকটা ব্যাপার আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে পুরাণের উদ্দেশ্য সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা নয়। অথচ কয়েক পাতার পরে পরেই সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর বলছেন *কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ*, এই প্রশ্নগুলো আদিকাল থেকে মানুষের মধ্যে চলে আসছে, তুমি কে, আমি কে, কোথা থেকে আমরা এসেছি, কে আমার জননী, কে আমার পিতা। শুধু বড়রাই নয়, অনেক বাচ্চাদের মনেও প্রায়ই এই ধরণের প্রশ্ন আসে।

মানুষ তার এই আদি প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে কার কাছে যাবে? তখনকার মুনি ঋষিদের জীবনচর্চা সাধারণ মানুষকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তাঁদের প্রতি মানুষের প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল। মুনি ঋষিরাও জানতেন সাধারণ মানুষের মন নানান প্রশ্নে অশান্ত হয়ে আছে, তাদের অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্য তাঁরা তাই সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। তার মধ্যে একটা হল যেটা এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, সৃষ্টির পূর্বে ভগবানই ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ভগবান যখন ইচ্ছে করলেন সৃষ্টি হোক তখন প্রথমে তিনটে গুণের সৃষ্টি হল – সত্ত্ব, রজ ও তমো। শাক্ত দর্শন বা তন্ত্র দর্শন এইখানে শক্তিকে নিয়ে আসে। ভগবান তাঁর নিজের শক্তিকে আশ্রয় করে এই তিনটে গুণের সৃষ্টি করেন। এই তিনটে গুণ ভগবানের বাইরে নেই, তাঁরই মধ্যে ছিল। কিন্তু যে শক্তিটা সুপ্ত ছিল সেটাই ব্যক্ত হয়ে গেল। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির কথা আছে। সত্ত্ব, রজ আর তমো হল ভগবানের অপরা প্রকৃতি।

এই তিনটে গুণের সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে একেবারে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধিক্য পুরোমাত্রায় বিস্তার করে আছে। বোঝাই যাবে না যে রজ ও তমো বলে আলাদা কোন গুণ আছে। ভগবান সেই সুবর্ণ ডিমের মধ্যে, যাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়, সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি শয়ন করে আছেন। ভগবানের হাজার বছর এইভাবে শয়ন করে থাকার পর ওই সুবর্ণ ডিমটা ভেঙে তিনি বেরিয়ে এলেন। ভগবানের এই রূপকে বলা হচ্ছে বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপে তিনি কারণ সলিলে একটা সাপের উপর শয়ন করে আছেন। সেই সাপকে বলা হয় শেষনাগ, শেষ বা অশেষ মানে অনন্ত। কারণ সলিল মানে কোথাও কিছু নেই। বিশুদ্ধ শুদ্ধ সত্ত্ব, রজ ও তমোর যে শক্তি বীজাকারে পড়ে আছে, একেই বলছেন কারণ সলিল। এখান থেকেই সব কিছুর এবার সৃষ্টি হবে, এখনও কিছু সৃষ্টি হয়নি। আর ভগবান, যিনি অনন্ত, তিনি এখন একটা রূপ ধারণ করেছেন। অনন্তের কি কখন কোন রূপ হয় নাকি? আবার সাকার রূপ ধারণ না করলে সৃষ্টি কোথা থেকে হবে! সৃষ্টি হওয়ার পরেই তো আমরা এক অপরকে সাকার রূপে দেখছি। তাই সৃষ্টি নেই এটাও আমরা বলতে পারবো না। এই সাকার

সৃষ্টির জন্য সাকার ভগবান দরকার। সাকার ভগবান যদি হতে পারেন, তাহলে সাকারের বাইরে কি আছে? মুসলিম পণ্ডিতদের কাছে এ এক বিরাট বড় সমস্যা ছিল। কিন্তু ইসলামে বড় বড় দার্শনিকরাও ছিলেন। যার জন্য পরে ওদের দুটো আলাদা লাইনই হয়ে গেল। একটা লাইনের পণ্ডিতরা বললেন আল্লাকে কোন কিছু দিয়ে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যাবে না। কোন জিনিষ যদি আল্লাকে সীমিত করে দেয় তক্ষুণি সেটাকে চিরতরে বাতিল করে দিতে হবে। আল্লাকে কোন রূপ দিয়ে দেওয়া মানেই আল্লাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া সেইজন্য আল্লার কোন রূপ হয় না।

হিন্দুদের কাছে এই সমস্যা ছিল না। এখানে বলছেন যিনি অনন্ত তিনিই সান্ত। তিনি কোথায় থাকেন? কারণ সলিলে। কারণ সলিল কি? সত্ত্ব, রজ ও তমো এই তিনটে গুণ অসাম্য অবস্থায়। সত্ত্ব, রজ ও তমো যদি সাম্য অবস্থায় থাকে তাহলে সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টি হওয়ার জন্য দরকার এই তিনট গুণের অসাম্যতা। যে কোন কাজের জন্য চাই অসাম্য অবস্থা। সাম্য অবস্থায় কোন কাজই হবে না। তাহলে ভগবান এখন কোন্ অবস্থায় আছেন? যিনি অনন্ত তিনি যেন এখন হয়ে গেছেন সান্ত। বলছেন যেন হয়ে গেছেন, কারণ অনন্ত কি করে সান্ত রূপ ধারণ করবে! একটা বিশাল জিনিষকে আমরা একটা ছোট্ট জিনিষে ঢোকাব কি করে! এই তত্ত্বটাকেই পুরাণের ঋষিরা পৌরাণিক আখ্যায়িকার মাধ্যমে উপস্থাপন করছেন, কারণ সলিল মানে সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটে গুণই ভগবানের প্রথম সৃষ্টি। সেইখানে সেই যিনি অনন্ত তিনি সান্ত হয়ে অনন্তের উপর শায়িত অবস্থায় বিরাজ করছেন। অনন্তই হল অশেষ। এই অশেষকে একটা নাগের আকৃতি দিয়ে দেওয়া হল, হাজারটি ফণা বিস্তার করে সে নিজেকে বিস্তৃত করে আছে। তখনও দৃশ্য জগৎ বলতে কিছুই নেই। তারপর তাঁর নাভি থেকে একটা পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। সেই প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের উপর ব্রহ্মা বিরাজ করে আছেন। তখন সেই কারণ সলিলে ঢেউ উঠতে শুরু হল। ঢেউ ওঠা মানে, আকাশের উপর প্রাণ আঘাত করতে শুরু করেছে। নাসদীয় সূক্তম একেই বলা হচ্ছে *আনীদবাতম্*, প্রাণশক্তি অর্থাৎ ভগবানের ক্রিয়াশক্তি এবার সত্ত্ব, রজ, তমের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিতে শুরু করে দিয়েছে। তিনটে গুণের সাম্য অবস্থা নষ্ট হওয়া মানে এবার সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। পদার্থের উপর আঘাত যত বাড়তে থাকে তত সৃষ্টি এগিয়ে যেতে থাকে।

পুরাণমূলক ও ইতিহাসমূলক শাস্ত্রের পার্থক্য

পুরাণের সব কটি চরিত্রই পৌরাণিক কিন্তু ইতিহাসের বেশির ভাগ চরিত্রই ঐতিহাসিক। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে কখনই ভগবান বা ভগবানের অবতার রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে না, আবার মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ রূপেই এক ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করার প্রয়াস দেখা যায়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলছেন কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ রূপেই পরিচয় করান হয়েছে। কিন্তু ভাগবতে এসে শ্রীকৃষ্ণকে পুরোপুরি ভগবানই বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। পুরাণের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল, অবতার আর অবতারের লীলাই হল পুরাণের মূল প্রেক্ষাপট। ইতিহাসমূলক শাস্ত্রে অবতার আর অবতারের লীলাকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যদিও মহাভারতে অবতার তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু সেইভাবে অবতার লীলাকে সামনে নিয়ে আসা হয়নি। এই যে দেবী দেবতাদের খেলা আর এদের পৃথিবীতে অবতরণ করে নানান কাণ্ড করা এগুলো রামায়ণ মহাভারতে কম পাওয়া যাবে। কিন্তু পুরাণে কথায় কথায় দেবী দেবতাদের আবির্ভাব ঘটে যাবে। ইতিহাস মূলক শাস্ত্রের চরিত্র অনেক বাস্তবানুগ, অন্য দিকে পুরাণের চরিত্রগুলো ভাবানুগ ও কাল্পনিক এবং প্রত্যেকটি চরিত্রই হয় পুরোটাই সাদা আর তা নয়তো পুরোটাই কালো, সাদা-কালো মেশানো কোন চরিত্রই পুরাণে পাওয়া যাবে না, এটাই পুরাণের মূল বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের চরিত্রগুলি দোষে-গুণে মেশানো, তাদের যেমন নিজস্ব চারিত্রিক মাহাত্ম্য আছে তার সাথে তাদের কিছু দোষ-ত্রুটিও আছে। কিন্তু ইতিহাস আর পুরাণের প্রধান পার্থক্য হল পঞ্চ লক্ষণ, ইতিহাস কখনই পঞ্চ লক্ষণকে অনুসরণ করে না, কিন্তু পুরাণ পঞ্চ লক্ষণকে পুরোপুরি মেনে চলে, যেখানে পুরাণ সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, বংশানুচরিত আর মন্বন্তরের বর্ণনা করবে। যদিও মহাভারতে এই ধরণের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু পুরাণের মত এত বিশদ স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়নি।

আরেকটি বড় পার্থক্য হল ইতিহাস মূলক শাস্ত্রে অধ্যাত্ম ও ধর্মকে যতটা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেছে পুরাণধর্মী শাস্ত্র তার পুরো প্রচেষ্টাই এই অধ্যাত্ম ও ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগিয়ছে। বেদে আমরা অনেক রকম মন্ত্র পাই যেখানে বেদের বিভিন্ন দেবতা ও দেবীদের স্তুতি করা হয়েছে। তাছাড়া বেদে বিশেষ ধরণের নারাসামসি পাওয়া যায়, যেখান কিছু কিছু পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে মন্ত্রাকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন দেবতা ও দেবীদের উপর অনেক জনপ্রিয় কাহিনী পাওয়া যাবে। আমরা যে এর আগে বলেছিলাম পুরাণের কাহিনীকে আমরা যতই কাল্পনিক মনে করি না কেন এই ধারাটা বীজাকারে বেদেই ছিল। তাই বলা হয় হিন্দু ধর্মে যা কিছু আছে সবই বেদে বলা আছে, বেদের বাইরের কোন জিনিষ হিন্দু ধর্মে পাওয়া যাবে না।

উপনিষদ ও পুরাণের ব্যাপারে আধুনিক পণ্ডিতদের কিছু উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা

অনেকে মনে করেন, বিশেষ করে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তাদের সাথে ভারতের কিছু যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবিদের ধারণা যে উপনিষদ হল ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের বিদ্রোহ আর পুরাণ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ। কি করে এনারা এই সব উদ্ভট ধারণা নিয়ে এসেছেন বোঝাই যায় না। কারণ সব কটি পুরাণ সংস্কৃতে রচিত আর সাদামাটা সহজ সংস্কৃতে নয়, অত্যন্ত কঠিন সংস্কৃতে। ভগবান বুদ্ধ যখন বেদ ও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বলতেন তখন তিনি পালি ভাষাতেই বলেছিলেন। পুরাণের সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণদের একটা বিশেষ ভাষা, এই ভাষা সংস্কৃতের পণ্ডিতরা ছাড়া আরে কেউই বুঝতে পারত না। তাহলে সাধারণ মানুষের ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, ব্রাহ্মণদের গালাগাল দেওয়া, সেগুলো কারা লিখছেন? নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষদের হয়ে কোন নেতা এসে লিখে দিয়ে যাননি। তাহলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে লিখছেন! সামান্যতম বুদ্ধি যার আছে সেও ধরতে পারবে এই ধারণা কতটা উদ্ভট ও ভ্রান্ত। আসলে ইংরেজদের হাতে ছিল রাজশক্তি, ইংরাজী ভাষা তাদের হাতে, ছাপা খানাও তাদের হাতে, তাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে যা কিছু মনে এসেছে সব ছাপিয়ে দিয়ে চলে গেছে। আর আমাদের বলা হচ্ছে এগুলো মেনে নিতে। বরঞ্চ পণ্ডিতরা বলছেন, ব্যাসদেবের করুণা হলো – আহা! এই যত আধ্যাত্মিক সম্পদ বেদ উপনিষদে রয়েছে সবইতো পণ্ডিতদের জন্য, সাধারণ মানুষ যাদের বেদে কোন অধিকার নেই, উপনিষদের বাণী বুঝতে পারবে না, তাদের কথা ভেবে ব্যাসদেব পুরাণ রচনা করলেন। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের শ্রেণী সংগ্রাম কোথা থেকে আসবে! তাই এই ধরণের উদ্ভট ধারণা ধোপে টেকে না।

পুরাণে বেদান্ত ও সাংখ্যের সমন্বয়

আমাদের ঐতিহ্যে দুটো ভিন্ন ভাবধারা বহু প্রাচীন কাল থেকে পাশাপাশি চলে আসছে। একটি বেদান্তের মত আর অন্যটি সাংখ্য মত। বেদান্তের যিনি ঈশ্বর তিনি অনন্ত, আর এই জগতে কোথায় কি হচ্ছে তার সঙ্গে তাঁর কোন লেনাদেনা নেই, এই সৃষ্টি মিথ্যা, সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই, উনি যা আছেন তাই আছেন, তাঁর কোন পরিবর্তন নেই। আর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হল মায়া। অন্য দিকে সাংখ্য ঈশ্বর বলে কোন কিছুকে মানে না, তাদের মতে জীব, জগৎ, জড়, চেতন যা কিছু আছে সবই পুরুষ প্রকৃতির খেলা। সাধনার ক্ষেত্রে সাংখ্য বলছে – একজন মানুষ সাধনা করে করে প্রকৃতিলীন পুরুষ হতে পারে। মানুষের সব থেকে যে উচ্চতম অবস্থা হতে পারে তা হল এই প্রকৃতিলীন পুরুষ, যিনি প্রকৃতিকে বশ করেছেন, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি হলে প্রকৃতি নিয়ন্তা। প্রকৃতিলীন পুরুষকে সাংখ্যরা যদি ঈশ্বর রূপে আখ্যা দেয় তাহলে এই ঈশ্বর আর বেদান্তের ঈশ্বর এক হবে না। সাংখ্যের প্রকৃতিলীন পুরুষ হলেন নিয়ামক ঈশ্বর।

পুরাণ বেদান্তের ঈশ্বর আর সাংখ্যের নিয়ামক ঈশ্বরের মধ্যে সমন্বয় করে বলছে – হ্যাঁ, মানুষই ভগবান হয়। কিন্তু যে মানুষ ভগবান হন, আসলে তিনি মানুষই নন, তিনি আগে থাকতেই ভগবান। মানুষ রূপ ধারণ করেন আবার ভগবান হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এনারা মানুষ হয়ে এলেন সাধনা করলেন আবার ভগবান হয়ে গেলেন। সাংখ্য দর্শন কোন ধরণের ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে না। তখনকার দিনে ভারতের খুব শক্তিশালী দর্শন পূর্বমীমাংসকরা বলছে দেবতারা আছেন কিন্তু ভগবান বলে কিছু নেই। বেদ এক জায়গায় এক রকম বলছে, অন্য জায়গায় অন্য রকম বলছে। এত ভিন্ন ভিন্ন মত, আমরা কি করে বুঝবো কোনটা ঠিক আর

কোনটা ভুল? পুরাণ সর্বসাধারণের সংশয় নিবারণের জন্য সব কটা মতকে সমন্বয় করে খুব সহজ করে বলে দিল – তুমিও ঠিক সেও ঠিক, যিনি সচ্চিদানন্দ ভগবান, তিনিই মানুষ হয়ে জন্মান, তিনিই আবার সাধনা করে ঈশ্বর হয়ে যান। তা ভগবান কি করে মানুষ হয়ে জন্মাবেন, এ কি কখন সম্ভব? তখন পুরাণ বলছে তিনি নিজের মায়াকে আশ্রয় করে আসেন। মায়াকে আশ্রয় করা মানে বেদান্ত, আর মায়া ও প্রকৃতিকে এক করে দিলে হয়ে যাবে সাংখ্য। পরবর্তি কালে বেদান্ত আর সাংখ্যকে মিলিয়ে একটা নতুন ককটেল হয়ে সবার পক্ষে সহজগ্রাহ্য এক অপূর্ব দর্শন অবতারবাদ জন্ম নিল – এটাই হচ্ছে জগতের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের জন্য পুরাণের সর্বশ্রেষ্ট অবদান।

ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন – ঈশান বলে আমার যে অবস্থা এটা নাকি যে কোন মানুষ সাধনার দ্বারা লাভ করতে পারে। ঠাকুর বলছেন – তা কিন্তু নয়, এখানে আলাদা কিছু আছে। তুমি যদি মনে কর সাধনা করে শ্রীরামকৃষ্ণের মত হয়ে যাবে, তা তুমি কোন দিন পারবে না। ঠাকুরের কথা পুরাণের সাথে মিলে যাচ্ছে। পুরাণ বলছে – ভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন, আবার সাধনা করে ভগবান হয়ে যান, সাধারণ মানুষ যদি সাধনা করে সে ভগবান হতে পারবে না। একদিকে সাংখ্য মতে ঠাকুর সাধনা করে প্রকৃতিলীন পুরুষ হয়ে গেলেন। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে আমরা যে যতই সাধনা করি না কেন কোন দিন শ্রীরামকৃষ্ণ হতে পারবো না, কিন্তু সাধনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ যে অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন, আমরাও সেই অবস্থায় পৌঁছাতে পারবো। ঠাকুরও নিজে বলছেন এখানে এসে বেদ পুরাণ তন্ত্র যা কিছু আছে সব একাকার হয়ে যায়। শুধু বেদান্তে আর সাংখ্যেই কত পার্থক্য, বেদান্ত মতে জগতের সুখ দুঃখ কোন কিছুর সঙ্গে ভগবানের কোন মতলব নেই, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সাথে তাঁর কোন লেনাদেনা নেই, আবার সাংখ্য মতে পুরুষই সব কিছু করে। বৌদ্ধ মতবাদে যে অবলোকিতেশ্বর বা অমিতাভ বুদ্ধ যে ধারণা গুলো দিয়েছেন এগুলোও সবই সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে মিলে যায়।

হিন্দু ধর্ম চারটে পুরুষার্থের কথা বলে – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। মহাভারতে, এমন কি রামায়ণেও ধর্ম, অর্থ ও কামের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরাণে এসে আমরা অন্য জিনিষ দেখতে পাই। ধর্ম ও মোক্ষকে রেখে পুরাণ অর্থ আর কামকে একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছে। বলছেন যারা অর্থ ও কামের পেছনে ছুটছে তারা পশু। ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বার বার বলে গেছেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে বাপু কিছু হবে না। মহাভারতে যেখানে চতুরবর্গের কথা বলা হয়েছে, কিভাবে ধর্ম সঙ্গত ভাবে অর্থ ও কামকে ভোগ করবে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে ঠাকুর কামিনী ও কাঞ্চনকে একবারেই অনুমতি দিচ্ছেন না – এটাই হয়ে গেল পৌরাণিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যারা অর্থ ও কামকে জীবনের লক্ষ্য ঠিক করেছে তারা পুরাণের দর্শন অনুযায়ী পশু ছাড়া আর কিছু নয়। এই কথা ঠাকুর অন্য ভাবে বলছেন 'মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন'। শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যে আর পৌরাণিক দর্শনের বক্তব্যে কোন অমিল পাওয়া যায় না। ধর্মের লক্ষ্য মোক্ষ। ধর্মই আপনাকে মোক্ষে নিয়ে যাবে। তবে পুরাণ আবার মোক্ষ লাভের থেকে ঈশ্বরে ভক্তি লাভের উপর বেশী জোর দিয়েছে। ঠাকুরও বলছেন – ভক্ত বলে আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই। পুরাণ মতে ভক্তিই তোমাকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবে।

মুক্তি ও মুক্তির উপায় অনেক রকমের হতে পারে, কিন্তু পুরাণ বিশেষ ভাবে আলোচনা করে গেছে মুক্তির কথা তুমি সরিয়ে রেখে আগে ঈশ্বরে কিভাবে ভক্তি লাভ করা যায় তার চেষ্টা কর, এই ভক্তিই তোমাকে সব কিছু পাইয়ে দেবে। একটা ছেলে বাবাকে খুব ভালোবাসে, তা ছেলের কি জানতে আগ্রহ হবে না যে বাবার কি সম্পত্তি আছে, ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে! ওয়াল্ট ডিজনের বাচ্চা মেয়ে ক্লাশ টুতে পড়ে। স্কুলের পড়ুয়ারা ওকে বলছে – তোমার বাবা বিখ্যাত ওয়াল্ট ডিজনে, তোমার বাবা মিকি মাউস সৃষ্টি করেছেন। বাচ্চাগুলো ওকে জিজ্ঞেস করছে – তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে অটোগ্রাফ নিয়েছো? মেয়েটি অবাক হয়ে বলছে 'কই না তো'। সেদিন বাড়িতে গিয়ে বাচ্চা মেয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে – বাবা! বাবা! are you the famous Disney? বাবা মেয়েকে কোলে তুলে বলছে – Yes my darling. মেয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে Are you the creator of Mickey Mouse? Yes darling. ওয়াল ডিজনে নিজের স্মৃতি কথায় লিখেছেন – that

horrifying four words I have to listen – Papa, please give me your autograph. বাচ্চা মেয়ে ওরতো তখন সেই বুদ্ধি হয়নি যে বাবার যা কিছু সবই তো তার।

ঠিক সেই রকম যিনি ঈশ্বরের ভক্ত তিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের দিকে কোন দৃষ্টি দেন না। মুক্তি ফুক্তি যার লাগার তার লাগবে, আমি ওসবের ধার ধারি না, আমি শুধু তাঁকে ভালোবাসতে চাই। ভক্তিই তার একমাত্র পুরুষার্থ। জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ভক্তি, এটাই সমস্ত পুরাণের অন্তর্নিহিত সার তত্ত্ব। ভক্তিই পথ আর ভক্তিই উদ্দেশ্য, লক্ষ্যটাও ভক্তি। জ্ঞানী মুক্তি কিভাবে পাবেন? নেতি নেতি করে। জ্ঞানী মুক্তির জন্য কি করবেন? তপস্যা করবেন। এখানে পথ আলাদা লক্ষ্য আলাদা। আমি ভালো করে পড়াশোনা করছি কেন? পরীক্ষায় যাতে ভালো নম্বর পাই। পরীক্ষায় ভালো নম্বর কেন চাই? যাতে ভালো একটা চাকরি পেতে পারি? চাকরি কেন চাই? যাতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারি। অর্থ উপার্জন করবো কেন? ভালো খাবো, দামী দামী পোষাক পড়ব, গাড়ী বানাব, বাড়ি বানাব, তারপর বিয়ে করব। সবেতেই পথ একটা লক্ষ্য আরেকটা। কিন্তু ভক্তিতে আমি কেন ভক্তি চাই? ভক্তি পাব বলে। কিভাবে ভক্তি পাবো? ভক্তি করে। ভক্তিতে পথ ও লক্ষ্য এক। এটাই পুরাণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য ভক্তিকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করবেন – কাঁচা ভক্তি, পাকা ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তি, বৈধী ভক্তি, পরা ভক্তি, প্রেমা ভক্তি এবং নবধা ভক্তির কথাও বলবেন। ভক্তি আর ভক্তি, ভক্তি ছাড়া আর কিছু বলবেন না। তার কাছে বাকি যা কিছু আছে অর্থ, কাম সব বেকার, এগুলোর পেছনে যারা ছুটছে তারা পশু। কেউ কাঁচ কুড়াতে গিয়ে যদি হীরে পেয়ে যায় তাতে ক্ষতি কি, আর ভক্তি চাইতে গিয়ে মুক্তি পেয়ে গেলে ভক্তিতো তার থাকলই। মুক্তি পাওয়ার জন্য ভক্তি পথ অবলম্বন করে মুক্তি পেয়ে গেলেন, মুক্তি কাঁচের টুকরো, সেখানে আবার কি পেয়ে গেলেন? ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাও পেয়ে গেলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ অনুধ্যানের সুবিধার্থে এতক্ষণ আমরা পুরাণধর্মী শাস্ত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের মূল গ্রন্থে প্রবেশ করব। স্বল্প সময়ে সমগ্র ভাগবত আলোচনা করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। আলোচনার জন্য আমরা মূল কয়েকটি স্কন্ধের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে বেছে নিয়েছি। শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক প্রণাম মন্ত্র আছে তার মধ্যে প্রথমেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে খুব সুন্দর একটা প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শুরু হয়। আমরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করে শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ অনুধ্যান শুরু করছি –

শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যম্

কৃষ্ণং নারায়ণং বন্দে কৃষ্ণং বন্দে ব্রজপ্রিয়ম।
কৃষ্ণং দ্বৈপায়নং বন্দে কৃষ্ণং বন্দে পৃথাসুতম্।।

নৈমিষারণ্যে সূত রোমহর্ষণকে শৌনক মুনির প্রশ্ন *('বৈষ্ণব' শব্দের অর্থ, ভাগবত রচনার উদ্দেশ্য, কলিযুগের কালসর্প, দেবতাদের প্রতি শুকদেবের উক্তি ও গ্রন্থস্তুতি)*

ভাগবত প্রথমেই শুরু হয় ভাগবতের মাহাত্ম্যের বর্ণনার দ্বারা, এই অধ্যায়ের নাম তাই **শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যম্**। মহাভারত আর ভাগবতের কাহিনী ঠিক একই ভাবে ও একই স্থান থেকে শুরু হয়। প্রথমে দেখানো হয় কোথাও সাধু সমাগম হয়েছে, কিংবা একটা বড় যজ্ঞ অনেক দিন ধরে চলছে, সেখানে যজ্ঞের মাঝে মাঝে অবসর সময়টুকু কিভাবে অতিবাহিত করবেন? তখন কোন পণ্ডিত বেদজ্ঞ ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে অনুরোধ করা হয়, আপনি এই ব্যাপারে কিছু বলুন। মহাভারত শুরু হয় নৈমিষারণ্যে, ভাগবতের শুরুও নৈমিষারণ্যে যেখানে একটা যজ্ঞ চলছে। ব্যাসদেবের শিষ্য শৌনক মুনিও সেখানে আছেন। তিনি সূত রোমহর্ষণকে প্রণাম ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক প্রশ্ন করছেন *অজ্ঞানধ্বান্তবিধ্বংসকোটিসূর্যসমপ্রভ। সূতাখ্যাহি কথাসারং মম কর্ণরসায়নম্।। ১/৪।* – 'হে সূত! জীবের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীকরণের জন্য যে জ্ঞান আপনার মধ্যে বিদ্যমান সেই জ্ঞান কোটি সূর্যের সমান প্রভাময়। পৌরাণিক জ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ, আমরা আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধানকারী অমৃতময় সারগর্ভ আপনার মুখ থেকে শ্রবণ করতে চাই'। এইভাবে সম্ভাষন করার

পর শৌনক মুনি বৈষ্ণবরা মায়া মোহ থেকে কিভাবে নিজেদের মুক্ত করবে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন। *ভক্তিজ্ঞানবিরাগাপ্তো বিবেকো বর্ধতে মহান্। মায়ামোহনিরাসশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ক্রিয়তে কথম্।।১/৫।।* ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা মহান বিবেকের বিকাশ কিভাবে হবে আর বৈষ্ণবগণ সমস্ত রকম মায়া মোহ থেকে নিজেদের কি করে মুক্ত করবেন?

এখানে বৈষ্ণব মানে ভগবানের ভক্তদের কথাই বলা হচ্ছে। শব্দটা হল *বৈষ্ণবৈঃ*, কিন্তু এর অর্থ হবে ভক্তজন, যিনি সগুণ সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন। পরের দিকে মীরাবাঈয়ের একটা বিখ্যাত ভজন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, যে ভজন গান্ধীজীরও খুব প্রিয় ছিল – বৈষ্ণবজনতো তেনে কহিয়ে, পীড় পড়াইয়ি জানিরে। বৈষ্ণবজন কাকে বলা যাবে? যিনি অপরের দুঃখকে বোঝেন। বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করা। ভক্ত তো ভক্তিই চাইবে। ভক্তি কেন চাইবে? *মায়ামোহনিরাসাশ্চ*, মায়া আর মোহ এই দুটো থেকে নিরাশ হওয়া। নিরাশ মানে, কেটে দেওয়া, যেখান থেকে সন্ন্যাস শুরু। মায়া ও মোহই অজ্ঞান। মায়া থেকেই মোহের জন্ম। মোহ মানে যে কোন জিনিষের প্রতি আসক্তি বা ভালোবাসা। মানুষ যতক্ষণ নিজের স্বরূপকে ভুলে থাকে ততক্ষণ সে বাইরেই শান্তি খুঁজে বেড়ায়। শান্তি পাওয়ার জন্য তখন সে জগৎকে ভালোবাসতে যায়, জগৎকে ভালোবাসাটাই মোহ। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে মোহকে ব্যাখ্যা করছেন বিবেকের অভাব। মায়া মোহ, আমি আর আমার এই বোধ থেকে বেরিয়ে আসাই বৈষ্ণবজনের উদ্দেশ্য। মায়া মোহ থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন ব্যাপার। যাঁরা সাধু সন্ন্যাসী, যাঁরা আশ্রমবাসী তাঁদেরও অনেক ছোটখাটো জিনিষের প্রতি আসক্তি থাকতে পারে। কিন্তু এই মোহ মায়া থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রথমে কোথাও আমাদের শুরু করতে হবে। সব সন্ন্যাসীই পরমহংস হয়ে যাননি, সন্ন্যাসীর কিছু না থাকুক তাঁর একটা শরীর আছে, সেই শরীরের মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। যিনি পরমহংস তিনি দেহ, মন ও বুদ্ধির পারে চলে গেছেন। কিন্তু যে সন্ন্যাসী পরমহংস নন, তাঁকে তাঁর দেহরক্ষার জন্য জামা-কাপড়, তেল, পেস্ট, ব্রাশ সবই রাখতে হবে। কিন্তু দেহের রক্ষার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু রাখেন। এখান থেকেই তার মায়া মোহ নাশের যাত্রা শুরু হয়। আমাদের শাস্ত্রে যখনই বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা করা হয় তখন সেখানেও তাঁরা বলেন শরীর ধারণের জন্য যতটুকু দরকার তার বাইরে কোন কিছু অতিরিক্ত রাখবে না। কিন্তু সমস্যা হল আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষের প্রতি আসক্তিটা বেশী। আমাদের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও আমাদের মন ভরতে চায় না। এটাই মোহ। সেইজন্য প্রথমেই একটা লাইন টেনে দিতে হয়, আমি এর বেশী কিছু নিজের কাছে রাখবো না, কেউ দিলেও নেবো না। কিন্তু কত জিনিষ আছে যা আমরা ব্যবহার করছি না, প্রয়োজনেও লাগছে কিন্তু কাছে রেখে দিচ্ছি, ছাড়তে চাইছি না। যেদিন সচেতন ভাবে আমি ঠিক করে নিলাম আমার প্রয়োজনের বাইরে কোন কিছু আমার কাছে রাখবো না, অতিরিক্ত যা কিছু আছে আমি দান করে দেব। এবার কিন্তু আমি মায়া মোহ থেকে শতকরা আটানব্বুই ভাগ মুক্ত হয়ে গেলাম। অল্প যেটুকু আছে সেটুকু হল দেহ সম্পর্কিত। সাধন ভজন করে শরীর বোধ থেকে যতক্ষণ না বেরিয়ে আসা যাচ্ছে ততক্ষণ দেহের চাহিদাটা থেকে যাবে। দেহবুদ্ধি থাকলেই মন বুদ্ধি থাকবে, মন বুদ্ধি থাকলেই নানা রকমের কষ্ট বোধ থাকবে। কষ্ট বোধ থাকলেই আমাকে পাঁচজনের সাহায্য নিতে হবে। পাঁচজনের সাহায্য নিতে হলে আমাকে জামা-কাপড়, টাকা, পয়সা, গয়না এগুলো রাখতে হবে। কিন্তু একটা জায়গায় এসে এগুলো সংগ্রহ করা ও কাছে রাখার ব্যাপারটা খুব সচেতন ভাবে একটা সীমারেখা টেনে আটকে দিতে হয়। আমি আমার জামা-প্যান্ট এই কটির বেশী রাখবো না। পুরুষদের আবার পোশাক-আশাকে বেশী আসক্তি থাকে না, কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের ব্যাপারে ভীষন সচেতন। আয় করে যাচ্ছে আর ব্যাঙ্কে ঢেলে যাচ্ছে। এখানেও লাইন টেনে দিয়ে নিজেকে আটকে দিতে হয়। এত টাকা আমার দৈনন্দীন খরচের জন্য, এই টাকা আমার ভবিষ্যতের জন্য। এরপর যেটা আসার আসবে, ওইদিকে আমার নজর থাকবে না। কিন্তু সেখানেও একটা জায়গায় গিয়ে রাশ টানতে হবে, এই টাকার বেশী হলে আমি রাখবো না, দান করে দেব। এতে মনের অনেক শক্তি বৃদ্ধি হবে, কারণ এটা আমি নিজে থেকে সচেতন ভাবে করছি কিনা। এবার আমি মায়া মোহ থেকে অনেকখানি বেরিয়ে এসেছি।

এখানে বলছেন, বৈষ্ণবজন অর্থাৎ ঈশ্বরের ভক্ত চায় মায়া মোহ থেকে মুক্তি। জাগ্রত বিবেকই মানুষকে মায়া মোহ থেকে মুক্তি দেয়। বিবেক জাগ্রত কিভাবে হবে? জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্যের অনুশীলনের দ্বারা। অল্প বয়সে মানুষ আধ্যত্মিক জীবন সম্বন্ধে কম ওয়াকিবহাল থাকে, ধারণাটাও মজবুত থাকে না। প্রত্যেক মানুষকে একটা বয়সের পর জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের ব্যাপারে খুব সচেতন হয়ে অনুশীলন করে এগুলোকে আয়ত্ত করতে হয়। জ্ঞান মানে নিত্য অনিত্যের বিচার, ভক্তি মানে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, অনুরাগ। আর বৈরাগ্য হল, ঠাকুরের কথা অনুযায়ী – যেটাকে বুঝে নিলাম অনিত্য সেটাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। যাঁরা বৈষ্ণবজন, যাঁরা নিজেকে ঈশ্বরের ভক্ত বলতে চান, অধ্যাত্মকে যাঁরা জানতে চাইছেন তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল, মায়া মোহ থেকে বেরিয়ে আসা। ঈশ্বর দর্শন তো পরের কথা আর ঈশ্বর দর্শন হলে কি হবে তাও আমাদের জানা নেই। শ্রীশ্রীমা বলছেন ঈশ্বর দর্শন হলে কি দুটো শিং বেরোয়? আদপেই না। তাহলে কি হয়? মায়া মোহ থেকে মুক্তি পায়। ভগবানের প্রতি ভালোবাসা মানেই মায়া মোহ থেকে বেরিয়ে আসা। বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত না হলে মায়া মোহকে নাশ করা যায় না। জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের অনুশীলন যত করতে থাকবে তত বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত হতে থাকবে। শৌনক এই প্রশ্নই করছেন 'হে সূত! কিভাবে এই মায়া মোহের নাশ হয়, বিবেক বুদ্ধিকে কিভাবে জাগ্রত করা যায়? জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যে আমাদের মনকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে দয়া করে আমাদের একটু বলুন। আপনি তো পণ্ডিত লোক, আপনার এগুলো সবই জানা আছে'।

তখন সূত বলছেন – ভাই তোমার প্রশ্নটা খুবই সময়োপযোগী, তোমার হৃদয়ে ভগবানের প্রতি অনুরাগ এসেছে বলেই তুমি এই প্রশ্ন করতে পেরেছ, তোমার মঙ্গলার্থে আমি বিচারপূর্বক সমস্ত সিদ্ধান্তের সার কথা তোমাকে শোনাচ্ছি, যে সার তত্ত্ব জীবের জন্মমৃত্যুর ভয়কে দূর করে। কলিকালের যে সাপ সবাইকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে এসেছে – তুমি যে বললে না যে স্ত্রী, পুত্র, টাকা, পয়সা, মান, সন্মানের প্রতি মানুষ আসক্ত হয়ে আছে, মানুষের মধ্য থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে, এর থেকে আরও জঘন্য হল মানুষের মধ্যে দেহবল ও আত্মবল কোনটাই নেই। *কালব্যালমুখগ্রাসত্রাসনির্ণাশহেতবে। শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ ভাষিতম্।।১/১১*। এটাই কলিকাল সর্পরূপ, যে সর্প সবাইকে নিজের মুখের গ্রাস বানিয়ে রেখেছে, কলিকাল সব গ্রাস করে নিতে আবির্ভাব হয়েছে। ব্যাসদেব প্রথমে বেদকে বিভাজন করলেন। বেদ বিভাজন করে দেখলেন এতে সাধারণ মানুষ কোন ভাবেই উপকৃত হয়নি। এই কালরূপী সর্পের মুখগ্রাসের ত্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য শুকদেব পরম পবিত্র এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রবচন করে গেছেন। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে এখনও কিন্তু ভাগবতের মূল কথা শুরু হয়নি, এখনও ভূমিকা চলছে, এই শ্লোকগুলো ব্যাসদেবের শিষ্যদের রচনা বলেই মনে করা হয়।

ভাগবতের এই অংশটাকে বলা হয় গ্রন্থস্তুতি। আমাকে যদি কোন বই পাঠ করতে বলা হয়, আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করব এই বই পাঠ করে আমার কি লাভ হবে, অথবা এই বইয়ের বৈশিষ্ট্যটা কি। বইয়ের যদি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে আর সেই বই পড়ে আমার যদি কোন লাভ না হয় তাহলে আমি কেন সেই বই পড়তে যাব। যখন গ্রন্থেরর বৈশিষ্ট্য বলে দেওয়া হবে, বই পাঠ করলে কি লাভ হবে জানিয়ে দেওয়া হবে, তখন সেটাই হয়ে যাবে গ্রন্থস্তুতি। ভাগবতের গ্রন্থস্তুতি কিভাবে হচ্ছে? ভাগবত আমাদের মায়া মোহকে দূর করে দেবে। দ্বিতীয় হল, যেটা সূত খুব মজা করে বলছেন –*শুকং নত্বাবদন্ সর্বে স্বকার্যকুশলাঃ সুরাঃ। কথাসুধাং প্রযচ্ছস্ব গৃহীত্বৈব সুদামিমাম্।।১/১৪।* এই শ্লোকটাও খুব সুন্দর। দেবতারা নিজেদের কাজ কিভাবে আদায় করতে হয় খুব ভালো জানেন, বড়লোকরা নিজেদের কাজ আদায় যেভাবেই হোক করে নেবে, সাধারণ মানুষ এই ভাবে কাজ আদায় করতে পারে না। রাজা পরীক্ষিৎকে যখন শুকদেব এই ভাগবত কথা শোনালেন তখন দেবতারা এসে শুকদেবকে বললেন – হে শুকদেব, আমরা এই অমৃত আপনার জন্য নিয়ে এসেছি, আপনি এই অমৃত পান করুন, তার বিনিময়ে আমাদের এই ভাগবত কথা দিয়ে দিন। তখন শুকদেব হেসে বললেন *অভক্তাংস্তাংশ্চ বিজ্ঞায় ন দদৌ স কথামৃতম্। শ্রীমদ্ভাগবতী বার্তা সরাণামপি দুর্লভ্য।।১/১৭।* হে ইন্দ্র, বরুণ দেবতাগণ! তোমাদের মন অনেক নিচু, কারণ তোমরা ভক্তিহীন, যাদের ভক্তি নেই তাদের এই

শ্রীমদ্ভাগবতী বার্তা শ্রবণ করার অধিকার নেই। তোমরা তোমাদের অমৃত ফিরিয়ে নিয়ে যাও, এই ভাগবত কথা তোমাদের জন্য উপযুক্ত নয়। যারা দেবতা তারাও এই ভাগবত কথা শোনার অধিকারী নয়। যারা ভক্ত, যাদের শুদ্ধমন, বা মনের শুদ্ধিকরণ করতে চাইছে, যাদের শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও গভীর আগ্রহ আছে তাদের জন্যই এই ভাগবত কথা। আসলে দেবতাদের প্রচুর ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য যাদের থাকে তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব থাকে।

সূত ভাগবতের আরও অনেক স্তুতি করছেন। শুকদেব যখন পরীক্ষিৎকে ভাগবত কথা শোনালেন, পরীক্ষিৎ ভাগবত কথা শ্রবণ করেই মুক্ত হয়ে গেলেন। পরীক্ষিৎ মুক্তি পেতেই ব্রহ্মা নিজেই খুব অবাক হয়ে গেলেন। সাধন ভজন নেই, বিবেক বিচার নেই, কিছুই নেই শুধু ভগবানের কথা শুনেই মুক্ত হয়ে গেল! ব্রহ্মা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তখন ব্রহ্মা যত মোক্ষ শাস্ত্র আছে সব শাস্ত্রকে দাঁড়িপাল্লার একদিকে রাখলেন এবং অন্য দিকে ভাগবত কথাকে রাখলেন, দেখা গেল ভাগবতের পাল্লাই ভারী। এগুলো হল গ্রন্থ মহিমা, গ্রন্থ মহিমা না বললে মানুষের মনে আগ্রহ আসবে না।

দেবর্ষি নারদের সাথে ভক্তির সাক্ষাৎ *(ঘোর কলিযুগের বর্ণনা, ভক্তির দুই সন্তান, নারদকে ভক্তির নিজের দুঃখের কথা নিবেদন, ভক্তিকে নারদের আশ্বাস, কলিযুগে ভক্তিই সার, নারদকে সনকাদি ঋষিদের উপদেশ, ব্যাসদেবের কীর্তি)*

এরপর দেবর্ষি নারদের খুব সুন্দর একটা কাহিনী আসে। একবার সনকাদি চারজন পবিত্র ঋষিরা সৎসঙ্গের জন্য বিশাল নগরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের সাথে দেবর্ষি নারদের দেখা হয়ে যায়। নারদকে দেখে ঋষিদের খুব চিন্তিত মনে হল। নারদকে এত ব্যাকুল ও চিন্তিত হবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে নারদ বলছেন, আমি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে এখানে একটু মনের শান্তি পাবার আশায় উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও মনের শান্তি পেলাম না। চারিদিকে ঘোর কলিকাল চলছে। এখানে নারদ ঘোর কলি যুগের বিশাল বর্ণনা দিচ্ছেন। পুরো বর্ণনাতে যাওয়ার দরকার নেই, শুধু দুই একটি শ্লোক আলোচনা করলেই বোঝা যাবে কি প্রচণ্ড ঘোর কলিকাল চলছে। বলছেন – *মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ। পাখণ্ডনিরতাঃ সন্তো বিরক্তাঃ সপরিগ্রহাঃ।।১/৩২।* পুরুষ নারী এরা কি করছে ছেড়ে দিন, যারা সাধু সন্ন্যাসী তারা সবাই পাখণ্ডী, দেখতে তাদের বিরাট বৈরাগ্যবান পুরুষ বলে মনে হয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে টাকা-পয়সা, নারী সবই সঙ্গে রেখেছে। কতদিন আগেকার বর্ণনা কিন্তু তখনই ঘোর কলিকাল চলছে, সাধু সন্ন্যাসীদের দেখতে বৈরাগ্যবান পুরুষ, চেহারা জ্বল জ্বল করছে কিন্তু ভোগের সামগ্রী, স্ত্রী থেকে শুরু করে টাকা-পয়সা সব আছে। টিভি ও খবর কাগজের দৌলতে কত বাবাজীদের নামে আমরা কত কিছু জানছি, শুনছি, এগুলো নতুন কিছু নয়, দুই আড়াই হাজার বছর আগে থাকতেই এগুলো চলে আসছে। কলিযুগের মানুষের মূল্যবোধ, বিবেক বলে কিছু নেই, শুধু নিজের পেট চালাবার দিকে মন। আর গৃহস্থের বাড়িতে কি হয় – *তরুণীপ্রভুতা গেহে শ্যালকো বুদ্ধিদায়কঃ। কন্যাবিক্রয়িণো লোভাদ্দম্পতীনাং চ কল্কনম্।।১/৩৩।* বাড়ির যে সাম্রাজ্য সেটা বউয়েরা চালায়, আর বউ যদি দেখতে সুন্দরী হয় তাহলে সংসারে তাদের আরো বেশি আধিপত্য। আর সংসারটাকে চালাতে কারা বুদ্ধি দেয়? শালারা। এখানে শালা মানে শালাই, গালাগাল শালা না, বউয়ের ভাইয়েরা তারাই জামাইবাবুর বাড়ি চালাচ্ছে। আর যত মহাত্মাদের আশ্রম, তীর্থ, নদী এই সব জায়গা যবনরা দখল করে নিয়েছে। এখানে যখন বলছে যবনরা দখল করে নিয়েছে, তার মানে মুসলিমদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে। এও বলছেন এরা যত মন্দির দেবালয় সব নষ্ট করে দিয়েছে। মানে তখন মহম্মদ ঘোরি, গজ্‌নী এরা ভারতে এসে গেছে। আমরা এখন যেটা আলোচনা করছি এটা কিন্তু ভাগবতের মূল অংশ নয়, আমরা ভাগবতের মাহাত্ম্যের কথা বলছি।

নারদ সনকাদি ঋষিদের বলে চলেছেন। নারদ হাঁটতে হাঁটতে যমুনা নদীর তীরে এক জায়গায় পৌঁছেছেন, সেখানে তিনি দেখছেন খুব সুন্দরী এক যুবতী কাঁদছে আর তার আশে পাশে আরো সব মহিলারা দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির সামনে দুজন বৃদ্ধ মাটিতে মড়ার মত পড়ে আছে, মেয়েরা আবার এই ঘাটের মড়া দুই বৃদ্ধকে বাতাস করে যাচ্ছে। নারদ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করছেন 'কি ব্যাপার এই যুবতী এত সুন্দরী কিন্তু

সে কাঁদছে কেন, আর এই দুই বৃদ্ধ কারা, এরা মাটিতে শুয়েই বা কেন আছে'? তখন দেবর্ষি নারদকে ঐ যুবতী বলছে 'আমার নাম ভক্তি, এই বুড়ো দুটো মাটিতে শুয়ে আছে এরা হল আমার দুই সন্তান, জ্ঞান ও বৈরাগ্য'। ভক্তির দুটি সন্তান। কারুর মধ্যে ঈশ্বরে প্রতি ভক্তি আছে কিনা কি করে বোঝা যাবে? ঈশ্বরের জ্ঞান তার মধ্যে আছে কিনা আর বৈরাগ্য আছে কিনা, এই দুটো দিয়ে বোঝা যাবে। জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিষ, ঈশ্বরের তত্ত্ব জানা মানেই জ্ঞান। মানুষের মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয় তখন সেই ভক্তি থেকে জ্ঞান আর বৈরাগ্যের জন্ম হয়, তাই বলা হচ্ছে ভক্তির দুটি সন্তান – জ্ঞান আর বৈরাগ্য। কিসের জ্ঞান – ঈশ্বরের স্বরূপের জ্ঞান, আর জগত সংসার থেকে বিমুখ হওয়াই বৈরাগ্য। যুবতী বলছে 'আর এই যে আমার আশে পাশে যত যুবতী নারীরা আছে এরা সব তীর্থ, নদী। এই সব নদী ও তীর্থগুলি আমার অনেক সেবা করছে, কিন্তু তবুও আমার মনে শান্তি নেই'। তারপর খুব বিখ্যাত একটা শ্লোকে ভক্তি বলছে, এই শ্লোকের জন্য অনেক দুর্নামও হয় – বলছেন *উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা। ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা।।১/৪৮।* 'আমার জন্ম দ্রাবিড় দেশে, কর্ণাটক রাজ্যে গিয়ে আমার বৃদ্ধি হল। তার মানে, কর্ণাটকে এসে ভক্তির মধ্যে পূর্ণ যৌবন এল, ভক্তি হৃষ্টপুষ্ট হল। মহারাষ্ট্রে যখন এলাম তখন কখন সখন বৃদ্ধি হলাম, মানে, মহারাষ্ট্রের কোথাও কোথাও আমার সম্মান করা হল, কিন্তু সাধারণ হয়ে গেলাম। আর গুজরাটে যখন ঢুকলাম তখন আমার সর্বনাশ হয়ে গেল'। অথচ গুজরাটেও ভাগবত প্রবচন হয়, সেখানে এই শ্লোকটা যখন পাঠ করা হয় তখন গুজরাটীরা শুনে কি মনে করে আমাদের জানা নেই। তবে গুজরাটের লোকেরা পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। এই নিয়ে এদের খুব সুন্দর সুন্দর দোঁহা আছে – বলে মা হল টাকা, বাবা হল টাকা, ভাই বোন হল টাকা, ছেলে মেয়ে হল টাকা, মানে টাকার বাইরে এরা কিছুই জানেনা। ভক্তি বলছেন – যেই আমি গুজরাটে এসে ঢুকলাম সেখানে এমন ঘোর কলিযুগ চলছে যে আমার যৌবন চলে গেল, আমি বুড়ি হয়ে গেলাম, আমার ছেলে দুটোও ঘাটের মড়া হয়ে গেল। কি আর করব, সেখান থেকে কোন রকমে হাঁটতে হাঁটতে আমি বৃন্দাবনে এসে পৌঁছেছি। বৃন্দাবনে আসার পর আমার যৌবনটা আবার ফিরে এসেছে, বৃন্দাবন ভক্তির জায়গা কিনা। কিন্তু আমার এই দুই সন্তান সেই যে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল তা তারা বুড়োই থেকে গেছে আর অচেতন হয়ে পড়ে আছে, এরা যদি মারা যায় আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব! তাই আমি কান্নাকাটি করছি। কোথায় মা বৃদ্ধা হবে আর সন্তান তরুণ থাকবে কিন্তু এখানে উলটো হয়ে গেছে। মা তরুণী আর সন্তানরা বুড়ো।

নারদ তখন ভক্তিকে অনেক কথা, বিশেষ করে ভাগবত কথা শোনালেন। ভাগবত কথা শুনিয়ে নারদ বলছেন 'হে দেবী! তুমি বেশি চিন্তা করো না। তুমি আর কি করবে এখন ঘোর কলিযুগ চলছে, কারুর ধ্যানযোগে মন নেই, শাস্ত্র অধ্যয়ন কেউ করছে না, সবাই লোভে নিমগ্ন হয়ে আছে'। এইসব অনেক কথা বলার পর নারদ ভক্তির দুঃখ দূর করার জন্য বলছেন – *দ্রৌপদী চ পরিত্রাতা যেন কৌরবকশ্মলাৎ। পালিতা গোপসুন্দর্যঃ স কৃষ্ণঃ ক্বাপি নো গতঃ।।২/২।* যিনি কৌরবদের অত্যাচার থেকে দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছিলেন, আর গোপীদের যিনি সনাথ করে দিয়েছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সত্যিই কি কোথাও চলে গেছেন নাকি! এখনও তিনি বৃন্দাবনে আছেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এখনো নিত্য লীলা করেন। তুমি তাঁর শরণাগত হও। তুমি যদি শ্রীকৃষ্ণের উপর ভরসা কর তাহলে তোমার সন্তানরা আবার তেজ সম্পন্ন হয়ে জেগে উঠবে। সত্য, ত্রেতা আর দ্বাপর যুগে জ্ঞান আর বৈরাগ্য হল মুক্তির সাধন। কিন্তু কলিযুগে একটাই সাধন, তা হল ভক্তির সাধন। এখান থেকেই খুব বিখ্যাত উক্তি এসেছে *নারদীয়া কলৌ ভক্তিঃ।* কলি যুগে নারদ যে ভক্তির কথা বলেছেন সেটাই মুক্তির একমাত্র পথ। নারদ বলছেন – হে দেবী! তুমি হলে ভক্তি। আমি তোমাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকিয়ে দেব। কারণ *কলিনা সদৃশঃ কোঽপি যুগে নাস্তি বরাননে। তস্মিংস্ত্বাং স্থাপয়িষ্যামি গেহে গেহে জনে জনে।।২/১৩।* হে দেবী! কলিযুগে ভক্তিই সার। তুমি শ্রীকৃষ্ণের উপর আস্থা রাখ, আমি তোমাকে ঘরে ঘরে জনে জনে প্রতিষ্ঠিত করে দেব। আমি হলাম ভগবান নারায়ণের দাস, আমি যদি এই কাজ না করতে পারি তাহলে আমি শ্রীহরির দাস নই। নারদ এই ভাবে ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলে উৎসাহিত করছেন।

নারদ এত কিছু বলার পর চিন্তাগ্রস্ত ভক্তিকে উজ্জীবিত করার জন্য বলছেন – বৃন্দাবন হল ভক্তির দেশ, তুমি সঠিক স্থানে এসেছ বলেই তুমি তোমার রূপ যৌবন ফিরে পেয়েছ। এখন তোমার সন্তান দুজনকে নিয়েই তোমার খুব চিন্তা হচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি কোন চিন্তা করো না, আমি তোমার এই দুটো সন্তানকেই দাঁড় করিয়ে দেব। আমি এদের বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শোনাব। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শুনলে জ্ঞান আর বৈরাগ্য জেগে যাবে। নারদ বলছেন 'কলিযুগে কোন মত চলে না আর বেদ মত তো কোন ভাবেই চলবে না'। তন্ত্রও ঠিক একই কথা বলে, কলিযুগে কোন মতই চলবে না, একমাত্র তন্ত্র মতই কলিযুগের জন্য প্রশস্ত। আর এখানে পুরাণ বলছেন কলিযুগে পুরাণ মতই চলে। এখন আমরা কোন মতকে অনুসরণ করব? কার্ল জুঙ বলছেন নিজের মিথ্ আপনাকে নিজেই দাঁড় করাতে হবে।

নারদ বলছেন, যেটা ঠাকুরও বলছেন – কলিযুগে ভক্তিই সার। কলিযুগে মানষের অন্নগত প্রাণ। আগেকার দিনে মানুষ যে তপস্যা করত এখন সেই তপস্যা করার শরীরই কারুর নেই। হরিদ্বার, হৃষিকেশে যত মঠ, আশ্রম আছে সব এখন হয়ে গেছে ট্যুরিস্ট সেন্টার। ছুটি কাটাতে সবাই আশ্রমে গিয়ে উঠছে, লোকেরা পিকনিক করছে। কোথায় গিয়ে মানুষ তপস্যা করবে! হিমালয়ে যেভাবে গাছ কাটা হচ্ছে তাতে পরিবেশ খুব সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেছে। তপস্যা করতে গিয়ে যে ন্যূনতম খাবারটুকুর দরকার তাও সব সময় জোটান সম্ভব হচ্ছে না। তারপর চারিদিকে ভোগীদের তন্মাত্রা এত বেশী মাত্রায় সব কিছুকে প্রভাবিত করে রেখেছে যে তপস্যা করা সম্ভবই নয়। তপস্যা করা দূরে থাক শান্তিতে যে একটু জপ-ধ্যান করবে তারও উপায় নেই। নির্জনতা আর নৈঃশব্দ আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য খুব জরুরী। পারিপার্শ্বিক কোলাহলে এই দুটোই এখন হারিয়ে গেছে। সেইজন্য নারদ বলছেন, ঘরে বসে ভগবানকে ভক্তি করে যাও, ভক্তিই এই যুগের সার। নারদ বলছেন, যেটা গীতাতেও ভগবান বলছেন – *ন তপোভির্ন বেদৈশ্চ ন জ্ঞানেনাপি কর্মণা। হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ।।২/১৮।* এখানে নারদ কয়েকটি পথের কথা বলছেন, যে পথ অনুসরণ করলে মানুষ ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে সমর্থ হবে। যেমন বলছেন, বেদ অধ্যয়ন। বেদ অধ্যয়ন করতে করতেও ঈশ্বর লাভ হয়। যজ্ঞ করলেও হয় আবার বেদ অধ্যয়ন করলেও হয়। বেদ অধ্যয়নে অনেক নিয়ম-বিধি পালন করার কথা বলা হয়। যার জন্য ব্রাহ্মণদের অল্প বয়স থেকে বেদ-পাঠের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। অতি প্রত্যুষে উঠে স্নান করতে হবে, বেশীর ভাগ দিন উপোস করে থাকতে হবে, অনেক রকম শৌচ পালন করতে হবে ইত্যাদি। বেদ অধ্যয়নের সময় এই সব নিয়মবিধি পালন করে করে অল্প বয়সেই ব্রাহ্মণদের মন একটা শুদ্ধির অবস্থায় পৌঁছে যেত। বেদের যা কিছু সত্য, একমাত্র সেই নিয়েই চিন্তন মনন করে সারাটা জীবন পবিত্র ভাবে কাটাতে হত। বেদের দুটি কাণ্ড, কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড, দুটো দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এছাড়া মানুষ তপস্যার দ্বারা ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন রকমের তপস্যার কথা বলা হয়েছে। মহাভারতে আমরা অনেক ঋষির বর্ণনা পাই যাঁরা অনেক রকম তপস্যা করতেন। বাল্মীকি রামায়ণেও এই ধরণের অনেক ঋষির বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁরা নানান রকমের তপস্যা করে বেড়াতেন। শ্লোকের পর শ্লোক বাল্মীকি কত রকম ঋষি আর তাঁদের তপস্যার বর্ণনা করে গেছেন। কেউ একটা হাতের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ গাছের উপরেই বসে আছেন, কেউ শুধু বাতাস খেয়ে থাকেন, কেউ শুধু গাছের একটা পাতা খেয়ে থাকেন, কেউ নদীতে কোমড় সমান জলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করে যাচ্ছেন, এই ধরণের কত যে ঋষিদের তপস্যার কথা বলছেন শেষ করা যায় না।

আর বলছেন *জ্ঞানেনাপি*, এখান জ্ঞান মানে চরম জ্ঞানের কথা বলছেন না, জ্ঞান বিচার করাটা যাঁদের পথ সেই জ্ঞানের কথা বলছেন। 'জ্ঞান' বা 'জ্ঞানী' শব্দের তিনটে অর্থ হয় – প্রথম হল, শাস্ত্র শুনে শুনে যখন ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে গেছে বা বুঝে গেছে আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্য কি। গুরুমুখে শাস্ত্র কথা শুনে আর নিজের মনন চিন্তন দ্বারা একটা ধারণা করে নিলো জ্ঞান মানে এই। এরপর আস্তে আস্তে নিজের জীবনকে ওই খাতে চালাতে থাকল। এইভাবে বুঝে নেওয়ার পর কেউ যখন এই পথেই চলছেন আচার্য শঙ্কর তাঁকেও জ্ঞানী বলছেন। তবে এখানে জ্ঞানীর স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে সৎ বস্তু বলতে এটাই অর্থাৎ ঈশ্বর

বলতে এই আর আমি ওইদিকেই এগোচ্ছি। গীতায় ভগবান বলছেন কাম আর ক্রোধ হল *জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা*, কাম আর ক্রোধ জ্ঞানীর সব সময়ের শত্রু। জ্ঞানী তাই নিজেকে কাম আর ক্রোধ থেকে সব সময় দূরে রাখবে।

দ্বিতীয় অর্থ হয়, নিত্য অনিত্য বিচার করতে করতে এবং কাম ও ক্রোধকে সংযম করে এমন একটা মানসিক অবস্থায় পৌঁছে গেছেন যে, এখন তাঁর দৈনন্দীন জীবনটাই অন্য ধরণের হয়ে গেছে। একজন পরমহংসের যে রকম আচার আচরণ, তাঁরও ভেতর ও বাইরে থেকে ঠিক সেই রকম আচার আচরণ হয়ে গেছে। কেউ আর তাঁকে তাঁর ওই অবস্থা থেকে নাড়িয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের অপরোক্ষানুভূতি এখনও হয়নি। ইনিও জ্ঞানী। তৃতীয় অর্থ যাঁর একেবারে সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়ে গেছে, যিনি সচ্চিদানন্দকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন, তিনিও জ্ঞানী। জ্ঞানীর প্রথম অবস্থা হল যেন গ্রুপ লিগের খেলা, দ্বিতীয় হলেন সেমিফাইনালে চলে গেছেন আর তৃতীয় যিনি ফাইনাল জিতে গেছেন। স্বামীজী তাঁর জ্ঞানযোগে নিত্য অনিত্যের বিচার করে এগিয়ে যাওয়ার কথাই বলেছেন।

নারদ বলছেন এই কলি যুগে তপস্যা দিয়ে, বেদ অধ্যয়ন বা বেদের যজ্ঞ করে, তীর্থাদি বা দানাদি কর্মের দ্বারা আর জ্ঞান বিচার করে ভগবানকে বশে আনা যাবে না। স্বামীজীর ভাষায় যদি বলা হয় তাহলে বলতে হবে কর্ম দিয়েও ভগবানকে জানা যায় না, জ্ঞান বিচার দিয়েও জানা যায় না, তপস্যা দিয়েও জানা যায় না আর বেদ অধ্যয়ন দিয়েও ভগবানকে জানা যাবে না। তাহলে কিভাবে জানা যাবে? *হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা*, শ্রীহরিকে যদি জানতে হয় তাহলে ভক্তিই একমাত্র পথ। এর প্রমাণ কি? *প্রমাণং তত্র গোপিকা*, বৃন্দাবনের গোপীরা লেখাপড়া জানতেন না, তপস্যা করেননি, জ্ঞান বিচার করেননি, কোন দান ধ্যান করেননি, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভালোবেসে গেছেন। শুধু ভালোবাসা দিয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছেন। ঠাকুরও বলছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ভালোবাসা উচ্চতম ভক্তির প্রতীক। এই ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। এখানে নারদ বলছেন একমাত্র ভক্তি ও ভালোবাসা দিয়ে যে ভগবানকে পাওয়া যায় বৃন্দাবনের গোপীরাই তার প্রমাণ।

এবার আমরা যদি ঠাকুরের জীবনের দিকে আলোকপাত করি তাহলে দেখতে পাবো, বেদ অধ্যয়ন না করেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, কারণ ঠাকুর বেদ অধ্যয়ন করেননি। পুঁথিগত বিদ্যা দিয়েও ভগবানকে পাওয়া যাবে না, এমএ বিএ পাশ করলেই যদি আধ্যাত্মিক গুণ সম্পন্ন হওয়া যেত তাহলে ঠাকুরের তো আধ্যাত্মিক জ্ঞান হওয়ার কথা নয়। ঈশ্বর লাভের জন্য জাগতিক বিদ্যারও তাহলে কোন প্রয়োজন নেই। ঠাকুর বিরাট কোন দান, ধ্যান করেননি। এখানেও আমরা বলতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ। যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে যে জিনিষগুলো করেননি সেই জিনিষগুলো ফেলে দিলেই তো হয়ে যাবে। ঈশ্বর লাভের জন্য পড়াশোনা করা বাধ্যতামূলক নয়। তাই বলে কি আমাদের কিছু জানতে হবে না? অবশ্যই জানতে হবে। ঠাকুরকে স্বামী সুবোধানন্দ বলছেন – আপনি তো পড়াশোনা করেননি, আপনি কি জানেন! ঠাকুর বলছেন – ওগো আমি শুনেছি কত। কিন্তু ঠাকুর কবে শুনেছেন? জ্ঞান লাভের পরে শুনেছেন। মা কালীর দর্শন তো তাঁর অনেক আগেই হয়ে গেছে। তার মানে ঈশ্বর দর্শনের জন্য পড়াশোনা অত্যাবশ্যক নয়। কিন্তু কতকগুলো জিনিষ আবার অবশ্যই দরকার। এখানে একটা জিনিষকে নেগেট করা হচ্ছে। নেগেট করা মানে, যদি কেউ বলে দেখো বাপু পড়াশোনা না করলে ঈশ্বর লাভ হবে না। আমরা বলব ঠাকুর প্রমাণ, পড়াশোনা না করলেও হয়। আবার এটাও বলা যাবে না, যারা পড়াশোনা করে তাদের ঈশ্বর লাভ হবে না। কারণ স্বামীজী লেখাপড়া জানা সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসী। কিন্তু যারা একেবারে গবেট, মাথামোটা, পাগল তাদের দ্বারা ঈশ্বর লাভ করা দূরে থাকুক, জগতের কোন কাজই তাদের দ্বারা হবে না। ঠাকুর এগুলোর কোনটাই ছিলেন না, ঠাকুরের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাহলে ঠাকুর কিভাবে ঈশ্বর লাভ করেছিলেন? ব্যাকুলতার দ্বারা। ব্যাকুলতা ঈশ্বর লাভের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এরপর প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যাকুলতা কি সাধনার একটি অঙ্গ রূপে ধরা হবে, না কি ধরা হবে না? যদি ধরা হয় তাহলে যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করছেন তাঁদের মধ্যে সেই ব্যাকুলতা আছে কিনা দেখতে হবে। এটা আবার আলাদা বিষয়ে চলে যাচ্ছে, আমরা এই বিষয়ে ঢুকবো না। এখানে বলা

হচ্ছে, যারাই ভাগবত অধ্যয়ন করবে তাদের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করতে হবে। তুমি বলবে আমার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস নেই কিন্তু ভাগবত পাঠ করবো, তা তো হবে না বাপু, তাহলে তুমি অন্য বই পড়ো, ভাগবত তোমার জন্য নয়। শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করা মানেই গোপীদেরও বিশ্বাস করতে হবে। তুমি হয়তো বলবে আমি শ্রীকৃষ্ণকে মানি, ভাগবতও মানি কিন্তু গোপীদের মানি না। তাহলেও ভাগবত তোমার জন্য নয়। সেইজন্য ভারতের পরম্পরাতে যত শাস্ত্র লেখা হয় তাঁরা প্রথমেই বলে দেবেন এই গ্রন্থে কি আছে। যোগশাস্ত্রে প্রথমেই বলে দিচ্ছে *অথ যোগানুশাসনম্*, আমরা যোগের কথা বলতে যাচ্ছি, এই কথা বলে পতঞ্জলী যোগশাস্ত্রের কথা শুরু করছেন। নারদীয় ভক্তিসূত্রে নারদও প্রথমেই বলে দিচ্ছেন আমি ভক্তির কথা বলতে যাচ্ছি। যদি কেউ বলে আমি ভক্তিতে বিশ্বাস করি না, তাহলে তাকে নারদীয় ভক্তিসূত্র পড়তে হবে না। ব্রহ্মসূত্রে প্রথম শ্লোকে বলে দেওয়া হচ্ছে *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, আমরা ব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা করব। সেইজন্য হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্তরণ করার কোন রকম প্রচেষ্টা ছিল না।

মদন মোহন মালব্য, যিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করেছিলেন, তাঁকে একবার বৃটেনের হোম সেক্রেটারি বললেন, আমি যদি ব্রাহ্মণ হতে চাই আমাকে ব্রাহ্মণ করবেন? চিন্তা করুন বৃটেনের হোম সেক্রেটারি মানে হোম মিনিস্টার, সেই সময় আবার ভারত আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে। কিন্তু বৃটেনের হোম সেক্রেটারি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভারতের একজন হিতৈষী ছিলেন, তাঁরও ইচ্ছে ছিল ভারতের জন্য কিছু কিছু অর্থনৈতিক ছাড় দেওয়া হোক। মদন মোহন মালব্যও তখনকার দিনের খুব প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি শুনে বললেন 'ব্রাহ্মণ! না! না! আপনাকে ব্রাহ্মণ করার কোন প্রশ্নই নেই। ব্রাহ্মণ হওয়ার আপনার যদি খুবই ইচ্ছা থাকে তাহলে আগে মনে এই বাসনাটাকে খুব তীব্র করুন। তারপর আপনার এই শরীরের মৃত্যুর পর ভারতে এসে শূদ্র হয়ে জন্মাবেন। তারপর সেখানে কয়েক জন্ম ধরে খুব সেবা করুন, তারপর বৈশ্য হয়ে, ক্ষত্রিয় হয়ে তারপর আপনার সংস্কার যদি খুব ভালো হয় তাহলে কয়েক জন্ম পরে আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাবার সুযোগ পাবেন'। মদন মোহন মালব্য কোন ব্যঙ্গ বা হাসিঠাট্টার ছলে এই কথা বলছেন না। মদন মোহন মালব্য তিনি নিজে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন আর তিনি ভালো করে জানতেন বৃটেনের এই হোম মিনিস্টার থেকে ভারতের জন্য অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে, মালব্যও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রচণ্ড গোঁড়া ছিলেন। তোমার দ্বারা হবে না যখন বলে দেওয়া হচ্ছে সেখানে ধর্মান্তরের কোন প্রশ্নই আসছে না। জহুদি, পার্সি আর হিন্দু এই তিনটে ধর্ম প্রচণ্ড গোঁড়া। ওরা বলেই দেবে, তোমার অনেক সুকৃতি থাকলে তবেই তুমি আমার ধর্মে আসতে পারবে। কারণ এরা জানে যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই তাদের আমাদের ধর্মে নিয়ে কোন লাভ নেই। আমার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস নেই, গোপীদের আমার কোন শ্রদ্ধা নেই অথচ আমি ভাগবত পড়ব! এই ভাবে শ্রদ্ধা, আগ্রহ ছাড়া কি কিছু হয়! যখনই বলছি আমি শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করি, গোপীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, তখন গোপীরাই প্রমাণ।

সেইজন্য প্রথম শর্ত হল আমি তাঁকে মানছি কিনা, তিনি যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তাঁর যা কিছু আছে সব প্রমাণ হয়ে যায়। যাঁরা ঠাকুরকে মানেন তাঁদের কাছে রাজা মহারাজ, লাটু মহারাজরা প্রমাণ। এনারা যা কিছু বলছেন সেটাকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। যারা ভাগবত অধ্যয়ন করেন তাদের কাছে গোপীরা প্রমাণ। গোপী প্রমাণ মানে, গোপীরা যা করতেন সেটাই সত্য। গোপীরা কি করত? তাঁরা বেদ পড়েননি, দান করেননি, তাঁরা জ্ঞান বিচার করতেন না, তপস্যা করেননি অথচ তারা শ্রীকৃষ্ণকে পেলেন। তাহলে গোপীদের কি ছিল? ব্যাকুলতা ছিল।

নারদ আবার বলছেন –*নৃণাং জন্মসহস্রেণ ভক্তৌ প্রীতির্হি জায়তে। কলৌ ভক্তিঃ কলৌ ভক্তির্ভক্ত্যা কৃষ্ণঃ পুরঃ হিতঃ।।২/১৯।* সহস্র জন্মের পূণ্য ফলে মানুষের মনে ভক্তির উদয় হয়। কলিযুগে একমাত্র ভক্তিই সার, আর যার মধ্যে ভক্তি ভাব জাগে সে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পেয়ে যায়। ভক্তি দুই রকমের – অপরা ভক্তি ও পরা ভক্তি বা বৈধী ভক্তি ও রাগাত্মিকা ভক্তি। বিধি থেকে বৈধী। এত জপ করতে হবে, গঙ্গা স্নান করতে হবে, তুলসী পাতা খেতে হবে, এত আচারে পূজা করতে হবে এগুলো সব বৈধী ভক্তি। পরা ভক্তি বা

রাগাত্মিকা ভক্তিতে জগতের সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে যায়, ইষ্টের সাথে সব ভেদ চলে যায়। ঠাকুর কথামৃতে বর্ণনা করছেন – গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের ভাবে এমন বিভোর হয়ে গেছে যে বলছে 'আমি কৃষ্ণ হয়েছি'। এখানে গোপীদের নিজের সত্তাটাই হারিয়ে গেছে, আমি বোধটা ধুয়ে মুছে গিয়ে সেখানে শুধু পরমাহ্লাদিত, পরমধন, পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণই বিরাজ করছেন। মা আর তার সন্তানের সাথেও একই ব্যাপার হয়। ছোট্ট শিশু, কথাও বলতে পারে না, কিন্তু মা তার সন্তানের সাথে এমন একাত্ম হয়ে যায় যে সন্তান কি চাইছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যায়। ঠাকুর তাই বলছেন – সতীর পতির প্রতি টান, মায়ের সন্তানের প্রতি টান, এই ভালোবাসা গুলো ইঙ্গিত করে পরা ভক্তি কি রকম হতে পারে। বলা হয় তাঁর নাম শুনলেই শরীরে রোমাঞ্চ হয়, গায়ের রোম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। গীতাতেও ভগবান অনেক ভাবে ভক্তির কথা বলছেন – *তদ্বুদ্ধয়স্তাদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ*, মন, বুদ্ধি, নিষ্ঠা সব কিভাবে এক হয়ে যায়। এখানে যেটা বলছেন *কৃষ্ণঃ পুরঃ স্থিতঃ* এখানে কিন্তু বৈধী ভক্তির কথা বলা হচ্ছে না। ভক্তিশাস্ত্রে বা অন্যান্য শাস্ত্রেও যখনই 'ভক্তি' শব্দ বলা হয় তখন সব সময় পরা ভক্তির কথাই বলা হয়। যখন বলা হয় ভক্তি দিয়ে মানুষ ভগবানকে পায়, তখন কিন্তু বৈধী ভক্তির কথা বলা হচ্ছে না। সমস্যা হল, মানুষ যতক্ষণ বৈধী ভক্তির অনুশীলন না করতে থাকবে ততক্ষণ তার পরা ভক্তিও আসবে না। সবাইকে প্রথমে বৈধী ভক্তির ভেতর দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু প্রহ্লাদাদি কিছু ভক্ত, যাঁদের জন্ম থেকেই পরা ভক্তি। ঠাকুর বলছেন – ফল আগে ফুল পরে, যেমন লাউ, কুমড়ো।

নারদ তাঁর এই প্রসঙ্গ শেষ করছেন আবার সেই এক কথা বলে - আগে যা হয়েছিল তখন হয়েছিল, এখন কিন্তু ভক্তিই একমাত্র পথ। এখন অত কথা ছেড়ে – *অলং ব্রতৈরলং তীর্থৈরলং যোগৈরলং মখৈঃ। অলং জ্ঞানকথালাপৈর্ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা।।২/২১।* ব্রত করা, উপোস করা, তীর্থে তীর্থে ঘোরা, যজ্ঞ যাগ করা, জ্ঞানচর্চা এই ধরণের নানা রকম সাধনার কোন আবশ্যকতা নেই, একমাত্র ঈশ্বরকে ভালোবাসলে, ভক্তি করলেই সব কিছু হয়ে যাবে, ভক্তিই মুক্তিদায়িনী।

এই কাহিনীর মধ্যেই ভাগবতের আরেকটি প্রেক্ষাপটকে নিয়ে আসা হয়েছে। একবার নারদের সাথে সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনৎকুমার এই চারজন শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র কুমারের সাক্ষাৎ হয়েছে। চারজনই ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করতে শুরু করলেন প্রথমে তিনি মন দিয়ে সৃষ্টি করতে থাকলেন। ব্রহ্মা জন্ম নিয়েই এমন তপস্যা করেছিলেন যে তাঁর ভেতরে প্রচণ্ড শক্তির উদয় হয়ে গিয়েছিল। এত শক্তি হয়েছিল যে তিনি ইচ্ছামাত্র সব কিছু সৃষ্টি করে দিতে পারতেন। ব্রহ্মা ইচ্ছা করলেন আমার সন্তান হোক। তখন তাঁর মন থেকে এই চার কুমার জন্ম নিলেন। তপস্যার ফলে ব্রহ্মার মন পুরো সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই সত্ত্বগুণ থেকে এই চার কুমারের জন্ম হওয়াতে এদেরও মনটা একেবারে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ ছিল। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – যে সন্তান ঈশ্বরের প্রার্থনা ব্যতিরেকে পৃথিবীতে এসেছে সেই সন্তান সমাজের পক্ষে অভিশাপ। আগেকার দিনে তাই দেখা যেত বিয়ের পর মেয়েরা দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত আমার যেন একটি খুব তেজ ও গুণ সম্পন্ন সন্তান হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার জন্য মেয়েদের মন একটা উচ্চ অবস্থায় চলে যেত, তাতে সত্ত্বগুণও বেড়ে যেত। সত্ত্বগুণীর যে সন্তান হবে সেই সন্তানেরও সত্ত্বগুণ বেশী থাকবে। সত্ত্বগুণের প্রভাবে ভেতরে রাজসিক ও আসুরিক বৃত্তিগুলো কম থাকে। শুধু মাত্র কাম চরিতার্থ করতে গিয়ে যে সন্তানের উৎপত্তি হচ্ছে, সেই সন্তান সব সময় আসুরিক বৃত্তি নিয়েই জন্মাবে। গীতাতেও এই ধরণের লোকের কথা বলা হয়েছে যারা বলে আমার বাবা-মার মধ্যে কামের ইচ্ছা হয়েছিল, সেইখান থেকে আমার জন্ম হয়েছে। এই ধরণের লোকরাই আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন হয়। সেইজন্য ভারতীয় পরম্পরাতে বলা হয় তোমরা যদি সন্তান না চাও তাহলে কখনই নিজেদের মধ্যে জড়াবে না, তা নাহলে সেই সন্তান সমাজের পক্ষে একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।

এই চারজন কুমার পুরোপুরি সত্ত্বগুণ থেকে জন্ম নিয়েছেন তাই এঁরা প্রত্যেকে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। ভেতরে এত বৈরাগ্য যে জগতের দিকে তাঁদের কোন দৃষ্টিই নেই, জন্ম নিয়েই এনারা কমণ্ডলু হাতে করে তপস্যায় বেরিয়ে গেলেন। সংসার করার জন্য রজো আর তমো গুণ বেশী দরকার। কিন্তু চার কুমারের

মধ্যে রজো আর তমো গুণের লেশ মাত্র নেই। সব সময় ঈশ্বর চিন্তনে হারিয়ে আছেন। কেউ তাঁদের কোন বাধা দিতে পারে না, যেখানে খুশী তাঁরা ঘুরে বেড়ান। একবার নারদের সঙ্গে এই চার কুমারের দেখা হতে নারদ তাঁদের ভক্তি আর তাঁর দুই সন্তান জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কথা বলে বললেন – *বেদবেদান্তঘোষৈশ্চ গীতাপাঠৈঃ প্রবোধিতম্। ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং নোদতিষ্ঠৎ ত্রিকং যদা।।২/৬৪।* তাদের চেতনা জাগাবার জন্য আমি অনেক কিছুই শোনালাম, বেদ বেদান্তের কথা শুনিয়ে, গীতা পাঠ করে তাদের জাগাবার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু সন্তান দুটো ঘাটের মড়াই রয়ে গেল। এদের এখন শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়ে কি করে জাগান যাবে?

তখন চারজন কুমার বললেন – দেখুন আপনি হলেন ভগবানের খুব প্রিয়, আপনি এদের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেই শোনান, এতেই কার্য সিদ্ধি হবে। নারদ তখন বলছেন – *শ্রীমদ্ভাগবতালাপাত্তৎ কথং বোধমেষ্যতি। তৎ কথাসু তু বেদার্থঃ শ্লোকে শ্লোকে পদে পদে।।২/৬৫।* আমি তো এদের বেদ, বেদান্ত, গীতা সবই শুনিয়েছি এরপর শ্রীমদ্ভাগবত শোনালে কি করে কাজ দেবে। ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোক এবং শ্লোকের প্রত্যেকটি পদে পদে বেদের অর্থই নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বেদের যা বক্তব্য, বেদান্তের যা বক্তব্য, গীতার যা বক্তব্য শ্রীমদ্ভাগবতে তো ওই একই বক্তব্য বলা হয়েছে। আমি তো আগেই তাদের বেদ, বেদান্ত, গীতা সব শুনিয়েছি, তাতে তো এদের কিছুই পরিবর্তন হয়নি, এখন এই অবস্থায় আলাদা করে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়ে লাভ কি!

দুটো লাইন নিয়ে একটা শ্লোক হয়। বেশীর ভাগ শ্লোকের, বিশেষ করে গীতার শ্লোকগুলিতে চারটে কর পদ থাকে। অবশ্য সব শ্লোকেই যে চারটে করে পদ থাকতে হবে, তা নয়। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি শ্লোকে আটটি শব্দ নিয়ে একটি করে পদ তৈরী হয় এবং চারটি করে পদ থাকে। রামচরিত মানসের শ্লোকগুলোকে বলা হয় চৌপায়ী। চৌপায়ীরও চারটে করে পদ হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি পদ ষোল মাত্রা দিয়ে তৈরী হয়। ছন্দ পাল্টালে ছন্দের নামও পাল্টে যায়। হিন্দীতে খুব নামকরা কিছু কবিতা আছে যাকে বলে দোঁহা। কবীর দাসের দোঁহা খুব নামকরা। দোঁহাতে আবার তেরো এগারো করে মাত্রা চলে, প্রথম পদে তেরো মাত্রা দ্বিতীয় পদে এগারো মাত্রা। ঠিক তেমনি আছে পঙক্তি, পঙক্তিতে আবার পাঁচটা করে লাইন থাকে। সংস্কৃতে আবার একটা ছন্দ আছে ষোড়ঠা, সেখানে আবার দোঁহাটা উল্টে যায়, এগারো তেরো করে মাত্রা। তবে শ্লোক হল কবিদের খুব প্রিয় ছন্দ, এতে স্বাভাবিক ছন্দটা আপনা থেকেই চলে আসে।

নারদ বলছেন, আপনারা হলেন *শরণাগতবৎসলাঃ*, যারাই আপনাদের শরণ নেয় আপনারা তাদেরই শরণ দেন। আপনারা তাই বলুন এদের কি করে বাঁচানো যাবে। আপনারা যে বলছেন শ্রীমদ্ভাগবত শোনাতে, কিন্তু আগেই তো আমি ভাগবতের সার বলে দিয়েছি, তাতেও তো কোন কাজ হল না। তখন কুমাররা বলছেন, আসলে তা নয়, শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। চারজন কুমার এখানে খুব সুন্দর বলছেন – *বেদান্তবেদসুস্নাতে গীতায়া অপি কর্তারি। পরিতাপবতি ব্যাসে মুহ্যত্যজ্ঞানসাগরে।।২/৭২।* ব্যাসদেব হলেন *বেদান্তবেদসুস্নাতে*, তিনি বেদ বেদান্ত রূপ নদীতে যে অবগাহন করেছেন তাই নয়, একেবার *সুস্নাত*। মানে বেদ বেদান্তের জ্ঞানে তিনি অত্যন্ত পরিপূর্ণ। বেদ বেদান্তের জ্ঞানে সুপরিপক্ক না হলে কি ব্যাসদেভব বেদকে বিভাজন করতে পারতেন! তিনি আবার গীতা রচনা করলেন। পুরো মহাভারত রচনা করেও তিনি গীতা কেন রচনা করলেন? কারণ বেদ বেদান্তের যা বক্তব্য সেটাকেই গীতাতে ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু করার পরেও তিনি অজ্ঞান সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলেন। পরে ভাগবতেই বর্ণনা আছে কেন তিনি অজ্ঞান সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলেন।

সংক্ষেপে ব্যাসদেবের কীর্তি হল, যে বিশাল বেদ অগোছাল অবস্থায় বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিল, ব্যাসদেব প্রথমে সমগ্র বেদরাশিকে একটা জায়গায় সংগ্রহ করলেন তারপর সেই বিশাল বেদরাশিকে চারটে বেদে বিভাজন করে দিলেন। বিরাট বড় ঋষি ছিলেন কিনা, তাঁর সেই ক্ষমতা ছিল। স্বামীজী যেমন যেটা বলে গেছেন সেটাই আজকে ধর্ম হয়ে গেছে। বেদের বিভাজন করার পর ব্যাসদেবের তখনও বয়স আছে। তারপর তিনি ব্রহ্মসূত্র রচনা করলেন, বেদ বেদান্তের বক্তব্যকে ব্রহ্মসূত্রে সূত্রাকারে সাজিয়ে দিলেন। ব্যাসদেবের এই

ব্রহ্মসূত্রের উপর পরে অনেকেই ভাষ্য রচনা করেছেন, আর সবাই তাঁদের ভাষ্যে প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন ব্যাসদেব যা বলতে চেয়েছেন তিনিও সেটাই বলছেন। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে বললেন ব্রহ্মসূত্র অদ্বৈতের কথা বলতে চেয়েছেন। রামানুজ তাঁর ভাষ্যে বললেন, ব্যাসদেব বিশিষ্টাদ্বৈতের কথা বলতে চেয়েছেন আর মাধ্বাচার্য প্রমাণ করে দিলেন ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে দ্বৈতের কথা বলছেন। ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্র এত কঠিন যে বড় বড় পণ্ডিতরা পর্যন্ত এর মধ্যে হাবুডুবু খান। ব্রহ্মসূত্র রচনা করেও ব্যাসদেবের মনে শান্তি হল না। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে ইদানিং একটা নতুন থিয়োরী এসেছে, যে থিয়োরী বলছে যারা কথা বলা শুরু করে তারা শুধু কথাই বলে যায় থামতে আর চায় না, যাঁরা কিছু রচনা শুরু করেন তাঁরা শুধু লিখতেই থাকেন। ব্যাসদেবেরও মনে হয় তাই হয়েছিল। তিনিও লেখা ছাড়লেন না, এরপর তিনি মহাভারত রচনা করলেন। ধাপে ধাপে তাঁর লেখার বিষয় কিভাবে পাল্টাচ্ছে এটাও একটা গবেষণার বিষয়। প্রথমে তিনি পরম্পরাতে যে জিনিষগুলো ছিল সেটাকে বিভাজন করলেন। সেই কাজ শেষ করে তিনি নিজের একটা মত দাঁড় করালেন। তাতেও তাঁর মনে শান্তি হল না। আরেক ধাপ এগোলেন এবার নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগালেন, রচনা করলেন মহাভারত। তারপরও তিনি হতাশ হয়ে বসে আছেন। হতাশা মানে অজ্ঞান সাগরে হাবুডুবু খাওয়া।

তারপর নারদের সাথে ব্যাসদেবের দেখা হতে নারদ তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন আপনাকে এত হতাশ ও বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? ব্যাসদেব বললেন, আমি এত কিছু রচনা করার পরেও মনে শান্তি পাচ্ছি না। তখন নারদ বললেন – আপনি সব কিছু নিয়েই লিখেছেন কিন্তু ভগবানের কথা কোথাও সেইভাবে বর্ণনা করেননি। ভগবানের কথা বললে আপনার মনে শান্তি হত। আর বেদ তো আপনার কথা নয়, ব্রহ্মসূত্র তো একটা তাত্ত্বিক দর্শন, আর মহাভারত পুরোটাই পলিটিক্সে ভর্তি। এরপর আপনি শান্তি কি করে খুঁজছেন! মানুষ শান্তি কোথায় পায়? একমাত্র ভগবানের কাছে। আপনি সেই ভগবানের কথাই কোথাও বললেন না। এরপর নারদ ব্যাসদেবকে চারটি শ্লোক বলেছিলেন। ব্যাসদেব এই চারটি শ্লোককে কেন্দ্র করে শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় নেমে পড়লেন। তারপর তিনি শান্তি পেলেন। এটা হল ভাগবতের প্রেক্ষাপট।

এই চারজন কুমার তাই নারদকে বলছেন – আরে মশাই! ব্যাসদেবের মত মহর্ষি যখন সব কিছু রচনা করে মনের অশান্তিতে অজ্ঞান সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন আপনিই তাঁকে সেই অজ্ঞান সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনিই তো ভাগবত কিভাবে রচনা হবে চারটি শ্লোকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাসদেবের মত লোককে আপনি তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন, আপনার নিজের কীর্তি নিজেই ভুলে গেছেন! যান আপনি গিয়ে ওদের শ্রীমদ্ভাগবত শোনান তাতেই ওরা চাঙ্গা হয়ে যাবে। আমরা আগেও বলেছি, এগুলো হল গ্রন্থস্তুতি, যে কোন গ্রন্থের গ্রন্থস্তুতিরও খুব প্রয়োজন আছে।

গোকর্ণ উপাখ্যান

এইভাবে গ্রন্থস্তুতিতেও যেন ঠিক জমছে না। নারদ গ্রন্থস্তুতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যাতে মানুষ আরও সহজে নিজেকে গ্রন্থের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে পারে। সেই উদ্দেশ্য এরপর গোকর্ণের কাহিনী নিয়ে আসা হচ্ছে। এর নাম হল গোকর্ণ উপাখ্যান। এখনও কিন্তু মূল ভাগবত শুরু হয়নি। এর কিছু পরেই ভাগবত শুরু হবে। যদিও গ্রন্থস্তুতির মধ্যে এই কাহিনীগুলো অন্তর্গত কিন্তু এগুলোও শ্রোতাদের কাছে বলতে হয়।

একজন ব্রাহ্মণ ছিল, ব্রাহ্মণটি অত্যন্ত সজ্জন। কিন্তু তার কোন সন্তান ছিল না। সন্তান নেই বলে সে দিনরাত চোখের জল ফেলত আর ভাবত আমার কি হবে! আমার পূর্বপুরুষদের কে জল দেবে! আমি মরে গেলে আমার পিণ্ডদান কে করবে! আর আমার যে টাকা পয়সা, সম্পতি আমার মৃত্যুর পর কে ভোগ করবে! সবাই লুটেপুটে নেবে। ব্রাহ্মণের বউটি ছিল আবার পুরো তার উল্টো, বলতে গেলে একেবারে আধুনিকা। ব্রাহ্মণী ভাবত – আমার যদি সন্তান হয়, তাহলে আমার রূপ চলে যাবে, আমার রূপ যদি চলে যায় তাহলে আমাকে কেউ পাত্তা দেবে না, সেইজন্য কিছুতেই সে সন্তান ধারণ করতে চাইত না। সন্তান না হওয়াতে ব্রাহ্মণও খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। খুব বিরাট কাহিনী এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

সেই ব্রাহ্মণ এক সন্ন্যাসীর কাছে গেল। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে একটা আম দিয়ে বললেন এই আমটা বউকে খাইয়ে দাও তাতেই তোমাদের সন্তান হয়ে যাবে, আর তোমাদের খুব ভালো একটি সন্তান হবে। বউকে বলাতে বউ ভাবল আমার সন্তান হলে আমার ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে, ফিগার নষ্ট হয়ে গেলে আমার গ্ল্যামার চলে যাবে। ব্রাহ্মণী সেই আমটি নিয়ে তার এক সখীর কাছে গিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে 'দেখ আমার স্বামীর কাণ্ড! আমাকে একটা ফল দিয়ে বলছে খেয়ে নিতে। এটা খেয়ে নিলেই তো আমি গর্ভধারণ করে নেব। গর্ভধারণ করে নিলে আমি আর খাওয়া-দাওয়া ঠিক ভাবে করতে পারবো না, আমার শরীর দুর্বল হয়ে যাবে, দুর্বল শরীর নিয়ে আমি বাড়ির কাজকর্ম করব কি করে! ডাকাতরা যদি ডাকাতি করতে আসে আমি দুর্বল শরীর নিয়ে পালাবো কি করে, আর আমার শরীরের সৌন্দর্যই চলে যাবে, আমার রূপ নষ্ট হয়ে যাবে, কেউ আর আমার কোন খোঁজ নেবে না, ননদগুলো এসে আমার শাড়ি গয়নাগুলো নিয়ে যাব' এই সব বলে ব্রাহ্মণী বিলাপই করে যাচ্ছে। কোন ভাবেই সে সন্তানের মা হতে চাইছে না। সন্তানের মা যাতে না হয় তার জন্য যত রকমের অজুহাত হতে পারে বলেই যাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, কত হাজার বছর আগেকার কাহিনী কিন্তু তখনও মেয়েদের মধ্যে এই ধরণের চিন্তা ভাবনা কাজ করত। নিজেদের রূপের ব্যাপারে মেয়েরা যে কি প্রচণ্ড সচেতন ভাবাই যায় না, রূপ লাবণ্য নষ্ট হয়ে যাবে বলে গর্ভধারণ করবে না। লোকেরা বলে আজকাল ছেলে-মেয়েগুলো একেবারে গোল্লায় গেছে। আরে বাবা এরা শাস্ত্র খুলে একবার দেখুক, তাহলে জানতে পারবে আগেকার ছেলে-মেয়েরা সব কেমন রত্ন ছিল, মানুষের স্বভাব কখন পাল্টায় না। এই ব্রাহ্মণী ভাবনার রাজ্যে ডানা মেলে কোথায় চলে গেছে! আমি যদি প্রসব করি তাহলে আমার শরীর এত দুর্বল হয়ে যাবে যে চোর ডাকাতে যদি তাড়া করে তখন আমি পালাতেও পারবো না। ব্রাহ্মণী সত্যি সত্যিই খুব ভেঙে পড়েছে।

ব্রাহ্মণী কাঁদতে কাঁদতে নিজের বোনকে খবর দিয়েছে। কপাল এমন তার বোন আবার তখন সদ্য গর্ভবতী হয়েছে। বোনকে সব বলার পর বোন ব্রাহ্মণীকে বলছে আমি আমার স্বামী থেকেই গর্ভবতী হয়েছি আর আমার যে সন্তান হবে আমি তোমাকে দিয়ে দেব। তার আগে ছয় মাস হয়ে গেলে বলব আমার গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে। সবই তো ব্যবস্থা হল, তাহলে আমটার কি গতি করা হবে? দুই বোন মিলে আমটা ব্রাহ্মণের গরুকে খাইয়ে দিয়েছে। এখন ব্রাহ্মণী ঐ মন্ত্রসিদ্ধ আম গরুকে খাইয়ে দিয়েছে। এরপর বোন ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে, বাচ্চা হওয়ার পর তার বাচ্চাকে দিদির কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছে। মূল কথা হল সন্নাসীর মন্ত্রসিদ্ধ আম খেয়ে নিয়েছিল বলে গরুটা যখন বাচ্চা দিয়েছে তখন সেটা আর বাছুর না হয়ে মানুষের বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। সবাই অবাক হয়ে ভাবছে গরুর পেট থেকে কি করে একটা মানুষের জন্ম হল। শুধু ওর কানটা গরুর মত বলে তার নাম রাখা হল গোকর্ণ। আর ঐদিকে ব্রাহ্মণীর বোনের যে ছেলে জন্ম নিয়েছে তার নাম রাখা হল ধুন্ধুকারী।

ব্রাহ্মণী যে বোনের বাচ্চাকে নিজের সন্তান বলে চালিয়ে দিচ্ছে সেটা ব্রাহ্মণ ধরতে পারেনি, ব্রাহ্মণ জানে ধুন্ধুকারী আমারই সন্তান। আগেই আলোচনা করা হয়েছিল, কাম-বাসনা থেকে যে সন্তান জন্ম নেয় সেই সন্তান সব সময় সমাজের পক্ষে অভিশাপ, অন্য দিকে টাকার লোভে তার মা তাকে ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে ব্রাহ্মণীর তো কোন সন্তানই হয়নি, বাচ্চা মায়ের বুকের দুধ পাবে কোথায়। ব্রাহ্মণী তখন নিজের বোনকে নিজের বাড়ীতেই নার্স করে রেখে দিয়েছে। এবার দুটো বাচ্চাই বড় হতে শুরু করল, এক দিকে গোকর্ণ আর অন্য দিকে ধুন্ধুকারী। কিছু দিন পর বড় হতেই দেখা গেল ধুন্ধুকারীর মত এত ধুরন্ধর আর বদ ছেলে দুনিয়াতে পাওয়া যাবে না। অন্য দিকে গোকর্ণ হল অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সৎ চরিত্রের খুব ভালো ছেলে। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ ধন্য সন্তান বলে কথা। কিছু দিন পরে দেখা গেল ধুন্ধুকারীর আচার বিচার বলে কিছুই নেই। এখানে বর্ণনা দিচ্ছেন *স্নানশৌচক্রিয়াহীনো দুর্ভক্ষী ক্রোধবর্ধিতঃ। দুষ্পরিগ্রহকর্তা চ শবহস্তেন ভোজনম্।।৪/৬৭।* ধুন্ধুকারী ব্রাহ্মণোচিত স্নান-শৌচাদির আচরণের কিছুই জানত না, খাওয়া-দাওয়ার তার কোনও বাছ বিচার ছিল না, এর উপর আবার প্রচণ্ড ক্রোধী, যেন জ্বলন্ত অগ্নি। আবার সব রকম খারাপ খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আনত, এমনকি মড়ার স্পর্শ যুক্ত অন্নও অবলীলা ক্রমে সংগ্রহ করে খেয়ে নিতে কোন দ্বিধা করত না। আমাদের নিয়মই আছে

মড়া স্পর্শ করলে স্নান করতে হয়। সে আবার মড়ার ছোঁয়া জিনিষ খেয়ে নিচ্ছে, তার মানে এখানে তন্ত্র সাধনার দিকে একটা ইঙ্গিত আছে। অথচ তার বাবা অত আচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

কিছু দিন পরে ধুন্ধুকারী চুরি করতে শুরু করল। যা পয়সা কড়ি পাচ্ছিল তাতে তার চলছিল না। এমনকি দরকার হলে খেলা করার নাম করে অপরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে পরে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিত, অপরের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিত, সবার প্রতি দ্বেষ করা তার স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। আসলে তার ভেতরটা হিংসা আর দ্বেষেই পরিপূর্ণ ছিল। সন্তানের এই সব আচরণ দেখে ব্রাহ্মণের মনে তো প্রচণ্ড সন্তাপ – কি চেয়েছিলাম আর কি হয়ে গেল! এর থেকে আমার বন্ধ্যা স্ত্রীই ভালো ছিল, আমার এই সংকট থেকে আমাকে কে উদ্ধার করবে! অন্য দিকে গোকর্ণ হয়েছে খুব জ্ঞানী। গোকর্ণ এসে ব্রাহ্মণ পিতাকে বোঝাচ্ছে – *অসারঃ খলু সংসারো দুঃখরূপী বিমোহকঃ। সুতঃ কস্য ধনং কস্য স্নেহবাঞ্জ্বলতেহনিশম্।।৪/৭৪।* ঠাকুর বলছেন এই সংসার হল আমড়া, আঁটি আর চামড়াই সার, খেলে আবার অম্লশূল। যাকেই ভালোবাসতে যাচ্ছে, যার পেছনেই দৌড়াচ্ছে কিছু দিন পরে দেখে কোনটাতেই সুখ নেই। আর কপাল! যদি কপাল ভালো থাকে সে ছেড়ে চলে যাবে, কপাল যদি খারাপ থাকে তাহলে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরবে। যার কপাল ভালো তার বিয়ে হয় না, আর যার কপাল খারাপ তার বিয়ে হয়ে যায়। ভাগবতেও এখানে বলছেন 'হে পিতা! এই সংসার অসার। এ কেবল দুঃখময় আর মোহ উৎপন্নকারী। স্নেহাসক্ত মানুষ দিবারাত্র প্রদীপের মতো কেবল জ্বলতেই থাকে। *ন চেন্দ্রস্য সুখং কিংচিন্ন সুখং চক্রবর্তিনঃ। সুখমস্তি বিরক্তস্য মুনেরেকান্তজীবিনঃ।।৪/৭৫।* দেবতাদের রাজা ইন্দ্র তাঁরও সুখ নেই, সব সময় তাঁর আতঙ্ক এই বুঝি তাঁর ইন্দ্রত্ব চলে গেল। আর পৃথিবীতে যে চক্রবর্তী রাজা তারও শান্তি নেই, সব সময় ভেতরে ভয়, এই বুঝি এখানে বিপ্লব শুরু হল, এই বুঝি এখানে রাজবিদ্রোহ শুরু হল। তাহলে শান্তি কার আছে? *সুখমস্তি বিরক্তস্য*, যিনি সংসারে বিরক্ত হয়ে বলছেন আমার কিছুই চাই না, এছাড়া কারুরই শান্তি নেই। বিরক্ত মানে ত্যাগ, যার মধ্যে বৈরাগ্য এসেছে। তোমার মধ্যে যদি ত্যাগ না থাকে, বৈরাগ্য যদি সংসারে না আসে তাহলে তোমার অশান্তি তোমাকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে। গোকর্ণ তার বাবাকে বোঝাচ্ছেন। বাবা! 'এ আমার ছেলে' এই অজ্ঞানতা ত্যাগ করুন। এই শরীর তো একদিন নষ্ট হয়ে যাবেই। তাই সব কিছু ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করুন। গোকর্ণের উপদেশের পর ব্রাহ্মণ বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে তপস্যা করতে চলে গেল। এবার সেই ব্রাহ্মণী পড়ে রইল, যে কিনা বলেছিল সন্তান প্রসব করলে আমার ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে। এখন সেই ছেলে মাকে সব সময় পীড়া দিতে শুরু করেছে, পীড়া দেওয়া মানে মায়ের সব গয়নাগাটি, টাকা পয়সা সব কেড়ে নিয়েছে।

ইতিমধ্যে ধুন্ধুকারী কিছু নষ্টা মেয়ের পাল্লায় পড়েছে। একটা দুটো নয়, এক সঙ্গে পাঁচটা নষ্টা মেয়ের পাল্লায় পড়েছে। মায়ের যত টাকা-পয়সা, গয়না ছিল মেয়েগুলোর পেছনে সব উড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। একদিন ধুন্ধুকারী নিজের মাকে বলছে – আমাকে এক্ষুণি টাকা দাও। মা কোত্থেকে টাকা দেবে! সব তো সে উড়িয়ে শেষ করে ফেলেছে। মা টাকা দিতে পারেনি, তখন সে তার মাকে বেঁধে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে খুব মারতে শুরু করেছে। মা নিজে জানে আমি তো আর মা নই আমি হলাম মাসি, কিন্তু নিজে সেটা বলতেও পারছে না। মহিলাটি দেখছে এইভাবে তো আর চলতে পারে না, তখন সে একটা কুয়োতে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে সেখানেই মারা গেল। গোকর্ণও বড় হয়েছে, তাকেও নিজের সন্তানের মত ব্রাহ্মণ বড় করেছিল। এখন মা মারা যাবার পর, মায়ের কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়ে ধুন্ধুকারী গোকর্ণকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। ইতিমধ্যে যা টাকা পয়সা ছিলে ধুন্ধুকারী ঐ নষ্টা মেয়েদের পেছনে সব শেষ করে ফেলেছে, একটা কানাকড়ি কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। এরপর ধুন্ধুকারী চুরি ডাকাতি শুরু করল। চুরি ডাকাতি করে যা পায় সব ওই মেয়েগুলোর পেছনেই চলে যায়। একেবারে বন্য পশুর মত হয়ে গেছে। মেয়েগুলো দেখল, এই ব্যাটা একদিন না একদিন ধরা পড়বে, আর যেদিন ধরা পড়বে তখন এতদিন একে বোকা বানিয়ে আমরা যা সম্পত্তি করেছি সেটাও হাত ছাড়া হয়ে যাবে, তখন আমাদেরও হয়তো জেলের ঘানি টানতে হতে পারে। তার থেকে বরং আমরাই এই ব্যাটাকে শেষ করে দিই। তখন মেয়েগুলো ধুন্ধুকারীকে ধরে খুব মারধোর করে কুয়োর মধ্যে নিক্ষেপ করে

দিল, কিন্তু তাতেও ধুন্ধুকারী মরল না। তারপর ওকে সব কটা মিলে চেপে ধরে ওর মুখে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ধুন্ধুকারী এই নষ্টা মেয়েগুলোর হাতে আগুনে পুড়ে মারা গেল। এরাও ধুন্ধুকারীকে মেরে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সব কেড়ে নিয়ে ওকে মাটিতে পুতে দিয়ে সেইখান থেকে চলে গেল আর সবাইকে বলল, ধুন্ধুকারী এখন অন্য দেশে টাকা সংগ্রহ করতে গেছে। টাকা সংগ্রহ করে ফিরে এলে আমরাও আবার চলে আসব। শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন – *তং দেহং মুমুচুর্গর্তে প্রায়ঃ সাহসিকা স্ত্রিয়ঃ। ন জ্ঞাতং তদ্রহস্যং তু কেনাপীদং তথৈব চ।।৫/১২।* স্ত্রীদের সাংঘাতিক দুঃসাহস। এই যে বলা হয় নারী হল অবলা, অবলা কখনই হয় না, চিরদিনই দুঃসাহসী হয়। শুধু তাই না, মেয়েগুলোর এই দুষ্কর্মের কথা কেউ জানতেও পারলো না। লোকেরা বলছে ধুন্ধুকারীকে তো দেখা যাচ্ছে না। মেয়েগুলো বলছে – আমাদের প্রিয়তম অনেক দূর বিদেশে গেছে, সেখান থেকে আমাদের জন্য অনেক টাকা নিয়ে আসবে বলে গেছে। ভাগবত এই ব্যাপারে মন্তব্য করছে – *স্ত্রীণাং নৈব তু বিশ্বাসং দুষ্টানাং কারয়েদ্ বুধঃ। বিশ্বাসে যঃ স্থিতো মূঢ়ঃ স দুঃখৈঃ পরিভূয়তে।।৪/১৪।* বুদ্ধিমান পুরুষরা যেন কখনই নারীদের বিশ্বাস না করে, বিশেষ করে এই ধরণের মেয়েদের কখনই যেন বিশ্বাস না করে। বিশ্বাস করলে ধুন্ধুকারীর মত দুরবস্থা হবে। যারা এই ধরণের মেয়েদের বিশ্বাস করে তাদের দুঃখের আর শেষ নেই। *সুধাময়ং বচো যাসাং কামিনাং রসবর্ধনম্। হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং প্রিয়ঃ কো নাম যোষিতাম্।।৪/১৫।* এদের কথাগুলো কামুকদের হৃদয়ে অমৃতরসের সঞ্চার করে কিন্তু এদের হৃদয় শাণিত ছুরির মত তীক্ষ্ণ। কতকাল আগের কথা, কিন্তু এই ধরণের ঘটনা এখন তো হামেশাই হচ্ছে।

ধুন্ধুকারীতো মরে গেলে, আর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে যত রকমের কুকর্ম দুষ্কর্ম করেছিল, কিন্তু তাতেও তার বাসনার তৃপ্তি হয়নি, তার ওপর নৃশংস ভাবে খুন হতে হল, মৃত্যুর পর তাই তার প্রেতযোনিতে জন্ম হল। প্রেতযোনিতে জন্ম নিয়ে সে তার সেই পৈতৃক বাড়িতে, যেটাকে সে বিক্রী করেনি, সেখানেই আস্তানা গেড়েছে প্রেতাত্মা হয়ে। আর ঐখানে সে এমন ধরণের ভৌতিক উৎপাত শুরু করল যে কিছু দিনের মধ্যেই ঐ বাড়িটা গ্রামের লোকেদের কাছে ভুতুরে বাড়ি বলে পরিচিতি পেয়ে গেল।

অনেক বছর পর গোকর্ণ ঘুরতে ঘুরতে তার সেই জন্মভূমিতে এসেছে। তার আগে সে কি করে খবর পেয়েছিল যে তার বাবা মা সবাই মারা গেছে। তাই গয়াতে গিয়ে সে পিণ্ড দান করে এসেছে। গ্রামের লোকেদের কাছে তার পৈতৃক বাড়ির খোঁজ করতেই গ্রামের লোকেরা বলল – বাড়ির খবর পরে নেবেন কিন্তু আপনি ঐ বাড়িতে একদম যাবেন না, ঐ বাড়িটা ভুতুড়ে বাড়ি, ঐখানে এক বিরাট প্রেত আছে, ইত্যাদি বলে গোকর্ণকে সাবধান করে দিল। কিন্তু গোকর্ণ এতদিনে সাধনা করে সিদ্ধপুরুষ হয়ে গেছে, তাই বলল – না না, কোন চিন্তা নেই, আমি আমার পৈতৃক বাড়িতেই যাব।

শেষ পর্যন্ত সবার নিষেধকে উপেক্ষা করে রাত্রিবেলা যখন গোকর্ণ ঐ বাড়িতে শুতে গেছে ধুন্ধুকারী দেখছে তার ভাই ফিরে এসেছে। ভাইকে এবার সে নিজের কেরামতি দেখাতে শুরু করেছে। কখন সে হাতি, কখন সে ভেড়া, কখন মহিষ, কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, বিভিন্ন রূপ ধারণ করছে আর গোকর্ণকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কোন কিছুতেই গোকর্ণকে কাবু করতে না পেরে শেষে মানুষের রূপ ধরেছে। গোকর্ণ একজন সিদ্ধ পুরুষ, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে কোন অতৃপ্ত আত্মা খুব কষ্টে পড়ে আছে। তিনি আবার এই সব প্রেতাত্মাদের সাথে কথা আদান প্রদান করতে পারতেন। তিনি ধুন্ধুকারীকে জিজ্ঞেস করছেন 'তুমি কে, এত রাতে এই রকম বিভৎস রূপ কেন ধারণ করছ? তুমি প্রেত, না পিশাচ, না রাক্ষস'? কিন্তু ধুন্ধুকারী এমনই পাপ করেছিল যে ওর বায়ু শরীর হয়ে যাওয়াতে কথা বলার কোন ক্ষমতা ছিল না, সব ভুতেরা কথা বলতে পারেনা, বিশেষ করে যারা প্রেতযোনিতে জন্ম নেয়। কিন্তু নানা রকম রূপ ধারণ করতে পারে। গোকর্ণ এতদিন সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছে, তাই তাঁর মধ্যে কোন ভয় ডর ছিল না। গোকর্ণ কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল নিয়ে মন্ত্রে অভিষিক্ত করে ধুন্ধুকারীর শরীরে ছিটিয়ে দিয়েছে। মন্ত্রসিদ্ধ গঙ্গাজল যখন ওর গায়ে পড়ল তখন ওর পাপ কিছুটা কমেছে, ঐ একটু পাপ কমতেই ধুন্ধুকারী কথা বলা শুরু করল। হিন্দু ধর্মের অনেক পুরনো মতবাদ যে, কারুর অঙ্গ যদি গোলমাল থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার আগের জন্মের কিছু পাপ থেকে গেছে, প্রায়শ্চিত্ত করলে ঠিক হয়ে

যাবে। কিন্তু কোন পাপ ছিল বলে একজন অন্ধ হয়ে জন্মেছে তাই বলে তুমি তার সঙ্গ করবে না, এটা কেউ সমর্থন করবে না। আমাদের দর্শনের এখন যে শিক্ষা সেখানে বলা হয়, সে পাপ করেছিল তো কি হয়েছে, এখন তুমি তার সেবা করে, চিকিৎসা করে পূণ্য অর্জন কর। গোকর্ণের মধ্যে অবশ্য আগে থাকতেই সেবার ভাব, করুণার ভাব ছিল।

পাপ একটু কমতেই ধুন্ধুকারী কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদতে কাঁদতে গোকর্ণকে বলছে 'আমি তো তোমার সেই ভাই ধুন্ধুকারী, আমার কুকীর্তির কথা তোমাকে আর কত বলব, নষ্টা মেয়েদের পাল্লায় পড়ে আমি কত যে পাপ করেছি তার হিসাব দেওয়া যাবে না। আমি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছি, ওই মেয়েগুলোই আমাকে মেরে মাটিতে পুতে দিয়েছে'। দাদাকে নিজের সব কুকীর্তির কথা বলে বলছে 'ভাই আমি এই সব কুকর্ম, পাপ কাজ করেছি আর তার ফলে প্রেতযোনিতে পতিত হয়ে ফলভোগ করতে হচ্ছে, আমার আর এই প্রেতযোনি ভালো লাগছে না, খুব কষ্টে আছি, তুমি আমার এই প্রেতযোনি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা কর'। সব শুনে গোকর্ণ বলছে 'আরে ভাই! আমি গয়াতে গিয়ে তোমার পিণ্ডদান করে দিলে তুমি প্রেতযোনি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে'। ধুন্ধুকারীর প্রেতাত্মা গোকর্ণকে বলছে – *গয়াশ্রাদ্ধশতেনাপি মুক্তির্মে ন ভবিষ্যতি। উপায়মপরং কংচিত্ত্বং বিচারয় সাম্প্রতম্।।৫/৩৩।* ভাই! আমি এত পাপ কর্ম করেছি যে, গয়াতে শত পিণ্ডদান করে, শ্রাদ্ধ করেও আমার মুক্তি হবে না, আমার আর কোন পথ নেই, তুমি অন্য কোন উপায় দেখ। এটা খুবই মজার ব্যাপার, প্রেতই বলে দিচ্ছে প্রেতযোনি থেকে তার মুক্তির জন্য কি করতে হবে। লীলাপ্রসঙ্গেও বর্ণনা আছে ক্ষুদিরামকে ভূতটাই বলে দিয়েছিল গয়াতে গিয়ে তুমি আমার পিণ্ড দান করলে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। ধুন্ধুকারী কিন্তু ভেবে নিয়েছে তার কোন কিছুতেই মুক্তি হবে না। কিন্তু দাদাকে বলে যাচ্ছে 'তুমি কিছু একটা কর যাতে এই প্রেতযোনি থেকে আমি বেরোতে পারি, আমি আর পারছি না'।

তখন গোকর্ণ সারা রাত ধরে অনেক চিন্তা ভাবনা করে বিচার করল ভাইয়ের জন্য কি করা যেতে পারে। অনেক বিচার করার পর শেষ পর্যন্ত ঠিক করে নিল 'ঠিক আছে, যখন কোন কিছুই কাজে দেবে না, তাহলে আমি তোমাকে ভাগবত কথা শোনাব, এই ভাগবত কথা শুনেই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে'। এটাও গ্রন্থস্তুতি, যার এত পাপ যে গয়াতে শত পিণ্ড দিলেও মুক্তি হবে না, কিন্তু ভাগবত কথা শোনালে মুক্ত হয়ে যাবে। গোকর্ণতো ভাগবত শোনাবে প্রেতকে, কিন্তু প্রেতকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না, আর ফাঁকা ঘরে ভাগবত কথা কাকে শোনাবে! আমরা এর আগেই বলেছি যে যেখানে ভাগবত কথার প্রবচন হয় সেখানে একজন মুখ্য শ্রোতা থাকতে হবে। তখন ঐ গ্রামেরই একজন ভালো ব্রাহ্মণ ভক্তকে রাজী করিয়ে মুখ্য শ্রোতা করা হল। মুখ্য শ্রোতাকে স্নান করে পবিত্র ভাব নিয়ে আসনে বসতে হবে, কোন নড়া চড়া সে করতে পারবে না। মুখ্য শ্রোতার ভূমিকা ঠিক যজমানের মত। বেদেও নিয়ম আছে, যখন যজ্ঞ যাগ হতো তখন একজন যজমান থাকতো, সেজেগুজে যজ্ঞের ওখানে বসিয়ে দেওয়া হত। বাকীরা আসতে যেতে পারবে কিন্তু যতক্ষণ যজ্ঞ চলবে যজমান ওঠা বসা করতে পারবে না। মুখ্য শ্রোতা ঠিক হয়ে গেল, সাত দিন ধরে ভাগবত কথা হবে। ভাগবত কথার প্রবচনের নিয়ম হল, সাত দিনে ভাগবত কথা শেষ করতে হবে। শুকদেবও সাত দিন ধরে পরীক্ষিৎকে ভাগবত কথা শুনিয়েছিলেন।

ভাগবত শ্রবণের বিধি ও কি কি জিনিষ ব্যর্থ হয়

এবার ধুন্ধুকারী, যে ভূত হয়ে বায়ু শরীর নিয়ে ঘুরছে, তাকেও তো একটা জায়গায় বসে ভাগবত কথা শুনতে হবে। তখন একটা সাত ফোঁকর ওয়ালা বাঁশ নিয়ে আসা হল। বাঁশের ঐ সরু ফোঁকরের মধ্যে ধুন্ধুকারী তার বায়ু শরীরকে কোন রকমে ঢুকিয়ে বসে থাকবে। ভাগবত কথা হবে বলে গ্রাম থেকে অনেক লোকজনও হাজির হয়ে গেছে। এবার গোকর্ণ ধুন্ধুকারীর প্রেতাত্মাকে ভাগবত কথা শোনাতে শুরু করেছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যখন শোনান হল, একদিনের ভাগবত কথা শেষ হতেই দেখা গেল বাঁশের যে গাঁট থাকে সেটার একটা দুম্ করে ফেটে গেল। তখন লোকেরা বলল ঐ বাঁশের মধ্যে তো ভূতটা ঢুকে আছে, তারই একটা গাঁট ফাটলো। সাত দিনের মধ্যে সমগ্র ভাগবত পাঠ করা হয়ে গেল। সাত দিনে বাঁশের সাতটি ফোকর ফেটে গেল

আর ধুন্ধুকারীও প্রেতযোনী থেকে মুক্ত হয়ে একটা দিব্য রূপ পেয়ে গেল। যখন সে মুক্ত হয়ে গেল তখন বৈকুন্ঠ ধাম থেকে দিব্যযান ওকে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। তখন গোকর্ণ বলছে 'আরে! এখানে এতো লোক ভাগবত কথা শুনেছে, মাত্র একটা দিব্যযানে কি হবে, এত লোক যাওয়ার জন্য আরো অনেক দিব্যযানের দরকার'। তখন সেই দূত বলল, একমাত্র ধুন্ধুকারীই এই দিব্যযানে যাবে কারণ একমাত্র ওরই মুক্তি হয়েছে বাকী কারোর মুক্তি হয়নি। ভগবানের সেবকরা খুব সুন্দর বলছেন – *সপ্তরাত্রমুপোষ্যৈব প্রেতেন শ্রবণং কৃতম্। মননাদি তথা তেন স্থিরচিত্তে কৃতং ভৃশম্।।৫/৭২।* এই প্রেত ধুন্ধুকারী সাতদিন উপোস করে শ্রবণ করেছে এবং সে জানে আমার আর কোন গতি নেই তাই ভাগবতের শ্রুত বিষয়গুলি এই প্রেত স্থিরচিত্তে উত্তমরূপে মনন ও নিদিধ্যাসন করেছে। ভাগবত শ্রবণের নিয়ম এখানে বলে দেওয়া হল – মন দিয়ে ভাগবত শুনতে হবে, স্থির চিত্ত হয়ে শ্রবণ করতে হবে, শ্রদ্ধা সহকারে শুনতে হবে আর তার সাথে যদি উপোস করে পবিত্র হয়ে শোনা হয় তবেই ভাগবত কথা শ্রবণের ফল প্রদান করবে। এখানেই কোন একটা জায়গায় এসে বৈধী ভক্তি পরা ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। সবাই সেখানে শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে শুনেছিল কিন্তু স্থির চিত্ত ছিল না। মনন করছিল না, আর উপোসও করেনি। আপাত দৃষ্টিতে ধুন্ধুকারী বিধি পালন করছিল কিন্তু তার মন সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানে নিবদ্ধ ছিল। পরের শ্লোকটি ভাগবতের একটি খুব মূল্যবান শ্লোক, এই শ্লোকে বলছেন কি কি জিনিষ ব্যর্থ হয় – *অদৃঢ়ং চ হতং জ্ঞানং প্রমাদেন হতং শ্রুতম্। সংদিগ্ধো হি হতো মন্ত্রো ব্যগ্রচিত্তো হতো জপঃ।।৫/৭৩।* যে জ্ঞান দৃঢ় হয় না, সেই জ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যায়, অদৃঢ় জ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন ধরুন বাচ্চা বয়সে বলা হল আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। কিন্তু আমার সংশয় আছে, আমি এরপর আগুনে হাত দিতে গেলাম, আমার হাতটা পুড়ে গেল। এবার আমার জ্ঞান দৃঢ় হয়ে গেল, কোন দিন আর আগুনে হাত দিতে যাবো না। আমাদের যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে জ্ঞান, এটা হচ্ছে অদৃঢ় জ্ঞান, সেইজন্য আমাদের ফল দেয় না। যদি মন দিয়ে না শোনা হয় তবে শ্রবণের কোন ফল দেয় না। কথায় বলে শাস্ত্র শুনলে একটা ফল দেয়, কিন্তু মন দিয়ে যদি না শোনা হয়, তাহলে সেই শাস্ত্র শ্রবণের কোন ফল দেয় না। এরপরের কথা হচ্ছে – *প্রমাদেন হতং শ্রুতম্* - প্রমাদ থাকলে ফল দেবে না। প্রমাদ মানে চঞ্চল চিত্ত। মন যদি চঞ্চল থাকে তাহলে শাস্ত্র শোনার কোন ফল দেয় না, কারণ চঞ্চল মন নিয়ে যা কিছুই শ্রবণ করা হয় সেটা কর্ণ কুহরে ধাক্কা মারছে ঠিকই কিন্তু চিত্তে কোন ছাপ পড়ে না। তারপর – *সন্দিগ্ধো হি হতো মন্ত্রো* – মন্ত্র নিলেন গুরুর কাছ থেকে বা বেদ থেকে, কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহ আসছে মন্ত্রটা ঠিক আছে কিনা, মন্ত্রের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ থাকলে সেই মন্ত্র কোন ফল দেবে না। একজন হয়তো একটা সাপের মন্ত্র দিয়ে সর্পদংশিত ব্যক্তির বিষ ছাড়াচ্ছে, এখন তার যদি সন্দেহ হয় কি জানি বাপু এই সব মন্ত্রে কোন কাজ হবে কিনা, তখন ওই মন্ত্রে কোন কাজ হবে না। আর শেষ কথা হচ্ছে – *ব্যগ্রচিত্তো হতো জপঃ*, জপ করার সময় মন যদি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় তাহলে সেই জপে কোন ফল হয় না। *ব্যগ্রচিত্তো* মানে অশান্ত চিত্ত, অশান্ত চিত্তে যদি জপ করে তাহলে সে জপের কোন ফল হয় না। অদৃঢ় জ্ঞান ব্যর্থ হবে, মন দিয়ে না শুনলে শ্রবণ ব্যর্থ, সন্দেহ থাকলে মন্ত্রের ফল হয় না আর চঞ্চল চিত্তে জপ করলে সেই জপ ব্যর্থ হয়, এই চারটে ক্ষেত্রে ফল দেয় না। কিন্তু তার সঙ্গে বলছেন, এই ভাগবত শ্রবণের ফল কিভাবে আসে – প্রথমে বলছেন গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকলে ফল দেবে। দ্বিতীয় অমানী, অর্থাৎ নিজের উপর অহঙ্কার না থাকলে ফল দেবে। তৃতীয় মনের উপর সংযম থাকলে ফল দেবে। চতুর্থ ভাগবত কথা শ্রবণে একাগ্রতা। এই কটি গুণ থাকলে ভাগবত কথা শ্রবণে ফল দেয়। কিন্তু প্রথম যে চারটে জিনিষের কথা বলা হল এই চারটে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য এখানে বাকী যারা ভাগবত শুনেছিল, এরা শ্রবণ করেছিল ঠিকই কিন্তু এই কারণে তারা ফল পাবে না।

প্রথম স্কন্ধঃ

প্রস্থানত্রয় দর্শন

আমরা এবার মূল ভাগবতে প্রবেশ করছি। তার আগে আমাদের দর্শনের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করে নেওয়ার আবশ্যকতা আছে। ভাগবতের কথা শোনা হবে কি হবে না, কিভাবে ঠিক করা হবে? হিন্দুদের মধ্যে যদি কেউ কোন নতুন দর্শন দিতে চান তখন তাঁকে দেখাতে হবে তাঁর নতুন দর্শন দিয়ে এই তিনটে বইকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে। দ্বিতীয় হল, তাঁর নতুন দর্শনের বক্তব্যের সাথে এই তিনটে বইয়ের বক্তব্যের যেন মিল থাকে। এই তিনটে বই হল উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র, তিনটে বইকে একত্রে বলা হয় প্রস্থানত্রয়। কোন বিজ্ঞানী আগামীকাল বিজ্ঞানের নতুন নতুন দর্শন এনে বলে দিল আইনস্টান, নিউটন যা যা বলেছেন এই নতুন তত্ত্ব দিয়ে আমি সব ভুল প্রমাণ করে দিলাম। আমরা কিন্তু এই বিজ্ঞানীর নতুন তত্ত্বকে কখনই মন থেকে মেন নিতে পারবো না। আগের আগের বিজ্ঞানীরা যা বলে গেছেন তার সঙ্গে নতুন তত্ত্বের মিল থাকতে হবে। আমাদের অনেকেরই ভুল ধারণা যে আইনস্টাইন দেখালেন যে নিউটনের থিয়োরী ভুল, কিন্তু তা নয়। আইনস্টাইন তাঁর থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি দিয়ে দেখালেন এই থিয়োরী দিয়ে নিউটনের যত থিয়োরী আছে সব ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়, কিন্তু তার সাথে সাথে আরও কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, যেটা নিউটনের থিয়োরী দিয়ে দেওয়া যায় না। বিজ্ঞানের অনেক কিছুকেই নিউটনের Laws of motion and Laws of gravitation ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু আইনস্টাইনের মডেল দিয়ে সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়। আইনস্টাইনের পরে এসেছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। আইনস্টাইন আবার কোয়ান্টাম মেকানিক্স মানতেই চাইলেন না। কিন্তু দেখা গেল কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিউটনের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে, আইনস্টাইনের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে, আর তার সাথে আরেও অনেক কিছুকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাচ্ছে। এই যে আমরা পৃথিবীর উপর বসে আছি, এটাকে নিউটনের সিদ্ধান্ত দিয়ে খুব সহজে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। কিন্তু যখন বিশাল দূরত্বের ব্যাপার আসবে, যেমন গ্যালাক্সির তারা মণ্ডলে যত তারা আছে, নিউটনের থিয়োরী দিয়ে পরিষ্কার হবে না, সেখানে আবার আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত কাজে আসে। আবার যখন অনুতে চলে যাবে, সেখান নিউটনও কাজে আসবে না, আইনস্টাইনের থিয়োরী দিয়েও পরিষ্কার হবে না। সেগুলো আবার কোয়ন্টাম মেকানিজম্ দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য কোন বিজ্ঞানী যদি বলে আইনস্টাইন, নিউটন যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেগুলো সব ভুল, সব ফেলে দাও, আমি যেটা বলছি সেটা দিয়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে, আমরা বলব – ভাই! আপনি বিজ্ঞানী হতে পারেন কিন্তু আপনার থিয়োরী আপনার কাছেই থাকুক, আমাদের লাগবে না। আপনি আমাদের এমন থিয়োরী দিন যেটা দিয়ে আগের গুলোও ব্যাখ্যা হয়ে যায়।

দর্শনের ক্ষেত্রে যখনই কোন নতুন কিছু নিয়ে আসা হয় তখন সেখানে বলা হয়, আপনার নতুন দর্শন কি এই তিনটে বইকে ব্যাখ্যা করতে পারছে? যদি ব্যাখ্যা করতে না পারে তাহলে আমরা আপনার দর্শনকে মানতে পারছি না। আগামীকাল কেউ যদি বলেন ইসলামের তত্ত্ব দিয়ে উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়, তখন হিন্দুরাই বলবে ইসলামই তো আমাদের ঠিক ঠিক দর্শন। হিন্দুরা কোন আপত্তি করবে না, শুধু এই তিনটে শর্ত। বিজ্ঞানে যেমন কোন নতুন থিয়োরীকে Laws of Motion, Relativity আর Quantum Mechanism এই তিনটেকে ব্যাখ্যা করতে হবে, ঠিক তেমনি দর্শনের ক্ষেত্রে বলা হয় আপনি যে সিদ্ধান্তই নিয়ে আসুন আমি শুনতে রাজী আছি, মানতেও রাজী আছি কিন্তু আপনার সিদ্ধান্ত দিয়ে উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।

উপনিষদের যে তত্ত্বগুলো বিভিন্ন উপনিষদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলোকে গুছিয়ে একটা সুসংবদ্ধ প্রণালীতে একটা দর্শনকে যেখানে রাখা হয়েছে সেটাই ব্রহ্মসূত্র। যার জন্য ব্রহ্মসূত্র খুব কঠিন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র হল *অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা*, আমরা ব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। এটা বলেই বলছেন *জন্মাদ্যস্য যতঃ*, যেখান থেকে জন্ম আদি হয়। জন্ম আদি বললেই সব কিছুকে বোঝায়, যেমন *অস্তি*, মানে একটা জিনিষ আছে, তার জন্ম হয় সেটাকে বলছেন *জায়তে*, তারপর *বর্ধতে* বড় হতে থাকে, *বিপরিণামতে*, পরিবর্তন হয়,

অপক্ষীয়তে, তার ক্ষয় হয় আর শেষে *বিনশ্যতে*, তার বিনাশ হয়। এই সব কিছু ব্রহ্মের মধ্যেই হয়, ব্রহ্মের বাইরে কিছু হয় না।

জন্মাদস্য যতঃ শ্লোকের ব্যাখ্যা

ব্রহ্মসূত্র শুরু হয় এই জন্মাদ্যস্য থেকে। আমরা যে ভাগবত পুরাণের আলোচনা করছি এই ভাগবত পুরাণও ঠিক এই জায়গা থেকেই শুরু হয় – *জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরযঃ। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।১/১/১।।* যাঁর থেকে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, তিনিই এই সমস্ত পদার্থে, সদ্রূপে বিদ্যমান এবং অসৎ পদার্থ থেকে তিনি পৃথক। তিনি জড় রূপে নয় একেবারে চেতনরূপে আছেন, পরতন্ত্র নয়, স্বয়ং প্রকাশ রূপে আছেন, যিনি ব্রহ্মা নন বস্তুত যিনি নিজে সংকল্প মাত্রই ব্রহ্মার নিকটে সেই বেদজ্ঞান প্রকাশ করেছেন, যাঁর তত্ত্ব নিরূপণে জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতেরাও হতবাক্ হয়ে যান, যেমন তেজোময় সূর্য রশ্মিতে জলের, জলেতে স্থলের এবং স্থলেতে জলের ভ্রম হয় তেমনই যাঁর মধ্যে এই ত্রিগুণময়ী জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি রূপ সৃষ্টি মিথ্যা হলেও অধিষ্ঠান সত্তাতে সত্যের ন্যায় প্রতীত হচ্ছেন, নিজের সেই স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতি দ্বারা সর্বদা এবং সর্বতোভাবে মায়া এবং মায়ার কার্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রূপে অবস্থিত পরম সত্যরূপ সেই পরমাত্মাকে আমি ধ্যান করি।

যে কোন দর্শনে বার বার শুধু একটি বিষয়ের উপর প্রচুর প্রশ্ন উঠে আসে, সেটা হল সৃষ্টি সম্বন্ধীয়। আমি কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছি? এই জগৎ কোথা থেকে সৃষ্টি হল? তৈত্তিরীয় উপনিষদে সৃষ্টির উপর একটা নাতিদীর্ঘ আলোচনা আছে। *ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ* – 'হে ভগবন্! আমায় ব্রহ্মের উপদেশ দিন' এই কথা বলে ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণপুত্র পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হলেন। এই জীব জগৎ কোথা থেকে জন্ম নেয়? কোথায় অবস্থান করে আর পরে কোথায় সব কিছু লয় হয়ে যায়? এরপর পুত্রকে পিতা *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি* ইত্যাদি বলে তপস্যায় পাঠিয়ে দিয়ে বিচার করতে বলে দিলেন। পুত্র ভৃগু তপস্যাতে একটা পর একটা বিচার করে চলেছেন। প্রথমে অন্নময়কোষের উপর বিচার করে বুঝলেন *অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, অন্নকেই ব্রহ্ম বলে জানো। মানুষ অন্ন ভক্ষণ করেই বাঁচে, অন্ন ভক্ষণ করেই থাকে আর অন্নতেই শেষ হয়। এটাই মার্ক্সবাদীদের ফিলজফি। কিন্তু সেটাতে ভৃগুর সন্তুষ্টি হলো না। আবার পিতার কাছে ফিরে এলেন। পিতা আবার তাকে তপস্যায় পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে একটার পর একটা প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ বিচার করে করে আনন্দতে গিয়ে শেষে দেখলেন – *আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, আনন্দই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মেই সব জীবের উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মেই বাস করে আর ব্রহ্মেই তাদের লয় হয়। জলের বুদ্বুদ্ যেমন, জলের মধ্যেই উঠছে, জলের মধ্যেই থাকছে আবার জলের মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

উপনিষদের এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে ব্রহ্মসূত্র একই কথা বলছে *জন্মাদস্য যাতঃ*, আবার আচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে একই কথার পুনারাবৃত্তি করে বলছেন ব্রহ্মসূত্র নতুন কিছু বলছে না। ঠিক তেমনি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণও নতুন কিছু বলছে না। উপনিষদে বা ব্রহ্মসূত্রে যে কথা বলা হয়েছে তাকে আবার নতুন করে ভাগবত বলছেন *জন্মাদ্যস্য যতঃ।* এখানে কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে দেওয়া হয়েছে, ব্রহ্ম থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি, ব্রহ্মেই স্থিতি আবার ব্রহ্মেই সব কিছুর লয়। এবার বলা হচ্ছে কোথা থেকে সৃষ্টি হয়নি আর ব্রহ্ম কি নন –

প্রথম হল প্রকৃতি/প্রধান। সাংখ্যে প্রধান শব্দকে প্রকৃতির অর্থে নিয়ে আসা হয়েছে। সাংখ দর্শন মতে সৃষ্টি সব সময় প্রকৃতি থেকে হয়। সাংখ্য মতে যখন বলছে প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হয়, অন্য দিকে বেদান্ত যখন বলবে প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হয় তখন দুটো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা হয়। বেদান্তের মতে প্রকৃতি মানে মায়া। ব্রহ্মই একমাত্র আছেন, সব কিছুই ব্রহ্ম বলা মানে প্রকৃতিকে নেগেট করে দেওয়া হল, কারণ প্রকৃতি আসলে জড়, ব্রহ্ম কখন জড় নন। সাংখ্য মতে সৃষ্টি প্রকৃতির খেলা, পুরুষ শুধু এই খেলা দেখে যাচ্ছে। বেদান্ত বলবে, পুরুষই এই সৃষ্টির মূলে, পুরুষ থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে এত পরিবর্তন কি করে

হচ্ছে? বেদান্ত বলবে, পুরুষ বা ব্রহ্মের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না, এই যা কিছু সৃষ্টি দেখছ এটা পুরুষের উপর মায়ার আবরণ পরে গেছে। এটা পরে আবার আলোচনা করা হবে। শুধু এখানে বলে দিলেন এই যে প্রকৃতি যাকে বলা হচ্ছে এই প্রকৃতি ব্রহ্ম নয়। এখানে সাংখ্য মতকে খণ্ডন করা হল।

দ্বিতীয় হল অনু। অনু থেকেও সৃষ্টি হয় না। বৈশেষিকদের মত হল সৃষ্টি অনু থেকে হয়, অনুতে অনুতে মিশ্রণ হতে হতে এই সৃষ্টি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। যত দিন আইনস্টাইনের থিয়োরী 'জড় আর শক্তি এক' বিজ্ঞান জগতে আসেনি, তত দিন পদার্থ বিজ্ঞানের এটাই থিয়োরী ছিল যে অনু অনুর সঙ্গে সংমিশ্রণ হচ্ছে, সেখান থেকেই এই সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বেদান্ত বলবে — না, এভাবে সৃষ্টি হয় না। আমি যদি বলি, কি করে না বলছেন? এখানে কিন্তু কারুর মাথা ব্যাথা নেই যে আমাকে যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে তত্ত্বটা দাঁড় করিয়ে দেবেন। ব্রহ্মসূত্রে প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা*, আমরা ব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। জন্ম কোথা থেকে হয়? ব্রহ্ম থেকে হয়। এর প্রমাণ কি? প্রমাণ হল উপনিষদ, উপনিষদেই বলছে *আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, ওই আনন্দই ব্রহ্ম। আমি যদি বলি – আপনার কথা আমি মানি না। ঠাকুরকে নরেন বলছেন – আপনার কথা আমি মানি না। ঠাকুর বলছেন – আমার কথা যদি নাই মানিস তাহলে শালা এখানে আসিস কেন? নরেন বলছে – আপনাকে ভালোবাসি বলেই আসি, আর এলে আপনার সব কথাই কি মানতে হবে নাকি! এনারাও এই কথা বলছেন – ভাই তর্ক, যুক্তি দিয়ে তোমাকে জানাতে আমার ভারী বয়ে গেছে। ঠাকুরের কাছে যদি কেউ বেশী তর্ক করতে আসত, ঠাকুর তখন একটু ছুঁয়ে তার তর্কের প্রবৃত্তিটাই নষ্ট করে দিয়ে বলে দিতেন 'নে দ্যাখ্ কি আছে'। বৌদ্ধ ধর্ম উপনিষদ মানে না, বৈজ্ঞানিকরা উপনিষদ মানবে না। এখন কোন যুক্তিবাদী এসে যদি বলে আমি যুক্তি ছাড়া কিছু মানি না, যুক্তি দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে ব্রহ্ম থেকে সব সৃষ্টি।

শঙ্করাচার্যের কাছেও বড় বড় যুক্তিবাদীরা আসতেন। যারা ব্রহ্মকেই মানে না তাদের কি করে বোঝাবেন যে *জন্মাদ্যস্য যতঃ*, ব্রহ্ম থেকেই সব উৎপত্তি! তখন আচার্য শঙ্কর উল্টে তাকে প্রশ্ন করতেন, ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হচ্ছে না, না হয় বুঝলাম কিন্তু সৃষ্টির ব্যাপারে আপনার কি মত সেটা বলুন তো। এরপর সেই যুক্তিবাদী তার নিজের মতটা রাখলেন, এবার আচার্য যুক্তিবাদীর মতকে যুক্তি দিয়ে কুঁচি কুঁচি করে কেটে রেখে বলবেন এই নিন আপনার মত। যুক্তিবাদীর মতকে খণ্ডন করার পর আচার্য নিজের দর্শনকে নিয়ে এগিয়ে যাবেন। কারণ এই ভাবে তর্ক যুক্ত দিয়ে ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হয় এটাকে প্রমাণ করা কখনই সম্ভব নয়। দক্ষিণেশ্বরে যখন হাজরা অনেক উল্টোপাল্টা তর্ক করত তখন ঠাকুর মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন – মা! হাজরা এখানকার মতকে উল্টে দিচ্ছে, ওকে এখান থেকে সরিয়ে দাও। কই ঠাকুর তো নিজে গিয়ে হাজরাকে এখানকার মতটা বোঝাতে চেষ্টা করলেন না। যদি চাইতেন তাহলে ঠাকুর তো হাজরাকে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। ঠাকুর তো হাজরাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন না, ঠাকুর তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত পাল্টাতে চেষ্টা করেননি, বঙ্কিমচন্দ্রের মতকে পাল্টাতে যাননি। ঠাকুর কাকে পাল্টালেন? নরেনকে পাল্টালেন, তাও যুক্তি তর্ক দিয়ে নয়, নরেনকে স্পর্শ করেই নরেনের ভাব পাল্টে দিলেন। কারণ এটাই মূল কথা, এই তত্ত্ব বা দর্শনকে কখনই যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝা যায় না। সেইজন্য যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, তাঁদের নিষেধই করা হয়, যারা যুক্তিবাদী, যারা অবিশ্বাসী, যারা মুর্খ তাদের সাথে কখনই যুক্তিতর্কে নামবে না। যাঁর প্রচুর শাস্ত্র পড়া আছে, তুখোড় বুদ্ধি আছে তাঁরা একটা কাজ করতে পারতেন। যুক্তিবাদীদের বলতে পারেন – ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এটা আপনি মানবে না ঠিক আছে তাহলে আপনার মতটা কি বলুন। তখন তারা যুক্তি দিয়ে তাদের মতকে দাঁড় করাতেই পারবে না, একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে যাবে। বেদান্ত দর্শনকে যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া খুব কঠিন, উল্টে বেদান্তই সবাইকে কেটে উড়িয়ে দেবে।

সাংখ্য বা বৈশেষিকরা বেদকে মানছে, বেদকে যখন মানে তখন উপনিষদের কথাকেও মানতে হবে। যখন ব্রহ্মসূত্রে *অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা* আসে তখন এরা দুজন বলতে পারবে না যে আমরা উপনিষদকে মানতে পারছি না। সেইজন্য এরা ব্যাখ্যাটা অন্য ভাবে করে। আচার্য শঙ্কর তখন আবার দেখিয়ে দেবেন যে এদের

ব্যাখ্যাটা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা যেমন এখানে বলছি *আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, কিন্তু সাংখ্য সেখানে অন্য কোন মন্ত্র নিয়ে আসে। তখন বেদান্ত আবার দেখিয়ে দেবে, তুমি যে মন্ত্রটা এখানে নিয়ে এসেছ আসলে ওই মন্ত্রের ব্যাখ্যাটা এই রকম হয়। সেইজন্য খুব তুখোড় ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে বেদান্ত অধ্যয়ন করা যায় না। আমরা খুব সহজে কঠোপনিষদ, গীতা অধ্যয়ন করে যাচ্ছি, আর মনে করছি সব অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু এই পরিষ্কারে কিছুই হবে না, যখনই কোন বিরুদ্ধ মত নিয়ে আক্রমণ করবে তখন আমরা কোথায় ছিটকে পড়ব বোঝাই যাবে না। একমাত্র আচার্য শঙ্করই ভারতের যত দর্শন ছিল সব কটাকে যুক্তি তর্কে একেবারে শেষ করে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তোমার কোথায় কোথায় ভুল। এইভাবে বৈশেষিকদের যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন অনু থেকে সৃষ্টি হতে পারেনা।

তৃতীয় হল অভাব/শূন্য। অভাব বা শূন্য থেকে কখনই সৃষ্টি হয় না। এই যুক্তি দিয়ে বৌদ্ধ মতকে খণ্ডন করা হল। বৌদ্ধদের যেটা শূন্য, বেদান্তে তাকেই বলে অভাব। বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিকদের বিশাল পাণ্ডিত্য ছিল, বিদ্বানের শিরোমণি ছিলেন। তাঁদের বিদ্যা আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি দিয়ে বিচার করতে করতে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছালেন যেখানে বলছেন নির্বাণ মানে শূন্য, সেখানে আর কিছুই নেই। যদি বলা হয়, আপনার শেষ অবস্থা যদি শূন্য হয় তাহলে আপনার প্রথম অবস্থা কি হবে? তার উত্তর শূন্যই হতে হবে, তাহলে সৃষ্টি শূন্য থেকেই হয়েছে। এবার আচার্য তর্ক দিয়ে দেখাবেন সৃষ্টি কখন শূন্য থেকে হতে পারে না। এখানে রীতিমত তর্কই করবেন। কিন্তু অতি বিদ্বান পণ্ডিত বৌদ্ধ সাধুরা যে শূন্যবাদ নিয়ে এসেছিলেন তখন তাঁরাও যুক্তি দিয়েই দাঁড় করিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি যখন শুনবো তখন সত্যিই মনে হবে সৃষ্টিটা শূন্য থেকেই এসেছে। আবার আচার্য শঙ্করের ভাষ্য যখন শুনবো তখন মনে হবে সৃষ্টি তো কখন শূন্য থেকে হতেই পারে না।

চতুর্থ হল হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ কিছুটা ব্রহ্মার মত, প্রকৃতির এলাকায় হিরণ্যগর্ভের অবস্থান। তাই ব্রহ্মা কখনই শেষ কথা হতে পারে না, মাঝামাঝারি কোন একটা জায়গায় হবেন। পঞ্চম হল স্বতঃস্ফুর্ত। আরেকটি মত হল সৃষ্টি নিজে থেকেই হচ্ছে, এটাই স্বতঃস্ফুর্ত। ভাগবতের *জন্মাদ্যস্য যতঃ* শ্লোকে এই পাঁচটা জিনিষকে নাকোচ করে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্ম থেকেই সব সৃষ্টি আর এই পাঁচটা জিনিষ ব্রহ্মের সঙ্গে মিল খায় না। এরপর যত রকমের যুক্তিতর্ক আসুক না কেন, সবটাই এই পাঁচটার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়টি আসলে মঙ্গলাচরণ। মঙ্গলাচরণের ব্রহ্ম শব্দটা নিয়ে আসা হচ্ছে না, বলছেন *জন্মাদ্যস্য যতঃ*, যেখান থেকে সব কিছু বেরিয়েছে। যত পদার্থ আছে সব কিছুর মধ্যে তিনিই আছেন। কিভাবে আছেন? সদ্রূপে বিরাজমান। অস্তি, এই গ্লাশটা আছে, এই যে আছে বলা হচ্ছে এটাই সৎ, তিনি আছেন এটাই সদ্রূপে বিরাজ। আর যত কিছু অসৎ পদার্থ আছে তার থেকে তিনি বিলক্ষণ পৃথক। অসৎ পদার্থ মানে, যেমন আকাশ কুসুম। আকাশ কুসুম বলে কিছু নেই, বন্ধ্যা পুত্র বলে কোন কিছু হয় না। এগুলো আমাদের মনের কল্পনা মাত্র, এর সাথে ব্রহ্মের কোন সম্পর্ক নেই। ব্রহ্ম কখনই জড় নন। যেমন এই গ্লাশটা জড় পদার্থ কিন্তু এটা আছে, তাই গ্লাশের দুটো সত্তা, একটা তার জড় আরেকটি আছে, অস্তি রূপে গ্লাশের একটা সত্তা আছে। এই যে অস্তি সত্তা, এটাই ঈশ্বর। কিন্তু গ্লাশ রূপে তা নয়, গ্লাশটা জড় পদার্থ। আমি যেটা আছি, আমি অমুক, আমার একটা জড় সত্তা আছে আবার আমার একটা চেতন সত্তা আছে। আমি যদি মারা যাই তখন আমার এই জড় দেহটা থেকে চেতন সত্তাটা বেরিয়ে যাবে। এই চেতন সত্তা যেটা সেটাই তিনি। তিনি কোন অবস্থাতেই পরাধীন হন না, আর তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। ঈশ্বরকে কোন আলো দিয়ে দেখা যায় না, কারণ তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। এখানে আলো জ্বলছে বলে আমরা পরস্পরকে দেখছি। ভগবানকে দেখার জন্য কোন আলোর প্রয়োজন হয় না। *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*, তিনি ব্রহ্মা নন, তিনি হিরণ্যগর্ভ নন। এখানে এই দুটোকে পরিষ্কার না করে দেওয়া হচ্ছে।

হিরণ্য মানে সোনা, হিরণ্যগর্ভ মানে সোনার ডিম। বলা হয় সৃষ্টির পূর্বে একটা সোনার ডিমের মধ্যে সব কিছু বীজাকারে থাকে, যখন সৃষ্টি হয় তখন ওই সোনার ডিম থেকে সব কিছু বেরিয়ে আসে। এই হিরণ্যগর্ভ থেকে প্রথম যিনি বেরিয়ে আসেন তিনি হলেন ব্রহ্মা। সৃষ্টি কিন্তু এই ব্রহ্মা থেকেও হয় না, সৃষ্টি

হিরণ্যগর্ভ থেকেও হয় না। তারও আগে থেকেই সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাহলে তিনি কে? তাঁকে আমরা ভগবান বিষ্ণুও বলতে পারি, ভগবান নারায়ণ বলতে পারি, ব্রহ্মণ বলতে পারি, কিন্তু যা কিছুই বলি না কেন, আমরা ব্রহ্মা বলতে যেভাবে বুঝি সেই ব্রহ্মা যখন প্রকটিত হন তখন তিনি সেই মায়ার রাজ্যেই এসে প্রকটিত হচ্ছেন। তন্ত্রেও ঠিক এই কথা বলে – ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজনই শক্তির এলাকায় অবস্থিত। ঠাকুরও বলছেন অবতারও মায়ার আণ্ডারে। যিনি এই শক্তির বাইরে, মায়ার রাজ্যের বাইরে যাঁর অবস্থান, প্রকৃতির এলাকার বাইরে যিনি আছেন, তিনিই জন্মাদির কারণ। তিনি আর কি করেন? ব্রহ্মার কাছে তিনি সঙ্কল্প মাত্র বেদজ্ঞান প্রকাশ করেছেন। কোন কিছু জানতে হলে আমাদের কত কিছু পড়তে হয়, শুনতে হয় কিন্তু তাঁকে এসব কিছু করতে হয় না, তিনি শুধু সঙ্কল্প করলেন আমি তোমাকে এই জ্ঞান দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞান তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। ঠাকুর যেমন ইচ্ছা প্রকাশ করছেন এর জ্ঞান হোক, সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, ঠাকুর কাউকে একটু ছুঁয়ে দিলেন তাতেই তার সব জ্ঞান দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপর বলছেন যিনি সব কিছুর আধার, যিনি স্বয়ংপ্রকাশ আমরা সেই পরমাত্মার ধ্যান করি। এই হল শ্রীমদ্ভাগবতের *জন্মাদ্যস্য যতঃ* শ্লোকের ব্যাখ্যা।

সূত কর্তৃক জ্ঞানীপ্রবর যোগীবর শুকদেবের স্তুতি

শৌনাকাদি ঋষিরা একবার নৈমিষারণ্যে এক হাজার বছরের একটা বিরাট যজ্ঞ করছিলেন। এখন এক হাজারের বছরের যদি যজ্ঞ হয় অত দিন ঋষিরা বেঁচে থাকবেন কি করে! এখানে প্রথমেই দেখিয়ে দেওয়া হল, পুরাণের অনেক কিছু অতিরঞ্জিত ভাবে বলা হয়। সবটাই যে মিথ্যা তা নয়, কিন্তু কিছু মশলা মেশানো আছে। ঋষিরা তখন একজন খুব নামকরা সূত উগ্রশ্রবাকে বললেন 'আপনি আমাদের কিছু পৌরাণিক কথা বলুন'। উগ্রশ্রবার বাবার নাম রোমহর্ষণ, তিনিও খুব নামকরা সূত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বাবা আর ক্ষত্রিয়ের মায়ের থেকে যাদের জন্ম হত তাদের সূত বলা হত। এগুলো আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। তখন থেকেই অসবর্ণের বিবাহের প্রথা চলে আসছে, এটা আজকের নতুন কিছু প্রথা নয়। সূতরা যজ্ঞ করাবার অধিকার পেতেন না, কিন্তু পুরাণ কথা পাঠ করার অধিকার পেতেন। ঋষিদের অনুরোধে উগ্রশ্রবা খুব আনন্দিত হলেন।

ঋষিদের কাছে উগ্রশ্রবা এই কাহিনী বলছেন। শুকদেব কত মহৎ পুরুষ ছিলেন বোঝাবার জন্য বলছেন – শুকদেবের তখনও যজ্ঞ উপবীত সংস্কার হয়নি, অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক কোন কর্মের অধিকার তখনও তিনি পাননি। কিন্তু জন্ম থেকেই তিনি জ্ঞানী। জন্ম থেকেই জ্ঞানী হওয়ার জন্য সংসারের সারমর্ম তাঁর অবগত। শুকদেব জন্ম নিয়ে তাই একাই সন্ন্যাস নেওয়ার উদ্দেশ্য ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন। পুত্রকে সংসার থেকে বিমুখ হয়ে পালিয়ে যেতে দেখে ব্যাসদেব পুত্রের প্রতি মোহ বশতঃ পুত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য পেছনে পেছনে হে পুত্র! হে পুত্র! বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে ডাকতে চলেছেন। কিন্তু পুত্রকে তিনি আর খুঁজে পেলেন না। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পথের ধারে একটা সরোবরে মেয়েরা বস্ত্রহীন হয়ে অবগাহন করছিল। ব্যাসদেবকে দেখেই সঙ্কোচে সন্ত্রস্ত হয়ে সবাই নিজেদের বস্ত্র দিয়ে শরীরকে আচ্ছাদিত করে নিল। ব্যাসদেব ললনাদের কাণ্ড দেখে খুব অবাক হয়ে বলছেন – কিছুক্ষণ আগে এই রাস্তা দিয়েই আমার যুবা সন্তান শুকদেব চলে গেল তখন তোমাদের কোন সঙ্কোচ উৎপন্ন হল না, আর আমার মত একজন বৃদ্ধকে দেখে তোমরা সবাই সঙ্কোচিত চিত্তে লজ্জা নিবারণে তৎপরে হয়ে উঠেছ! মেয়েরা বলছে, হে ঋষিবর! আপনার মধ্যে এখনও নারী পুরুষ ভেদ জ্ঞান আছে কিন্তু আপনার পুত্রের মধ্যে এই ভেদ বুদ্ধি নেই। শুকদেব জন্ম থেকে জ্ঞানী হওয়াতে সংসারে কোথাও তার ভেদ বুদ্ধি ছিল না।

সমস্ত ধর্ম-কর্মের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণে পরা ভক্তি লাভ

উগ্রশ্রবা বলছেন – সেই জ্ঞানী প্রবর শুকদেব পরীক্ষিৎকে এই ভাগবত কথা শুনিয়েছিলেন। আমি সেই সর্বভূতহৃদয় শুকদেবকে নমস্কার করছি। আপনারা যে সমগ্র জগতের কল্যাণকারী অতি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এটা খুবই আনন্দের কথা। কারণ এই প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিভাব উদয় হলে আত্মশুদ্ধি হয়। *বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্।।১/২/৭।* যার

মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চলে গেছে, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যার ভক্তি জন্মেছে, স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে নিষ্কাম জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হবেই। আমরা এর আগেও আলোচনা করেছিলাম ভক্তি দুই প্রকার, বৈধী ভক্তি ও পরা ভক্তি। বৈধী ভক্তি মানে নানান রকমের বিধি পালন করা আর পরা ভক্তি মানে সমস্ত বিধিকে অতিক্রম করে যাওয়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করা মানেই পরা ভক্তি। যাঁর পরা ভক্তি আছে তাঁর তো জ্ঞান বৈরাগ্য হবেই। কারণ শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি এক। আর পরা ভক্তি হওয়া মানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর কাছে জগৎ আপনা থেকে খসে পড়ে যাবে। যার মনে একবার ভগবানের প্রতি ভালোবাসার উদয় হবে তার আর জগতের প্রতি কি আকর্ষণ থাকবে! জগতের প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকাটাই বৈরাগ্য।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।। ১/২/৮। যাঁরাই ধর্মের অনুষ্ঠান করছেন, ধর্মের অনুষ্ঠান করা মানে বিভিন্ন রকমের উপাচার পালন করা, মন্দিরে যাওয়া, সন্ধ্যা-আরতি করা, তীর্থ করা, একাদশী ব্রত করা, এগুলো সবই ধর্মের অনুষ্ঠান, ধর্মের অনুষ্ঠান পালন করার পর তাঁর যদি ভগবানের লীলাকথার প্রতি অনুরাগ না জন্মায় তাহলে এই সমস্ত কর্মই *শ্রম এব হি কেবলম্*, বৃথা শ্রম মাত্রে পর্যবসিত হয়। তাহলে কি এই ধর্মানুষ্ঠান না করাই ভালো ছিল? কখনই না, তা কখনই বলবেন না। কিন্তু তুমি এতদিন ধরে যে এত পরিশ্রম করলে, এরপর তোমার যদি ভগবানের লীলাকথার প্রতি অনুরাগ না জন্মায় তাহলে এই পরিশ্রমটা বৃথা হয়ে গেল, যদি ভগবানের প্রতি ভক্তিভাবের আবির্ভাব হত তাহলে এই পরিশ্রমটা সার্থক হত। ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ভগবানের প্রতি ভক্তি ভাব জাগ্রত করা।

আপনি রোজ ধর্ম কর্ম করে যাচ্ছেন, রোজ গঙ্গা স্নান করছেন, মন্দিরে নিয়মিত পূজা দিয়ে যাচ্ছেন, জপ ধ্যান রোজ করছেন, অথচ ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করার কোন আগ্রহই নেই। তখন, আপনার সমস্ত ধর্ম-কর্ম ভস্মে ঘি ঢালার মত হয়ে যাবে। যজ্ঞের সময় ঘিকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, কিন্তু যদি আগেই ভষ্মে ঘি ঢেলে দেন তাহলে কোন লাভ হবে না। আজকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, উপনিষদ, ভাগবত পড়ান হয়, অনেকই তো পড়ছে আর এগুলো পড়ে কোন ছাত্রের ইচ্ছে হচ্ছে কি – আহা প্রভুর কথা আরেকটু শুনি। এই ইচ্ছে তো হচ্ছে না। তাহলে কি হল? শুধু বৃথা পরিশ্রম। ধর্মের ফল হচ্ছে মোক্ষ। ধর্মের ফল অর্থপ্রাপ্তির জন্য নয়, ধর্মের ফল ভোগবিলাসের জন্য নয়। অনেকে বলেন আমার সন্তান নেই, আমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করব। বেদও তাই করতে বলছে, তোমার শত্রুর নাশ চাও, তুমি সম্পদ চাও তাহলে এই এই যজ্ঞ কর। বর্তমান যুগে কি বলছে? পরীক্ষায় পাশ করতে চাও? ঠাকুরের কাছে মানত কর। তুমি কোন জিনিষ চাইছ? ঠাকুরের কাছে চাও। ভাগবত বলছে – না না, এ জিনিষ কখনই করতে নেই। কেন করতে নেই? বলছেন – ঠিক ঠিক ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হচ্ছে শুধু তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।

মহাভারতের পুরুষার্থ ও ভাগবতের পুরুষার্থের পার্থক্য

ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।।১/২/৯। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনুষ্য জীবনের চারটি পুরুষার্থ – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। মহাভারতে এই চারটেকেই স্বতন্ত্র রূপে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে অর্থ আর কাম ইহজগতের পুরুষার্থ, ধর্ম হল মৃত্যুর পরের ভোগ। আর মোক্ষ হল জীবন-মৃত্যুর পারে। এই হল চারটে পুরুষার্থ সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রের মত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে এসে পুরুষার্থের এই দর্শনটা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এখানে বলছেন অর্থের উদ্দেশ্য হল ধর্ম আর ধর্মের উদ্দেশ্য মোক্ষ। এখানে চারটে পুরুষার্থের মধ্যে তিনটে পুরুষার্থকে একটার সাথে আরেকটাকে যোগ করে দেওয়া হল। অর্থ হল ধর্মপ্রাপ্তির জন্য, ধর্ম হল মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য। আর কাম ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য নয়, কাম হল কেবল মাত্র জীবননির্বাহের জন্য। জীবননির্বাহের উদ্দেশ্য হল তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া। ঠাকুর যে বার বার বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, ঠাকুরের এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত থেকে এসেছে। ঈশ্বর লাভ আর মোক্ষ লাভ একই জিনিষ। যে কোন কাম, আমার শাড়ি চাই, আমার ভালো গাড়ি চাই, আমার বাড়ি চাই, এই সব কিছু হল জীবন চালানোর জন্য। জীবন ধারণটা কেন? জীবন ধারণের উদ্দেশ্য

হল তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে জানাটাই জীবনের উদ্দেশ্য। আর অন্য দিকে অর্থের উদ্দেশ্য হল ধর্ম এবং ধর্মের উদ্দেশ্য মোক্ষ। মোক্ষ মানে ভাগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ।

তাহলে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, মশাই আপনি যে এত টাকা জমিয়ে যাচ্ছেন, এত টাকা না জমিয়ে একটা বাড়ি করুন। সব শুনে তিনি একটা বড় বাড়ি করলেন, বড় বাড়ি করা মানেই একটা ভোগের উপকরণ। এখন বড় বাড়ি করে কি তাঁর ভগবান লাভ হবে? তত্ত্ব জিজ্ঞাসাতে কি কোন লাভ হবে? কোন লাভ হবে না। তাহলে বাড়ি করার ইচ্ছা মন থেকে ফেলে দিতে হবে। ফেলে দিয়ে এবার আমি একটা ছোট্ট সামান্য কুঁড়ে ঘরে থাকছি। এতে কি এবার আমার ঈশ্বর লাভ হবে? কখনই হবে না। কেন হবে না? কুঁড়ে ঘরে এদিক ওদিক দিয়ে সাপ বিছে ঢুকছে, বৃষ্টি হলে ঘরের মধ্যে জল পড়ছে। জপ করতে বসলে মাথার মধ্যে চিন্তা ঘুরছে ঘরের মধ্যে সাপ বিছে না ঢুকে পড়ে, বৃষ্টি হলে চিন্তা জল পড়া কি করে আটকাব, এরপর আর কি ঈশ্বর লাভ হবে! জপই করতে পারছি না! তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কি করে হবে! তার মানে, কাম আমাকে পালন করতেই হবে, তা নাহলে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করতে পারবে না।

বলরাম বাবু একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখেন ঠাকুর ছারপোকা মারছেন। ছারপোকা মারার জন্যই কি অবতারের আগমন! রাম অবতারে রাবণ বধ করেছিলেন, কৃষ্ণ অবতারে কংস বধ করেছিলেন আর রামকৃষ্ণ অবতারে ছারপোকা নিধণ হয়েছিল। এই কথা বললে লোকে ভাববেটা কি! এটা কি কোন অবতারের কাজ হল! কিন্তু তা নয়, ঠাকুর দেখাচ্ছেন এই ছারপোকা যদি তোমার বিছানায় থাকে তাহলে তোমার রাতের ঘুম বিঘ্ন হবে, রাতে ঘুম না হলে তোমার শরীরের যা অবস্থা হবে সেই শরীর দিয়ে আর ধ্যান করা হবে না। কামের উদ্দেশ্য হল এই বিঘ্নগুলোকে দূর করা। যাদের সামর্থ আছে তারা এই অর্থকে ধীরে ধীরে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার দিকে নিয়ে যাবে। কামের ভোগ যদি করতে হয় তাহলে তাকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু অর্থ হল ধর্মের জন্য। ঠাকুর বলছেন – টাকা দিয়ে কি হয়! নিজের একটু ডাল ভাত হয় আর সাধু সেবা হয়। সাধু সেবা মানেই ধর্ম। সাধুদের ভরণ-পোষণ, ঠাকুর-দেবতার সেবা এগুলো গৃহস্থদের দিয়ে হয়, সেইজন্য গৃহস্থকে কখনই বলা হয় না যে তুমি টাকা-পয়সা উপার্জন করবে না। কিন্তু শুধু জমিয়ে রাখার জন্যও উপার্জন করতে বলা হচ্ছে না, এই অর্থ দিয়ে তুমি ধর্ম প্রাপ্তি করবে। ধর্ম প্রাপ্তি কেন? মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য। ঘুরিয়ে দুদিক থেকেই বলা হচ্ছে, তুমি যেটাই করবে তোমার উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বর লাভ। ঠাকুর খুব সহজ করে বলে দিলেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। তোমার যে অর্থ সেটাও ওই দিকে যাবে, তোমার যে কাম সেটাও ওই দিকে যাবে আর তোমার যে ধর্ম সেটাও ঈশ্বরের দিকে যাবে। মহাভারত থেকে শ্রীমদ্ভাগবতে এসে এই চারটি পুরুষার্থের দর্শন তাই পাল্টে যায়।

অদ্বয় জ্ঞান লাভের উপায় এবং ভগবৎ কথা ও ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য

তত্ত্ব জিজ্ঞাসার তত্ত্বটা কি বোঝাতে গিয়ে বলছেন – *বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।১/২/১১।* বলছেন তত্ত্ববেত্তাগণ জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়ের অভেদ অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ জ্ঞানকে তত্ত্ব বলে থাকেন। অর্থাৎ তত্ত্ব মানে অদ্বয় জ্ঞান। অদ্বৈত জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, আমি ও তুমির ভেদ চলে যায়। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*, অদ্বয় জ্ঞান = অদ্বৈত জ্ঞান = ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্মার জ্ঞান বা ভগবান লাভ। সেইজন্য ঈশ্বরদর্শন আর ব্রহ্মজ্ঞান এই দুটো আলাদা নয়। এই তত্ত্বজ্ঞান মানুষ কিভাবে পায়? *তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া।।১/২/১২।* শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন শ্রদ্ধাবান পুরুষ যাঁরা, যাঁরা জ্ঞান আর বৈরাগ্য সম্পন্ন তাঁরা নিজেদের হৃদয়েই সেই পরমাত্মস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করেন। বাইরে কোথাও দর্শন করেন না, নিজের শুদ্ধ হৃদয়েই সেই আত্মার দর্শন করেন। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য তিনটে গুণ থাকতে হবে – প্রথমটা হল শ্রদ্ধা। দ্বিতীয় ভাগবত শ্রবণ, ভাগবত শ্রবণ মানে ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করা। ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হবে। তৃতীয় হল ভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ। তাহলে পুরোটা এইভাবে বলা যায় – শ্রদ্ধাবান পুরুষ ভাগবত শ্রবণ করে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি সহকারে নিজের হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তাহলে

প্রথম হল শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভাগবত কথা পাঠ ও শ্রবণ। যে কোন ঈশ্বরীয় কথাকেই ভাগবত কথা বলা হয়। এটাই পরের দিকে পুরো ভারতে সবাই ধারণা করে নিল এখানে যখন ভাগবত কথা বলেছে তার মানে শ্রীমদ্ভাগবত কথাই পাঠ ও শ্রবণ করতে হবে, কিন্তু তা নয়, যে কোন ঈশ্বরীয় কথাই ভাগবত কথা। আর শেষে ভক্তি থাকা চাই। এই ভক্তি কি রকম হবে? জ্ঞানবৈরাগ্য পূর্ণ। ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু এটাই জ্ঞান। বৈরাগ্য মানে, সংসার আর জগতের কোন কিছুর দিকে তার মনে নেই। এই কটি হলে তখন পরমাত্মার দর্শন হয়, ঠাকুর বলছেন বোধে বোধ করেন।

বলছেন *বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরাঃ মখাঃ। বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেপরাঃ ক্রিয়াঃ।। বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।।১/২/২৮-২৯।* ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন। *বাসুদেবপরা বেদা*, বেদের তাৎপর্য হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পুরো বেদ একটা দিকেই ইঙ্গিত করছে, ভগবানের দিকে। যজ্ঞের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ। যত যোগাদি করা হয় তাও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয়, যত রকমের ক্রিয়াদি হয় সবই শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করা হয়। জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্যই সমস্ত রকমের তপস্যা করা হয়। সমস্ত ধর্মের অনুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণের জন্যই পালন করা হয় আর যত রকমের গতি আছে সব শ্রীকৃষ্ণে গিয়েই সমাপ্ত হয়ে যায়। তার মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই শেষ কথা। আর যত পথ আছে, ধর্মের যত কথা আছে সব কিছুর লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে তাঁর দিকে নিয়ে যাওয়া।

ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা

ভাগবত পুরাণের এখান থেকেই বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা শুরু হয়। সূত বলছেন – *জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবন্মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।।১/৩/১।* সৃষ্টির পূর্বে ভগবানের ইচ্ছা হল আমি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ আদি লোকসমূহ সৃষ্টি করব। এই ইচ্ছা হওয়া মাত্রই যিনি নির্গুণ নিরাকার ছিলেন তিনি সগুণ সাকার হলেন। সগুণ সাকার হয়ে তিনি মহৎ তত্ত্বাদির সৃষ্টি করে তার সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদি ষোলটি কলা সম্পন্ন দেহ ধারণ করলেন। ষোলটি কলা হল – দশ ইন্দ্রিয়, এক মন আর পঞ্চ ভূত (ক্ষিতি, অপঃ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)। সৃষ্টি যখন হয় তখন সেই সৃষ্টি তিনটি অবস্থায় থাকে – স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এই যে জগৎ দেখছি এটি স্থূল, মনের গতি হল সূক্ষ্ম আর কারণ হল সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম। এই কারণের পেছনে আছে মহাকারণ। মহাকারণই নির্গুণ নিরাকার। যখন সৃষ্টি হয় তখন তিনি কারণ রূপ ধারণ করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে যেখানে বলছেন *আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, আনন্দই ব্রহ্ম, সেই আনন্দময়কোষই কারণ।

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ।।১/৩/২। তিনি তখন কারণরূপী সলিলে শায়িত হয়ে যোগনিদ্রার বিস্তার করলেন। অনেক জায়গায় ছবিতে দেখা যায় ভগবান বিষ্ণু ক্ষীরসাগরে অনন্তনাগের উপর শয়ন করে আছেন। এখানে যে জল বলছেন তা এই জল নয়, এই জলকে বলা হয় কারণরূপী জল। প্রথমে যখন সৃষ্টি হয় তখন একমাত্র কারণই আছে, কারণ ছাড়া আর কিছু নেই। কারণ মানে যেখানে শুধু আনন্দরূপে ভাসমান হয়ে আছেন। পাঁচটি কোষ নিয়ে আমাদের এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর গঠিত। পরমাত্মার উপর যেন এই পাঁচটি আবরণ দেওয়া আছে। এই পাঁচটি কোষ হল অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আর আনন্দময়। অন্নময় আর প্রাণময় এই দুটো স্থূলের মধ্যে, মনোময় আর বিজ্ঞানময় সূক্ষ্মের মধ্যে আর আনন্দময় কারণ শরীরের মধ্যে পড়ে। একমাত্র এই কারণই তখন ছিল। ওই শুদ্ধ আনন্দকে অবলম্বন করে তিনি পুরুষ রূপে দেহ ধারণ করেছেন। এই পুরুষ আমাদের নারী-পুরুষের পুরুষ নয়, এখানে তিনি মানব রূপ ধারণ করেছেন। এই পুরুষ হলেন আদি পুরুষ। এখানে আবার ব্রহ্মার জন্মের কথা বলা হচ্ছে। সেই আদি পুরুষের নাভি থেকে এক পদ্মের সৃষ্টি হল এবং সেই কমল থেকে প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন। ব্রহ্মার জন্মের ঠিক আগে আছেন ভগবান নারায়ণ, তিনি সগুণ সাকার কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য কি?

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্।।১/৩/৩। তাঁর সেই সাকার রূপের মধ্যেই সমস্ত লোকের কল্পনা করা হয়েছে আর তাঁর সেই রূপ একেবারে বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় সত্ত্বময় শ্রেষ্ঠ রূপ। *পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্। সহস্রমূর্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ।।১/৩/৪।* এখানে বলছেন যোগীরা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ভগবানের সেই রূপ দর্শন করতে সক্ষম। বিজ্ঞানের পদার্থ, রসায়ন দিয়ে কেউ যদি ভগবানকে দর্শন করতে চায় তাহলে সে কখনই ভগবানকে জানতে পারবে না। তাহলে তো বিজ্ঞান বলে দেবে ভগবান বলে কিছু নেই। কিন্তু না, তিনি এখনও আছেন, তিনি যদি ওই ভাবে শয়ন না করে থাকেন তাহলে সৃষ্টি থাকবে না। এই সৃষ্টি কে করেছেন? ব্রহ্মা সব সৃষ্টি করেছেন। সেই ব্রহ্মা আবার কোথায় বসে আছেন? ভগবানের সেই নাভি কমলে ব্রহ্মা বসে আছেন। নাভি হল এখানে যে কোন কিছুর কেন্দ্রস্থলের প্রতীক। ভগবানের একেবারে কেন্দ্রে বসে আছেন। সেই ভগবানের অসংখ্য পদ, ঊরু, হস্ত ও মুখ। একদিকে ভগবানের পুরুষ রূপ বলা হয়েছে আবার বলছেন তাঁর অসংখ্য পদ, ঊরু, হস্ত ও মুখ। বেদের পুরুষসূক্তমে ঠিক এই বর্ণনাই আমরা পাই, যেখানে বলা হচ্ছে – *সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ*। বেদের সাথে ভাগবতের এখানে সমন্বয় করা হয়েছে।

ভগবানের দুটো রূপ, একটা নির্গুণ নিরাকার আরেকটি সগুণ সাকার। ভগবানের সগুণ সাকার রূপটাই পুরুষ রূপ, এই পুরুষ রূপকেই বলছেন ভগবান নারায়ণ। নারায়ণ মানেই তিনি ভগবান। তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তিনিই নির্গুণ নিরাকার তিনিই সগুণ সাকার। তিনি কোন সময় হঠাৎ কারণ সলিলের সৃষ্টি করেন। কারণ মানে আনন্দময়, সলিল মানে জল। তাহলে আনন্দময় জল মানেটা কি? অনেক কিছু বোঝা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সেই আনন্দময় সলিলে অশেষনাগের উপর তিনি শায়িত। অশেষ মানে অনন্ত। আর সেই শায়িত অবস্থায় তিনি যোগনিদ্রার বিস্তার করছেন। নিদ্রা মানে তমস, কিন্তু ভগবানের এই নিদ্রা তমস নয়, এই নিদ্রাকে বলছেন যোগনিদ্রা। যোগনিদ্রা যেন যোগেরই একটা তমস ভাব বা মায়া। এই মায়াকে যখন তিনি বিস্তার করে দিচ্ছেন তখন সেখান থেকে হঠাৎ একটা পদ্মফুল যেন প্রস্ফুটিত হল। সেই প্রস্ফুটিত পদ্মে এবার ব্রহ্মা জন্ম নিলেন।

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্যঙনরাদয়ঃ।।১/৩/৫। ভগবান নারায়ণ তিনি হলেন অবতারদের অক্ষয় কোশ। আর এই ভগবান নারায়ণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ থেকে দেবতা, পশু, পাখি ও মনুষ্যাদি দেহের সৃষ্টি হয়। ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন আমাকে কি মনে হয়? কলা না অংশ। অংশ হলে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হতে পারে। অন্য দিকে কলা মানে ষোলটি কলা, তাই কলা বললে ষোলর এক ভাগের নীচে যাবে না। কলা তাই সব সময় অংশ থেকে বড় হবে। অংশ বললে যে কোন ভাগ হতে পারে, শতকার এক ভাগ হতে পারে, পয়েন্ট এক ভাগ হতে পারে, পয়েন্ট শূন্য শূন্য এক হতে পারে। কিন্তু কলা কখনই ষোল ভাগের এক ভাগের নীচে যাবে না। পূর্ণ অবতার মানে ভগবান স্বয়ং নিজে অবতরণ করেছেন। আবার এর থেকে বড় দেখাবার জন্য 'অবতারী' আরেকটা শব্দ নিয়ে আসা হয়। অবতারী মানে যাঁর ইচ্ছাতে অবতাররা অবতরণ করে দেহ ধারণ করেন। এখানে অবতারের আবার অনেক শ্রেণীভাগ করা হয়েছে – পূর্ণ অবতার, অংশ অবতার, কলা অবতার ইত্যাদি। অংশ অবতার মানে তাঁর শক্তি অনেক কম। পূর্ণ শক্তির অবতারকে আবার আলাদা দেখাবার জন্য বলছেন *কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং*। আবার অন্য অবতারদের থেকেও শক্তিশালী দেখাবার জন্য বলা হয় অবতারী। গীতার ভাষ্যেও আচার্য শঙ্কর অবতার তত্ত্বকে স্বীকার করেছেন।

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাস্থিতঃ। চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্যমখণ্ডিতম্।।১/৩/৬। সেই প্রভু প্রথমে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারজন ব্রাহ্মণ রূপে অবতার গ্রহণ করে অত্যন্ত কঠিন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেন। ভাগবতের এই পর্বে এখান থেকে পর পর ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা করা হচ্ছে। দ্বিতীয়বার তিনি বরাহ অবতারে বরাহরূপ ধারণ করেন। হিরণ্যাক্ষ যখন পৃথিবীকে টেনে নিয়ে রসাতলে চলে গিয়েছিল তখন ভগবান এই বরাহ অবতার হয়ে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে পৃথিবীকে উদ্ধার করে

নিয়ে এলেন। ঋষিসর্গে তিনি দেবর্ষি নারদ রূপে তৃতীয় অবতার ধারণ করেন। ধর্মের পত্নী মূর্তির গর্ভে তিনি নরনারায়ণ রূপে চতুর্থ অবতারত্ব গ্রহণ করেন। পঞ্চম অবতারে তিনি সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপিল রূপে আবির্ভূত হন। অত্রিপত্নী অনুসূয়ার প্রার্থনায় ষষ্ঠ অবতারে তিনি অত্রিমুনির পুত্র দত্তাত্রেয় নামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। রুচি নামক প্রজাপতির পত্নী আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নাম নিয়ে তিনি সপ্তম বার অবতার রূপে অবতরণ করেন। রাজা নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেব রূপে ভগবান অষ্টম অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঋষিদের প্রার্থনায় নবমবার তিনি রাজা পৃথু রূপে অবতার হয়ে এসেছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে যখন সমগ্র ত্রিভুবন প্লাবিত হয়েছিল তখন ভগবান মৎস্যের রূপ ধারণ করে দশম অবতার হয়ে এই জগৎকে রক্ষা করেছিলেন। দেবতা ও দানবরা সমুদ্র মন্থন করার সময় ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে একাদশ অবতার হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। দ্বাদশ অবতারে তিনি ধন্বন্তরি মুর্তি ধারণ করে অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলেন। ত্রয়োদশ অবতারে মোহিনীরূপ ধারণ করে দানবদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন। চতুর্দশ অবতারে তিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন। পঞ্চদশ অবতারে বামনরূপ ধারণ করে ভগবান দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থলে গমন করেন। ষোড়শ অবতারে তিনি পরশুরাম হয়ে একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেন। এরপর তিনি পরাশর মুনির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হন। অষ্টাদশ অবতার হলেন শ্রীরামচন্দ্র এবং ঊনিবিংশ অবতার হলেন শ্রীকৃষ্ণ। *ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাজনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।।১/৩/২৪।* তারপর কলিযুগে এসে তিনি অজনের পুত্ররূপে বুদ্ধাবতার হবেন। বুদ্ধাবতারে এসে তিনি যত দেবতা বিদ্বেষী দৈত্য আছে তাদের মোহিত করে দেবেন। মোহিত করে কি করবেন? সবাইকে নিজের শিষ্য করে নেবেন। ভগবান বুদ্ধের জন্ম ছ'শ খ্রীষ্টপূর্বে। ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে যখন ভারতে জনজাগরণ হতে শুরু হল তখন বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। একদিকে ভগবান বুদ্ধ হয়ে গেলেন সাধারণ মানুষের ভগবান, অন্য দিকে হিন্দুরা ভগবান বুদ্ধকে মানবে না। তখন হিন্দুরা বুদ্ধকে অবতার বানিয়ে দিল। যিনি বেদকে মানছেন না, তাঁকে কি করে অবতার করল এ এক আশ্চর্যের। কিন্তু এর পেছনে হিন্দুরা একটা যুক্তি নিয়ে এল। ভগবান দেখলেন এখন এত অসুরের বৃদ্ধি হয়ে গেছে এদের শেষ করতে শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণের মত যুদ্ধ করা যাবে না। তাই তিনি ঠিক করলেন সব অসুরগুলোকে হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা করে দিতে হবে, যাতে হিন্দু ধর্ম রক্ষা পায়। সেইজন্য ভগবান বুদ্ধ এমন একটা নাস্তিক মত সবাইকে শেখালেন, যেটাকে বলা হয় বৌদ্ধ মত, তাতে হিন্দু ধর্মে যত অসুরগুলো ছিল সব কটা বৌদ্ধ হয়ে হিন্দু ধর্ম থেকে বেরিয়ে গেল। সেইজন্য ভগবান বুদ্ধ হিন্দুদেরও অবতার হয়ে গেলেন। এর অনেক পরে যখন কলিযুগের অবসান হয়ে আসবে তখন জগৎপালক ভগবান বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কি রূপে অবতীর্ণ হবেন। এখানে যদিও বাইশ জন অবতারের বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু আমাদের পরম্পরাতে লোকশ্রুতি হয়ে আছে যে অবতার হলেন চব্বিশ জন। অনেক পণ্ডিতরা বাইশজন অবতারের সাথে হংস ও হয়গ্রীব এই দুজনকে অবতার রূপে যোগ করে চব্বিশ অবতারের কথা বলেন।

ভগবানের পাঁচটি রূপ

সব শেষে বলছেন *এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।১/৩/২৮।* এটাই এই পুরো অধ্যায়ের মূল কথা। এখানে যত অবতারের কথা বলা হল এনারা সবাই *চাংশকলাঃ*, ভগবানের অংশাবতার অথবা কলাবতার কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। অসুরদের অত্যাচারে যখন মানুষ নিপীড়িত হয় তখন যুগে যুগে ভগবান নানান রূপ ধারণ করে তাদের রক্ষা করেন। মানুষের যখন দৃষ্টিভ্রম হয়, যেমন ট্রেনে যাবার সময় বাইরের গাছপালা, ঘরবাড়ি মনে হয় সেন সব উল্টো দিকে ছুটছে, ঠিক তেমনি তিনি হলেন আত্মা, সাক্ষী আত্মা, কোন কিছুতেই তিনি লিপ্ত হন না, সেই আত্মাতেই স্থূল দৃশ্যরূপ জগৎ আরোপিত হয়। আত্মা বা ভগবান ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু তার উপর এই স্থূল রূপী জগৎকে আরোপ করা হয়। যেমন আকাশের কোন রঙ নেই, কিন্তু সেই আকাশকে নীল দেখাচ্ছে, কারণ ধুলিকণা আছে বলে নীল দেখায়। সমুদ্রের জলের কোন রঙ নেই কিন্তু দূর থেকে নীল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে জল নিলে

বোঝা যায় কোন রঙ নেই। ঠিক তেমনি আত্মা হলেন সাক্ষী, তিনি কোন কিছুতে জড়ান না, কিন্তু তাঁর উপর এই স্থূল জগৎ আরোপিত হয়ে দেখাচ্ছে এই পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে, আমি কথা বলছি, আমি শুনছি।

যিনি ভগবান, তিনি অবতার হয়ে নানা রকম লীলা করছেন, তাঁর যেমন একটা স্থূল রূপ আছে ঠিক তেমনি তাঁর একটা সূক্ষ্ম অব্যক্ত রূপ আছে, যেটা দেখা যায় না। ভগবানের সূক্ষ্ম অব্যক্ত রূপ, যে রূপকে কখন দেখা যায় না, এই সূক্ষ্ম অব্যক্তই যখন কোন শরীরে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হয় জীব। এইভাবে ভগবানের অনেকগুলো রূপ এসে যায় – প্রথম হল নির্গুণ নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, ভগবানের এই নির্গুণ নিরাকারের বর্ণনা মহাভারতে যেমন এসেছে ঠিক সেই ভাবে ভাগবতেও বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের দ্বিতীয় রূপ সগুণ সাকার, যিনি নারায়ণ হয়ে কারণ সলিলে শয়ন করে আছেন। তাঁর তৃতীয় রূপ যিনি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে নররূপ ধারণ করেছেন, অর্থাৎ অবতারাদি হচ্ছেন। ভগবানের চতুর্থ একটা রূপের কথা মহাভারতে বর্ণনা করা হয়েছে – যিনি নারায়ণ ঋষি হয়ে বদ্রিকাশ্রমে এখনও তপস্যা করে যাচ্ছেন। আর পঞ্চম রূপ হল তিনি মানুষ ও সমস্ত প্রাণীর মধ্যে জীব হয়ে আত্মা রূপে বাস করেন। সেই একই ভগবান কিন্তু এক সঙ্গে তিনি এত রূপে বিরাজ করে আছেন। মহাভারতে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, সেখানে আবার শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জুনকে তাঁর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন – আমি নির্গুণ নিরাকার, আমিই আবার নারায়ণ রূপে কারণ সলিলে অশেষ নাগের উপর শয়ন করে আছি, আমিই আবার এই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে তোমার সারথি হয়ে যুদ্ধ করাচ্ছি, সেই আমিই নারায়ণ ঋষি হয়ে বদ্রিকাশ্রমে তপস্যা করছি আবার আমি তোমার অন্তর্যামী হয়ে তোমার (অর্জুনের) ভেতরে আছি।

বিবর্তনের যাত্রা শুরু শূন্য বুদ্ধি থেকে আর সমাপ্তি শূন্য বুদ্ধিতে

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে।।১/৩/৩৪।

পরমাত্মা জীবের বুদ্ধির ভেতরে একেবারে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। আমি আর পরমাত্মা এক, কিন্তু জীব আর আমার মাঝখানে একটা আবরণ দেওয়া আছে। এটাই বুদ্ধির আবরণ, বুদ্ধিই জীবকে খেলাচ্ছে, বুদ্ধিই কাঁচা আমি আর পাকা আমিকে পৃথক করে দিচ্ছে। জীবের আমি বোধটা বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয়। আসলে বুদ্ধি হল জড়, বুদ্ধির নিজের মত ভাবনা চিন্তা করার কোন ক্ষমতাই নেই। জীবের ভেতরে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ঢুকে বসে আছেন, তিনি ভেতরে আছেন বলে বুদ্ধি প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধি জীবকে পরমাত্মার সঙ্গে এক হতে দেয় না। এই বুদ্ধিকে এখানে বলছেন বুদ্ধিরূপা পরমেশ্বরের মায়া। এই দৈবী মায়া বুদ্ধি রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। মায়া যখন নাশ হয়ে যায়, বুদ্ধিকে যখন ছেড়ে দেয় তখন জীব নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে এক দেখে। বিবর্তনে দেখা যায় প্রথম অবস্থায় কোন বুদ্ধি থাকে না। যেমন পাথরের কোন বুদ্ধি নেই। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যখন পাথর উদ্ভিদ হয় তখন তার মধ্যে একটু চেতনা জাগে। যখন পোকা-মাকড় হয় তখন আরেকটু চেতনা জাগে। যখন মানুষ হয় তখন চেতনা অনেক বেশী জাগ্রত হয়। মানুষ যখন ঋষি হয় তখন ধ্যানের গভীরে সেই আবার এই বুদ্ধি ও মনকে ত্যাগ করে বেরিয়ে যায়। বিবর্তনের যাত্রাপথের এই যাত্রা শুরু হয় শূন্য বুদ্ধি থেকে আর শেষ হয় শূন্য বুদ্ধিতে গিয়ে। যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনি যখন সগুণ সাকার হন অর্থাৎ জড় বা শক্তি হন, দৃশ্য জগতে আমরা যা দেখি, প্রথমে তাঁর বুদ্ধি বলে, মন বলে কিছু থাকে না। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে হয়ে যখন বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন তিনি বুদ্ধিকে ছেড়ে দেন। তাই বলছেন এই যাত্রাপথ হল no mind থেকে no mind। প্রথম no mindটা negative, পরের no mindটা positive। এখানে এই জিনিষটাই বলা হচ্ছে, এই দৈবী মায়া যা কিনা বুদ্ধি রূপে ভাসমান, এই বুদ্ধি যখন নাশ হয় তখন সে দেখে – আরে! আমি তো বোকার মত এতক্ষণ নিজেকে জগৎ থেকে, ভগবান থেকে আলাদা দেখছিলাম, আমিই তিনি তিনিই আমি। অনেকে মনে করেন ভাগবতে শুধু ভক্তির কথাই বলা হয়েছে কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘোর অদ্বৈত ছাড়া কিছু নেই। যেখানে বলা হচ্ছে বুদ্ধি নাশ হয়ে গেলে দেখে যিনি জীবাত্মা তিনিই পরমাত্মা, এর থেকে ঘোর অদ্বৈত কথা কি হতে পারে! আর ভাগবতের প্রারম্ভিকেই বলে দেওয়া হয়েছে ভাগবত গ্রন্থ হল অদ্বয় জ্ঞান। কিছু লোকের মাথায় কি করে ঢুকে গেছে যে অদ্বৈতের কথা বললে ভক্তির হানি হয়। কিন্তু তা নয়,

এগুলো সব আমাদের ভুল ধারণা। অদ্বৈত সব কিছুকে নিয়েই চলে কিন্তু দ্বৈতকে মানবে না। যিনি ভক্তিমার্গে অন্তিমে পৌঁছাচ্ছেন তিনি দেখছেন সব কিছু তিনিই হয়েছেন, এটাই তো অদ্বৈত হয়ে গেল। যাই হোক, এই বুদ্ধি নাশ হয়ে গেলে জীব পরমানন্দকে প্রাপ্ত করে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

শিশুরা যেমন যাদুকরের খেলা বুঝতে পারে না, নটনটীর অভিনয়ের সংকেত ধরতে পারে না, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ ভাগবতে যে ভগবানের এই লীলার বর্ণনা করা হয়েছে এগুলো বুঝতে পারে না। না বুঝে এরা নানা রকমের তর্কযুক্তিকে আশ্রয় করে নিজেদের অজ্ঞতাকে আরও প্রকট করে ফেলে, যার ফলে তারা ভগবানের বিবিধ নাম ও লীলার রহস্য ধারণাতেও আনতে পারে না। উঁই পোকারা ভাবল বই পড়েই মানুষের নাকি এত বুদ্ধি হয়েছে। আমাদেরও মানুষের মত বুদ্ধি অর্জন করতে হবে। উঁই পোকাদের মধ্যে যারা খুব বলিষ্ঠ তারা কয়েকজন মিলে একটা লাইব্রেরীতে গিয়ে সেখানকার সব বই খেয়ে ফেলল। সব বই খাওয়ার পর উঁইদের সমাজে ফিরে গিয়ে বলছে – আমরা সব বই সাবাড় করে দিয়েছি কিন্তু আমাদের কিছুই তো হলো না। তর্ক করা হল এই উঁই পোকার বই খাওয়ার মত। ঋষিরা তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে পরিষ্কার বুঝতে পারেন এদের অবস্থান অনেক নীচে, এদের সঙ্গে কথাও বলা যায় না। সেইজন্য ঋষিরা কখন তর্কযুক্তি দিয়ে কিছু বোঝাতে যেতেন না, তাঁরা বলছেন আমি এই রকমটিই দেখেছি বাপু, তোমার সঙ্গে আমি কি তর্ক করব!

বিমর্ষ ও হতাশাগ্রস্ত ব্যাসদেবকে নারদের উপদেশ

এখান থেকে ভাগবত আস্তে আস্তে আরও গভীরে প্রবেশ করতে শুরু করে। শৌনক মুনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন – আমরা তো শুনেছি জন্ম নেওয়ার কিছু দিন পরে পবিত্র শুদ্ধচিত্ত শুকদেব সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি এতই পবিত্র হৃদয়ের যে রাস্থা দিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েরা পাশের সরোবরে স্নান করছিল সেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল না আর মেয়েদের মধ্যেও কোন সঙ্কোচ না হওয়াতে জল থেকে উঠে এসে বস্ত্র দিয়ে তারা নিজেদের আচ্ছাদিত করলো না। কিন্তু কিছু পরে ব্যাসদেবকে আসতে দেখেই তাদের অনাবৃত দেহকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে নিল। শুধু তাই নয় – *কতমালক্ষিতঃ পৌরৈঃ সম্প্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্। উন্মত্তমূকজড়বদ্‌বিচরন্ গজসাহ্বয়ে।।১/৪/৬।* শুকদেব কুরুজাঙ্গল দেশের রাজধানী হস্তিনাপুরে পৌঁছে উন্মত্তের মত বিচরণ করছিলেন, মূক, মুখ থেকে তাঁর কোন কথা বেরোচ্ছে না, আর জড়বৎ জড়ের মত বিচরণ করছিলেন, তখন তাঁকে পুরবাসীরা চিনলো কি করে? *কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ। সংবাদঃ সমভূৎ তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ।। ১/৪/৭।* তিনি কথা বলতে পারছেন না, পাগলের মত আচরণ, জড়ের মত যাঁর অবস্থা তাঁর সাথে পাণ্ডবনন্দন রাজর্ষি পরীক্ষিতের আলাপ পরিচয় কি করে হয় আর কি করেই বা তিনি ভাগবতের প্রবচন করেছিলেন? এই ব্যাপারটা আপনি আমাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলুন।

তখন সূত উবাচ করে শুরু হচ্ছে। সূত প্রথমেই ব্যাসদেবের জন্মের ইতিহাস দিয়ে শুরু করছেন। ব্যাসদেবের জন্ম হল, জন্ম হওয়ার পর তিনি অনেক কিছু করলেন, বেদ বিভাজন করলেন, ব্রহ্মসূত্র রচনা করলেন। তাতেও শান্তি না পেয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে মহাভারত ইতিহাস প্রণয়ন করলেন। কিন্তু তবুও তাঁর মনে শান্তি হচ্ছিল না। মন বড়ই অপ্রসন্ন। সরস্বতী নদীর তীরে নির্জনে বসে তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন – *ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ। মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতং চানুশাসনম্।।১/৪/২৮।* আমি নিষ্কপট ভাবে ব্রহ্মচার্যাদি ব্রত পালন করে বেদ, গুরুজন ও অগ্নিকে পূজা করেছি এবং তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছি। *ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থশ্চ দর্শিতঃ। দৃশ্যতে যত্র ধর্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত।।১/৪/২৯।* মহাভারত প্রণয়ন করার ছলে, অর্থাৎ মহাভারত রচনা করা ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বলছেন মহাভারত রচনা করার নাম করে আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ব্যাপারে বেদের সমগ্র বক্তব্যকে সহজ সরল ভাবে বলে দিয়েছি যাতে স্ত্রী, শূদ্র যাদের বেদ পাঠের অধিকার ছিল না, তারাও সবাই এই মহাভারত অধ্যয়ন করে করে নিজের স্বকর্ম ও স্বধর্ম বুঝে নিতে পারবে। আমি ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন, আমার মধ্যে ব্রহ্ম তেজ আছে এবং আমি একজন সামর্থবান পুরুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অপূর্ণ, আমার মনে শান্তি নেই। এর রহস্যটা কি আমি বুঝতে পারছি না।

একটা মানুষের মধ্যে কত গুণের সমারোহ হতে পারে ব্যাসদেবের জীবন না দেখলে বোঝা যায় না। তাঁর জন্ম ঋষি থেকে, শৈশবকাল থেকে তিনি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করে এসেছেন। বিয়েথা করেননি। একবার এক অপ্সরার দিকে দৃষ্টিপাত হতে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর মনটা চঞ্চল হয়ে গিয়েছিল। সেই চঞ্চল মনের বিকারকে তিনি অগ্নিতে স্থাপন করে দিতে সেখান থেকে জন্ম হল শুকদেবের। তিনি ব্রাহ্মণ, বেদ, গুরুজন এবং অগ্নি সবাইকে সম্মান দিয়ে এসেছেন। তিনি ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন, ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর ভেতরে ছিল। মহাভারতের মত বিশাল গ্রন্থ রচনা করে এক মহৎ কাজ সমাধান করেছেন। ব্যাসদেবকৃত যত কাজ আছে তার একটি কাজ করলে মানুষ জীবনে কৃতকৃত্য হয়ে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়ে যায়। সেখানে এত কিছু করার পরেও ব্যাসদেবের মনে শান্তি ছিল না, অপূর্ণকাম। ইদানিং কালে ডাক্তাররা বলছেন depression থেকে মানুষের অনেক রোগ ব্যাধির আক্রমণ হয়। Depression যে শুধু এই যুগের সমস্যা তা নয়, কত হাজার হাজার বছর আগে ব্যাসদেবের মত মানুষরও depression হয়েছিল আর তখনও counsellingএর ব্যবস্থাও ছিল, কারণ নারদ এসে counselling করাতে ব্যাসদেব আবার সোজা হলেন। কেউ যদি depression এ ভোগে, তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে, স্বয়ং ব্যাসদেবের মত মানুষেরও depression হয়েছিল।

যাই হোক আশ্রমে ব্যাসদেব মনে অশান্তি নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। সর্বত্র অবাধ বিচরণ সম্পন্ন নারদ এসে দেখছেন ব্যাসদেব ক্ষুণ্ণ মনে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। নারদ ব্যাসদেবকে তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেই সরাসরি বলছেন – আপনার সমস্যাটা কি বলুন তো, একজন অকৃতকার্য ব্যক্তির মত আপনি মনের মধ্যে কতকগুলো অনুশোচনা নিয়ে এইভাবে মনমড়া হয়ে বসে আছেন? ব্যাসদেব তখন বলছেন – আরে দেখুন না আমার এত গুণ, আমার এত কীর্তি – আমি নিষ্কপট ভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেছি, বেদ অধ্যয়ন করেছি, বেদের বিভাজন করেছি, মহাভারত রচনা করে বেদের ধর্মকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম, ব্রহ্মসূত্রের মত এত উচ্চ দর্শন রচনা করলাম কিন্তু আমার মনে একটুও শান্তি নেই।

অনেক বয়স্ক ভক্তরা এসে সন্ন্যাসীদের বলে 'মহারাজ! জীবনে শান্তি আর পেলাম না'। তখন তাদের এটাই বলতে হয়, জীবনের উদ্দেশ্য শান্তি এটা কোন্ শাস্ত্র বলছে! দুদিন পরে চিতায় উঠলেই তো শান্তি, দেহেরও শান্তি মনেরও শান্তি। কিন্তু কোন শাস্ত্রই তো বলছে না যে জীবনের উদ্দেশ্য শান্তি। বরঞ্চ ঠাকুর বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন হলে মন শান্ত হয় এটাও তো কোন গ্রন্থে বলছে না! ঠাকুরও তো মা কালীর দর্শন পাওয়ার পর শান্ত হয়ে বসতে পারছেন না, কুঠি বাড়ি থেকে চেঁচাচ্ছেন ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। আর ঠাকুরের শিষ্যদের তো আরও কঠিন অবস্থা, ঠাকুর তো তাও কলকাতার মধ্যেই ঘুরে বেড়ালেন, তাঁর শিষ্যরা তো বিদেশে পৌঁছে গেলেন। মহম্মদের তো আরও শান্তি ছিল না, তিনি তো তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আল্লার কথা বলতে। যিশু এমন অশান্তি ছড়ালেন যে তাঁকে সবাই মিলে ক্রুশ বিদ্ধ করে মেরেই ফেলল। তাই জীবনের উদ্দেশ্য কখন শান্তি পাওয়া নয়, আর আধ্যাত্মিক জীবনে শান্তি তো কখনই আসবে না।

ব্যাসদেবের মনের অশান্তির কারণ শুনে নারদ তখন বলছেন – *ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্। যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্।।১/৫/৮।* হে বেদব্যাস! আপনার যে অশান্তি এর কারণ আছে। ভগবানের যে নির্মল রস, শ্রীকৃষ্ণের যে দিব্যলীলা, ভগবানের যে মহিমা তাঁর কীর্তন আপনি কোথাও করেননি। ভগবানের মহিমা কীর্তন করেননি বলে আপনার শাস্ত্রগুলো অপূর্ণ থেকে গেছে। *তদ্দর্শনং খিলম্*, যে গ্রন্থে ভগবানের কথা থাকে না, সেই গ্রন্থ অপূর্ণ।

যদি বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে সেখানেও দেখতে পাবো, যে সাহিত্যে ভগবানের কথা নেই, কোন না কোন ভাবে আধ্যাত্মিকতার ভাব যদি না থাকে তাহলে সেই সাহিত্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে কালজয়ী হতে পারে না, কিছু দিন পরে সেটা সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে হারিয়ে যায়। গ্রীক সাহিত্যে ওডিসি প্রথমে ছিল ধর্মগ্রন্থ। পরের দিকে তারা ওডিসি থেকে ধর্মের অংশটাকে সরিয়ে দিল, তখন সেটা ধর্মগ্রন্থ থেকে হয়ে গেল সাহিত্যগ্রন্থ। সাহিত্যগ্রন্থ হয়ে যাওয়ার পরেই তার আগের সেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে গেল। আগে গ্রীস

দেশের লোকরা ঘরে ঘরে ওডিসি রাখত আর মুখস্ত করত। তুলসীদাসের রামচরিত মানস হিন্দীভাষী এলাকায় ঘরে ঘরে পাঠ হয়ে চলেছে আর অনেকেই আছে সে হয়তো লেখাপড়া জানে না কিন্তু পুরো রামচরিত মানস মুখস্ত। কিন্তু কালিদাসের মেঘদূতম্ বলুন বা ঋতুসংহার বলুন কোনটাই রামচরিত মানসের মত আপামর জনসাধারণের মনে স্থান করে নিতে পারেনি। তবে সংস্কৃতের পণ্ডিত আর সাহিত্য রসিকদের কাছে কালিদাসের কাব্যগ্রন্থ অত্যন্ত উচ্চমানের রচনা। অজ গ্রামে এখনও অনেক মুসলমান আছে, তারা হয়তো অশিক্ষিত, মুর্খ, নিজের নামটাও লিখতে পারে না, কিন্তু কোরান থেকে তারা অনেক কিছু খুব সহজে শুনিয়ে দেবে। কিন্তু তাকে বিখ্যাত কোন সাহিত্যিকদের বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করুন, সে জানেই না ওই নামে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন কিনা। সাহিত্য সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না, যাঁরা শিক্ষিত, পণ্ডিত তাঁরাই সাহিত্যের রস আস্বাদনে তৃপ্ত হন। কিন্তু সাহিত্যে যদি ধর্মের কথা থাকে তখন সেই সাহিত্য সবার হৃদয়কে স্পর্শ করবে। ধর্ম কিন্তু সবাইকে আকর্ষণ করবে, শিক্ষিতকেও ধর্ম টানবে, অশিক্ষিতকেও টানবে, যে পাপী তাকেও ধর্ম স্পর্শ করবে, যে পূণ্যবান তাকেও স্পর্শ করবে। আর যিনি ধর্ম সাহিত্যের রচয়িতা তাঁকে তো ধর্ম অবশ্যই সব সময় একটা পূর্ণতার ভাব দেবে। যদি ধর্মের কথা না থাকে, তাহলে যে কোন রচনা, সৃষ্টি বা শিল্প সব সময় অপূর্ণ থেকে যাবে। হিন্দুরা এই জিনিষটা ধরতে পেরেছিল। যার জন্য হিন্দুরা সাহিত্য, কলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য সব কিছুতে ভগবানকে জড়িয়ে দিয়েছে। ইসলামে সঙ্গীত চর্চা খুব কঠোর ভাবে নিষেধ করা আছে, কারণ গান হল জাগতিক ব্যাপার। কিন্তু পরের দিকে মুসলমানদের মধ্যে কাওয়ালী খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করল, কাওয়ালী হল আল্লার ভজন। যে ধর্মে সঙ্গীত নিষিদ্ধ, অথচ তারাই নিয়ে এল কাওয়ালী। যেহেতু ভগবানের নামে গান হচ্ছে তখন সেটাই কত লোকের মুখে মুখে গীত হয়ে চলেছে। অবশ্য ভারতের যত বড় বড় ওস্তাদ সঙ্গীত শিল্পী তাঁদের বেশীর ভাগই মুসলমান। এটাই ইতিহাসের পরিহাস। তবে ইসলামে যত শিল্পকলা এসেছে সবেতেই আধ্যাত্মিকতার ভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি লায়লা-মজনুর কাহিনীকে যখন ক্যালিগ্রাফি করা হয় তখন তো সেখানে পুরোপুরি ধর্মীয় ভাবকে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্য দিকে খ্রীশ্চান ধর্মে জাগতিক আর আধ্যাত্মিকতাকে সব থেকে বেশী আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য গ্যালিলিওকে জেলে পুরল, ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হল। খ্রীশ্চান ধর্ম যে সময় বিশ্বে ক্ষমতার তুঙ্গে ছিল সেই সময়টাকে বলাই হয় Dark Ages, অন্ধকারের যুগ। পুরো বিশ্বের পায়ে তখন একটা শৃঙ্খল লাগিয়ে দিয়েছিল। এখন ধর্মের উপর যত আক্রমণ, এর সবই কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্মের বিরুদ্ধে। সেই তুলনায় হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে তেমন কিছু আক্রমণ হচ্ছে না। বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে বিরোধ নিয়ে যে সমস্যা চাড়া দিচ্ছে, হিন্দুদের কাছে এই ব্যাপারে কোন সমস্যাই নেই, সব খ্রীশ্চান ধর্মের সমস্যা। নারদ এই কথাই বলছেন ঈশ্বরকে নিয়ে আর ঈশ্বরের জন্য যতক্ষণ সব কিছু না করা হবে ততক্ষণ অশান্তি থাকবেই। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে অভ্যুদয় হয়েছিল, তার মূলে ছিল সর্ব ক্ষেত্রে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার নিরবিচ্ছিন্ন প্রভাব।

নারদ বলছেন, আপনি মহাভারতে ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, অন্যান্য পুরুষার্থ, অর্থ ও কামের বর্ণনা করেছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কীর্তন সেই ভাবে করেননি। নারদ খুব সুন্দর বলছেন – *ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ। তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়া।। ১/৫/১০।* ভগবানের ভক্ত হল মানস সরোবরের হাঁস, ভগবানের ভক্তি হল মানস সরোবর। ভগবানের ভক্ত মানস সরোবর ছাড়া কোথাও থাকবে না। আপনি যতই অলঙ্কার যুক্ত কাব্যিক রস ও ভাব দিয়ে কাব্য রচনা করুন না কেন ভগবানের কথা না থাকা মানে সেতো কাকের জন্য উচ্ছিষ্ট ফেলার স্থান আস্তাকুঁড়ের মতই অপবিত্র। পবিত্র হৃদয় মহাপুরুষরা যদি আপনার বই নাই পড়ে তাহলে সেই বই চলবে কি করে!

এখন ভারতে সবাই লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে, সব কিছু ছাপার অক্ষরেও পাওয়া যাচ্ছে। বটতলার উপন্যাসও সবাই পড়তে পারছে। আগেকার দিনে তো এখনকার মত পরিস্থিতি ছিল না, সেই সময় যে কজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি পড়াশোনা করার সুযোগ পেতেন তাঁরা সত্যিই বিদ্বান ও জ্ঞানী ছিলেন, তাঁরাই যদি মহাভারত না পড়েন তাহলে এর সম্মান কোথা থেকে আসবে! ভক্তির কথা না থাকলে তখনকার দিনে কেউ সেই গ্রন্থ পাতা উল্টেও দেখতেন না। আর সত্যিই, এখনও চারিদিকে ভাগবত পাঠ হয় কিন্তু মহাভারত

কোথাও পাঠ হয় না। নারদ আবার বলছেন *তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ। শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ।।১/৫/১১।* অন্য দিকে শব্দ বিন্যাস যদি ভালো নাও হয়ে থাকে, অপভাষায় যদি রচিত হয় কিন্তু তার প্রত্যেক শ্লোক যদি ভগবানের পবিত্র লীলাকথায় সমৃদ্ধ হয় তখন সেই বাক্য মানুষের সমস্ত পাপ নাশ করে দেয়, কারণ মহাপুরুষরা এই রকম বাণীই শ্রবণ, বর্ণন ও কীর্তন করেন। আজকে যদি কোন বৈয়াকরণ বা আগেকার দিনের বড় বড় পণ্ডিতদের কথামৃতের বিচার করতে দেওয়া হয় তখন তাঁরা কথামৃতের অনেক দোষত্রুটি বার করে দেবেন, কিন্তু চলছে কথামৃতই, কারণ ভগবানের কথা আছে কিনা।

এখানে নারদ মহাভারতের ব্যাপারে অনেকগুলো আপত্তি তুলেছেন, বলছেন আপনি মহাভারতে এমন সব কথা বলেছেন যে কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি, কারণ সাধারণ মানুষ এগুলোকে ভুল বুঝবে। এইসব কথা বলে বলছেন, যারা শুধু স্বধর্ম পালন করে কিন্তু ভগবানের নাম নেয় না, তাদের কোন লাভ হবে না। এই ধরণের স্বধর্ম পালন হোল ঠিক নোঙড় ফেলে নৌকার হাল টেনে যাওয়ার মত। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা সেই জিনিষটাই পাওয়ার চেষ্টা করবেন যেটা চিরন্তন। আপনি যদি চেষ্টা না করেন তাহলেও দুঃখ কিন্তু আপনার জীবনে আসবেই। এই যুক্তিটা খুব মজার, কোন মানুষ চায় না যে তার জীবনে দুঃখ আসুক আর দুঃখ পাওয়ার জন্য কখন চেষ্টাও করে না, কিন্তু তাও মানুষের জীবনে দুঃখ আসে। ঠিক তেমনি, জীবনের সুখপ্রাপ্তিটা আপনা থেকেই হয়। কাক, চড়ুই, শালিখ বা পশু পাখি যত আছে, এরাও যদি সব সময় বসে বসে থাকে তবুও কিছু না কিছু খাবার জুটে যাবে। একটু সুখ একটু দুঃখ প্রত্যেক জীবের নিজে থেকেই এসে যায়। মৃত্যুর পর যদি কেউ স্বর্গে যায় সেখানে তার নিজে থেকেই সুখ আসবে। যে পোকা মাকড় হয়ে নীচ যোনীতে জন্মায় সেখানে তার দুঃখের শেষ নেই, সেই দুঃখ নিজে থেকেই আসবে। কিন্তু একটি জিনিষ যেটা কোন যোনিতেই নিজে থেকে আসেনা, সে আপনি কীট পোকা হয়ে যান, মানুষ হয়ে যান কিংবা দেবতা হয়ে যান, সেটা হল ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি বা মুক্তির ইচ্ছা। এটা কখনই নিজে থেকে আসে না, আর বাদ বাকী সব নিজে থেকে এসে যাবে। সেইজন্য মানুষকে কখন সকাম কর্মের কথা বলতে নেই, তুমি সকাম কর্ম করলে তোমার ভালো হবে এই উপদেশ মানুষকে কখনই দেওয়া উচিৎ নয়। মানুষের জীবনে ঝামেলা যেটা আসার সেটা নিজে থেকেই আসে। এইতো একটা ছোট্ট জীবন, আমাদের হাতে খুবই অল্প সময়। তার মধ্যে পঁচিশ বছর এদিক সেদিক করে নষ্ট করেছি, আর পঞ্চান্ন ষাট হয়ে গেলে তো খেলা শেষ, জীবন-সূর্য এখন অস্তের দিকে। হাতে রইল মাত্র কুড়ি পঁচিশটা বছর, এটুকু সময়ও যদি সকাম কর্ম করতেই চলে যায়, তাহলে জীবনে যেটা চিরস্থায়ী, মৃত্যুর পরও যেটা থাকবে সেটা পাওয়ার চেষ্টা কবে শুরু করবেন! এই কথাই নারদ ব্যাসদেবকে বলছেন।

নারদ বলছেন, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করেন, জগতের সব কিছু থেকে তাঁদের মন সরে আসে। তখন তাঁর যেমন ভালো এলো তাতেও তিনি উৎফুল্ল হন না, তেমন মন্দ এলেও বিমর্ষ হয়ে ভেঙে পড়েন না। আর কোন কারণে পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ সে যদি পাপ কর্মে লিপ্তও হয়ে যায় তখনও সে ভগবানের চরণের আশ্রয় ত্যাগ করে না। মা যখন তার সন্তানকে শাসন করার জন্য মারতে থাকে তখন বাচ্চা কোথায় যাবে? মা ছাড়া তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই, মা যত মারতে থাকে সে তত মায়ের আঁচলের মধ্যে ঢুকতে থাকে। ভগবানের ভক্তও যখন গোলমাল করে তখন মানসিক কষ্ট পায়। কষ্ট পেলে যাবে কোথায়, ভগবানকেই সে ধরে থাকে। তার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। আসলে আমাদের সমস্যা হল, আমরা যতই শাস্ত্র পাঠ করি, যতই ভালো ভালো ধর্মের কথা শ্রবণ করি, আমাদের কোথাও একটা বোধ আছে যে আমার এই এই সম্বল আছে, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে যেটা আমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে, আমার বাড়ির লোকজন আছে যারা আমার সম্বল, আমার বন্ধুবান্ধব আছে যারা আমার ভরসা, কিন্তু আসল সময়ে এগুলো কোনটাই কোন কাজে দেবে না। আমাদের যতই সম্বল, নিরাপত্তা থাকুক একটা অবস্থার পর সবাই আমরা কিন্তু একা। কিন্তু যারা ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, ভগবানকেই আশ্রয় করে আছে তাদের জীবন অন্য রকম হয়, জীবনে তাদের দুঃখ-কষ্টও অনেক কম।

ব্যাসদেবকে এইভাবে অনেক কথা বলে নারদ বোঝাচ্ছেন, তিনি কি করেননি আর কি করা উচিৎ ছিল। এরপর নারদ গীতাতে যে দর্শন তত্ত্ব আছে সেটাই ভাগবতে নিয়ে আসছেন। *আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্।। এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ। ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে।।১/৫/৩৩-৩৪।* এর মূল অর্থ হল – যাদের হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন যদি কোন সুস্থ মানুষকে কোন বিশেষ একটা ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার শরীরে সেই রোগটা এসে যাবে। আর ঐ রোগটাই কারুর যদি হয়ে থাকে সেই ওষুধটা তাকে অল্প অল্প মাত্রায় সেবন করালে তার সেই রোগটা সেরে যায়। চিকিৎসার এটা একটা পদ্ধতি। যে জিনিষটা একজনের ক্ষেত্রে বিষের কাজ করে সেটাই আরেকজন অসুস্থ রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করলে তার রোগের উপশম হয়। এই কথাই এখানে বলা হচ্ছে – এই যে সংসার জগত, এর বিনাশের মূলে হচ্ছে মায়া। মায়া কি করায়? মায়া মানুষকে কর্ম করায়, মায়া নাচিয়ে চলেছে, কামিনী-কাঞ্চনের পিছনে মানুষ অসহায়ের মত ছুটে চলেছে। মানুষ যে ছুটে চলেছে, কাজ করে চলেছে, এটাই হচ্ছে তার রোগ। যা কিছু গোলমাল সব কর্মের জন্য। কিন্তু কর্ম না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে। যার কোন কাজ নেই সে খই ভাজে। খই তো ভাজাই আছে, আবার ভাজো। একই জিনিষ মানুষ করে যাচ্ছে, নাহলে সে পাগল হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন – অমুক জায়গায় গেলাম সেখানে দেখি এই বয়সে দড়ি তৈরী করে যাচ্ছে, বলে কিনা, আমি তো বসে থাকতে পারিনা। আরেক জায়গায় দেখলাম মন্দিরে বসে তাস খেলছে। তাহলে মানুষের আসল রোগ কি? কাজ করার ইচ্ছা। কাজ ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না, কাজ না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে। আগাথা ক্রিষ্টির খুব নামকরা কথা আছে - পাগল হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে সব সময় নতুন নতুন কাজ আবিষ্কার করতে হয়। ব্যাসদেবকে ঠিক এই কথাই নারদ বলছেন, যাদের কাজ করার ইচ্ছা আছে তাদের আপনি মহাভারতে সকাম কর্মের উপদেশ দিলেন। তাহলে উপায় কি? এই কর্মকে যদি মানুষকে ওষুধ রূপে দেওয়া হয় তাহলে তার রোগটা সেরে যাবে। তা কিভাবে কর্মকে ওষুধ রূপে প্রয়োগ করবে? বলছেন – ঈশ্বরের জন্য যদি সব কর্ম করা হয় তাহলে এই ভবরোগ, সংসার রূপ রোগ সেরে যাবে। কিভাবে সেরে যাবে? ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করা হলে। কর্ম করে যাও, কর্মটা তো তোমার রোগ, কাজ ছাড়াতো তুমি থাকতে পারবে না, তাই কেউ তোমাকে কর্ম করতে নিষেধ করছে না, কিন্তু সব কর্মের ফল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করে দাও।

সব দৌড়াচ্ছে। কোথায় দৌড়াচ্ছে কেউ জানে না। এখন এই ভবরোগকে কিভাবে সারাতে হবে? এই কর্মকেই ওষুধ রূপে লাগাতে হবে – ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কাজ করতে হবে। এই ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি যেমন যেমন বাড়তে থাকবে ঠিক সেইভাবে ততটা করে ভবরোগ কমতে থাকবে। এটাই ভাগবত ধর্ম, ভাগবত দর্শনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গীতাতেও এই একই তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কাজ করতে করতে মানুষের কাজ করার প্রবণতটা কমে আসে। মানুষ যত কর্ম করবে, যত রকমের কর্ম করবে তত তার মধ্যে নতুন নতুন সংস্কার তৈরী হবে, যেমন যেমন সংস্কার তৈরী হবে সেই অনুযায়ী তাকে নতুন নতুন যোনির মধ্যে দিয়ে এই সংসারে বার বার ফিরে ফিরে আসতে হবে। এর থেকে বাঁচার একটাই পথ সব কর্ম থেকে বেরিয়ে আসা। কিন্তু কর্মপ্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব, কারণ তুমি যদি সব কর্ম ত্যাগ করে বসে যাও তখন তোমাকে আলস্য ঘিরে ধরবে, সেটা তোমার পক্ষে আরও দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কর্ম তোমাকে করতেই হবে, কিন্তু যা কিছু কর্ম করবে সব কর্মের ফল ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে দেবে, এটাই ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করা। এটাই ভবরোগ থেকে উদ্ধারের পথ।

নারদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত

এরপরে আসছে নারদের জন্ম বৃত্তান্ত। পূর্বে কোন জন্মে নারদ ছিলেন দাসী পুত্র। আমাদের ঋষিরা এক একটা চরিত্র নিতেন আর যাকে বড় করতে চাইবেন, ভালো যা কিছু আছে সব তার চরিত্রে ঢেলে দিতেন। আর যদি খারাপ করতে চাইতেন তখন যত বাজে জিনিষ থাকতে পারে সব তার মধ্যে ঢালতে থাকবেন। এখন নারদকে দেখাতে হবে তার কিছুই ছিল না। তাই এখন তাকে এমন গোল্লায় রসাতলে নিয়ে যেতে হবে যে,

তারপর দেখাতে হবে সেখান থেকে তিনি কত উঁচুতে উঠে গেছেন। তাই তাকে দাসী পুত্র করে দিলেন, খুবই সাধারণ জীবন, কিছুই বৈচিত্র্য নেই। নারদের তখন পাঁচ বছর বয়স, একদিন নারদের মা দুধ দুইতে গেছেন তখন তার মাকে সাপে ছোবল দিয়েছে। সেই সাপের বিষেই নারদের মা মারা গেলেন। নারদ একা পড়ে গেছেন, অনাথ বালক হয়ে গেলেন। কি আর করবেন ভগবানের চিন্তাই করেন। মানুষ যখন দেখে দুনিয়াতে তার কেউ নেই তখনই তো তার ভগবানের দিকে মন যায়।

একদিন তিনি জঙ্গলে চুপচাপ ভগবানের জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে মন খারাপ করে বসে আছেন। সেই সময় হঠাৎ তাঁর মনে ভগবানের একটা অনির্বচনীয় রূপ ভেসে উঠেছে। সেই রূপ দর্শনে নারদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সেই আনন্দটুকুকে নারদ একটু বেশী সময় ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন ততক্ষণে দেখেন তাঁর মন থেকে সেই রূপটা অন্তর্ধান হয়ে গেছে। এরপর তিনি ভগবানের সেই রূপকে মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শত চেষ্টাতেও সেই রূপকে তিনি আর দর্শন করতে না পেরে তাঁর ভেতরে প্রচণ্ড ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে। ওই অপূর্ব দৈবী রূপের দর্শন না পেয়ে যখন তিনি খুব হতাশায় ব্যকুল হয়ে ভেঙে পড়েছেন তখন একটি গভীর দৈববাণী তাঁর কর্ণে ভেসে এল। সেই দৈববাণীতে নারদকে বলা হচ্ছে *হন্তাস্মিঞ্জন্মনি ভবান্মা মাং দ্রুষ্টুমিহার্হতি। অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্।।১/৬/২২।* 'দ্যাখো বাছা! এই জন্মে তুমি আর আমার দর্শন পাবে না। তার কারণ যারা পূর্ণকাম নয় অর্থাৎ যাদের বাসনা কামনার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়নি সেইসব অপরিপক্ক যোগীদের পক্ষে আমার দর্শন অতি দুর্লভ। ভাগবতের শব্দটা হল *কুযোগিনাম্*, যোগী কিন্তু 'কু', এই কুযোগী শব্দটা বিশেষ ভাবে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কুযোগী মানে তিনি যোগী ঠিকই কিন্তু তাঁর কামনা-বাসনা এখনও পূর্ণ হয়নি।

কোন সন্ন্যাসী যখন প্রথম ঘরবাড়ি, মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, সম্পত্তি, টাকা-পয়সা সব থুতুর মত ফেলে বেরিয়ে আসে তখন বুঝতে হবে তাঁর মনে আর কোন বাসনা নেই। প্রথমেই সন্ন্যাসীকে তো গেরুয়া দেওয়া হবে না, যে কোন সম্প্রদায়েই প্রথমে তাঁকে প্রাথমিক প্রবেশিকায় থাকতে হবে। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর তাঁকে ব্রহ্মচারী ব্রত দেওয়া হয়। সেই সময় তাঁকে কিছু অঙ্গীকার করতে হয় আমার কোন কিছু নেই, কারুর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এরপর ব্রহ্মচারী থেকে যখন সন্ন্যাসী হচ্ছে তখনও তাঁকে একই অঙ্গীকার করতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়ার পর এবার যদি তিনি বলেন আমার কিছু সিদ্ধাই চাই, আমার নাম-যশ চাই, তার মানে তাঁর ভেতরে কামনা-বাসনা গিজ্‌গিজ্ করছে। কিছু দিন পরে তাঁর চারিদিকে একটা ভক্ত-ভক্তানীর পরিমণ্ডল তৈরী হয়ে যায়। এরাই হল কুযোগী। সেই দৈববাণী আসলে ভগবান বিষ্ণুই নারদকে বলছেন 'তোমার বাসনাগুলি, যার জন্য তুমি এই শরীরকে প্রাপ্ত হয়েছ, এখনো পুরোপুরি শান্ত হয়নি'। আসলে নারদের মায়ের প্রতি একটা মমত্ব বোধ থেকে গিয়েছিল, তাছাড়া তাঁর আর কিছু ছিল না। ভগবান বিষ্ণু বলছেন আমার প্রতি তোমার একটা তীব্র ভালোবাসা জন্মানোর জন্য তোমাকে আমি একটা ঝাঁকি দর্শন দিলাম। এরপর তুমি আমার এই রূপ দর্শন করার জন্য যত ছটফট করবে তত তোমার মন থেকে সব অঙ্কট বঙ্কট গুলো খসে পড়তে থাকবে। তারপর পরের জন্মে তুমি আমার দর্শন পাবে।

আধ্যাত্মিক সাধনায় সব সাধককেই এই ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। যারা আধ্যাত্মিক সাধক নয় তাদের পক্ষে এগুলো বোঝা খুব কঠিণ। এখন ভগবানের কোন ভক্ত ভগবানের দিকে এগুচ্ছেন, কিন্তু এগিয়ে যাবে বললেইতো এগিয়ে যাওয়া যায় না। তখন ভগবান করেন কি – গাধা যখন চলে তখন গাধাতো নিজে থেকে এগোতে চায় না, তাই তাকে হয় ডাণ্ডা মারে নয়তো সামনে একটা গাজর ঝুলিয়ে দেয় যাতে লোভে পড়ে এগিয়ে চলে। ভক্তি সাধনের পথে কোন ভক্ত নেমে পড়ে ঠিকই কিন্তু চলার পথে তার সেই লেগে থাকার মানসিক জোরটা থাকে না। তখন ভগবান করেন কি, এমন একটা চমক তাকে দেখিয়ে দেন, তখন ভক্ত সেটাকে পাওয়ার জন্য পুরো উদ্যম লাগিয়ে এগিয়ে যায়, বা ভক্তকে এমন একটা ব্যাথা দিয়ে দেবেন কিংবা এমন একটা দুঃখ কষ্টের ধাক্কা দিয়ে দেন যখন ভক্তের মনে জগতের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ভাবের উদয় হবে আর ঐ জায়গা থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর কদমে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যায়।

তার মানে হচ্ছে, অন্তর মানেতো জগত, হয় তাকে জাগতিক দিক থেকে তাকে একটা জোর আঘাত দেবেন, অথবা জগতের বাইরে ভগবানের যে ঐশ্বর্য বা বিভূতি আছে তারই কিছু একটা ভক্তকে দেখিয়ে দেবেন। নারদের ক্ষেত্রে তাই হল, ভগবান নারদকে তাঁর দিব্য রূপের ঐশ্বর্যের একটা ঝলক দেখিয়ে দিলেন। দর্শন দিয়ে বললেন 'তোমার কিন্তু এখনো সময় হয়নি, তোমার এই শরীরের ভেতরে এখন অনেক কামনা-বাসনা আছে, এই শরীর যখন তোমার চলে যাবে, তারপর তোমার হবে, এখন তুমি সাধনা করতে থাক, ভক্তি করতে থাক, এর পরে হবে'।

ঠিক তেমনি ভগবান কাউকে কাউকে খুব জাগতিক কষ্ট দেন, কথায় বলে – যে করে আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ। সর্বনাশ কেন করেন? জগতে যত বন্ধন আছে কষ্ট দিয়ে দিয়ে তিনি সেই বন্ধনগুলিকে পুড়িয়ে দেন। যতক্ষণ বন্ধন থাকবে ততক্ষণ সে এগোতে পারবে না। সেইজন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যারাই ঈশ্বরের পথে বা আধ্যাত্মিক পথকে বেছে নিয়েছেন তাদের জাগতিক কষ্টের আর শেষ নেই। একদিকে যেমন কষ্টের শেষ নেই আবার অন্য দিকে তিনি এমন একটা কিছু চমক দেখিয়ে দেন যার জন্য তার মধ্যে এগিয়ে যাবার উৎসাহ তাকে প্রেরণা শক্তি জুগিয়ে দেয়। ঠাকুরের জীবনেও ঠিক তাই হয়েছিল। ঠাকুর প্রথম প্রথম কোন ধরণের সাধনা করেন নি, কিছুই জানতেন না। শুধু ব্যাকুলতার জোরেই তিনি জগন্মাতার দর্শন পেলেন। কিন্তু তারপরেই সব শেষ। তারপর তাঁকে নিয়ম মাফিক পদ্ধতি মেনে সমস্ত রকমের সাধনা করে জগন্মাতার দর্শনকে সর্বক্ষণের জন্য করে নিতে হল।

ঈশ্বর দর্শনের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম, আধ্যাত্মিক সাধনায় সাধক একটা যদি কিছু নৈসর্গিক দিব্য দর্শনের ঝলক না পায় তাহলে সাধক কখনই তার সাধনার জীবন চালাতে পারবে না। তাই সন্ন্যাসীর জীবন যে কত একাকীত্বময় জীবন আর কত কঠোর ও কষ্টের জীবন, বাইরের লোকেদের ধারণাতেই আসবে না। এই কষ্ট, এই একাকীত্বকে ধরে রাখতে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতির চমক যদি না পায় তাহলে এই পথে চলা খুব দুরূহ হয়ে যায়। একটা বাচ্চা ছেলে যখন স্কুলে যাচ্ছে তখন তাকে কত কষ্ট করতে হয়, নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হচ্ছে, স্কুলের পড়া, বাড়ির পড়া করতে হচ্ছে তারপর কত পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কিন্তু তাকে অনবরত এই জিনিষটা বোঝান হচ্ছে যে এখন তুমি যা কিছু করে যাচ্ছ এই সংগ্রামই তোমাকে ভবিষ্যতে মহতের দিকে নিয়ে যাবে। এই উৎসাহ দেওয়ার পরেও উৎসাহিত করার জন্য তার ছোট ছোট সাফল্যে পুরস্কৃত করা হয়। এই পুরস্কার গুলোই তার জীবনের সব কষ্টকে ভুলিয়ে দেয়। একজন সন্ন্যাসী নিজের কাঁধে এই যে এত বোঝা চাপিয়ে নেয়, তার একটাই কারণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোথাও সে আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা ঝলক পায়। এই ক্ষণিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি না পেলে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে সন্ন্যাস জীবন চালানো অসম্ভব। নারদের কাহিনীতে এটাই বলা হয়েছে। নারদ ওই যে এক মুহুর্তের জন্য ভগবানের দিব্য রূপের দর্শন পেয়েছিলেন তাতেই তিনি আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই জন্মের জন্য এটুকুই নারদের প্রাপ্য, বাকিটা পরের জন্মে সাধনা করে পাওয়ার জন্য তোলা রইল।

যদিও এখানে আগের জন্মের কথা বলা হচ্ছে, আসলে এই কাহিনী আগের কল্পের। কল্প মানে ব্রহ্মার দিন চলছে। তারপর ব্রহ্মা ঘুমিয়ে পড়তেই কল্প শেষ হয়ে গেল। এরপর ব্রহ্মা আবার যখন ঘুম থেকে জাগবেন তখন তিনি আবার নতুন করে সব সৃষ্টি করবেন। এই নতুন সৃষ্টি হওয়ার পর নারদ এবার এই কল্পে সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিদের সাথে জন্ম নিলেন। সেইজন্য সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিদের নাম সব সময় মেলে না। যাই হোক নারদ এখানে আগের কল্পের কথা বলছেন। আগের কল্পে নারদের এই রকম হয়েছিল। তার মানে, আজ থেকে শত শত কোটি বছর আগে জগৎ এই রকমই ছিল, তখনও মানুষ দাসীর কাজ করত, তখনও সাপের ছোবলে মানুষ মারা যেত, তখনও শিশু মাতৃহারা হত, তখনও জঙ্গল ছিল, সেই জঙ্গলে অনাথ শিশুরা কেঁদে বেড়াত। এগুলো আদৌ সত্যি কিনা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। হিন্দুদের সৃষ্টির ব্যাপারে এটাই একটা দৃষ্টিভঙ্গী, এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্টির সব কিছু চক্রাকারে চলতে থাকে। আগের কল্পটা কি রকম ছিল? এখন যেমন আছে ঠিক সেই রকম ছিল। তাহলে ডারউইনের ক্রমবিবর্তানবাদ কোথায় থাকবে? হিন্দুরা বলে আগের

কল্পেও ঠিক এইভাবেই সব কিছু বিবর্তিত হয়েছে। বিবর্ত হতে হতে যত দিনে চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছেছে তত দিনে ব্রহ্মার একটা দিন শেষ হয়ে এসেছে, ব্রহ্মা এবার ঘুমোতে চললেন। আবার যখন ব্রহ্মার ঘুম ভাঙবে তখন সেই একই জিনিষি আবার চলতে থাকবে। ডারউইনের থিয়োরীতে বিবর্তন কয়েক লক্ষ বছরের হিসাব, এই কয়েক লক্ষের হিসাব হিন্দুরা হিসাবের মধ্যেই নেবে না। পদার্থ বিজ্ঞানীরা যে বিগ্ ব্যাঙের কথা বলা হিন্দুরা এটাকেই বলছে বিগ্ ব্যাঙ হওয়া মানে ব্রহ্মার একটা দিন শুরু হল। এই শুরু হওয়ার পর ব্রহ্মার আয়ুর হিসাবে সৃষ্টি একশ বছর চলতে থাকবে। তারপর যখন সব শেষ হয়ে যাবে এরপর আবার কবে নতুন করে সৃষ্টি শুরু হবে তার বর্ণনা এনারা দেননি। ব্রহ্মার একটা জীবনের বর্ণনাই এখানে দেওয়া হয়েছে। একটা সময়ে এই ব্রহ্মার লয় হয়ে যাবে, তখন আবার সময়েরও লয় হয়ে যাবে, কাল মহাকালে মিলিয়ে যাবে।

হিন্দুদের চিন্তা পদ্ধতি যে কত যুক্তি সম্মত এগুলো একটু ধারণা না করলে বোঝা যায় না। এত যুক্তি সম্মত চিন্তা পদ্ধতি আর কোন ধর্মে পাওয়া যাবে না। হিন্দুরা মানুষের জীবনের হিসাব দেবেন, দেবতাদের জীবনের হিসাব দেবেন, ব্রহ্মারও জীবনের হিসাবে দেবেন, কিন্তু যখনই বলবেন ব্রহ্মার লয় হয়ে যাবে তখন আর বলবেন না যে কত বছর লয় হয়ে থাকবে। যদি বলে দেয় তখনই সেটা অযৌক্তিক হবে যাবে। কারণ ওনারা বলছেন কালী কালকেই গ্রাস করে নিল, কাল বলে আর তখন কিছু নেই। তাহলে দুটো ব্রহ্মার জন্মের মাঝখানের সময়টা কত হবে? এটাই যদি কেউ বলে দেয় তখনই সেটা অযৌক্তিক হয়ে যাবে, কারণ তখন তো সময় বা কাল বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানীরা সময়ের জন্ম কখন হয় বলতে গিয়ে বলছেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকে সময়ের জন্ম হয়। অনেক পরীক্ষা-নিরিক্ষা করার পর বিজ্ঞান আজকে এই কথা বলছে, কিন্তু আমাদের ঋষিরা আট দশ হাজার বছর আগে ধ্যানের গভীরে গিয়ে এই জিনিষগুলোকে প্রত্যক্ষ করে তাঁদের শিষ্যদের বলে গেছেন। তাই এগুলো আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়, অনেক আগে থাকতেই আমরা জানি। আমাদের শাস্ত্রই বলছে সৃষ্টির আগে কালী, কালী হলেন আদি, কাল তার পরে। স্টিফেন হকিং যখন বললেন Time has a begining, তখন সমস্ত বিশ্ব স্টিফেন হকিং কী দারুণ কথা বলছেন বলে লাফাতে শুরু করে দিল। আমাদের কাছে দারুণ কথা নয়, আমাদের যে অতি সাধারণ গ্রামের নিরক্ষরও জানে কালীই হলেন আদ্যা, তিনি কালকে বশ করে রেখেছেন, কালী হলেন কালাতীত। ঈশ্বরতো তাঁরও এক ধাপ পেছনে। ব্রহ্মার আয়ু যখন শেষ হয়ে গেল মানে সময় শেষ। সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার কত দিন পর ব্রহ্মা আসবেন এটা কেউ বলতে পারবে না, যদি কেউ বলে দেয় আর যেটাই বলবে সেটাই অযৌক্তিক হয়ে যাবে। হিন্দুদের চিন্তার মধ্যে তাই কেউ কখন কোন গরমিল পাবে না।

নারদের দাসীপুত্র হয়ে জন্ম নেওয়ার এই কাহিনী আগের কল্পের। এই কল্পে নারদ এবার দেবর্ষি হয়ে জন্ম নিয়েছেন। নারদ হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র, নারদের মা বাবা কেউ নেই। আমরা অনেক সময় ভাবি জগতে আমরা যা কিছু দেখি সেটাকেই শাস্ত্রে বড় করে দেবতাদির রূপ দেওয়া হয়েছে। আসলে তা নয়, আমাদের পরম্পরাতে সৃষ্টি সাধারণতঃ তিন রকম পদ্ধিতিতে হয় যেমন এ্যমিবা জাতীয় কোন জিনিষকে আপনি খাবার দিয়ে যাচ্ছেন, সেই খাবার খেয়ে খেয়ে বড় হয়ে দুটো টুকরো হয়ে গেল। দ্বিতীয় সৃষ্টি হয় একটা গাছে কলম করে সেই গাছেরই আরেকটা গাছ তৈরী করে নিল আর তৃতীয় হল পুরুষ নারীর মিলনে সৃষ্টি। কিন্তু সপ্তর্ষির ঋষিদের জন্মের ব্যাপারে এই তিনটের কোনটাই চলে না। এনারা মন থেকেই সব কিছু সৃষ্টি করে দিতে পারতেন। ব্রহ্মা চিন্তা করলেন আমার সন্তান হোক, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সন্তান হয়ে গেল। এখানে দুম্ করে একসাথে সাতজন সৃষ্টি হচ্ছেন না। ব্রহ্মা ধ্যানের গভীরে চলে যাচ্ছেন, সেখানে তিনি চিন্তা করলেন আমার একটি সন্তান হোক, সেখান থেকেই একজন সন্তান আবির্ভূত হয়ে গেলেন। সেইজন্য এই পদ্ধতিতে সৃষ্টির গতি খুব মন্থর ভাবে এগোতে থাকল। পুরাণে পরে আসবে যেখানে ব্রহ্মা দেখলেন এইভাবে সৃষ্টি করতে থাকলে তো সৃষ্টি এগোতেই পারবে না। সৃষ্টিতে গতি আনার জন্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হবে। তখন তিনি এই তিন ধরণের সৃষ্টির প্রক্রিয়া নিয়ে এলেন। অন্যান্য ধর্মের সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে তাতে প্রচুর গোলমাল ধরা পড়বে। হিন্দুদের সৃষ্টির প্রক্রিয়া অন্য ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যাই হোক, ব্রহ্মা যখন দেখলেন সৃষ্টি খুব মন্থর গতিতে এগোচ্ছে, তখন তিনি নিজের শরীরকে নারী পুরুষ দুটো ভাগে বিভক্ত করে

দিলেন। এদের থেকে যখন সন্তানাদির জন্ম হল তখন তাদের বিয়ে দিলেন তাঁর সেই আগের মানসপুত্রদের সাথে। এগুলো সত্যি কিনা আমরা জানি না। কিন্তু মাথা থেকে চিন্তা করে করে যখন একটা যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বের সিদ্ধান্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই সিদ্ধান্তকে নিয়ে যখন পৌরাণিক কাহিনীতে নিয়ে চলে যায় তখন সেই কাহিনীটা অনেক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মূল সিদ্ধান্তকে কখনই তিনি আলাদা করছেন না, শেষে সেই একমাত্র ব্রহ্মাই আছেন, তাঁর আবার কোন স্ত্রী নেই। সেই এক থেকে এই পুরো সৃষ্টিটা বেরিয়ে আসছে। উপনিষদেই আছে আমি এক, আমি বহু হব। পুরাণে সৃষ্টিকে নিয়ে আসতে গেলে নারী পুরুষ নিয়ে আসতে হবে, তা নাহলে এক থেকে বহু হবে কি করে! তাই বলছেন, ব্রহ্মা আছেন, তিনি এক, তিনি ধ্যানের গভীরে চিন্তা করলেন আমি এক, আমার একটি সন্তান হোক, সেখান থেকে সন্তানের আবির্ভাব হয়ে গেল। কিন্তু যে সন্তানের আবির্ভাব হল, সেতো ব্রহ্মার একেবারে শুদ্ধ সত্ত্ব মন থেকে জন্ম নিয়েছে, সেই সন্তান তো সাধারণ সন্তান হবে না। তারও মন একেবারে সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ। কিন্তু যাঁর মন সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ তাঁর দ্বারা সৃষ্টিকার্য কখনই সম্ভব নয়, তিনি তো ঋষি। সৃষ্টিকার্য চালানোর জন্য একটু খাদ মেশাতে হবে। চব্বিশ ক্যারেটের সোনা দিয়ে তো গয়না বানানো যাবে না। তখন ব্রহ্মা ঠিক করলেন এবার নিজেকে নারী পুরুষে ভেঙে দিতে হবে।

নারদের প্রেরণায় ব্যাসদেবের ভক্তিগ্রন্থ ভাগবত রচনা শুরু

নারদকে তো ভগবান বলে দিলেন এখন আর তোমার এই রকম দর্শন হবে না, তুমি এখন সাধনা করতে থাক। তারপর নারদ ব্যাসদেবকে বলছেন যে তিনি তারপর সাধনা করতে থাকলেন। সে অনেক কাহিনী। এইসব বলার পর বলছেন 'সাধনা করে করে এখন আমি অশরীরি হয়ে গেছি, ভগবৎ কৃপাতে বৈকুণ্ঠাদি থেকে ত্রিভুবন সর্বত্র অপ্রতিহত গতিতে অবাধে পর্যটন করার ক্ষমতা আমার মধ্যে এসে গেছে। আমার গতিপথকে তাই কোথাও কেউ রোধ করতে পারে না। আমি দিব্য বীণা নিয়ে সারা জগত ঘুরে ঘুরে নিরন্তর তাঁর নাম গুণগান করে চলেছি, এ ছাড়া আমি আর কিছু করি না। সেইজন্য আমি খুব শান্তিতে আছি'। এই কাহনী সূত উগ্রশ্রবা শৌনক ঋষিদের বলছেন। সূত কাহিনী বলার পর বলছেন – সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরে শম্যাপ্রসাদ নামে এক আশ্রমই মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রম। নারদ মুনি প্রস্থান করার পর ব্যাসদেব সেই আশ্রমে আচমন করে নিজের মনকে ভগবানের ধ্যানে সমাহিত করলেন। ধ্যানের গভীরে তিনি দেখলেন আসল তত্ত্ব হল সচ্চিদানন্দই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দের আশ্রিত মায়ার আবরণের ফলে মোহিত মানুষ স্বভাবত ত্রিগুণাতীত হয়েও গুণের অধীন মনে করে নানারকমের দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। জগতে যত অনর্থ, যত অশান্তি এর থেকে শান্তি পাবার একমাত্র উপায় ভগবানে ভক্তি। এই ভাগবত ভক্তির প্রতি মানবজাতিকে আকৃষ্ট করার জন্য তিনি রচনা করলেন শ্রীমদ্ভাগবত। এর আগে, মানব জীবনের কর্তব্য কি? চারটি পুরুষার্থকে লাভ করা – তার জন্য রচিত হল মহাভারত। আর শ্রীমদ্ভাগবতে মানব জীবনের লক্ষ্য কি? ভক্তি – এই ভক্তির কথা বলার জন্য ব্যাসদেব রচনা করলেন ভাগবত। তিনি বলছেন – ভক্তির এমনই মহিমা, যাঁরা আত্মবিৎ, আত্মতত্ত্ব জেনে গেছেন, হৃদয়ের গ্রন্থি যাঁদের খুলে গেছে তাঁরাও কিন্তু ভক্তির কথা, ঈশ্বরীয় কথা বলেন।

ইদানিং কালে এর জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত হলেন তোতাপুরী। তিনি কিছুতেই মা কালীকে মানতেন না, ভক্তিকে তো মানতেনই না। কিন্তু যাঁর অবিদ্যা গ্রন্থি খুলে গিয়েছিল, ঠাকুরের পাল্লায় পড়ে সেই তিনিও আবার ভক্তি পথে নামলেন। একবার শারীরিক কোন যন্ত্রাণায় বিবশ হয়ে ঠিক করলেন, যে শরীর থেকে এই ব্যাধি সেই শরীরকেই ফেলে দেবেন। তিনি গঙ্গায় শরীর ত্যাগ করবেন বলে নামলেন কিন্তু সব জায়গাতে তিনি দেখলেন হাঁটু সমান জল, তাঁর আর জলে ডুবে মরা হল না। পরের দিন তিনি মা ভবতারিণীর সামনে দাঁড়িয়ে স্তুতি করছেন। সেইজন্যই ভাগবতে ব্যাসদেবে বলছেন এই অনর্থ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটিই অব্যর্থ পথ ভগবানে ভক্তি। কিন্তু মানুষ ভক্তিযোগের কথা জানে না। এই চিন্তা করে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় ব্রতী হলে। শুধু সাধারণ মানুষের জন্যই যে ভক্তিযোগ উপযোগি তা নয়, যাঁরা পরমহংস তাঁদের জন্য এই ভাগবত গ্রন্থ হল সংহিতা, তাঁদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত বেদ, তাই ভাগবতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

যাঁরা ভক্তি চান তাঁরা মুক্তি চান না, কিন্তু যাঁরা মুক্ত পুরুষ তাঁরাও পরবর্তি কালে ভক্তিকে অবলম্বন করে জগতের মাঝে বিচরণ করেন। এর আরেকটি বড় দৃষ্টান্ত শঙ্করাচার্য। তিনি পূর্ণজ্ঞানী, অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েও কত দেব-দেবীর স্তুতি করে ভক্তিমার্গের স্তোত্রাদি রচনা করে গেছেন। আজও প্রতিদিন ভারতের অগণিত ভক্ত নরনারী গভীর শ্রদ্ধা সহকারে আচার্যের রচিত স্তোত্রাদি পাঠ করে ভাগবদ্ ভক্তি নদীতে অবগাহন করে চলেছে। ভাগবতেও এই কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা পূর্ণজ্ঞানী তাঁরাও ঈশ্বরে প্রতি ভক্তির মহিমার কথা বলেন।

তবে ভাগবতই যে প্রথম ভক্তির কথা বলছে তা নয়। ভক্তির ধারণা নতুন কিছু নয়, ভক্তির কথা চিরদিনই আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে বেদ হল সমস্ত শাস্ত্রের উৎস। যজ্ঞে যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়, সে যে দেবতাই হোন না কেন, এটাই তো ভক্তি, ইদানিং এর শুধু রূপটা পালটে গেছে। আর বেদকে হিন্দুরা কেন শেষ কথা বলে মানে? কারণ হিন্দু ধর্মে এমন কিছু নেই যেটা বেদে আগে থাকতে নেই। সেইজন্য ভক্তির ধারণাও বেদেই আমরা পাই, তাই ভাগবতে নতুন কিছু বলা হচ্ছে না। শুধু দৃষ্টিভঙ্গীটা কোথায় দেখতে হবে। স্মৃতিতে যে শ্রৌতসূত্র ও স্মার্তসূত্রের কথা বলা হয়েছে ওটাও বেদেই আছে। বেদের এই অংশটুকুকে নিয়ে স্মৃতি সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তির আচরণ বিধিগুলির বিধান দিয়েছে। স্মৃতিও প্রথমে বলছে সৃষ্টি কিভাবে এসেছে, স্মৃতির উদ্দেশ্যও মুক্তি কিন্তু মাঝখানে জোর দিল social conduct এর ওপর।

ভাগবতও প্রথমে সৃষ্টির কথাই বলবে, সৃষ্টি লয় হয়ে যাওয়ার পর আমরা কোথায় যাব সেই কথাও ভাগবত বলবে, কিন্তু মাঝখানে বেশি জোর দেবে ভক্তিতে। এর মানে এই নয় যে ভাগবতে শুধু ভক্তির কথাই আছে আর অন্যান্য শাস্ত্রে ভক্তি বাদে যা কিছু আছে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। স্মৃতিতে যে শৌচের কথা বলা হয়েছে ভাগবতেও সেই শৌচের কথা বলা হবে, তন্ত্রে যেমন উপাচারের বর্ণনা আছে ভাগবতেও এই একই উপাচারের কথা বলবে। উপনিষদে যে দর্শনের কথা আছে সেই দর্শনের কথা এখানেও বার বার নিয়ে আসবেন। শুধু বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে ভক্তিতে। আমি এখানে আজ যে কথাটা বলছি তার মানে এই নয় যে আমি এই কথাই রোজ বলি, অন্যান্য দিনে আমি অন্য বিষয় নিয়েও অনেক কথা বলি, কিন্তু আজকের বিষয় যেটা সেটার ওপরেই বেশি করে বলব। ভাগবত কখনই উপনিষদে যা আছে, তন্ত্রে যা আছে, স্মৃতিতে যা আছে সেগুলিকে কখনই ফেলে দিতে তো বলবেই না, এগুলিকে ভুলও বলবে না। তার বদলে বলবে – হ্যাঁ তখন ছিল ঠিকই কিন্তু এখন যেটা বলছি এটাই যুগধর্ম।

ভাগবতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক রূপে দেখানো হয়েছে। আমরা যে অর্থে তামসিক বা রাজসিক বলি সেই অর্থে এখানে বলা হয়নি। মনু স্মৃতিতে বলছে সত্ত্বেরও আবার সত্ত্ব, রজো ও তমো আছে। সৃষ্টিতে এমন কোন জিনিষ নেই যাতে এই তিনটে জিনিষ নেই। সত্ত্ব, রজো ও তমো সব কিছুতেই থাকবে। ভগবানের যখন রজোগুণ হয় তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রের মত অবতার হয়ে আসেন, যখন সত্ত্বগুণ থাকে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ, যিশুর মত অবতার আসবেন, যখন তমোগুণের প্রভাব থাকবে তখন নরসিংহ অবতার হয়ে যাবেন, কিংবা কচ্ছপ অবতার হয়ে যাবেন। নির্ভর করে তিনটে গুণের মধ্যে কোনটাকে আশ্রয় করেছেন। এই তিনটি গুণ এক অপরকে ছেড়ে নেই, সবাই মিশে আছে। পঞ্চভূতের শরীর ধারণ করলে তিনটি গুণ থাকবেই। ঠাকুরের মধ্যেও তমোগুণ ছিল, তমোগুণ না থাকলে দেহ ধারণই হবে না। ঠাকুরকেও ঘুমাতে হত, ঘুমানো মানেই তমোগুণ। একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুণকে আশ্রয় করবে।

মুক্তি ও ভক্তির লাভের প্রচেষ্টা একমাত্র মনুষ্য জীবনেই সম্ভব

সবারই একটা ধারণা যে, ভগবানের কৃপা হল বাচ্চাদের মত, যাকে ইচ্ছে হল তাকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু এগুলো উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলা হয়, ঈশ্বর আদপে কক্ষণই এই রকম খামখেয়ালী নন। একমাত্র মুক্তি হচ্ছে এমন জিনিষ যেটা চেষ্টা না করলে কোন দিন আসবে না। একবার কয়েকজন মহারাজ অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফেরার সময় তাঁরা জম্মুতে যে বাড়িতে উঠেছিলেন, সেই বাড়ির ভদ্রলোক খুবই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানীয়। তিনি মহারাজদের বললেন ‘এখানে একজন মুসলমান ফকির আছেন, চলুন আপনাদের

তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে নিয়ে আসি’। মহারাজদের কেউ কেউ মনে মনে ভাবছেন একেই অমরনাথ দর্শন করে এসেছি তার ওপর আবার একজন মুসলমান ফকিরের কাছে যাবো, মনটা ঠিক মানছে না। কিন্তু মহারাজরা ঐ ভদ্রলোকের অতিথি। না গেলে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন ভেবে সবাই যাওয়াই ঠিক করলেন। রাস্তায় যেতে যেতে ঐ ভদ্রলোক ফকিরের অনেক চমৎকারিত্বের কথা শোনাতে লাগলেন। এসব শুনে সবারই মুড নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। যাই হোক ঐ ফকিরের আশ্রমে গিয়ে সবাই পৌঁছেছে। মুসলমান ফকিরের স্ত্রী আছে আর অনেক বাচ্চাকাচ্চাও আছে। আশ্রমে বেশ কয়েকটি মোষ বাঁধা, ওগুলোই তাঁর সম্পত্তি। আশ্রমের মধ্যেই একটা মাজহার আছে। ফকির বাবা একটা আলখাল্লা ধরণের কালো পোষাক পড়ে আছেন। তারপর তিনি মাজহারে আরতির মত করতে লাগলেন। ফকিরকে দেখে সন্ন্যাসীদের মনে হল যেমনটা ভেবেছিলাম সেরকম নয়, কিছু একটা এঁর মধ্যে আছে। আরতি হয়ে যাবার পর কথার ছলে একজন সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন ‘আচ্ছা, ভক্তি ক্যায়সে আতি হ্যায়’? তাঁর তাৎক্ষণিক জবাব ‘জমিদারি যেভাবে অর্জন করতে হয়, ভক্তি ঠিক সেইভাবেই অর্জন করতে হয়’। জমি পেতে হলে এদিক ওদিক পরিশ্রম করে আমাকে আগে টাকা পয়সা উপার্জন করতে হবে, পয়সা এমনি এমনি আসবে না, আমাকে পরিশ্রম করতে হবে তবেই আসবে। ভক্তিও এমনি এমনি এসে যায় না, আমাকে খেটে খুটে অর্জন করতে হবে আর ঠিক ঐভাবেই খেটে খুটে ভক্তিকে ধরে রাখতে হবে। ফকিরের কথাটা সবারই মনের মধ্যে খুব দাগ কাটল। আমরা এত বই পড়েছি কিন্তু কোথাও এই ভাবে বলতে দেখিনি যে ভক্তিকেও জমিদারি অর্জন করার মত দিনারাত খাটতে হয়, আর তাকে রক্ষা করতেও নিরন্তর খাটতে হবে।

ভাগবতও ঠিক এই কথা বলছে। ঠাকুরও বলছেন – মানুষ মাগ ছেলের জন্য ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে কিন্তু ভগবানের জন্য ক’ফোঁটা চোখের জল ফেলে! এটাই খাটনি। খাটতে হবে, আর বিনা খাটনিতে ভক্তি কখনই আসবে না। তাই ভাগবত বলছে – তোমার যে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নেওয়া, উপর নীচে যাওয়া আসা, দেবযোনিতে যাওয়া, পশুযোনিতে যাওয়া, তির্যকযোনিতে যাওয়া, মানুষযোনিতে যাওয়া, এগুলো তোমার কর্মবিধানে হবে। কোন প্রজাতিতে তুমি নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছ না, তোমার কর্ম আর বাসনাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে। উচ্চ যোনিতে যাওয়াটাও নিজে থেকে এসে যাবে না, খাটতে হবে। সেইজন্য এই যে দুর্লভ মনুষ্য জীবন পেয়েছে, আর তোমার যে বুদ্ধিটুকু পেয়েছে, চিন্তা করার জন্য যে বুদ্ধি পেয়েছ, আমি কিছু করতে পারি, এই বোধটাকে ভগবদ্‌মুখী করতে হবে। কুকুরকে তো বোঝান যাবে না যে তুমি ঈশ্বরে ভক্তি কর। কুকুরকে যতই খাওয়া দাওয়া, ট্রেনিং দাও না কেন কুকুর তার প্রভুকে মানবে কিন্তু ভগবানের প্রতি তার কোন দিন ভক্তি আসবে না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি লাভ একমাত্র মনুষ্য যোনিতেই সম্ভব। সেইজন্য বলছে এই দুর্লভ মানব জীবন পেয়েছ, এ এক মহা সুবর্ণ সুযোগ, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভগবানের প্রতি বেশি বেশি করে মন দাও।

পরীক্ষিৎএর জন্ম ও পরীক্ষিৎ নামের তাৎপর্য

এই জায়গা থেকে ভাগবত ঢুকে পড়ে মহাভারতের কাহিনীতে, এখন আর যুদ্ধ নেই। অশ্বত্থামা এদিকে উত্তরার গর্ভের সন্তানের ওপর ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে কাহিনী আবার শুরু হয় কিন্তু ভাগবতে এই কাহিনীকে মহাভারতের থেকে আরো অনেক বেশি বিস্তার করা হয়েছে। কাহিনীর মাঝে মাঝেই ভাগবত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির কথা নিয়ে আসবে, আর যেখানে যেখানে ভাগবতে ভক্তির কথা আসবে আমরা সেই জায়গাটাই আলোচনা করব।

এবার বলছেন – অশ্বত্থামা তো উত্তরার গর্ভের সন্তানকে উদ্দেশ্য করে ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে সবাই পাণ্ডবদের একমাত্র বংশধরকে বাঁচাবার জন্য পিতামহ ভীষ্মের কাছে গেছেন কিছু উপায় বার করবার জন্য। ভীষ্ম সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ‘তোমরা এত উতলা হচ্ছ কেন? শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও, তিনিই সব’। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যে কত বড় মহাত্মা বোঝাবার জন্য ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনেক মহান কীর্তিমূলক ঘটনার কথা বলছেন। এখানে অবশ্য মহাভারতে থেকে কাহিনী একটু অন্য দিকে যায়। ভীষ্ম সবাইকে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের বর্ণনা করে বলছেন ‘কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না। আমিও তখন মনে মনে পণ করে নিলাম ভগবানের এই প্রতিজ্ঞাকে আমি ভঙ্গ করিয়ে ছাড়ব। মনে মনে এই সঙ্কল্প করে

একদিন আমি বাণ দিয়ে অর্জুনকে এমন ব্যতিব্যস্ত করলাম যে, অর্জুন আর আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে সামাল দিতে পারছিল না। সেই সময় আমাকে রোধ করার মত ধারে কাছে কোন বীরও ছিল না। অর্জুনের উপর ভরসা না করতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বধ করতে রথের একটা ভাঙ্গা চাকা তুলে নিয়ে আমার দিকে তীব্র বেগে ধাবমান হলেন'। এখানেই মহাভারত আর শ্রীমদ্ভাগতের তফাৎ হয়ে যায়। মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র নিয়ে ভীষ্মের দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ভাগবতে ভাঙ্গা চাকার কথা বলা হয়েছে। মহাভারতের বর্ণনা অনেকটাই যুক্তিযুক্ত। অর্জুন ভীষ্মের সঙ্গে মন দিয়ে যুদ্ধ করছিলেন না, ভীষ্মের প্রতি তাঁর একটু দুর্বলতা আছে, এই জিনিষগুলো শ্রীকৃষ্ণ জানতেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সব সময়ই নিজের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে চলবেন। ভাগবতে রথের ভাঙা চাকার কথা বলা হয়েছে। ভীষ্ম বলছেন – এই শ্রীকৃষ্ণ যিনি আমাকে বধ করবার জন্য ছুটে আসছেন অথচ আমার প্রতি অনুগ্রহ আর বাৎসল্যে তাঁর হৃদয় সব সময়ই পরিপূর্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণই যেন অন্তিমে আমার পরমগতি হন। এখানে মূল ভাবটা হল – ভগবানের মধ্যে যেন যুগপৎ দুটো বিপরীত ভাব বিদ্যমান, ভীষ্মের প্রতি ভালোবাসা, অনুগ্রহ সবই আছে। কিন্তু ভীষ্ম এখন অধর্মের পক্ষে লড়াই করছেন। তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তার উপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাবেন বলে এমন যুদ্ধ করছেন যে, ভগবান এই জিনিষ বরদাস্ত করতে পারছেন না। ভগবান তাই ভীষ্মকে বধ করতে নিজেই নেমে পড়েছেন। কিন্তু তখনও তাঁর হৃদয়ে ভীষ্মের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। মহাভারতে কিন্তু পুরো অন্য রকম বর্ণনা, সেখানে ভীষ্ম পরিষ্কার আমি অর্জুনকে ছাড়ছি না, আজ হয় অর্জুন মরবে তা নাহলে আমি মরব। ভীষ্ম এমন যুদ্ধ শুরু করলেন যে অর্জুন যে শক্তি নিয়ে ভীষ্মকে প্রতিরোধ করবেন সেই শক্তিটাই জাগাতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বার বার বলে যাচ্ছেন 'তুমি একি করছ! এইভাবে ভীষ্ম যুদ্ধ করলে আজকেই সব পাণ্ডব সেনা শেষ হয়ে যাবে'। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন অর্জুনের দ্বারা হবে না, এবার আমাকেই নামতে হবে। তখনই তিনি সুদর্শন চক্র নিয়ে ভীষ্মের দিকে তেড়ে গেছেন বধ করার জন্য। তখন অর্জুন রথ থেকে নেমে শ্রীকৃষ্ণের পা সজোরে জাপটে ধরে বলছেন 'আপনি এই কাজ করতে যাবেন না, আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না'। তারপরেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পা জাপটে থাকা অবস্থায় দশ পা টেনে নিয়ে গেছেন। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের পা ছাড়ছেন না, আপনি এই রকম করবেন না। এই দৃশ্য দেখে ওদিকে ভীষ্ম হাসতে হাসতে বলছেন 'ভালোই হল, আপনার প্রতিজ্ঞাটা ভাঙিয়ে দিলাম'। তারপর ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণ ঠাণ্ডা হয়ে আবার রথে এসে বসলেন। মহাভারত সামাজিক, রাজনীতি, আধ্যাত্মিক, ভক্তি সব কিছুকে নিয়ে চলে। শ্রীমদ্ভাগবত শুধু ভক্তিকে নিয়েই চলে, কারণ ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র।

ভক্তিশাস্ত্র এভাবে চলবে না। ভক্তিশাস্ত্র বলবে, আমি অনেক অন্যায় কাজ করেছিলাম, তাও আমার প্রতি ভগবানের বাৎসল্য, আমার প্রতি তাঁর কৃপার শেষ নেই, মা যেমন দুষ্টু ছেলেকে উত্তম-মধ্যম দেয় তিনিও আমাকে মারতে এসেছিলেন। কিভাবে মারতে এসেছিলেন, আমাকে মৃত্যুদণ্ড রূপ শাস্তি দিয়ে মারতে এসেছিলেন। ভীষ্ম যে স্তরে আছেন মৃত্যু তাঁর কাছে কোন কিছুই নয়। তারপরেই ভীষ্ম বলছেন – অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে আটকাতে গেছেন, তখন কিন্তু অর্জুনের কথাতে তিনি অস্ত্র ছাড়ছেনই না, তিনি আমাকে মারবেনই মারবেন। ভীষ্ম বলছেন 'তিনি কেন আমাকে মারতে চাইছেন জান? এটাই ভগবানের করুণা। ভগবান যদি কথা দিয়েও থাকেন কিন্তু ভগবানের ভক্তের প্রতি তাঁর এমনই ভালোবাসা যে নিজের যে প্রতিজ্ঞা সেটাও ভেঙ্গে দেন'। সাধারণ মানুষ কখনই পারবে না। সাধারণ মানুষ যেটা পণ করে সেটা কখনই ভাঙ্গবে না – না, আমি দিব্যি করেছি, আমি কিছুতেই করব না। কিন্তু ভগবান এমনই যে তিনি ভক্তের জন্যও তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসেন। তাঁর কাছে সত্যটা কোন গুরুত্ব নয় কেননা তিনি সত্যস্বরূপ কিনা। সত্যস্বরূপ বলে তাঁর কাছে এই সব প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের জাগতিক দৃষ্টিতে যখন আমরা তাকাই তখন আমরা দেখি তিনি যেন সত্য থেকে নড়ে যান। ঠাকুরের জীবনে দেখতে পাই – তিনি বলছেন আমি কোন ধাতু ছোঁব না, আমি কারুর কাছে কিছু চাইনা, তিনি ছিলেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী। অথচ নরেনকে বলছেন 'ওরে, তোর জন্য আমি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে পর্যন্ত করতে পারি'। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন ঠিকই যে তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। কিন্তু অর্জুন তাঁর পরমতম ভক্ত, সেই ভক্তের জীবন রক্ষার্থে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে ছুঁড়ে

ফেলে দিলেন। ভীষ্ম বলছেন ‘এই হচ্ছেন ভগবান, ভগবান ছাড়া এ জিনিষ কেউ করতে পারবে না’। এইভাবে ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন।

এরপর আসছে, শ্রীকৃষ্ণের উত্তরার গর্ভের সন্তান পরীক্ষিৎকে বাঁচিয়ে দেওয়ার কথা। যদুবংশ নাশ হওয়ার ঠিক আগে অশ্বত্থামা পাণ্ডব বংশের নাশের উদ্দেশ্যে যে মহাতেজ সম্পন্ন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন তাতে উত্তরার গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সেই গর্ভকে জীবিত করে দিয়েছিলেন। পরীক্ষিৎ যখন গর্ভে ছিল সে তখন দেখছে এক দিব্যকান্তি পুরুষ তাঁর দিব্য তেজের দ্বারা তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। আসলে সুদর্শন চক্রের যে তেজ সেই তেজ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের তেজকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন। পরীক্ষিৎ জন্ম নিয়েই তার চোখটাকে চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, কাউকে যেন সে খুঁজছে – ভাগবতে বলছে *স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ। গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ।।১/১২/৩০।।* সেই লোকটি কোথায় যিনি আমাকে গর্ভে রক্ষা করেছিলেন। মায়ের গর্ভে যে মুখ দেখেছিল, যে মুখ তাকে রক্ষা করেছে, জন্ম নেওয়ার পরে সে চারিদিকে অবলোকন করে সবাইকে দেখছে কোন্ জন সেই ব্যক্তি যিনি মায়ের গর্ভে আমাকে রক্ষা করেছিলেন। সেই মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করে দ্বারকায় চলে গেছেন। জন্ম নিয়েই শিশু পরীক্ষা করছিল সেই মুখটি কোথায় যিনি আমায় রক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষা মানে ঈক্ষণ, ঈক্ষণ মানে দেখা, ‘ঈক্ষ’ ধাতু থেকে ঈক্ষণ বা ঈক্ষতে, মানে পরীক্ষা করা। পরীক্ষা দেওয়া, পরীক্ষা নেওয়া, চোখ দিয়ে দেখা একই জিনিষ। পরীক্ষা শব্দ এই ঈক্ষ বা অক্ষি থেকেই এসেছে। বালক জন্ম নিয়ে ঈক্ষণ করছে, গর্ভে আমি কাকে দেখেছিলাম, এই যে জন্মের পরেই ঈক্ষণ করছে সেইজন্য তার নাম হয়ে গেল পরীক্ষিৎ। ঠাকুর বলছেন নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। পরীক্ষিতের যেন জন্ম থেকেই এই বিবেক জাগ্রত, কারণ জন্মের আগেই তার ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে। পরীক্ষিৎ ছাড়া পাণ্ডব বংশে আর কেউ নেই।

ধর্মরূপী বলদ ও পরীক্ষিৎ সংবাদ *(অর্জুনের অজ্ঞান নাশ, পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ এবং পরীক্ষিৎএর রাজ্যভার গ্রহণ, মানুষের দুঃখের কারণ)*

তারপরের কাহিনী, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক উপদেশাদি দিয়ে বলছেন ‘আপনি তীর্থের কাকের মত আর কতদিন যুধিষ্ঠিরের অর্থের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবেন। যে শরীর দিয়ে আর কোনও ধর্মকার্য হবে না সেই শরীরের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, সমস্ত মমত্ব ছিন্ন করে অরণ্যবাসী হয়ে যান। *যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ।।১/১৩/২৬।* যিনি ‘এই সংসার দুঃখময়’ বুঝে নিয়ে বৈরাগ্যবান হয়ে নিজের মনকে বশীভূত করে শ্রীহরিকে হৃদয়ে স্থাপন করে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তিনিই নরোত্তম। বিদুরের কথা শোনার পর গান্ধারী ও কুন্তিকে সঙ্গে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র জঙ্গলে চলে গেলেন। পরে তারা জঙ্গলে পুড়ে মারা গেলেন। এরপর যদুবংশের নাশ, শ্রীকৃষ্ণের শরীর ত্যাগের প্রস্তুতি ও শরীর ত্যাগ, অর্জুনের গাণ্ডীবের শক্তি চলে যাওয়া ইত্যাদি কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে।

এবারে অন্তিম সময় এসে গেছে। যুধিষ্ঠির বলছেন পরীক্ষিৎ বড় হয়ে গেছে এবার আমাদেরও বাণপ্রস্তে চলে যাওয়াই উচিৎ। পরীক্ষিৎ পাণ্ডবদের নাতি, পাণ্ডবদের ছেলেদের তো আগেই মেরে ফেলা হয়েছে। সরাসরি নাতির কাছে রাজ্যপাট সামলাবার দায়ীত্ব দিয়ে পাণ্ডবরা এবার বাণপ্রস্তে চলে যাবেন। অর্জুনেরও সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভাব এসে গেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার বেশ কয়েক বছর পর অর্জুন গীতার উপদেশ ভুলে গিয়েছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন সংক্ষেপে যদি তিনি অর্জুনকে গীতার বাণী আবার মনে করিয়ে দেন। ভুলে যাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যদিও পরে শ্রীকৃষ্ণ গীতার বাণীকে অন্য ভাবে অর্জুনকে বলেছিলেন, মহাভারতে অনুগীতাতে এর খুব সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই শেষ বয়সে এসে যে অর্জুন গীতার বাণী ভুলে গিয়েছিল, সেই অর্জুনের মনে এখন আর কোন চাহিদা নেই, অর্জুনের এখন তীব্র বৈরাগ্য। মন এখন নির্মল, শান্ত হয়ে গেছে আর দিন রাত অর্জুনের মনে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণই বিরাজ করে আছেন, শুধু শ্রীকৃষ্ণের কথাই

স্মরণ মনন করে চলেছেন। হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির এমন প্রচণ্ড বেগ এসেছে যে সেই ভক্তির তেজে অর্জুনের মনের যত বিকার ছিল সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

'Twelve Tasks of Hercules' হারকিউলাসকে বারোটি কাজ দেওয়া হয়েছিল। তারমধ্যে একটা কাজ ছিল একটা আস্তাবল পরিষ্কার করা। ঐ আস্তাবলে শত শত বছর ধরে রাজার বদমাইস অবাধ্য সব ঘোড়া থাকত। অবাধ্য ঘোড়াগুলোর জন্য আস্তাবলটা কোনদিন পরিষ্কার করা যেতনা। হারকিউলাসকে বলা হল তোমাকে এক রাতের মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে। ঘোড়াগুলো এমন বদমাইস যে, কেউ ওখানে ঢোকার সাহসই পায় না। আর এই অবস্থা শত শত বছর ধরে চলে আসছে। হারকিউলাসকে যখন বলা হল, তখন সে বলছে – আরে এতো অসম্ভব! এক রাত্রের মধ্যে পরিষ্কার করাতো দূরের কথা, কত বছরেও যে পরিষ্কার করা যাবে বলা যাবে না। ঐ আস্তাবলের পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে চলে গেছে। হারকিউলাস সারা রাত করল কি, সেই নদীর স্রোতটাকেই ঘুরিয়ে দিল। নদীর জলের গতিপথ এমন করে দিল যে ঐ আস্তাবলের মাঝখান দিয়েই নদীটা বইতে শুরু করল। নদীর ঐ বেগে আস্তাবলের এত বছরের নোংরা আবর্জনা সব ধুয়ে বার করে সাফ করে দিল। সকালে রাজা দেখে আস্তাবলের পুরোটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিছুই নেই। ঠিক তেমনি ভক্তির যখন তোড় আসে তখন হৃদয়ের শত শত জন্মের বিকার যত জমে আছে, যত কামনা-বাসনা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে হৃদয় নির্মল হয়ে যায়। অর্জুন গীতার যে উপদেশ ভুলে গিয়েছিল, এখন এই ভক্তির প্রচণ্ড বেগ যখন তার মনের সব বিকারগুলিকে বিনষ্ট করে দিলো তখন তার মনে আবার সেই গীতার উপদেশের কথা মনে পড়ে গেল। গীতা মোক্ষশাস্ত্র কিনা তাই অর্জুনের গীতার উপদেশ ধারণা হওয়া মাত্রই তার সমস্ত অজ্ঞান দূর হয়ে গেল। অর্জুনও যুধিষ্ঠিরকে বললেন এখন আর আমাদের কিছুর প্রয়োজন নেই, চলুন আমরা হিমালয়ে চলে যাই।

পাণ্ডবরা হিমালয়ে চলে গেলেন। পরীক্ষিৎ রাজা হলেন। একদিন পরীক্ষিৎ নিজের রাজ্যের মধ্যে ঘুরছেন, ঘুরতে ঘুরতে দেখছেন একটা সাদা ধবধবে সুন্দর বলদ তার তিনটি পা বিকলাঙ্গ আর এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কোন রকমে নড়বড় করতে করতে চলেছে। পরীক্ষিৎ বলদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে 'আরে কি ব্যাপার! আপনার তিনটে পা বিকলাঙ্গ আর এক পায়ে কোন রকমে হাঁটছেন, অথচ আপনার শরীর এত সুন্দর, আপনাকে দেখতেও খুব সুন্দর, আপনার এই অবস্থা কে করেছে আমাকে বলুন, আমি এক্ষুণি তাকে দণ্ড দেব'। বলদটি তখন বলছে 'আমি হলাম ধর্ম। আর এখন কলি যুগ আসছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও মর্ত্যলীলা ত্যাগ করে স্বধামে চলে যাওয়ার পর আমার সব ক্ষমতা শেষ হতে চলেছে। তাই আমি কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছি'। এই বলে ধর্ম বর্ণনা করছে কিভাবে দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ধর্মকে শেষ করে দিচ্ছে।

এখানে একটা Theory of Misery আছে। ধর্ম পরীক্ষিৎকে দুঃখের কি কি কারণ হতে পারে সেই ব্যাপারে ব্যাখ্যা করছেন। বলছেন – যাঁরা কোন রকম দ্বৈতবাদকে মানেন না, অর্থাৎ যারা ঘোর অদ্বৈতী, তাঁরা মনে করেন যত দুঃখ, যা কিছু কষ্ট আসে সেটা তার নিজের কর্মের জন্যই আসে। কেউ কেউ নিজের প্রারব্ধকে দুঃখের কারণ মনে করে। ধর্ম এখানে অবশ্য প্রারব্ধের ব্যাখ্যা করছে না, প্রারব্ধ কেন, প্রারব্ধ কোথা থেকে আসে, এখানে সেটা বলা নেই। কেউ কেউ কর্মকে দুঃখের কারণ রূপে মনে করে। আর কেউ বলেন স্বভাবের জন্যই এই দুঃখ কষ্ট পায়। এখানে স্বভাব মানে accidental, chance, এই দুঃখ এসেছে, এটা আসবার কথা তাই এসেছে। কেউ মনে করে ঈশ্বর দুঃখ দেন। কেউ কেউ বলেন দুঃখকে যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। কেউ বলেন বাণী দিয়ে দুঃখকে প্রকাশ করা যায় না। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত এই ধরণের অনেক দর্শন নিয়ে হিন্দুধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হিন্দুদের জীবনদর্শন দাঁড়িয়ে আছে অদ্বৈত দর্শনের উপর। অদ্বৈতের প্রথম মত হল, তোমার দুঃখের জন্য কেউ দায়ী নয়, তুমি নিজেই তোমার দুঃখের জন্য দায়ী। তোমার সুখের কারণও তুমি। এখানে কর্মই হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্মে তুমি খারাপ কিছু করোনি তাও তোমার ভালো কিছু হচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে আগের জন্মে খারাপ কিছু করেছিলে। মূল কথা হল তোমার যা কিছু হচ্ছে, সুখ, দুঃখ, ভালো, মন্দ এগুলোর জন্য ভগবান দায়ী নন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের যে বেশীর ভাগ লোককেই দেখা

যায় সব কিছুতে ভগবানকে জড়িয়ে নেয়। যত দ্বৈতবাদী ধর্ম আছে তাদের কাছে এটা এক মারাত্মক সমস্যা। দ্বৈতবাদীদের যদি বলা হয় ভগবান আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কেন তিনি আমাকে এত দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাঠিয়েছেন? কোন দ্বৈতবাদী ধর্মে এর উত্তর পাওয়া যাবে না। একে কানা, ওকে খোঁড়া, তাকে বোবা করে কেন ভগবান পাঠিয়েছেন? এর কোন উত্তর নেই। যে কোন সেমেটিক ধর্ম বলবে – ভগবান হলেন ন্যায়প্রিয়, তিনি দয়াবান, যিশু তোমাকে ভালোবাসেন। ভালোবাসার এই নমুনা! আমাকে কানা, খোঁড়া পাঠিয়ে জগতে চলার শক্তি, দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিয়ে তিনি কিসের দয়া দেখাচ্ছেন! স্বামীজী প্রচণ্ড কড়া ভাষায় এই সব ধর্মকে নিন্দা করে গেছেন, স্বামীজী বলছেন যে ভগবান আমাকে এখানে একটা রুটি দিতে পারে না সে কিনা বলছে মৃত্যুর পর আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। নিকুচি করেছে এমন ভগবানের। হিন্দুরা এই ব্যাপারে একেবারে পরিষ্কার, এই সমস্যার সমাধান তারা অনেক আগেই করে রেখেছে। হিন্দু দর্শন বলে, ভগবান হলেন কর্মাধ্যাক্ষ। তোমার কি হল আর কি হল না তার জন্য ভগবানের ভারি বয়ে গেছে, তোমার যা কিছু হয়েছে তার জন্য তুমি নিজে দায়ী। এটাই অদ্বৈতবাদীদের দর্শন।

কিভাবে ধাপে ধাপে এই মতটা এসেছে দেখতে গেলে প্রথমে আমরা পাই, অদ্বৈত বলছে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। সচ্চিদানন্দ মায়ার আবরণ তৈরী করে নিজের দুটো রূপ দিয়ে দিলেন, একটা তাঁর শুদ্ধসত্ত্ব রূপ আর দ্বিতীয়টি তাঁর মায়ার রূপ। তুমি সেই সচ্চিদানন্দ কিন্তু সচ্চিদানন্দের এই মায়ার রূপকে তুমি গ্রহণ করেছ বলে তোমার যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, সুখ, ভালো-মন্দ যা কিছু হচ্ছে। তুমি মায়ার এই আবরণকে সরিয়ে দিয়ে দেখো, তোমার দুঃখ-কষ্ট, ভালো-মন্দ বলে কিছুই নেই। এই মতকে যখন লম্বা টেনে দেওয়া হয় তখন এটাই কর্মফলে গিয়ে পড়ে। তুমি নিজেই মায়ার আবরণ তৈরী করেছিলে, তুমি নিজেই এই মায়ার রূপের খেলাতে নেমেছ। খেলা কখন ভালো হবে, কখন খারাপ হবে, ভালো খেলার ফল ভালো হবে, খারাপ খেলার ফল খারাপ হবে। এই ভাবে তোমার কোটি কোটি জন্ম চলছে। আবার অন্য দিকে ব্রহ্মার একটা করে দিন পাল্টাচ্ছে, কল্পের শেষ হয়ে আবার নতুন করে যখন খেলা শুরু হচ্ছে, সেই খেলার মধ্যে খেলতে খেলতে এত দিনে তোমার মাথা থেকে হারিয়ে গেছে যে তুমি সেই সচ্চিদানন্দ। প্রায়ই অনেকে প্রশ্ন করে কর্মফল শুরু কোথা থেকে? মায়ার জগতে সৃষ্টি অনাদি, তার কর্মও অনাদি। তাই এখানে এই প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। আমার হাসি কান্না, দুঃখ-কষ্ট যা কিছু সব আমারই সৃষ্টি, আমার যত আনন্দ, সুখভোগ সব আমারই সৃষ্টি, আমিই আমার সব কিছুর জন্য দায়ী, আমারই কর্ম ঘুরে ঘুরে আমার কাছেই ফিরে আসে – এই ধারণার মূলে হল অদ্বৈত তত্ত্ব।

দুঃখের কারণের মূলে প্রথম হল এই ঘোর অদ্বৈত তত্ত্ব – তুমি মায়ার আবরণে আছ বলে সব কিছু চলছে, আসলে সুখও নেই দুঃখও নেই, এগুলো তোমার মনের ভ্রান্তি। দ্বিতীয় কারণ হল, এটাই যখন জাগতিক স্তরে আসে তখন এই সুখ-দুঃখকে কেউ বলে প্রারব্ধ, কেউ বলে আমার কপালে যা আছে তাই এসেছে, কেউ বলে আমার কর্মের জন্য। কপালে আছে এটাও শেষ পর্যন্ত কর্মে গিয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেকে বলে সুখ-দুঃখ সব ঈশ্বরই দেন। এই ধরণের নানা রকমের মত এখনও চলে আসছে। তবে যুক্তিসম্মত গ্রহণযোগ্য মতটা হল, ভালো-মন্দ যাই হয়ে থাকুক না কেন, এর জন্য আমি নিজেই দায়ী।

দুঃখ জিনিষটা একটা পুরো বিশ্লেষণের বিষয়। কেউ মনে করেন আমার কর্মের জন্যই দুঃখ, কেউ মনে করেন প্রারব্ধের জন্য, কেউ মনে করেন দুঃখ নিজে থেকেই আসে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমরা যখন দুঃখের বিষয়ে কথা বলি তখন এই বুলিগুলিই আওড়াই। কেউ যদি দুঃখের মধ্যে পড়ে আমরা বলি – তোমার কিছু কর্ম খারাপ ছিল। আবার কেউ বলে আরে এ রকমই আসতে যেতে থাকে। কেউ বলেন ভগবান তোমার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তোমাকে দুঃখ পাঠিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের মূল তত্ত্বটা কি, এই ব্যাপারে ভাগবত কোন উত্তর দেবে না। যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা এই সব জাগতিক ব্যাপার নিয়ে কখনই মাথা ঘামান না। আপনি যেমন যেমন শাস্ত্র পড়বেন, আপনি যে ধরণের বিচার যুক্তির উপর নির্ভর করবেন, আপনাকে ঠিক সেই রকমই বলে দেবেন। যেমন কেউ মনে করে প্রকৃতির নিয়মের মতই দুঃখ কষ্ট আসে যায়,

যেমন এই রোদ এল, এই বৃষ্টি এল, এই রকম দুঃখ-কষ্টও আসে আবার চলে যায়। কিন্তু মূল কথা হল নিজের নিজের যে ধর্ম সেটাতে অবস্থিত থাকা। জীবনে দুঃখ আসুক, সুখ আসুক, অশান্তি আসুক, শান্তি আসুক, যত যাই আসুক না কেন তুমি তোমার ধর্মে অবস্থিত থাকো, এটাই শাস্ত্রের উপদেশ।

রাজা পরীক্ষিৎ কর্তৃক কলিযুগের দমন *(কলিযুগের পাঁচটি আশ্রয়)*

পরীক্ষিৎ আর ধর্মরূপী বলদের মধ্যে নানা রকম আলোচনাতে বোঝা গেল কলিযুগের আগমনে অধর্মের এই বাড়বাড়ন্ত। অধর্ম বৃদ্ধি হওয়ার জন্য লোকেদের দুঃখ-কষ্টও বেড়ে গেছে। পরীক্ষিৎ ঠিক করলেন অধর্ম কোথায় আছে সন্ধান করে তাকে শেষ করতে হবে। পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করছেন অধর্মের মূলে কে? ধর্ম বলছেন কলিযুগ। ঠিক আছে তাহলে আগে কলিযুগকে খুঁজে বার করতে হবে। অর্জুনের পৌত্র বলে কথা! তা তিনি কলিযুগকে বার করে ধরতে পেরেছেন। কলিযুগকে ধরে পরীক্ষিৎ বলছেন 'তোমাকে আমি শেষ করে দেব'। কলিযুগ হাতজোড় করে বলছে 'তা তো সম্ভব নয়, আমার সময় এসে গেছে, আমি কালের প্রবাহে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। কালের প্রবাহে যা কিছু আসে তাকে আপনি কেন ভগবানও আটকাতে পারেন না, কেননা এটা তাঁরই বিধান। তাই আপনার ক্ষমতা থাকলেও আপনি আমাকে মেরে ফেলতে পারেন না'। ভাগবত হল ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্রের এই সব ব্যাপারে কিছু বোকা ভক্ত বোকার মত প্রশ্ন করে, ভগবান এগুলো পাল্টাতে পারেন কি, পারেন না? ভগবান কখনই তাঁর নিজের বিধান ভাঙবেন না। আপনি বিধান করে বিধান ভাঙছেন, তাহলে বিধান করলেন কেন? যাই হোক, পরীক্ষিৎ তখন বলছেন 'আমি যতদিন রাজা থাকব ততদিন তুমি আমার রাজ্যে কোন রকম অধর্ম করতে পারবে না, বরঞ্চ তুমি আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাও'। কলিযুগ বলছে 'সেটাও কি করে সম্ভব! আমি কালের নিয়মে এসে গেছি, আমাকে তো থাকতে হবে, ঠিক আছে আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা করে নিন। আপনি বলে দিন আমি কোথায় কোথায় থাকব'। তখন কলিযুগকে রাজা পরীক্ষিৎ বললেন 'ঠিক আছে তুমি সূক্ষ্ম হয়ে থাকো, আর চারটে জায়গাতে তুমি থাকতে পারবে, এই চারটের বাইরে যদি পঞ্চম জায়গায় তোমাকে দেখতে পাই তাহলে কিন্তু তোমাকে আমি শেষ করে দেব'। *অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ। দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ।।১/১৭/৩৮।* কলিযুগের প্রার্থনা পূরণ করে রাজা পরীক্ষিৎ কলিযুগকে এই চারটে জায়গায় থাকার অনুমতি দিলেন। এই চারটে জায়গা হল – ১) দ্যুত, যেখানে জুয়া খেল হবে। ২) মদ্যপান। ৩) স্ত্রীসঙ্গ। ৪) হিংসা। রাজা পরীক্ষিৎ কলিযুগকে এই চারটে জায়গার নাম বলে দিয়ে বললেন 'আমি রাজা, আমি তোমাকে এই চারটে স্থান দিলাম, যেখানে তুমি থাকতে পারবে'। প্রথমটা হল দ্যুত খেলা – দ্যুত মানে অসত্য, যেখানে দ্যুত খেলা হয় সেখান অসত্যের আশ্রয় নেওয়া হয়। তাই যেখানে অসত্য সেখানে কলিযুগ থাকতে পারবে। মদ্যপান – মানে মদ, অহঙ্কার যেখানে সেখানেই কলি যুগ। স্ত্রীসঙ্গ মানে আসক্তি – যেখানেই আসক্তি, যদি সন্তানের প্রতিও আসক্তি থাকে সেটাও খারাপ। আর হিংসা মানে হচ্ছে নির্দয়তা, শুধু হিংসা না, কারুকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে কষ্ট দেওয়া সেটাও নির্দয়তা। এই চারটে জায়গায় কলি যুগ থাকবে।

তখন কলি যুগ বলল 'না না, এই অল্প কটি জায়গায় আমি থাকব কি করে! অন্তত আরেকটি জায়গা দিন'। তখন পরীক্ষিৎ অনেক চিন্তা করে বললেন 'ঠিক আছে সুবর্ণ যেখানে থাকবে সেখানেও তোমাকে থাকার অধিকার দিলাম'। এখানে সোনা মানে টাকা পয়সাকেও বোঝাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। প্রথমে নারীসঙ্গ, তা নিজের স্ত্রীই হোক আর কোন অবৈধ সঙ্গই হোক, সব রকম সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ চাই, আর কাঞ্চন মানে টাকা-পয়সা। এই ভাবে কলিযুগকে একটা সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হল। আর বলদরূপী ধর্ম, যার তিনটে পা বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, রাজা পরীক্ষিৎ তখন তপস্যা, শৌচাদি দিয়ে ধর্মকে আবার দাঁড় করিয়ে দিলেন। তা এখন ধর্মটাও দাঁড়িয়ে গেল আর কলিযুগকেও নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানের মধ্যে সীমিত করে দেওয়া হল। এবার লড়াইটা ঐখান থেকেই এদের মধ্যে চলতে থাকবে।

রাজা পরীক্ষিৎকে শৃঙ্গী মুনির অভিশাপ

এরপর আবার লম্বা কাহিনী। একদিন পরীক্ষিৎ শিকার করতে গিয়ে হারিয়ে গেছেন। তিনি বনের মধ্যে একা একা ঘুরছেন। পরীক্ষিৎএর মাথায় রাজমুকুট পড়া আছে, মুকুট সোনার তৈরী। আর সোনা মানেই সেখানে কলিযুগ বসে আছে। কলিযুগ বসে আছে মানেই রাজার মাথাটা বিগড়ে আছে। ঘুরতে ঘুরতে রাজা পরীক্ষিৎ জঙ্গলের মধ্যেই এক ঋষির আশ্রম দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন এক ঋষি ধ্যান করছেন। ঋষির নাম ছিল শমীক। রাজা অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে যখন দেখলেন ঋষি সাড়া দিচ্ছেন না, ঋষির ধ্যান আর ভঙ্গ হচ্ছে না। তখন রাজা বলছেন 'ভণ্ডামি করার জায়গা পাও না', কাছেই একটা মরা সাপ পড়েছিল, এই বলেই সে ঐ মরা সাপটা ঋষির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

রাজা বাড়িতে ফিরে আসার পর হঠাৎ মনে পড়ল, এ আমি কি করলাম! একজন ঋষি, যিনি আবার ধ্যানাবস্থায়, তাঁর গলায় কিনা আমি মরা সাপ ঝুলিয়ে দিলাম। কি করলাম ভেবে আর কি হবে – আপনিইতো কলিযুগকে বলে দিলেন যেখানে সুবর্ণ আছে সেখানে কলিযুগ থাকতে পারবে, আপনার মাথায়তো সোনার মুকুট, সেখানেই তো কলিযুগ ঢুকে বসে আপনার মাথা দিয়েছে ঘুরিয়ে, উচিৎ অনুচিত জ্ঞান আপনার হারিয়ে গেছে। সেই সময় শমীক ঋষির ছেলে, সেও খুব তেজস্বী, বাইরে কোথাও খেলা করছিল। বন্ধুরা গিয়ে শমীক ঋষির ছেলে শৃঙ্গীকে বলছে 'তুমি এখানে খেলা করছ, আর এত তেজ দেখাচ্ছ, ঐদিকে তোমার বাবার গলায় একজন মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছে'। ঋষির ছেলে এতে নিজেকে খুবই অপমানিতে বোধ করে রেগে গিয়ে বলছে 'আমার বাবার গলায় মরা সাপ ঝোলান হয়েছে! দাঁড়াও আমি অভিশাপ দিচ্ছি'। ঋষির ছেলে বলে কথা! এই বলে সে গঙ্গা জল হাতে নিয়ে বলছে 'আমার বাবার গলায় মরা সাপ ঝুলিয়ে অপমান করা! ঠিক আছে! আমি অভিশাপ দিচ্ছি যে আমার বাবাকে অপমান করেছে আজ থেকে সাত দিনের মাথায় তক্ষক নাগ গিয়ে তাকে দংশন করবে আর তার বিষে সেই মুহুর্তেই সে প্রাণ ত্যাগ করবে'।

পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন ব্রত এবং শুকদেবের আগমন *(কিংকর্তব্য, মুক্তির পথে প্রধান বাঁধা, শুকদেবকে পরীক্ষিতের চারটি মৌলিক প্রশ্ন)*

ভারতের সংস্কৃতির আধার মূলতঃ এই দুটো বইয়ের উপর – একটি মহাভারত আর দ্বিতীয়টি শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত শুরু হয় জনমেজয়কে নিয়ে আর শ্রীমদ্ভাগবত শুরু হয় পরীক্ষিৎকে নিয়ে। এরপর ভাগবতে অনেক লম্বা কাহিনী টানা হয়েছে। ইতিমধ্যে পরীক্ষিৎ ঋষিপুত্রের অভিশাপের কথা জানতে পেরে গেছেন। সাত দিন পর তক্ষক সাপের দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। নিজের মৃত্যুর দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে জানতে পেরেই রাজা পরীক্ষিৎ ঠিক করলেন এই কটি দিন আমি আর কোন সুখ ভোগে নিজেকে জড়াব না। কেউ এসে আমাকে যদি বলে তোমার আয়ু আর সাত দিন। তখন এই সাত দিন আমি কি ভাবে কাটাব? আমি তখন মনে মনে ঠিক করে নিলাম, এই সাত দিন আমি কারুর সাথে কোন ঝগড়া বিবাদ করবো না, কোন ভোগের মধ্যে জড়াব না, সাত দিন টানা গীতা বা কথামৃত পাঠ করে যাব। আমার মৃত্যুর দিন জানার পর আমি এগুলো ঠিক করলাম, তাহলে এখন থেকেই কেন শুরু করছি না! এক জায়গায় বলা হয় কিংকর্তব্য, আমাদের কর্তব্য কি। মনে করুন আমাকে সাপে কামড়েছে কিংবা বিষ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাকে ডাক্তার বলে দিল আপনার আয়ু আর একটি ঘন্টা। মৃত্যুর কথা ভাবলেও আমাদের আতঙ্ক হয়। কিন্তু আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে আমার আয়ু আর মাত্র এক ঘন্টা। এখন আমি এই একটি ঘন্টা কি ভাবে অতিবাহিত করব? বলা হয় ওই এক ঘন্টা আমি যা যা করতে চাইব সেটাই আমার ঠিক ঠিক কর্তব্য, এর বাইরে আর কোন কর্তব্য নেই। কর্তব্য সেটাই, জীবনের শেষ এক ঘন্টায় আমি যা করতে চাইব। জীবনের ওই শেষ এক ঘন্টায় কি কারুর ইচ্ছে হবে এর সঙ্গে একটু ঝগড়া করি, আমার পাশের বাড়ির লোকটা আমাকে খুব জ্বালাত, যাই ওকে আমি একটা ঘুষি মেরে আসি! এগুলো কিছুই করতে মন তখন চাইবে না। যাদের প্রতি আমার রাগ ক্ষোভ ছিল সবাইকে তখন আমি ক্ষমা করে দেব। এই ভাবটাই আমার প্রকৃত স্বরূপ। সেইজন্য যারা আধ্যাত্মিক পথে যেতে চায় তাদের সব সময় মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে বলা হয়। সব সময় যে নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে পারে না, সে কখন আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে পারে না। মৃত্যুর কথা চিন্তা করাটা নেগেটিভ অর্থে বলা

হচ্ছে না, একেবারে পজিটিভ অর্থে বলা হচ্ছে। মৃত্যু সবারই জন্য অবশ্যম্ভাবি, কেউ মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। শুধু সময়টা জানা নেই, কিন্তু টাইম বোমার মত সময় ঠিক করা আছে, টিক্ টিক্ করে ঘড়ির কাটা ওই সময়ের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা পঞ্চাশ ষাট বছর অতিক্রম করে গেছেন, তাঁদের কাছে সাত দিনও যা, সাত বছরও তাই। কিন্তু একদিন আমরা সবাই মারা যাব জানা সত্ত্বেও আমরা কেউই কর্তব্য করি না, এটাই মায়া।

এখানে খুব সুন্দর বলছেন *অথো বিহায়েমমমুঃ চ লোকং বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান উপাবিশাৎ প্রায়মমর্ত্যনাদ্যাম্।।১/১৯/৫।* রাজা পরীক্ষিৎ বলছেন, এই অভিশাপ শোনার আগে থেকেই আমি ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ভোগে নিস্পৃহ ছিলাম। এখন এই অভিশাপ বাক্য শোনার পর আমি ঐহিক সুখ ও স্বর্গসুখ সব কিছু পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ জ্ঞানে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করব। অভিশাপের কথা জানতে পেরেই পরীক্ষিৎএর চেতনা জেগে গেছে। ‘আমার আর সাত দিন মাত্র সময়, সংসারের কোন কিছুই আমার আর দরকার নেই, এমনিতেই সংসারে বড্ড বেশী আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবার আমি পূর্ণ বৈরাগ্য অবলম্বন করব। এর আগেও জগতের ভোগ্য পদার্থকে ত্যাজ্য মনে করতাম। কিন্তু আর না, এবার সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে মনোনিবেশ করে পূতসলিলা, পতিতপাবনী গঙ্গার তীরে গিয়ে আমি প্রায়োপবেশন করব। ব্রাহ্মণ কুমার যখন অভিশাপ দিয়েছেন তখন বুঝে গেছি যে আমি আর বাঁচব না, এই কটা দিন ঈশ্বর চিন্তন করেই কাটিয়ে দেব’। এই বলে তিনি পুরোপুরি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর মনকে নিবিষ্ট করলেন। ভাগবতের এই অংশটি খুবই মূল্যবান।

আধ্যাত্মিকতার দুটো দিক – একটা সংসার নিবৃত্তি আর দ্বিতীয়টি ঈশ্বরপ্রাপ্তি। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, নির্বাসনা না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি হবে না। আমরা এখানে সবাই এত কষ্ট করে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছি, সংসারে কিছু কর্তব্য থাকতে পারে কিন্তু শাস্ত্রের কথা শুনতে শুনতে ভেতরে ভেতরে সবারই একটা অনাসক্তির ভাব এসেছে। যাঁদের বৈরাগ্যের ভাব আগে থেকেই ছিল তাঁদের অনাসক্তির ভাব আরও বেড়েছে। কিন্তু তাও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু হচ্ছে না কেন? এখানে কিন্তু সুপ্ত বাসনার কথা বলা হচ্ছে না। সুপ্ত বাসনা তাদের জন্যই যারা এখনও জগতের কিছুই দেখেনি, যেমন পাঁচ বছরের ছেলে রমণ সুখ কি জানে না। কিন্তু যারা জগৎ দেখে নিয়েছে, এখনও খাওয়া হজম করার শক্তি আছে, এখনও এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করার ক্ষমতা আছে, সে যদি বলে আমার সত্যিই সেই ধরণে কোন বাসনা নেই। তাহলে আটকাচ্ছে কোথায়? এই যে বলা হল নির্বাসনা হলে মুক্তি হয়, আসলে নির্বাসনা শুরুতেই এসে যায়, কিন্তু একটা জায়গায় আটকে থাকে বলে মুক্তি হয় না। ঠাকুর বলছেন সুতোর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভেতরে যাবে না। নির্বাসনা হয়ে যাওয়া মানে সব আঁশ গুটিয়ে দেওয়া হল। আঁশ গুটিয়ে গেলেই ছুঁচের ভেতর সুতো যাবে না, সুতোটাকে এবার ছুঁচে ঢোকাতে হবে। জগতের প্রতি আসক্তি আমাদের চলে যেতে পারে কিন্তু তাই বলে যে ঈশ্বরে মন আসবে তা নয়। ঠাকুর ঠিক এই কথা কয়েকজন বয়স্ক লোকের সম্বন্ধে বলছেন – দেখলাম কয়েকজন বুড়ো বসে বসে দড়ি বানাচ্ছে, কেউ বেড়া বাঁধছে, বলে কিনা আমি তো কাজ ছাড়া বসে থাকতে পারিনা। এটা তো অত্যন্ত লজ্জার কথা – কোন বয়স্ক সন্ন্যাসী যদি বলে আমি কাজ ছাড়া বসে থাকতে পারিনা তাই বাচ্চাদের পড়াচ্ছি। তোমার কর্মের এই প্রবাহ তো অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কারণ জগৎ যার কাছে অসার বোধ হয়ে গেছে সে কেন আর কাজ করতে যাবে! তখন তার একমাত্র কাজ ভগবানের দিকে মন দেওয়া। কিন্তু ভগবানের দিকে তাও মন যেতে চায় না।

পরীক্ষিৎ এটাই বলছেন, মৃত্যুর দিন ক্ষণ যদি জানা হয়ে যায় তখন মনে কি বিচার আসছে সেটাই দেখার। বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন রকম বিচার আসবে। যে ঠিক আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাইছে তার কাছে এটা ধাক্কার মত আসে। কি ধাক্কা আসে? সংসারের প্রতি বৈরাগ্য তো আমার আগে থেকেই ছিল, এবার যখন আমার অবশ্যম্ভাবি মৃত্যুর আগাম সংবাদ জেনে গেছি তখন ভগবানের পাদপদ্মে প্রাণপন দিয়ে মন লাগাবার চেষ্টা করব। যদি কারুর নির্বাসনা থাকে, আর সে যদি মারা যায় তাহলেও তার মুক্তি হবে না। মরে গিয়ে

আবার জন্ম নিতে হবে। ঈশ্বর দর্শন না হওয়া পর্যন্ত তো কারুর মুক্তি হবে না। মরে গিয়ে আবার কিভাবে জন্ম নেবে? ফাঁকিবাজ সরকারি কর্মচারীদের মত জন্ম নেবে। এদের কাজের প্রতি কোন নিষ্ঠা নেই, আসক্তিও নেই নিষ্ঠাও নেই। এটাই এই শ্লোকের মূল ভাব – ঈশ্বর দর্শন না হলে, আত্মজ্ঞান না হলে কিছুই কিছু নয়। আজকে হয়তো আমি মনে করছি আমার মধ্যে নির্বাসনা এসে গেছে, কিন্তু কালই মহামায়া কোন একটা কিছু দিয়ে আমাকে বেঁধে দেবেন। আমি ঠিকই মনে করছি আমার মধ্যে নির্বাসনার ভাব এসে গেছে, কিন্তু এই নির্বাসনাটা দগ্ধবীজ নয়। বাগানের সব জঙ্গল আমি সাফ করে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু বড় ছোট সব গাছের বীজ মাটিতে পড়ে আছে, একটু জল পেলেই সেখান থেকে আবার বাগান জঙ্গলে ভরে যাবে। গাছগুলোকে বীজ শুদ্ধু যদি পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আর আগাছা জন্মাবে না। ঠিক তেমনি আমি মনে করছি আমি অনাসক্ত, কিন্তু একটু কিছু হলেই ভেতর থেকে সংস্কারগুলো বেরিয়ে এসে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে বুঝতেই দেবে না। কেন এই গোলমালটা হয়? এর উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষিৎ বলছেন আমি আগে থাকতেই ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ভোগে নিস্পৃহ ছিলাম, সংসারের প্রতি বিরক্ত ভাব আগে থেকেই আছে। তাও তো তাঁর তখন কিছু হচ্ছিল না। কারণ তখন তাঁর ভগবানের দিকে মন ছিল না, ঈশ্বরে ভক্তি ছিল না। এখন তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা জানতে পেরে পুরো মন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চলে গেছে। শুধু সংসারে অনাসক্তিতে হয় না, ভোগে নিস্পৃহ হলেই হয় না, ঈশ্বরে ভক্তি থাকা চাই। ঈশ্বরে ভক্তিতে কি হয়, একটু আধটু যা দোষ ছিল সেটাও নাশ হয়ে যায়। ঠাকুরের স্তবে স্বামীজী বলছেন *কৃত্যংকরোতি কলুষম্*, হে গুণনিধি প্রভু! তোমার প্রতি একবার ভক্তি এসে যাওয়ার পরও যদি কিছু কলুষ থেকে যায়, সেই কলুষটাই তখন তুমি কৃত্য করে মহৎ করে দাও। সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনে সংসারে বিরক্তিটা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল ঈশ্বরে ভক্তি। যে দেশে এত সন্ন্যাসী, এত যোগী, এত সাধুবাবা তবুও সেই দেশের এত দুরবস্থা কেন? বিরক্তি আছে ঠিকই, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের ঈশ্বরে ভক্তিটুকু ছাড়া আর সব কিছুই আছে। যত লোকের সংসারে বিরক্তি এসেছে তার অর্দ্ধেক লোকের যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকত তাহলে দেশের চেহারা অন্য রকম হয়ে যেত। একজন বিষয়ী লোক, কামাসক্ত মানুষও ঈশ্বরের ভক্ত হয়ে যেতে পারে, সে হয়তো তত আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে পারবে না, কিন্তু তার যদি আন্তরিক চেষ্টা থাকে তখন ভগবানই তার আসক্তিকে ধীরে ধীরে নাশ করে দেবেন, এরপরও যদি অল্প একটু থেকে যায়, তখন ওই দোষটুকুই তাকে মহৎ করে দেবে।

যাই হোক, পরীক্ষিৎ বুঝে নিয়েছেন তাঁর আয়ু আর মাত্র সাতটি দিন। তিনি তাঁর ছেলে জন্মেজয়কে ডেকে সব রাজ্যভার বুঝে নিতে বললেন আর তাকেই রাজা করে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে প্রায়োপবেশন করে শরীর ত্যাগের মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি জল পান করব না, খাওয়া-দাওয়া না করে মন প্রাণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে সমর্পণ করলাম। পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের এই খবর সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে যেতেই চারিদিক থেকে ঋষি-মুনিরা তাঁদের শিষ্যমণ্ডলী সহ সেখানে এসে উপস্থিত হতে শুরু করলেন, পরীক্ষিৎও প্রত্যেককে যথাযোগ্য অর্চনা করে ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁদের সবাইকে প্রণাম করলেন। সেই সময় নিজের ইচ্ছামত বিনা উদ্দেশ্যে পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে ব্যাসনন্দন ভগবান শুকদেবও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

শুকদেব গঙ্গাতীরে উপস্থিত হতেই রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর কাছে এসে অবনত মস্তকে প্রণাম করে পূজা করে রাজপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করালেন। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিদের সেই মণ্ডলের মধ্যে শুকদেব যেন পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পেতে লাগলেন। রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে আবার প্রণাম করলেন, মধুর বাক্যে তাঁকে প্রশ্ন করলেন। *অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্। পুরুষস্যেহ যৎ কার্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বতা।। যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্তব্যং নৃভিঃ প্রভো। স্মর্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্যয়ম্।।১/১৯/৩৭-৩৮।* যাঁরাই আধ্যাত্মিক পথে চলতে চাইছেন, যাঁরা ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করতে চান তাঁদের সবারই উচিৎ ভাগবতের এই দুটি শ্লোককে মাঝে মাঝেই স্মরণ মনন করা। রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছে জানতে চাইছেন, আপনি যোগীদের পরমগুরু, সেইজন্য আমি আপনার কাছে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি রূপ পরম সিদ্ধির স্বরূপ ও সাধন সম্বন্ধে উপায় জিজ্ঞাসা করছি। আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষে

সর্বপ্রকার যা কর্তব্য তা আমাকে বলুন। পরম সিদ্ধি মানে আধ্যাত্মিক জীবনের যেটা শেষ লক্ষ্য। সেই সিদ্ধির স্বরূপটা কি? আর তার পথ বা সাধনটা কি? সাঁইত্রিশ নং শ্লোকে প্রথমে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছে এই দুটো প্রশ্ন করছেন। তারপর জানতে চাইছেন, *যৎ কার্যং ম্রিয়মাণস্য*, যে মানুষ কিছুক্ষণ পরেই মরতে যাচ্ছে তার এখন কি কর্তব্য? যাঁদের পঞ্চাশ ষাট বছর হয়ে গেছে, তাঁদের সন্তানরা বড় হয়ে গেছে, সব কিছু করা হয়ে গেছে, এখন তাঁরা মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন, এই প্রশ্নটা তাঁদের জন্যও অত্যন্ত জরুরী।

ইতিমধ্যে পরীক্ষিতের তিনটে প্রশ্ন করা হয়ে গেছে। এবার আটত্রিশ নং শ্লোকে প্রথম প্রশ্ন করছেন মানুষ মাত্রেরই কি কর্তব্য। আগে প্রশ্ন করেছিলেন *যৎ কার্যং ম্রিয়মাণস্য*, আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষে কি কর্তব্য। এখানে প্রশ্ন করছেন মনুষ্য মাত্রের কি কর্তব্য। কি কর্তব্য প্রশ্ন করেই পর পর জানতে চাইছেন মানুষ কার জপ করবে, কি শ্রবণ করবে, কার স্মরণ করবে, কার ভজন করবে আর শেষ প্রশ্ন মানুষ কোন জিনিষকে ত্যাগ করবে। পরোক্ষে ভাবে প্রশ্নের মাধ্যমেই রাজা পরীক্ষিৎ বলেই দিচ্ছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। তাহলে মোট চারটে প্রশ্ন করছেন ১) পরম সিদ্ধির স্বরূপ কি? ২) তার সাধন কি? ৩) আসন্ন মৃত্যুমুখী মানুষের কি কর্তব্য? আর ৪) সাধারণ মানুষের কি কর্তব? এইখানে এসে ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় স্কন্ধ

ভগবানের বিরাট রূপ ও ধ্যানের কিছু বিধি *(পরম সিদ্ধি কি, মানব জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের স্থুল রূপ, ঈশ্বরে শরণাগত হয়ে প্রারব্ধানুসারে বাহুল্য বর্জিত জীবন অতিবাহিত করা, দুর্মদান্ধদের থেকে দূরে থাকা, বড়লোকদের অনুগ্রহ পরিহার করা, স্বরূপের ধ্যান, বিভিন্ন কামনার জন্য বিভিন্ন দেবতার পূজা, পুরুষোত্তম ভগবানের পূজাই একমাত্র কর্তব্য)*

এরপর শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় স্কন্ধ। দ্বিতীয় স্কন্ধে মূলতঃ দুটো জিনিষের বর্ণনা করা হয়েছে – ভগবানের বিরাটরূপের বর্ণনা আর ধ্যানবিধির কথা। অবশ্য এই দুটো বিষয় ভাগবতে অনেকবার আসবে। শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলছেন 'হে পরীক্ষিৎ! তুমি খুব উত্তম প্রশ্ন করেছ। লোককল্যাণের জন্য এই প্রশ্ন অত্যন্ত উপযোগী। আত্মজ্ঞানী পুরুষরা এই ধরণের প্রশ্নকে খুব আদর করেন। তার কারণ তাঁরা যখন সমাজে, লোকালয়ে ভ্রমণ করে বেড়ান তখন তাঁদের গৃহস্থদের সঙ্গই করতে হয়'। *শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ। অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।। নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ। দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা।।২/১/২-৩।* হে রাজন্! তাঁরা দেখেন গৃহস্থরা সারাদিন হাজার রকম কাজে জড়িয়ে আছে, নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই আর তাদের মন সব সময়ই কামনা-বাসনার পুর্তি কিভাবে করবে তার জল্পনা কল্পনার মধ্যেই পড়ে থাকে। সারা রাত এরা ঘুমিয়ে কাটায় আর তা নাহলে স্ত্রীসঙ্গ করে কাটিয়ে দেয়। সারাটা দিন শুধু টাকা টাকা করে যাচ্ছে যার জন্য সকাল থেকে খেটেই চলে। বলতে চাইছেন, গৃহস্থের দিনটা টাকার জন্য হাই হাই করতে করতে কেটে যায় আর রাতটা স্ত্রীসঙ্গ আর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। তার উপর আবার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের অসুখ-বিসুখ আছে, বাড়িতে এলে তাদের আদর আপ্যায়নাদি করতে হয়ে। এই করে করেই তাদের জীবনের বেশীর ভাগ সময় চলে যাচ্ছে। অথচ মজার ব্যাপার হল সংসারে যাদের আপন বলে মনে করে, স্ত্রী-পুত্র বলুন, আত্মীয়-বন্ধু বলুন, আর নিজের এই দেহই বলুন, শেষে কোনটাই তার সাহায্যে আসে না। বড় রকমের যদি ব্যাধি হয় তখন ডাক্তার বাবু নিদান দিয়ে দেবে, বাড়ির লোক ওষুধ খাইয়ে দেবে কিন্তু শরীরের কষ্টটা তার নিজের, নিজেকেই সেই কষ্ট ভোগ করতে হবে, অপর কেউ এসে এই কষ্টটা তার হয়ে ভোগ করতে পারবে না।

সেইজন্য কর্তব্য কি? শুকদেব পরম সিদ্ধি কি এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন – *তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছাতাভয়ম্।।২/১/৫।* বলছেন যারা বুদ্ধিমান পুরুষ, যারা অভয়পদ প্রাপ্তাভিলাষী তাদের জন্য একমাত্র কর্তব্য হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তি শ্রবণ, লীলাকীর্তন ও লীলা স্মরণ করা। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ, তিনি মনুষ্যদেহধারী, নিজের মায়াকে আশ্রয় করে মানবজাতির কল্যাণার্থে তাঁর এই দেহ ধারণ। তাই যখনই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তন করা হবে তখন তাঁর আধ্যাত্মিক

রূপকে নিয়েই ধ্যান চিন্তন করতে হয়। নারদ এই আপত্তিই ব্যাসদেবকে করেছিলেন, আপনি যে মহাভারত রচনা করেছেন তাতে শ্রীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক রূপের বদলে তাঁর মানব রূপটাই প্রাধান্য পেয়েছে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে নিয়ে ইদানিং অনেক গবেষণা হচ্ছে, অনেক প্রবন্ধ রচনা হচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বেশীর ভাগ গবেষণার বিষয়গুলোর সাথে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্কই নেই। স্বামীজী যখন বিদেশ যাচ্ছেন তখন তাঁর জাহাজ বোম্বাই থেকে বারোটা পঞ্চান্নতে ছেড়েছিল নাকি বারোটা পঞ্চাশে ছেড়েছিল, এই হল বিষয়। স্বামীজী যখন বজবজ স্টেশন থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে নামলেন তখন সেই ট্রেন চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল, নাকি তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল। এগুলো একটা উদাহরণ, কিন্তু এই ধরণের বিষয়ের উপরই বেশীর ভাগ গবেষণা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। আর এই ধরণের গবেষণা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এই সব গবেষণার কোন দাম নেই। এগুলো শুধু মানুষের চিত্ত বিক্ষেপ করে। স্বামীজীর ট্রেন তিন নম্বরে না চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেছিল এর কোন দাম নেই। তবে এর মধ্যে একটা জিনিষ হল, আমি জানলাম স্বামীজীর ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেছিল। এরপর আমি যখনই তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে কখন যাব তখন আমার মনে পড়বে এই প্ল্যাটফর্মে স্বামীজীর ট্রেন বজবজ থেকে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই মুহুর্তে আমার মধ্যে স্বামীজীর ভাব উদয় হচ্ছে, সেই দিক থেকে এর একটা দাম আছে, এটাই আধ্যাত্মিক ভাব। শুধু তথ্য হিসাবে যদি জানা হয়ে থাকে তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে তার কোন মূল্য থাকবে না। এখানে এটাই বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ মানুষ হয়ে মথুরায় কংসের কারাগারে জন্মালেন, গোকুলে বড় হলেন, বড় হয়ে কংস বধ করলেন, তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের সারথি হলেন, এইভাবে মানুষ রূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করলে কিছুই হবে না। তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক রূপ ও ভাবের চিন্তন মনন করতে হবে, তবেই তোমার সেই পরম অভয়পদ প্রাপ্ত হবে।

পরের শ্লোকে মানব জীবনের উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে – *এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া। জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ।।২/১/৬।* মৃত্যুর সময় যেন তোমার ভগবানের স্মৃতি থাকে। মৃত্যুর সময় ভগবানের স্মৃতি থাকার জন্য কি করতে হবে? *এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া*, জ্ঞান দিয়েই হোক বা যোগ দিয়েই হোক বা নিষ্ঠাপূর্বক স্বধর্ম পালন দিয়েই হোক, জীবনকে এমন ভাবে তৈরী করবে যাতে মৃত্যুকালে নিশ্চিত ভাবে ঈশ্বরের স্মরণ হয়। সাধারণ মানুষ ধর্ম বুঝতে পারে না, সেইজন্য হিন্দু ধর্ম খুব সহজ ভাবে স্ত্রীদের বলে দিল তোমার যে স্বামী তাঁর মধ্যেই তুমি তোমার ইষ্টকে দেখ, স্বামীকে যদি ইষ্ট রূপে দেখ তাহলেই তোমার সব কিছু হয়ে যাবে, তবে স্বামী রূপে দেখলে হবে না, ইষ্ট রূপেই দেখতে হবে। এখন দেখতে হবে সেই স্ত্রী তার মৃত্যুর সময় স্বামীকে কিভাবে দেখছে, যদি স্বামীকে নারায়ণ রূপে দেখে থাকে, অর্থাৎ নারায়ণের স্মৃতিই যদি স্মরণ হয় তবেই সেই স্ত্রীর জীবন সার্থক হবে। এই কথাই এখানে বলছেন, *স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া*, যার যেটা স্বধর্ম সেই ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা দিয়েই জীবন ধন্য হয়ে যাবে। একজন স্ত্রী বলছে আমি পতিধর্ম পালন করব, পতিধর্মতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য স্ত্রী বলছে আমার স্বামীই জগৎস্বামী। স্বামীকে জগৎস্বামী রূপে দেখছে কিনা কোথায় ধরা পড়ে যাবে? তার মন অনেক উদার হয়ে যাবে, তার হৃদয়টা বড় হয়ে যাবে। আর কখন ধরা পড়বে? মৃত্যুর সময় নারায়ণের স্মৃতি থাকছে কিনা।

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ।।২/১/৭। এমন কি যাঁরা বড় বড় মুনি, যাঁরা নির্গুণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, বিধি-নিষেধের মর্যাদাকে যাঁরা অতিক্রম করে গেছেন তাঁরাও ভগবানের অনন্ত গুণের কীর্তনে সর্বদা রমণ করেন। সাত নম্বর শ্লোক ঠাকুরের অবস্থাকে বর্ণনা করছে। ঠাকুর স্বামীজীর অবস্থাকে এই সাত নম্বর শ্লোক দিয়ে বোঝা যায়। ঠাকুর মুহুর্মুহু নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, আমরা জানি স্বামীজীও নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। ওই নির্বিকল্প অবস্থা থেকে নেমে এসে ওনারা কি করছেন? *রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ*, শ্রীহরির গুণকীর্তনের আনন্দে তাঁরা রমণ করতেন। ঠাকুর সব মতে, সব পথে সিদ্ধি লাভ করার পর শুধু মা মা করে যাচ্ছেন, মা হলেন সচ্চিদানন্দময়ী, যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম। এইজন্য শাস্ত্র না পড়লে এগুলো বোঝা যায় না। সবাই বিচার করেন নির্গুণ বড় না সগুণ বড়। এখানে নির্গুণ সগুণ কোনটা বড় সেই নিয়ে কথা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে যিনি নির্গুণ সাধনা করে সিদ্ধি

পেয়ে গেছেন, দেখা গেছে তাঁরাও যখন সেই নির্গুণ অদ্বৈত অবস্থা থেকে মনকে নামিয়ে শরীর ধারণের জন্য জীবন চালাচ্ছেন তখন তাঁরাও শ্রীহরির কথা নিয়েই থাকতেন, ভগবানের গুণকীর্তনে যে আনন্দ সেই আনন্দে মগ্ন থাকতেন। সেইজন্য এই জগতে ভগবানের কথাই শ্রেষ্ঠ। তাই সর্ব সাধারণের কর্তব্য হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাগাথা কীর্তন করা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করা, শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করা, শ্রীকৃষ্ণের গুণচিন্তন করা। যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁরাও এই কাজই করেন, তাই সবারই উচিৎ সিদ্ধ পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। আমাদের মত সাধারণ জনের উদ্দেশ্য দুটো, এই জীবনেই মুক্তি লাভ করে জীবনমুক্ত অবস্থায় থাকা, আর যদি এই জীবনেই মুক্তি লাভ নাও হয় অন্তত মৃত্যুর সময় যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিটা অটুট থাকে।

পরীক্ষিতের প্রশ্ন ছিল মৃত্যুমুখী মানুষের কি কর্তব্য, তার উত্তর হল জীবনকে এমন ভাবে তৈরী করা যাতে মৃত্যুকালে নিশ্চিত ভাবে ভগবান নারায়ণের স্মৃতি স্মরণ মনন হয়। শুকদেব বলছেন *অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ। ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেহনু যে চ তম্।।২/১/১৫।* দেহান্তকাল উপস্থিত হলে মৃত্যু ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়। বৈরাগ্য রূপ অসি দ্বারা সেই সময় জগতের যত কিছুর উপর মমত্ব আছে, নিজের শরীরের উপর, স্ত্রী-পুত্রের উপর, বিষয়ের উপর, সব মমত্বকে ছেদন করা। যত কিছুর উপর আসক্তি আছে, মমত্ব বোধ আছে সেগুলোকে কেটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পবিত্র জলে স্নান করে একান্ত স্থানে শুদ্ধ আসনে উপবিষ্ট হবে। আসনে উপবিষ্ট হয়ে পরম পবিত্র 'অ', 'উ' ও 'ম' এই অক্ষরত্রয় গ্রথিত ব্রহ্মবাচক প্রণব মনে মনে জপ করতে হবে। গীতাতেও ভগবান ঠিক এই কথা বলছেন, *ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্*। মৃত্যুর সময় যিনি এই প্রণব মন্ত্রের জপ ও ধ্যান করেন তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। এরপর পরীক্ষিৎ একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর যতিশ্রেষ্ঠ শুকদেব সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরীক্ষিতের সংশয় দূর করে দিচ্ছেন।

পরীক্ষিতের একটা প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলছেন *বিশেষস্তস্য দেহোহয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্। যত্রেদং দৃশ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ।।২/১/২৪।* এই কার্যরূপ সমগ্র দৃশ্যমান জগতে যা কিছু ইন্দ্রিয়ের গোচর হচ্ছে এর পুরোটাই ভগবানের স্থূল রূপ। এই দৃশ্যমান জগৎ তাঁরই বিরাট রূপ। ভগবানের স্থূলদেহ কোনটা? সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পূর্বেও যা কিছু ছিল, বর্তমানে রয়েছে অথবা ভবিষ্যতে যা হবে সব কিছু যে রূপের মধ্যে দৃশ্য, সেই রূপই ভগবানের স্থূল থেকে স্থূলতর বিরাট দেহ। ঈশ্বরের এই ধারণা ও ভাবকে সব সময় জাগ্রত রাখতে হবে।

স সর্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ। তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ।।২/১/৩৯। স্বপ্নে আমি যা কিছু দেখি তখন আমি নিজেকেই বিভিন্ন বস্তু রূপে অবলোকন করে, ঠিক তেমনি ভগবান হলেন সবার চিত্তবৃত্তি দ্বারা সব কিছুর অনুভবকারী। তার মানে তিনিই সব কিছু হয়েছেন। জগতে তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তাই একান্ত ভাবে সত্যস্বরূপ ভগবানেরই ভজনা করা কর্তব্য এবং অন্য কোন বস্তুতে আসক্তি রাখবে না। এই গ্লাশ, বোতল, টেবিল সব কিছু ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। ঠাকুর বলছেন কুকুর-কুকুরীর মৈথুনের সময় সেখানেও দেখলাম ব্রহ্মজ্যোতি লক্‌লক্ করছে। এগুলো কল্পনার কিছু নয়, ঠাকুর নিজে স্বচক্ষে দেখছেন, কথামৃতে এর বর্ণনা আছে। যা কিছু আছে তিনি ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু এক একটি রূপে তিনি নিজেকে এক এক ভাবে অভিব্যক্ত করছেন। ভগবানেরও অনেক রূপ আছে, এখন আমি ভগবানের কোন রূপটা চাইছি দেখতে হবে। মা যখন রেগে যায় তখন ছেলে ভয় পেয়ে বলে – মা তুমি অমন রেগে যাচ্ছ কেন? ছেলে মায়ের এই রূপ দেখতে চাইছে না। সন্তান মায়ের হাসি মুখ, শান্ত মুখ দেখতে চায়। মা যখন রেগে যাচ্ছে তখন মা পাল্টে গিয়ে অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছে না, মা যখন হাসি মুখে থাকে তখন সেটাও মায়েরই রূপ। ঈশোপনিষদে বলছে *যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি*, আপনার যে কল্যাণময় রূপ সেই রূপটা আমি দেখতে চাইছি। এখানে অন্য রকম বলছেন, ভগবানের এই জগৎলীলা রূপ এই রূপ আমি চাই না, সুন্দর মোহিনী নারীরূপ এটা আমি চাই না, তাঁর টাকা-পয়সার ঐশ্বর্যের রূপ সেটা আমি চাইছি না। এগুলো সব তাঁরই রূপ, মনের যে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খা এগুলোও তাঁরই রূপ, কিন্তু এই রূপ যার লাগার তার লাগুক,

আমার লাগবে না। যেমন সাপ, সাপও তো ভগবানের একটি রূপ, সেই সাপ নিয়ে সাপুড়ে খেলা করে। তুমি কি সাপ নিয়ে খেলা করতে চাও? না প্রভু, আমি জানি তুমি এই সর্প রূপেও বিরাজমান কিন্তু তোমার এই সর্পরূপ আমার লাগবে না। তোমার সাপের লেজ রূপ এটাতেই আমি খুশী, অর্থাৎ তোমার সাপ রূপকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নাও। জগতে যত কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ সবই ভগবানের রূপ। স্বর্গ, নরক, পাতাল সব তাঁরই রূপ, বিজ্ঞানী, সিনেমার হিরো হিরোইন সবই তাঁর রূপ, ভগবানের বাইরে কিছু নেই, কিন্তু আমার এই রূপ লাগবে না। এখানে কোন ভাবনার আরোপ করার কিছু নেই, বিচার করার কিছু নেই, এটাই সত্য। তাহলে তুমি কি চাও? তোমার যেটা স্বরূপ, আমি সেটা জানতে চাই। জীবনের উদ্দেশ্যই তাই, ভগবানের স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা। সেইজন্য এখানে বলছেন জগৎকে যখন দেখবে তখন তাকে ভগবানের বিরাট রূপের প্রকাশ রূপে দেখবে। বিরাট মানে সমষ্টি রূপ।

ভাগবত গার্হস্থ ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম নিয়ে বেশী আলোচনা করে না। সংসার নিবৃত্তির কথাই ভাগবতে বেশী বলা হয়েছে। ভাগবতের মতে জীবনের উদ্দেশ্য হল ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ। সেই কারণে ভাগবত মূলতঃ মোক্ষ শাস্ত্র। মহাভারতে আবার বেশী জোর দেওয়া হয়েছে তুমি যেখানে যে অবস্থায় আছ সেখানে তোমাকে কি কি করতে হবে, কিভাবে করবে এই জিনিষগুলোর উপর। ভাগবতে এসব কিছু নেই। নারদ প্রথমেই ব্যাসদেবকে বলে দিচ্ছেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হল কর্মমুখীনতা, সেখানে আপনি আবার কর্মের প্রতি প্রেরণা দিয়ে গেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে একটি যুবক এসে প্রশ্ন করছে 'মা! বিয়ে করা কি খারাপ? শাস্ত্রে তো গৃহস্থধর্মের নিন্দা করা হয়নি বরং গৃহস্থ ধর্মের প্রশংসাই করা হয়েছে'। শ্রীশ্রীমা বলছেন 'হ্যাঁ বাবা! ঠিকই বলেছ, বিয়েতে খারাপ কি আর আছে, তুমি বিয়ে করবে, সংসার করবে এতে তো কোন খারাপ কিছু নেই'। যুবক ছেলেটি চলে যেতে একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞেস করছে 'মা! আপনি এই রকম কথা কি করে বললেন! আপনি কাউকে সন্ন্যাসী হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন আবার একে বিয়ে করে সংসার করতে উপদেশ দিলেন'? শ্রীশ্রীমা তখন বলছে 'কথামৃতে ঠাকুরের এত এত কথা আছে কিন্তু তার এই কথাটুকুতেই নজর গেছে। তার মানে ওর মনটা পুরো সংসারের দিকে। ওকে সন্ন্যাসের কথা বলে কোন লাভ নেই'। মানুষের শেষ গুরু তার নিজের মন। শাস্ত্রের কাজ হল মানুষের মনটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। সংসারী টাকার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে, বেকার যুবক চাকরীর জন্য ছুটোছুটি করবে, মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য কাজ করবে তাতো ধরেই নেওয়া হয়েছে। গীতা কখনই বলে না যে কর্ম কর, বলছে নিষ্কাম কর্ম কর। মানুষ কর্ম তো করবেই। যদি কোন কাজ না করে তাহলে বসে থাকবে। বসে থাকলে যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে সেটাও কাজ, মনের মধ্যে চিন্তা ভাবনা চলছে সেটাও কাজ। কাজের বাইরে কেউই যেতে পারবে না। তাই ভগবান গীতায় বলে দিলেন কাজ কর কিন্তু নিষ্কাম ভাবে কর। সামর্থে কুলালে অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ কর। স্বার্থশূন্য ভাবে কাজ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব, সেইজন্য অর্থ ও কামের প্রশংসা করার কোন অর্থই হয় না।

সেইজন্য ভাগবত ওই দিকে যাচ্ছে না। এর আগে বলা হয়েছিল, এই জগতে কেউই দুঃখ চায় না কিন্তু তাও সবার কাছে দুঃখ এসে হাজির হয়। ঠিক তেমনি আমি যদি নাও চাই আমার যা প্রাপ্য সেটা ঠিক আমার কাছে চলে আসবে, তাই আমার সুখ যদি প্রাপ্য থাকে তাহলে তা আসবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। তাই ভাগবত বলছে *অতঃ কবির্নামসু যাবদর্থঃ স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ। সিদ্ধেহন্যথার্থে ন যতেত তত্র পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ।।২/২/৩।* প্রারব্ধ বশতঃ আমার যেটা পাওয়ার সেটা যদি চলেই আসে, তাহলে সাংসারিক ক্ষেত্রে বৃথা পরিশ্রম করা নিরর্থক। কলকাতা শহরে মাঝে মাঝেই জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো কোন সময় দুদিন তিন দিনেও জলের সাপ্লাই ঠিক হয় না। এখন আমি যদি দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার জলের ট্যাঙ্ক খুলে দেখতে থাকি জল এলো কিনা, তাতে কি ট্যাঙ্কে জল আসতে শুরু করবে? কখনই না, জল যখন আসার তখন আপনা থেকেই আসবে আর জলের ট্যাঙ্কও আপনা থেকেই জলে ভরে যাবে। আমি যে বার বার নীচে নেমে জলের ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে দেখছি এই পরিশ্রম তো বৃথা। আসলে আমাদের বিশেষ কোন কাজ নেই, কাজ না থাকাতে মনটা জলের ট্যাঙ্কে পড়ে আছে। আমি যদি চাকরি করে থাকি, তাহলে যা মাইনে

পাওয়ার আমি সেটাই পাবো। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস হয় না। মনে করি আমি যদি একটু চেষ্টা চালাই তাহলে এর থেকে হয়তো একটু বেশী রোজগার করতে পারবো। চাকরি করার পর আমার হাতে কিছুটা সময় থাকে, আমি ঠিক করলাম টিউশনি করলে কিছু বেশী রোজগার হয়ে যাবে। এতে অবশ্যই আমার টাকা বেশী আসবে। চাকরি করে দশ হাজার টাকা পাচ্ছি, আর টিউশনি করে আরও হাজার টাকা বেড়ে গেল। তারপর দেখা যাবে, এতদিন আমি বাসে করে যাচ্ছিলাম, তখন ইচ্ছে হবে কিছু টাকা যখন বেশী আসছে তাহলে মাঝে মধ্যে ট্যাক্সি করেই যাই। আমার যা অতিরিক্ত টাকা আসছিল সেটা এখন ট্যাক্সির পেছনেই চলে যাচ্ছে। বছরে একবার করে বেড়াতে যাই, আগে স্লিপার ক্লাশে যেতাম এখন এসিতে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত থাকবে ওটাই, যেটা মাসের শেষে পাচ্ছিলাম, তার বেশী কখনই থাকবে না। জীবনে আমি যা কিছুই করি না কেন শেষে দেখতে হবে আমি কতটা ভালো মানুষ হয়েছি, এর বাইরে কিছু থাকে না। কিন্তু যদি কামিনী-কাঞ্চনের জন্য ছটফটানি থাকে, তখন এর প্রভাবটা মাথার মধ্যে থেকে যাবে। এই ছটফটানিটাই মাথাটা বিগড়ে দিয়ে চলে যাবে, আর এই বিগড়ানটাই স্থায়ী হয়ে থাকবে, আমি স্লিপার ক্লাশেই যাই আর এসিতেই যাই, বিগড়ানোটা থেকেই যাবে। তখন আবার নতুন কিছুর জন্য ছটফটানিতে মাথাটা বিগড়াতে থাকবে।

এই কারণে ভাগবত বলছে, একবার যদি বুঝে যাও তোমার প্রারব্ধে যেটা আছে সেটা তুমি পাবেই তখন তোমার এই ছটফটানিটা কমে যাবে। জোর করে তুমি যদি কিছু পেতে যাও তাহলে হয়তো অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তি হয়ে যাবে, কিন্তু এই প্রাপ্তির জন্য যতটা জোর লাগিয়েছিলে তত জোরে সেটাই তোমাকে মাটিতে ফেলে দেবে। তোমার যা প্রাপ্য সেটা তোমার কাছে আসবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। প্রারব্ধে থাকলে টাকা-পয়সা, নাম-যশ, কামিনী-কাঞ্চন সব আসবে, এই বোধটা একমাত্র আধ্যাত্মিক পুরুষদের হয়। সাংসারিক মানুষ যতই শাস্ত্র পড়ুক, যত কিছুই করে দেওয়া হোক না কেন, তাদের এই বোধটা কোন দিন হবে না। এই কারণেই সংসারীরা সারা জীবন ধরে শুধু ছুটেই মরছে।

মাঝে মাঝে ভাগবতে খুব কড়া ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। এখানেও খুব কড়া ভাষায় বলছেন – *সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধো হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্। সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ।।২/২/৪।* যদি সুবিস্তৃত ভূমিশয্যায় সুখে নিদ্রা যাওয়া যায় তাহলে তোমার দুগ্ধফেননিভ শয্যাযুক্ত পালঙ্কের কি দরকার? ভগবান প্রদত্ত নিজের বাহু থাকতে নরম বালিশের কি প্রয়োজন? হস্তাঞ্জলি দিয়েই যদি জল পান করা যায় তাহলে বহুবিধ ভোজনপাত্রের কিসে প্রয়োজন? যদি সাধারণ বস্ত্রেই লজ্জা নিবারণ হয়ে যায় তখন বহু মূল্যের বস্ত্রের কি দরকার? এই ধরণের আরও খুব কড়া কড়া কথা বলছেন। এখানে মূল বক্তব্য হল, আমাদের কাউকে না ঘুমিয়ে থাকার কথা বলা হচ্ছে না, খাওয়া-দাওয়া না করে থাকতে বলছেন না, সমস্ত কিছুই তুমি কর কিন্তু বাহুল্য বর্জন কর। অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলোর ব্যবহার বন্ধ করে দাও। এখানে কিন্তু ধরে নেওয়া হয়েছে তুমি ঈশ্বরের ভক্ত। সবার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে না। তুমি যদি ঈশ্বরের ভক্ত হও তাহলে তোমার উদ্দেশ্যে ভাগবত বলছে – ভগবান শ্রীহরি অবশ্যই তাঁর শরণাগতের সব সুবিধা অসুবিধার প্রতি নজর রাখছেন। একটা কথা আমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে, আমাদের শাস্ত্র কোথাও বলে না যে, ঈশ্বরকে ভক্তি করলে দিনে দিনে বড়লোক হয়ে যাবে। আমাদের একটা ভুল ধারণা কি ভাবে মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে, ঈশ্বরে ভক্তি করলে আমাদের সব জাগতিক সমস্যার রাতারাতি সমাধান হয়ে যাবে।

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোহপ্যশুষ্যন্। রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোহবতি নোপসন্নান্ কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্।।২/২/৫। ভাগবতের কি কঠোর বাক্য! পথে ঘাটে কি জীর্ণ বস্ত্রের টুকরো পড়ে থাকে না, যা দিয়ে তোমার লজ্জা নিবারণ করতে পার? বনজঙ্গলে বৃক্ষ কি ফলপ্রদান করে না, যা দিয়ে তুমি তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পার? তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নদী, সরোবর কি সব শুকিয়ে গেছে? বাসস্থানের জন্য কি পাহাড়-পর্বতের গুহার দরজা কি রুদ্ধ হয়ে আছে? আরে ভাই! ভক্তের জন্য অন্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি সদা সর্বদা তার সাথে সাথে অবস্থান করে তাকে রক্ষা করেন। তার থেকে

মারাত্মক কথা বলছেন – *ধনদুর্মদান্ধান্*, ক্ষমতার দম্ভে একেবারে যারা অন্ধ হয়ে আছে। শুধু মদান্ধ নয় দুর্মদান্ধ, এমন তার অহঙ্কার যে মনে করে আমার মত আর কেউ ধনী নেই। বড়লোকরা এই দুটোতে একেবারে অন্ধ হয়ে আছে, ধনে অন্ধ আর অহঙ্কারে অন্ধ। শুকদেব বলছেন *নোপসন্নান্ কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো*, যারা বুদ্ধিমান, বিবেকী পুরুষ তারা কেন শ্রীহরিকে ছেড়ে এদের তোয়াজ করতে যাবে? ধনীদের উচ্ছিষ্ঠ লাভের জন্য কেন এদের ভজনা করতে যাবে? ঠাকুর একজন ধনীকে স্পষ্ট ভাষায় সরাসরি বলে দিচ্ছেন – আমি তোমাকে রাজা টাজা বলতে পারবো না।

বার্টাণ্ড রাসেল 'মেজর বারবারা' নামে একটা বইতে বলছেন Every charitable organization has to live by selling themselves to the rich। যত দাতব্য সংস্থা আছে, আমাদের দেশে যত গুলো এনজিও আছে কিভাবে যে দুর্নীতিতে ছেয়ে আছে এগুলো কল্পনাই করা যায় না। ভাবছে সেবার কাজ করবো, সেবার কাজ করতে গেলে টাকা লাগবে, সেই টাকা কোথা থেকে আসবে? বড়লোকদের তোয়াজ করতে হবে। তাদের তোয়াজ না করলে টাকা আসবে না। বড়লোকরাও বিনা স্বার্থে টাকা দান করবে না, তারাও নিজেদের সুবিধার্থে এই সব সেবা সংস্থাগুলোকে কাজে লাগায়। এর থেকেও আরও নীচ কাজ হল যখন এরা নিজের জন্য বড়লোকদের তোয়াজ করতে নেমে পড়ে। ঠাকুর কথামৃতে বলছেন – গোবিন্দজীর মন্দিরের পূজারীদের আগে কি তেজ ছিল! রাজা তাদের ডেকে পাঠালে বলে দিত 'আমরা কেন রাজার সঙ্গে দেখা করব রাজার যদি প্রয়োজন হয় রাজা নিজে এসে দেখা করুক'। রাজা দেখলেন এদের শিক্ষা দিতে হবে। পুরোহিতদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। বিয়ের পর রাজাকে আর ডাকতেও হচ্ছে না, পূজারীরা কদিন বাদে বাদেই এসে রাজাকে বলছে রাজামশাই এই আপনার জন্য নির্মাল্য এনেছি, কারণ আজকে ছেলের অন্নপ্রাশন, কাল উপনয়ন। বড়লোকদের তোয়াজ করা, খাতির করা সব জায়গাতেই আছে। সাধুরাও বড় বড় মহন্তজীদের তোয়াজ করে – আপনার মত মহাত্মা আমি কোথাও দেখিনি। মহন্তজী খুশী হয়ে তাকে একটা দামী কম্বল দিয়ে দিলেন। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বরে ভক্তি লাভ হয় তাহলে কক্ষণ বড়লোকদের তোয়াজ করতে যাবে না, যারা মদান্ধ তাদেরকেও না আর যারা দুর্মদান্ধ তাদের তোয়াজ করা তো দূরে থাকে তাদের ধারে কাছেই কখন যাবে না।

এখানে বলছেন না যে তুমি দুর্মদান্ধদের থেকে দূরে থাকলে তোমার জাগতিক ভালো হবে, বলেই দিচ্ছেন তোমার ক্ষতি হবে। তখন তোমাকে খাটতে হবে, জমিতে শুতে হবে, দশটা কাপড়ের জায়গায় দুটো কাপড় জুটবে। কিন্তু তোমার জীবন যাপন যদি এই খাতে ঢেলে দাও তাতে তোমার আত্মসম্মান বাড়বে আর শ্রীকৃষ্ণে পুরোপুরি মন দিতে পারবে। আমাদের কখনই মনে করা উচিত হবে না যে, ঈশ্বরে ভক্তি করলে জাগতিক ভালো হবে। শাস্ত্র কোথাও এই কথা বলবে না। তবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, ঈশ্বরের ভক্তির প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ বাড়াবার জন্য এমন কিছু কিছু কাহিনী তৈরী করা হয়েছে যেখানে ভক্তের সব সমস্যা দূর করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায় শতকরা একজন কি দুজন ভক্তের ভালো হয়েছে আর বাকি আটানব্বুই জন ভক্তকে না খেয়ে মরতে দেখা গেছে। কিন্তু ঈশ্বরের ঠিক ঠিক ভক্তের এই দুঃখের জন্য মনে কোন খেদ নেই।

জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অন্বেষণ করা মনের চাঞ্চল্যতার লক্ষণ। এই অন্বেষণ বন্ধ করে সাধনার দিকে মন দাও। সাধনার পথে চলতে চলতে তোমার মন ধ্যানমুখী হবে। ধ্যান অভ্যাস করতে করতে যেমন যেমন তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ হবে তেমন তেমন তোমার মন স্থির হবে। এখানে শুকদেব ধ্যানের প্রাথমিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা করছেন। মন স্থির হওয়ার পর যখন ইষ্টের ধ্যান করবে তখন ইষ্টের একটি একটি অঙ্গের আলাদা করে ধ্যান করবে। প্রথমে তাঁর পাদপদ্মের ধ্যান করবে। পাদপদ্মের ধ্যান হয়ে যাওয়ার পর তাঁর হস্তকমলের ধ্যান করবে, এইভাবে প্রতিটি অঙ্গের ধ্যান করার পর তাঁর সর্বাঙ্গ অবয়বের ধ্যান শুরু করবে। শুকদেব বলছেন – *যাবন্ন জায়েত পরাবরেহস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ। তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত।।২/২/১৪।* আমাদের মাথায় রাখতে হবে যাঁর অবয়বের ধ্যান করছি তিনি দৃশ্য নন তিনিই দ্রষ্টা, স্বগুণ-নির্গুণ সবটাই তাঁর স্বরূপ। ঈশ্বর দর্শন কথাটা শুনে শুনে আমাদের ধারণা হয়ে আছে যে ঈশ্বর দর্শন

মানে ছবি বা মুর্তিতে আমি যে রূপ দেখছি তিনি সেই রূপে আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন। এভাবে কখনই ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বর কখনই দৃশ্য নন, তিনি সব সময় দ্রষ্টা। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন বোধে বোধ হওয়া। ঠাকুরের মা কালীর দর্শন হয়েছিল, তার মানে এই নয় যে মা কালী ঠাকুরের সামনে দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। এই বোতল আছে আর আমি আছি। বোতল হল দৃশ্য আমি তার দ্রষ্টা। বোতলের মত ঈশ্বর কখনই দৃশ্য হন না, ঈশ্বর দর্শনে ঈশ্বর সব সময় দ্রষ্টা। যেভাবে আমরা এই দৃশ্যমান জগতকে দেখছি এই অর্থে ঈশ্বর দর্শন হয় না। সেইজন্য সব সময় বলা হয় বোধে বোধ হওয়া। ঠাকুর যখন রামলালাকে অষ্টধাতুর মুর্তিতে দেখছেন তখন অন্যরা কেউ দেখতে পারছে না, দেখার কথাও নয়, অন্য কেউ যদি দেখে তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। বোধে বোধ হওয়া মানে, আমার যে চেতনা, যে চৈতন্য সত্তা, সেই চৈতন্য সত্তাতে ভাসমান হয়। কিভাবে ভাসমান হয়? ঈশ্বরের বৃত্তিটা এসে যায়, কিন্তু তিনি কখন দৃশ্য হন না, তিনিই দ্রষ্টা। আবার বলছেন তিনিই স্বগুণ তিনিই নির্গুণ। যা কিছু আছে সব তাঁরই স্বরূপ। ভক্ত যখন সাক্ষাৎ দেখেন তিনিই দ্রষ্টা, তিনিই স্বগুণ, তিনিই নির্গুণ আর এই জগৎ তাঁরই স্বরূপ, এটাই তখন ভক্তের প্রেমাভক্তির অবস্থা।

যত দিন এই প্রেমাভক্তির উদয় না হয় তত দিন সে কি করবে? তার নিত্যনৈমেত্তিক যত কর্ম আছে, সব কর্ম করার পর নিয়মিত ভাবে ঈশ্বরের স্থূল রূপের ধ্যান চিন্তন করে যাবে। এখানে এসে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের আধ্যাত্মিক পথের মধ্যে একটা বিরাট দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে। একটা মজার ব্যাপার হল সারা বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা সব থেকে বেশী, তারপরেই আসে খ্রীষ্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম হল তৃতীয়। কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যখন কোন কথা ওঠে, আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে যখন কেউ কিছু জানতে চায় তখন সবাই ভারতেই আসে। এর পেছনে কারণটা কি? এই যে এখানে একটা ভাব বলা হল, তিনিই স্বগুণ তিনিই নির্গুণ, তিনি দৃশ্য নন তিনি দ্রষ্টা আর জগতের সব কিছু তাঁরই স্বরূপ, এই জ্ঞান যতক্ষণ না তোমার উৎপন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তুমি ঈশ্বরের স্থূল রূপের চিন্তা করবে। ইসলাম প্রথমেই আল্লার স্থূল রূপকে সরিয়ে রেখেছে, আর যারা স্থূল রূপের কথা বলবে তারা কাফের। মুসলমানরা দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ছে ঠিকই, সবই করছে কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এইভাবে সে একজন বড় ধার্মিক পুরুষ হতে পারবে কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষ কোন দিন হতে পারবে না। তারা অবশ্য এটা মানবে না। মহম্মদ যে নির্গুণ নিরাকারের কথা বলছেন, তিনি ঠিকই কথা বলছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্লা বা ঈশ্বরের নির্গুণ নিরাকারের ধারণা খুব উচ্চস্তরের সাধকদের জন্য। আমাদের মত সাধারণ মানুষ যদি শুরুতেই নির্গুণ নিরাকারের সাধনা করতে যায় প্রথম দিনেই মুখ থুবড়ে পড়বে। আমাদের ঋষিরা এই ব্যাপারটা খুব ভালো করে জানতেন বলে তাঁরা প্রথমেই বলে দিচ্ছেন যতক্ষণ না তোমার বোধে বোধ হচ্ছে ততক্ষণ তোমাকে ভগবানের স্থূল রূপের চিন্তন করে যেতে হবে, স্থূল রূপের চিন্তন না করলে তোমার দুঃসাহসিক আধ্যাত্মিক অভিযান শুরুই হবে না।

অন্যান্য ধর্মের আরেকটা সমস্যা হল, যদিও কোন স্থূল রূপকে নিয়ে আসে তারা বলে দেয় এটাই ভগবানের একমাত্র স্থূল রূপ। সেই কারণে হাজারটা রূপ দাঁড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে সব রূপকেই তারা কেটে উড়িয়ে দেয়। হিন্দুরা প্রথমেই এই সমস্যাকে একেবারে শেকড় শুদ্ধু উপড়ে দিয়েছে। হিন্দুরা বলবে তুমি যে রূপই নিয়ে আসো না কেন সেটাই ঠিক। কিন্তু তোমাকে সব সময় মাথায় রাখতে হবে যিনি স্বগুণ তিনিই নির্গুণ, তিনি কোন অবস্থায় দৃশ্য হন না, সব অবস্থাতেই তিনি দ্রষ্টা। এটাই হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতার প্রাণ, তুমি বোধে বোধ করবে তিনি দৃশ্য নন তিনি দ্রষ্টা। এটাই বেদান্তের শেষ কথা। আর জগতের যা কিছু আছে সবটাই তাঁর স্বরূপ, স্বর্গটাও তাঁর স্বরূপ, পাতালও তাঁর স্বরূপ, পৃথিবীটাও তাঁর স্বরূপ, ভালোটাও তাঁর স্বরূপ মন্দটাও তাঁর স্বরূপ। এটা হল উচ্চতম বেদান্ত। যিশু যেমন বলছেন, আমিই যিশু সেই খ্রাইষ্ট, আমিই সেই বিশ্বাসঘাতক জুদাস্। দ্বৈতবাদী ধর্ম কক্ষণ এটা মানতে পারবে না, বুঝতেও পারবে না। একমাত্র হিন্দু ধর্মই সবার দৃষ্টি এই তত্ত্বের দিকে নিয়ে যাবে – যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ, জগতের যাবতীয় যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন। এটাকে আমাদের বোধে বোধ করতে হবে, কারণ তিনি দৃশ্য নন তিনি দ্রষ্টা। আর যতক্ষণ এটা বোধে বোধ না হচ্ছে ততক্ষণ তুমি তাঁকে স্থূল রূপে চিন্তন করবে। তার সাথে তোমার যত রকম দৈনন্দিন কর্ম আছে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সব নিষ্ঠা সহকারে করে যাবে। এগুলো করার পর ধ্যান করবে।

এটা একটা ধাপ গেল। পরের ধাপে বলছেন মনে যখন নানান রকমের কামনা-বাসনা থাকবে তখন বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করতে হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিই প্রধান, ভগবদ্ভক্তির সাথে কোন কিছুর তুলনা করা যাবে না। গীতাতেও ভগবান বলছেন যে আমার উপাসনা করে সে সব কিছুই পেয়ে যায়। তন্ত্রেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে, একই মন্ত্র জপ করে কেউ তার বিশেষ কামনা পূর্ণ করছে, সেই মন্ত্রেই অন্য জন্য মুক্তিও পেতে পারে। কিন্তু ভাগবতে বেদের পুরনো যে ধারণাগুলো ছিল সেগুলোকে আবার নিয়ে আসা হয়েছে। শুকদেব একটা বিরাট তালিক দিচ্ছেন – *ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণস্পতিম্। ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্।।২/৩/২।* যিনি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন তিনি বৃহস্পতির উপাসনা করবেন, যিনি কোন ইন্দ্রিয়ের বিশেষ শক্তি চাইছেন তিনি ইন্দ্রের উপাসনা করবেন আর যিনি সন্তান কামনা করছেন তিনি প্রজাপতির উপাসনা করবেন। এইভাবে এক এক করে বলে যাচ্ছেন, যে ঐশ্বর্য চাইছে সে মায়ার উপাসনা করবে, যে তেজ চাইছে তাকে অগ্নির উপাসনা করতে হবে আর যে টাকা-পয়সা চায় সে বসুদেবের উপাসনা করবে এবং বীর্যকামী ব্যক্তি রুদ্রগণের পূজা করবে। যে প্রচুর খাদ্যবস্তু চায় সে অদিতি, স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি দ্বাদশ আদিত্যের, রাজ্যাভিলাষী বিশ্বদেবের উপাসনা করবে। এইভাবে বিরাট লম্বা তালিকা দিয়ে বলে যাচ্ছেন আয়ু লাভের ইচ্ছা থাকলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, পুষ্টি কামনায় পৃথিবীদেবীর এবং প্রতিষ্ঠা চাইলে লোকমাতা পৃথিবী আর দ্যৌকে পূজা করবে। এই রকম বিরাট তালিকা দেওয়ার পর বলছেন – তবে কি যান *অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।২/৩/১০।* বুদ্ধিমান পুরুষ নিষ্কামই হোন আর সব রকম কামনা যুক্তই হোন অথবা মোক্ষকামীই হোন – তিনি তীব্র গভীর ভক্তিযোগ আশ্রয় করে কেবলমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকেই পূজা করবেন। তুমি সকাম সংসারী হতে পার, তুমি নিষ্কাম সংসারী হতে পার আর তুমি মোক্ষমার্গী হতে পার, তুমি যাই হও সবারই উদ্দেশ্য পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের আরাধনা করা।

এখানে খুব সুন্দর কাব্যিক ছন্দে বলছেন *জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।।২/৩/২৩।* যে মানুষ ভাগবভক্ত মহাপুরুষদের চরণধূলা কখন মাথায় নেয়নি সে জীবদ্দশাতেই মৃত আর ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদিত তুলসীপাতার পবিত্র গন্ধের আঘ্রাণে যার হৃদয় পুলকিত হয়নি সেই মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েও মৃত। আবার বলছেন *তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।২/৩/২৪।* ভক্তদের দ্বারা শ্রীহরির মঙ্গলময় নামের কীর্তন শুনে যার হৃদয় বিগলিত ও ভগবানের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়নি সেই ব্যক্তির হৃদয় পাষাণের মতই নিষ্প্রাণ, এদের ঈশ্বরে ভক্তি আসতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু শ্রীভগবানের নাম ও কথা শুনলে যাদের হৃদয় বিগলিত হয়, নয়নে প্রেমাশ্রু আসে ও শরীরে রোমাঞ্চ হয় এরাই ধন্য। ঠাকুরও ভগবদ্ভক্তির কথা বলতে গিয়ে এই কথাগুলোই বলেছেন।

শুকদেব কর্তৃক সৃষ্টির বর্ণনা *(স্রষ্টার স্বরূপ, ঈশ্বর ও মায়া, ব্রহ্মার জন্ম ও তপস্যা, পঁচিশ তত্ত্ব সহ ঈশ্বরের সাকার রূপ, ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য, তপস্যার গুরুত্ব, গুণ ও কর্মানুসারে ব্রহ্মার সৃষ্টি কার্য)*

যাই হোক এইসব কথাবার্তা হওয়ার পর পরীক্ষিতের ইচ্ছে হল সৃষ্টির ব্যাপারটা জানার। এরপর শুকদেব পরীক্ষিৎকে পুরো সৃষ্টির বর্ণনা করছেন। এখানে সৃষ্টির বর্ণনা করার আগে যিনি স্রষ্টা তাঁর বর্ণনা করছেন। ভাগবতে কয়েক অধ্যায়ের পরে পরেই সৃষ্টির বর্ণনা চলতে থাকে। আমরা খুব সংক্ষেপে ভাগবতের সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা করছি। শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সৃষ্টির বর্ণনা করতে গিয়ে স্রষ্টার স্বরূপের কথা বলছে – *স এষ আত্মহত্মবতামধীশ্বরস্ত্রয়ীময়ো ধর্মময়স্তপোময়ঃ। গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভির্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতম্।।২/৪/১৯।* যিনি ঈশ্বর, যিনি ভগবান তিনি কে? জ্ঞানীরা যাঁকে আত্মা বলেন তিনি সেইই। জ্ঞানী মানে বিজ্ঞানী, উপনিষদের যাঁরা ঋষি ছিলেন। আর ভক্তদের তিনি হলেন স্বামী। যারা কর্মকাণ্ডী, যারা পূর্বমীমাংসী, মণ্ডন মিশ্র প্রথম জীবনে যার প্রচারক ছিলেন, এদের জন্য তিনি হচ্ছেন বেদমুর্তিস্বরূপ। আর যারা শুধু ধার্মিক, শুধুই ধর্ম কর্ম করেন তাদের জন্য তিনি ধর্মমূর্তি স্বরূপ। যারা তপস্বী, তাদের কাছে তিনি

তপঃস্বরূপ। যার কাছে যেটা সর্বোচ্চ, তা সে যে পথ দিয়েই যাওয়া হোক না কেন, সব পথের সর্বোচ্চ পদ যেটা ভগবান সেটাই। আর এই রূপের চিন্তা করে ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রমুখ প্রধান দেবগণও কিছু বুঝতে না পেরে আশ্চর্যান্বিত হয়ে কেবল অনুমানই করতে থাকেন, হে পরীক্ষিৎ সেই ভগবান আমাদের অনুগ্রহ করুন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে কোথা থেকে শুরু বলা মুশকিল। অনেকে অবশ্য যেখান থেকে জন্মাদস্য শ্লোক শুরু হচ্ছে সেখান থেকেই ভাগবতের আরম্ভ ধরা হয়। তবে একেবারে ঠিক ঠিক কোন জায়গা থেকে ভাগবত শুরু হয় বলা খুব কঠিন। তবে মোটামুটি এই জায়গা থেকে ভাগবতের শুরু বলা যেতে পারে। ভাগবতের প্রায় প্রতিটি স্কন্ধেই সৃষ্টির বর্ণনা করতে থাকবে। সব জায়গাতে যে একই রকম সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে তাও নয়। বর্ণনার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও কয়েকটি জিনিষ সব সময় ঠিক থাকবে, যেমন ভগবান ছাড়া কিছু নেই এই তত্ত্বের কখন বিরোধ থাকবে না। আবার সুবর্ণ ডিমের কথাও সব বর্ণনার মধ্যে থাকবে। সৃষ্টি যখন শুরু হওয়ার উপক্রম হয় তখন কোথা থেকে যেন একটা সুবর্ণ ডিম উৎপন্ন হয়ে যায়। এরপর ওই সুবর্ণ ডিমটা একটা সময় ফেটে গিয়ে তার মধ্য থেকে ভগবানের সাকার শরীর বেরিয়ে আসে। তিনি সেই সুবর্ণ ডিমের মধ্যে শয়ন করে থাকেন আর সেখান থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। আমরা এক এক করে এগুলোর আলোচনা করতে থাকব। তবে আর যাই হোক না কেন, সবারই মূল কথা হল ভগবানই আছেন। কোথাও আবার সাংখ্যবাদীদের মতের উপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করছেন ভগবান নিজের মায়ার দ্বারা কিভাবে সৃষ্টি করেন। শুকদেব তখন রাজা পরীক্ষিৎকে বলছেন 'অনেক আগে নারদ এই প্রশ্ন ব্রহ্মাকে করেছিলেন'। ব্রহ্মার মন থেকে নারদের সৃষ্টি হয়েছিল বলে নারদকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়। শুকদেব যে এখানে ব্রহ্মাকে নারদের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছেন এর একটা মাহাত্ম্য আছে। শুকদেব যদি নিজে থেকেই রাজা পরীক্ষিৎকে বলতে শুরু করতেন সৃষ্টি এইভাবে হয়, তখন সেই কথার বিশেষ কোন দাম থাকবে না। যে কোন কথার দাম তখনই হবে যখন তা ভগবানের মুখের কথা হবে। সেইজন্য আমরা নিজে থেকে যদি কোন আধ্যাত্মিক কথা বলি সেই কথাগুলো কেউ মানবে না। শুকদেবের মত আজন্ম ত্যাগী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষও বলছেন ব্রহ্মা নারদকে যেমনটি বলেছিলেন আমি তোমাকে তেমনটি বলছি।

এখন মজার ব্যাপারে হল নারদ নিজেই একটা তত্ত্বকে উল্লেখ করে পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেছেন – *আত্মন্ ভাবয়সে তানি ন পরাভাবয়ন্ স্বয়ম্। আত্মশক্তিমবষ্টভ্য ঊর্ণনাভিরিবাক্লমঃ।। ২/৫/৫।* মাকড়সা যেমন সহজাত ভাবে অন্য কারো অপেক্ষা না করেই নিজের মুখ থেকে লালা নিঃসৃত করে খেলার ছলে জাল সৃষ্টি করে আবার নিজের মধ্যে গিলে নেয়, ঠিক তেমনি আপনিও বিনা আয়াসে নিজের শক্তিকে আশ্রয় করে এই সৃষ্টিটাও আপনার মুখ থেকে নিঃসৃত করেন তারপর এই সৃষ্টিকে আবার আপনার মধ্যে টেনে নেন। যদিও সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা করা হচ্ছে, কিন্তু এগুলো অতি সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে। কারণ বেদেই এই ধারণাটা এসে গিয়েছিল – যখন দেবতা, ঋষি এদের কারুই জন্ম হয়নি তখন কে জানবে যে সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে! ব্রহ্মার আগেই তো সৃষ্টি হয়ে গেছে, ব্রহ্মা তার আগে যদি থাকতেন তবেই তো তিনি জানতেন কিভাবে সৃষ্টি হল! এই ব্যাপারটা আচার্য শঙ্করও তাঁর গীতার ভাষ্যে এক জায়গায় উল্লেখ করে বলছেন যে, সৃষ্টির রহস্য কখনই বলা যায় না, তবে মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে উৎসুক বলে এইভাবে সৃষ্টির বর্ণনা করে তাদের মনকে শান্ত করে দেওয়া হয়।

নারদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা এক এক করে উত্তর দিতে দিতে এক জায়গায় এসে বলছেন *তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ। সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ।।২/৫/১৭।* ভগবান নারায়ণ হলেন দ্রষ্টা, তিনি কোন কিছুতে জড়ান না। তিনি সর্বনিয়ন্তা ও নির্বিকার হয়েও সর্বভূতাত্মা। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর ঈক্ষণ শক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়েই আমি তাঁর ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি রচনা করি। প্রায়শই যে ভগবানের ইচ্ছার কথা বলা হয়, এগুলো বলা হয় মানুষকে একটু অবলম্বন দেওয়ার জন্য। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা কখনই হয় না, তাহলে গোলমাল লেগে যাবে। কারণ তখন ভগবানের পক্ষপাত দোষ এসে যাবে। আমার

আপনার পক্ষপাত দোষ আসুক তাতে কিছু এসে যাবে না। ব্রহ্মা তাই বলছেন তিনি দ্রষ্টা মাত্র, কিন্তু ঈশ্বর, সব কিছুর প্রভু। তিনি আর কি কি? তিনি নির্বিকার অথচ সব কিছুর স্বরূপ তিনিই। তিনিই ব্রহ্মাকে সৃজন করে এই সৃষ্টি রচনার দায়ীত্ব দিয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, কোন অনুষ্ঠান বাড়ির ভাঁড়ারে একজনকে দায়ীত্ব দিয়ে দেওয়ার পর বাড়ির কর্তা আর ভাঁড়ারে যান না। কর্তার কাছে কেউ কিছু চাইতে গেলে কর্তা ভাণ্ডারীকে দেখিয়ে দেন। তিনি কর্তাই আছেন কিন্তু ভাঁড়ারে একজনকে দায়ীত্ব দেওয়ার পর আর ভাণ্ডারীর কাজে কখন নাক গলাতে যাবেন না। ভগবানও ঠিক সেই রকম, তিনি সৃষ্টির দায়ীত্বটা ব্রহ্মাকে দিয়ে দিয়েছেন।

ভগবান হলেন ত্রিগুণাতীত, *সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ। স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ।।২/৫/১৮।* ভগবান তিনটে গুণের বাইরে হয়েও সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করার সময় সত্ত্ব, রজ ও তমো এই তিনটে গুণের আশ্রয় নেন। এইসব জায়গায় এসে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। এই তিনটে গুণ কার? এই তিনটে গুণ কি ভগবানের বাইরে না ভেতরে? বেদান্ত সব থেকে বড় সমস্যায় পড়ে ঠিক এই জায়গাতে এসে – ভগবান আর তাঁর তিনটে গুণের মধ্যে সম্পর্ককে নিয়ে। এই তিনটে গুণ কোথায় ছিল, কোথা থেকে এল? ভগবানের বাইরে যদি থাকে তাহলে সেটা দ্বৈতবাদ হয়ে যাবে, আর ভগবানের ভেতরে যদি থাকে তাহলে ভগবানে মল এসে যাবে। সেইজন্য শেষমেশ যেটা দাঁড়ায় সেটা হল শুদ্ধ বেদান্ত। শুদ্ধ বেদান্ত মানে মায়া, সবটাই তাঁর মায়া, মানে কল্পনা, আছে অথচ নেই। মায়াকে তাই বলা হয় অনির্বচনীয়, মুখে স্পষ্ট করে বলা যায় না। কিন্তু তার পরের ধাপ থাকে দৃশ্যমান জগৎ রূপীতে যে রূপান্তর দেখি, তা একেবার সত্যিকারের, চোখের সামনে জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ হচ্ছে। অথচ তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি এই তিনটে গুণকে আশ্রয় করে সৃষ্টি রচনা করে চলেছেন। তন্ত্রের শিব আর শক্তি আর পুরাণের ভগবান আর এই তিনটে গুণকে আশ্রয় করা একই জিনিষ। কিন্তু সমস্যা হয়, একদিকে এই জগতকে আমরা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দিয়ে পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করছি আবার অন্য দিকে ধ্যানের গভীরে দেখছি ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। এই দুটোর মিলনটা কিভাবে আর কোথায় হয়? এই প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই পাওয়া যায় না। একই ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ অবস্থায় তিনি দেখছেন এই জগৎ, সেই শ্রীরামকৃষ্ণই আবার দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। ঈশ্বর থেকে জগতের যে রূপান্তরটা হচ্ছে সেটা কি করে হচ্ছে? এই প্রশ্নে এসে বিভিন্ন দর্শনের জন্ম হয়। কেউ বলে তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। কেউ বলে তিনি মাটি থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের সাধারণ বোধ বুদ্ধি দিয়ে যখন বিচার করতে থাকব তখন বেদান্তের মায়াটাই ঠিক মনে হবে। সবই মায়া, স্বরূপের দিক থেকে একমাত্র তিনিই আছেন। কিন্তু তাঁর শক্তি বা মায়াতেই তিনিই নানান রূপে নিজেকে দেখাচ্ছেন। এই রূপ পরিবর্তনটাই মায়া।

ব্রহ্মা এখানে নারদকে বলছেন *কার্যকারণকর্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ। বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ।।২/৫/১৯।* ভগবান যখন এই তিনটে গুণ গ্রহণ করেন, তখন এই তিনটে গুণ তিনটে জিনিষকে আশ্রয় করে। এই তিনটে হল দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া। সত্ত্ব, রজ ও তমো এই তিনটে জিনিষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার জন্য যিনি ভগবান, যিনি নিত্যমুক্তশুদ্ধ, আত্মা যিনি, তাঁর মধ্যে তিন রকমের অভিমান এসে যায় – কার্য, কারণ ও কর্তৃত্ব। মনে করুন আমি হলাম নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, আমার ভেতরই মায়া আছে, এই মায়া কিন্তু আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না। ঠাকুর যেমন বলছেন, সাপের মুখে বিষ আছে কিন্তু সাপের তাতে কিছু হয় না, কিন্তু যাকে ছোবল দেবে তার উপর বিষ কাজ করবে। এবার আমি ঠিক করলাম আমি খেলা করব। কিভাবে খেলা করব? আমার ভেতরে যে মায়া আছে, সেই মায়াকে আমি ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম। মায়া আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজ ও তমো দিয়ে আমাকেই ঘিরে ফেলছে। সত্ত্ব হল সাম্য, রজ হল ক্রিয়াশীল আর তমো হল জড়। এই তিনটে গুণের আশ্রয় হল দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া। এবার এই তিনটে আশ্রয় আমার সামনে নাচতে শুরু করে দিল আর ওই নাচের প্রভাব আমার মধ্যে তিনটে সংস্কারের সৃষ্টি করছে – একটা হল কার্য, এবার কাজ শুরু হল, দ্বিতীয় কারণ, প্রত্যেক কার্যের পেছনে একটা কারণ থাকে আর তৃতীয় হল ওই কার্যের একজন কর্তা আছেন। এই যে তিনটে আশ্রয় দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া এরা আমার মধ্যেই ছিল, আমার থেকে আলাদা নয়, এরা বেরিয়ে আমার সামনে নাচ

করতে শুরু করল। এবার আমি পরিষ্কার দেখতে পারছি যে ক্রিয়া হচ্ছে, এই ক্রিয়ার পেছনে একটা কারণ আছে, কি কারণ? নাচ করছে। আর তার সঙ্গে আমার অভিমান জুড়ে যাচ্ছে। কিসের অভিমান? কর্তার অভিমান, আমি এই নৃত্য উপভোগ করছি। এবার আমি মোহগ্রস্ত হয়ে গেলাম। এখন যেমন যেমন নাচ করতে থাকবে তেমন তেমন আমার ভেতরে নানান ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করবে। কোন নাচে আমি আনন্দ পাচ্ছি, কোন নাচ এমন হল যার জন্য আমি দুঃখ পেতে শুরু করলাম। কিন্তু আমি যখনই এই খেলা বন্ধ করতে চাইব তখনই এই মায়াকে আমার ভেতরে চলে আসতে বললেই চলে আসবে।

এই মায়া যখন ভগবান থেকে বেরিয়ে আসে তখন মায়ার এই পার থেকে আর ভগবানকে দেখা যাবে না। কারণ মায়ার আবরণ এসে যায় বলে ভগবানের স্বরূপ আবৃত হয়ে যায়। এদিকে আবার বলছেন *কালং কর্ম স্বভাবং চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া। আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদবে।।২/৫/২১।* এই ভাবটাও বেদ থেকেই এসেছে। মায়ানিয়ন্তা ভগবান একাই ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে তাঁর ইচ্ছে হল আমি এক আমি বহু হব। কেন তাঁর এই ইচ্ছে হল এরও কোন উত্তর নেই। এক থেকে বহু হওয়ার এই ইচ্ছে হতেই তিনি কয়েকটি জিনিষ গ্রহণ করে নেন। এগুলো হল কাল, কর্ম আর স্বভাব। কাল মানে সময় আর স্বভাব মানে প্রকৃতি। কেন ইচ্ছে হল, কেন এগুলো গ্রহণ করেন প্রশ্ন করলে আমাদের ঋষিরা বলেন এগুলো তাঁর খেলা। অনেক সময় বলেন তাঁর কি ইচ্ছা আমরা কি করে জানব, সবই মায়া। মায়া মানে এগুলো কিছুই নেই, সত্যিই তাই ভগবান ছাড়া তো কিছু নেই।

যাই হোক আমরা সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা যখন করছি তখন এটাকেই আধার করে চলতে হবে। ভগবান যখন কালের জন্ম দিলেন তখন এই কাল ওই তিনটে গুণের মধ্যে একটা ক্ষোভের জন্ম দেয়। তার আগে এই তিনটে গুণ একেবারে সাম্য অবস্থায় শান্ত ছিল, কালের জন্ম হতেই এই তিনটে গুণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে গেল। চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতেই এই তিনটে গুণ থেকে মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এরপর এক এক করে বিভিন্ন তত্ত্বের সৃষ্টি হতে শুরু করে। এগুলো আমরা পরে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করব। খুব সহজ ভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে, ভগবান যখন সৃষ্টি করতে চাইলেন তখন প্রকৃতি যেন তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। তিনি ও তাঁর প্রকৃতি কখন আলাদা নন। গীতাতে ভগবান বলছেন আমার দুটো রূপ পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি, একটা চৈতন্য স্বরূপ (পরা প্রকৃতি) আরেকটি জড় স্বরূপ (অপরা প্রকৃতি)। এই জড় প্রকৃতি যখন বেরিয়ে আসে তখন তার মধ্যে যেন একটা কম্পন শুরু হয়। এই কম্পন থেকেই সৃষ্টি শুরু হয়। সৃষ্টির ব্যাপারে ঋষিরা যত রকম তত্ত্ব দিয়ে গেছেন, ভাগবতে এসে যেন সব কটি তত্ত্বকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে ভগবান নিজেই সব কিছু সৃষ্টি করেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মে ভগবান নিজে কখন সৃষ্টির কাজে থাকেন না, তিনি ব্রহ্মাকে জন্ম দিয়ে তাঁর উপরই সৃষ্টির দায়ীত্বটা দিয়ে দেন।

এর আগে আমরা চব্বিশ অবতারের কথা বলেছিলাম। এখানে আবার বিভিন্ন অবতার আর তাদের লীলার কথা পুনরায় পরীক্ষিৎকে বলা হচ্ছে। শুকদেবকে রাজা পরীক্ষিৎ সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করছেন আর শুকদেব তার উত্তর দিয়ে চলেছেন। এর মধ্যে যেগুলি আমাদের জানা খুব প্রয়োজন সেগুলোই আমাদের সবার সুবিধার্থে সহজ করে আলোচনা করা হচ্ছে। ভাগবতকে যদিও ভক্তিশাস্ত্র বলা হয় কিন্তু ভাগবত আবার এমন এমন ঘোর অদ্বৈতের কথা বলে তখন মনে হয় যেন আমরা উপনিষদ পড়ছি। সৃষ্টির প্রসঙ্গে প্রথমেই শুকদেব বলছেন – *আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ। ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা।।২/৯/১।* স্বপ্নে দৃষ্ট দৃশ্যাবলীর সাথে স্বপ্নদ্রষ্টার যেমন কোন সম্বন্ধ থাকে না, ঠিক তেমনি দেহাতীত অনুভবস্বরূপ আত্মার সাথে দৃশ্যমান বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন মায়া ছাড়া সম্ভবই নয়। মায়ার জন্যই জীব নিজেকে বিভিন্ন রূপের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে 'এটা আমি' 'এটা আমার' এই অভিমান করে। আসলে বলতে চাইছেন সৃষ্টি রূপে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সবই ঈশ্বরের মায়া। সেই ঈশ্বর কিভাবে সৃষ্টি করেন? তিনি অনন্ত শয়নম্, ক্ষীরসাগরে শুয়ে আছেন। আর তিনি যখন চিন্তা করেন যে এবার সৃষ্টি হবে, তখন ব্রহ্মার জন্ম হয়। বলা হয়, নারায়ণ, যিনি ঈশ্বর, তিনি জলের উপরে শুয়ে আছেন, তিনি যখন চিন্তা করলেন যে সৃষ্টি হবে, তখন তাঁর নাভি থেকে একটি

প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুল উৎপন্ন হল। সেই পদ্ম ফুলের মধ্যে প্রথম সৃষ্ট হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা পদ্মের উপর বসে আছেন। তা ব্রহ্মাও কিছু বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কি হল।

ত্রিলোকের আদিদেব ব্রহ্মা জন্ম নিয়ে জগৎ সৃষ্টির উপায় চিন্তা করছিলেন। তিনি জানেন সৃষ্টি কার্যের জন্যই তাঁর জন্ম কিন্তু যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার হবে তা তিনি তখনও পাননি। চুপচাপ বসে বসে ভাবছেন কিভাবে সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। *স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভস্যুপাশৃণোদ্ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ। স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ ধনং বিদুঃ।।২/৯/৬।* এই রকম চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন সেই প্রলয়কালীন সমুদ্রের ঢেউ যেন গুঞ্জন করে ব্যঞ্জনবর্ণের ষোলতম আর একুশতম দুটি বর্ণের উচ্চারণ করল। ব্যঞ্জনবর্ণের ষোলতম বর্ণ 'ত' আর একুশতম বর্ণ 'প', মানে 'তপঃ' 'তপঃ'। দুবার ব্রহ্মা এই তপঃ তপঃ শুনতে পেলেন। ভাগবতের এখানে বলা হচ্ছে, যারা ত্যাগী '*নিষ্কিঞ্চনানাং*' – যাঁর কোন কিছু নেই, তাঁদের এটাই '*নৃপ যদ্ ধনং বিদুঃ*' – যাঁরা সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন, যাঁরা তপস্বী, যাঁরা নিষ্কাম ভক্ত, যা কিছু অর্জন করেছিলেন সেটাও ফেলে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে তপঃই সম্পদ, তাঁরা এই তপঃ কে কখনই ছেড়ে দেন না।

ব্রহ্মা তখন ভাবলেন, আমি এখানে একা আছি, কোথাও কিছু নেই, কিন্তু কোথা থেকে এই 'তপঃ' শব্দ ভেসে এল, এই শব্দের উদ্গাতা কে। তিনি তপঃ শব্দের উৎস অনুধাবন করবার জন্য চারিদিকে তাঁর মুখটাকে ঘোরালেন। কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। চার দিকে মুখটা ঘোরালেন বলে তাঁর চতুর্মুখ হয়ে গেল। ব্রহ্মা বুঝলেন তাঁকে যেন আদেশ করা হচ্ছে তুমি তপস্যা কর। তারপর তিনি ধ্যানে ডুবে গেলেন। ধ্যানে ডুবে গিয়ে তিনি এক হাজার দিব্য বছর যাবৎ এমন তপস্যা করলেন যে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ তাঁর সামনে এসে আবির্ভূত হলেন। এখানে ভাগবত ভগবান নারায়ণের খুব সুন্দর তাত্ত্বিক বর্ণনা দিচ্ছে। ব্রহ্মা দেখছেন অতি সুন্দর এক আসনে ভগবান অধিষ্ঠান করে আছেন। অনেক কিছুর বর্ণনা করে বলছেন *অর্হ্যহণীয়াসনমাস্থিতং পরং বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ। যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্।। ২/৯/১৬।* এখানে এসে ভাগবত আবার সাংখ্য দর্শনকে মিশিয়ে দিয়েছে। ভগবান খুব সুন্দর অতি উত্তম বহুমূল্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আছেন। পুরুষ সহ পঁচিশটি শক্তি দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিতে হয়ে আছেন। সাংখ্য মতে আমরা জানি চব্বিশটি তত্ত্ব হয়। এগুলো হল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব (Cosmic Mind), অহংকার(Cosmic Ego), পাঁচটি তন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পঞ্চভূত (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী), এই পঞ্চভূত থেকে জন্ম নেয় দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন। সাংখ্যের চব্বিশ তত্ত্বের সাথে এখানে পুরুষকেও একটি তত্ত্ব হিসাবে ধরে পঁচিশ তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য দর্শন থেকে ভাগবত এখানে এসে আলাদা হয়ে যাচ্ছে কারণ পুরুষকেও এনারা তত্ত্ব হিসাবে রেখেছেন। সাংখ্য পুরুষকে কখনই তত্ত্ব বলে মানবে না, কিন্তু ভাগবত মতে পুরুষ মানে আত্মাকেও একটি তত্ত্ব হিসাবে গণ্য করে পঁচিশ তত্ত্বের কথা বলছে। গীতাতেও পুরুষ হলেন পরা প্রকৃতি আর বাকি চব্বিশটি তত্ত্ব হল অপরা প্রকৃতি। ব্রহ্মা যখন ভগবানকে দেখছেন তখন তাঁর মধ্যে এই পঁচিশটি তত্তকেও দেখছেন। এই পঁচিশটি তত্ত্বের সাথে ভগবানের মধ্যে ছয় রকমের নিত্যসিদ্ধ শক্তিকে ব্রহ্মা দেখতে পাচ্ছেন। এই ছয়টি শক্তি সব সময় তাঁর সঙ্গে যুক্ত, এই শক্তি ভগবানকে কখনই ছেড়ে যায় না। এই ছয়টি শক্তি হল ঐশ্বর্য, ধর্ম, কীর্তি, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। আচার্য শঙ্করের তালিকায় আবার অন্য ভাবে দেওয়া হয়েছে। আসলে ভাগবতের শ্লোকগুলো এমন কঠিন যে, যে যেমন চাইবে সেই রকম ব্যাখ্যা করে দিতে পারবে। আচার্য শঙ্করের মতে ভগবানের ছয়টি শক্তি জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ ভগবানের সাথে সর্বদা যুক্ত হয়ে আছে। মূল কথা হল ভগবানের কখন অজ্ঞান হয় না তার মানে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান কখন চলে যাবে না আর শক্তির হ্রাসও কখন হয় না। এর সাথে ভগবান সব সময় ঐশ্বর্য যুক্ত। এই তিনটে জিনিষ থাকলে বাকি গুলো তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই এসে যায়। যেমন বৈরাগ্য জ্ঞানেরই অঙ্গ আর বল, বীর্য ও তেজ এগুলো শক্তিরই অঙ্গ।

ব্রহ্মা দেখছেন যত দৃশ্য অদৃশ্য বস্তু হতে পারে সবই ভগবানের শরীরে বিদ্যমান। ব্রহ্মা ভগবানের দর্শনে আপ্লুত হয়ে প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবানের চরণকমলযুগলে মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন। ভগবান নারায়ণ তাঁর সেই দিব্য স্মিত হাস্য মুখে ব্রহ্মাকে বললেন দেখো তোমার মনে সৃষ্টির সঙ্কল্প জেগেছে, সেইজন্য তুমি নিষ্কপট ভাবে তপস্যা করেছ। *মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্। যদুপশ্রুত্য রহসি চকর্থ পরমং তপঃ।। প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র ত্বয়ি কর্মবিমোহিতে। তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোঽনঘ।। সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ। বিভর্মি তপসা বিশ্বং বীর্যং মে দুশ্চরং তপঃ।।২/৯/২১-২৩।* সৃষ্টি করতে গিয়ে তপস্যা করবো কি করবো না ভেবে তুমি যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হচ্ছিলে সেইজন্য আমিই তোমাকে তপস্যা করার আদেশ করেছিলাম। তুমি আমাকে না দেখেই, শুধু আমার বাণী 'তপঃ' এই কথা শুনেই এই ঘোরতম কঠোর তপস্যা করেছ, আমি তোমাকে শুধু মাত্র আদেশ করেছিলাম, তাতেই তুমি ঘোর তপস্যা করলে, তাই আমি তোমার উপর খুব প্রসন্ন হয়েছি। বল, তুমি কি বর চাও। ভগবান তপস্যাকে নিয়েই বলে যাচ্ছেন। মহাভারতেও তপস্যার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে, আর বাল্মীকি রামায়ণ শুরুই হয় তপঃ শব্দ দিয়ে। ভগবান খুব সুন্দর বলছেন 'তপস্যাই আমার হৃদয়, আমিই তপস্যার আত্মা'। ভগবান গীতাতেও বলছেন *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানীই আমার আত্মা। তপস্যাই শুদ্ধ জ্ঞান। 'তপস্যা দ্বারাই আমি এই জগতের সৃষ্টি করি, তপস্যা দিয়েই আমি এই জগতকে ধারণ করি আর তপস্যা দিয়েই আমি এর লয় করি। তপস্যা আমার এক দুর্ল্লঙ্ঘ্য মহাশক্তি'। তপস্যা হল কোন একটা জিনিষকে নিয়ে সেটাতেই মনকে কেন্দ্রীভূত করে রাখা। একটা মাত্র জিনিষকে ধরে রেখে বাকি সব কিছুকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা সবাই কিছু না কিছুর জন্য তপস্যা করে যাচ্ছি। কেউ একটা ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য সব কিছু ছেড়ে উঠে পড়ে চারিদিকে দৌড়াচ্ছে, যার চাকরি আছে সে আরও বেশী টাকা কি করে উপার্জন করবে তার জন্য আরও ভালো চাকরি খুঁজছে, যার সন্তান নেই সে সন্তান পাওয়ার জন্য কত কি না করে যাচ্ছে। জাগতিক বিষয় লাভের জন্য মানুষ যখন তপস্যা করে তখন সেই তপস্যা যে বিফলে যাবে তা নয়, সেও এই তপস্যার ফল পাবে। কিন্তু ভগবানের জন্য যখন তপস্যা করা হয় তখন তার মধ্যে যে শক্তির উন্মেষ হয় সে এক দুর্ল্লঙ্ঘ্য শক্তি, এই শক্তির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। ভগবান নিজে বলছেন তপস্যা আমার এক দুর্ল্লঙ্ঘ্য মহাশক্তি। ভগবানের জন্য যখন তপস্যা করা হয় তখন সেই তপস্যাটাই ভগবানের হৃদয়। তপস্যা আর ভগবান অভেদ। ঠাকুরও বলছেন, সবাই মাগ ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে, ভগবানের জন্য কে চোখের এক ফোঁটা জল ফেলছে!

এই যে ভগবান এখানে বলছেন তুমি আমাকে না দেখেই, শুধু আমার বাণী শুনেই এমন কঠোর তপস্যা করলে এর জন্য আমি সত্যিই তোমার উপর খুব প্রসন্ন হয়েছি। এটিও ভক্তদের জন্য খুব প্রেরণাদায়ক কথা। ভক্ত তো ঈশ্বরকে দেখেনি, শুধু ঈশ্বরের কথা শুনে তার মনে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে। মঠের সন্ন্যাসীরা তো ঠাকুরকে না দেখে তাঁর দু চারটে কথা শুনে সব কিছু ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। সন্ন্যাসীদের ত্যাগ বৈরাগ্য তাই অনেক বেশি। রাজা মহারাজরা তো ঠাকুরকে দেখে তাঁর ভালোবাসা পেয়ে সব ছেড়ে এসেছিলেন। এখানেও ঠিক তাই, নারায়ণের দুটো কথা শুনেই ব্রহ্মা কি কঠিণ তপস্যা করলেন।

ব্রহ্মা আবার বলছেন 'আপনি নিজের মায়াকে আশ্রয় করে খেলার ছলে নিজেকেই অনেক রূপে রূপান্তরিত করে দেন, এর জন্য আপনাকে কোন চেষ্টাও করতে হয় না। আমি যখন সৃষ্টি করব তখন আপনারই রূপকে আমি পরিবর্তন করব'। ব্রহ্মাও ভগবান থেকেই জন্ম নিয়েছেন, তিনিও ভগবানের বাইরের কোন কিছু নন। যাই হোক ব্রহ্মা বলছেন *যাবৎ সখা সখ্যুরিবেশ তে কৃতঃ প্রজাবিসর্গে বিভজামি ভো জনম্। অবিক্লবস্তে পরিকর্মণি স্থিতো মা মে সমুন্নদ্ধমদোঽহমানিনঃ।।২/৯/২৯।* হে প্রভু! আমি বুঝেছি যে আমাকে সৃষ্টি কার্য করতে হবে, তবে আপনি আমাকে এই আশীর্বাদ করুন, আমি যখন সৃষ্টি রচনার কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করব, তখন এর আগের আগের সৃষ্টি কার্য যেভাবে হয়েছিল, আমি যেন সে ভাবেই পূর্বকল্পের গুণ ও কর্মানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম রূপে প্রাণীগণকে বিভাজন করে সৃষ্টি করতে পারি। আর নিজেকে জন্ম, কর্ম থেকে স্বাধীন মনে করে আমি যেন কখন এই অহঙ্কার করে না বসি যে আমিই এই সৃষ্টি করেছি।

এই শ্লোকটা আবার খুব গুরত্বপূর্ণ এবং খুব জটিলও। এই শ্লোককে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এর সহজ ব্যাখ্যা হল, ব্রহ্মা এখন সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মা যখন বাঘের সৃষ্টি করবেন তখন বাঘের একটা গুণ ও কর্ম আছে, বাঘ স্বভাবে হিংস্র জীব। তাই বাঘ যেন তার স্বভাবেই থাকে, বাঘ যেন ছাগলের মত ব্যবহার করতে না শুরু করে। মানুষকে সৃষ্টি করার পর সে যেন মানুষের মতই আচরণ করে। এখন মানুষ যেমন এমন এমন গান তৈরী করছে সেটা গান না আর্তনাদ বোঝাই দুষ্কর, এমন পেইন্টিং বানাচ্ছে সেটা মানুষের ছবি না ভাল্লুকের ছবি বোঝাই যায় না, জিজ্ঞেস করলে বলবে এটাই মডার্ন আর্ট। ব্রহ্মা তাই বলছেন আমি যেন মডার্ট আর্ট বানাতে না নেমে পড়ি। দ্বিতীয় বলছেন সৃষ্টি কার্য করতে গিয়ে আমার মধ্যে যেন অহঙ্কার না জন্মায়। সৃষ্টির কাজ কিনা, অহঙ্কারের ভাব আসবেই। ছেলে-মেয়ে যখন ভালো রেজাল্ট করে তখন বাবা-মার গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে, সন্তান তাদের নিজের সৃষ্টি কিনা। মায়েরা পর্যন্ত নিজের সন্তানকে বলে – তোমার জন্য আমি কত কি করেছি জানো! একটা কবিতা যদি কোন রকমে লিখে দিতে পারে তারপর সবাইকে না শোনান পর্যন্ত তার ঘুম আসবে না। অপরকে শুনিয়ে তার আনন্দ হয়, এই আনন্দটা অহঙ্কার থেকে আসে। ব্রহ্মা তাই বলছেন সৃষ্টির কাজ করতে গিয়ে আমার মধ্যে অহঙ্কারের ভাবটা যেন না আসে। ভাগবতের বেশীর ভাগ শ্লোকই বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যা। এখানে এটাই বলতে চাইছেন যে ভগবান কখনই সৃষ্টি করেন না, তিনি ব্রহ্মাকে দিয়ে তাঁর সৃষ্টি কার্য চালান। আমাদের মনে রাখতে হবে এখন আমরা বিষ্ণুপুরাণে আছে। বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মাকে নারায়ণের থেকে একটু ছোট করবেই।

চতুঃশ্লোকী ভাগবত

ভগবান বলছেন *জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ্ গদিতং ময়া।। যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।২/৯/৩০-৩১।* 'আমি তোমাকে আসল গুহ্য কথাটা বলে দিচ্ছি, এটি যদি তুমি বুঝে নিতে পার তাহলে তোমার আর কর্তৃত্বের অভিমান হবে না। আর এই গুহ্য কথার সাহায্যে আমার যে স্বরূপের জ্ঞান, আমার যে বিস্তার, আমার যত রূপ হতে পারে আর আমার গুণ ও লীলা সবই তুমি আমার আশীর্বাদে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে'। এখান থেকেই চতুঃশ্লোকী ভাগবত শুরু হয়। চতুঃশ্লোকী ভাগবত মানে চারটে শ্লোক, ব্রহ্মসূত্রে চারটে সূত্রকে বলা হয় চতুঃসূত্রী, ঐ চারটে সূত্র যদি কেউ ভালো ভাবে বুঝে নিতে পারে তাহলে ব্রহ্মসূত্র কি বলতে চাইছে সেটা বুঝে যাবে। ঠিক সেই রকম কেউ যদি ভাগবতের এই চারটে শ্লোককে ঠিক ঠিক বুঝে নেন তাহলে ভাগবত কি বলছে বুঝে নেবেন। এখানে সংক্ষেপে আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতের আলোচনা করছি। ভক্ত সাধকদের এই চারটি শ্লোক নিত্য পাঠ করা উচিৎ।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।২/৯/৩২
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাঽভাসো যথা তমঃ।।২/৯/৩৩
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।।২/৯/৩৪
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাঽঽত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।২/৯/৩৫

পুরো ভাগবতের সার এই চারটি শ্লোকে বলে দেওয়া হয়েছে। ভগবান এর আগেই ব্রহ্মাকে বলে দিলেন আমার পরম গুহ্য তত্ত্ব আমি তোমাকে বলে দেব। এসব শ্লোকের ভাব হল ধ্যানের বিষয়। ভগবান বিষ্ণু বলছেন 'সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমি, শুধু আমিই ছিলাম। আমা ব্যতিত না কিছু স্থূল ছিল, না কিছু সূক্ষ্ম ছিল, না এই দুটোর কারণস্বরূপ অজ্ঞান ছিল'। সৃষ্টির পূর্বে মানে এখন ব্রহ্মা এসে গেছেন, তার মানে ব্রহ্মারও আগের

কথা। সৃষ্টির আগে ভগবানই ছিলেন, অর্থাৎ ভগবানের সত্তার কখন নাশ হয় না। এখানে বলতে চাইছেন প্রথমে ভগবান, ভগবানের পরে অজ্ঞান, অজ্ঞানের পরে স্থূল ও সূক্ষ্ম। আর যেখানে এই সৃষ্টি নেই? এর প্রকৃত অর্থ, সৃষ্টি সব জায়গায় নেই, শুধু যে সৃষ্টিতেই ভগবান আছেন তা নয়, সৃষ্টির বাইরেও ভগবান আছেন। আর যেখানে যেখানে সৃষ্টি আছে, যেমন আজকাল ফিজিক্স বলছে the expanding universe কিন্তু universe কোথায় expand করছে, যেখানে expand করছে সেখানে কি আছে? ফিজিক্স সেটা আর ব্যাখ্যা করতে পারছে না কি আছে। বক্তব্য হচ্ছে যেখানে সৃষ্টি নেই, ভগবান বলছেন সেখানেও আমি আছি। আর সৃষ্টিতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, যা কিছু প্রতীতি হচ্ছে সবই আমি। আর যা কিছু এর বাইরে আছে, অর্থাৎ সৃষ্টির বাইরে যা কিছু আছে অথচ দেখা যাচ্ছে না সেটাও আমি। তাহলে কি বোঝাচ্ছে – সৃষ্টির বাইরে যেটা সেটা আমি, সৃষ্টিটাও আমি, সষ্টিতে যেটা দৃশ্যমান সেটাও আমি। সৃষ্টিতে যেটা অদৃশ্যমান সেটাও আমি – ফিজিক্সের ভাষাতে বললে এই রকম হবে – সেই black hole ও আমি, dark matter ও আমি, seen unseen matters in creation সবই আমি। বিজ্ঞান বলছে বিগ্ ব্যাঙ হল তারপর সৃষ্টি হল। তারপর কি হবে? সব আবার শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। তা কি কখন হয়! শূন্য থেকে সৃষ্টি কি কখন সম্ভব!

অহমেবাসমেবাগ্রে, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম। *নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্*, আমি ছাড়া সৎ আর অসৎ এর কোনটাই ছিল না। উপনিষদেও এই বিষয়গুলো বার বার আসে। প্রথম শ্লোকের প্রথম লাইনে দুটো ভাগ এসে যাচ্ছে, যার মধ্যে শুধু তিনটি বক্তব্য – সৃষ্টির আগে শুধু ভগবান ছিলেন, তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না। এখানে সৎ আর অসতের অনেক রকম অর্থ করা হয়। বিভিন্ন ভাষ্যকাররা তাঁদের নিজের নিজের দর্শন অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে গেছেন। মোটামুটি যে সাধারণ অর্থ করা হয় তাতে সৎ মানে যেটা ইন্দ্রিয়গোচর। তার মানে তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছুই ছিল না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছু যখন ছিল না তাহলে কি অসৎ ছিল? না, তখন অসৎও ছিল না, কোন অভাব ছিল না। তাহলে কি ছিল? তিনিই ছিলেন। ভগবান তাহলে কি? তিনি দৃষ্টিগোচর নন, *অবাঙমনসোগোচরম্*, তিনি মন বাণীর পারে, কিন্তু তিনি আছেন। তার মানে একটা কিছুর অস্তিত্ব আছে। সেই অস্তিত্বটা অসৎ নয়। অসৎ মানে যেমন বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম এগুলো অলীক, জিনিষটা নেই। সেই রকম কি কিছু নেই? না তাও নয়। তাহলে কি তাঁকে দেখা যাবে? না, দেখা যাবে না। কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানে সৎ নন। প্রথম শ্লোকের প্রথম লাইনের এই হল সোজাসাপ্টা অর্থ। কিন্তু পণ্ডিতরা অনেক সময় এর অর্থ করেন, তখন সূক্ষ্ম পদার্থও ছিল না, স্থূল পদার্থও ছিল না। অসৎকে এনারা কখন অজ্ঞান বলেন, কখন মায়া বোঝান, আবার কখন অভাব অর্থেও বলেন। কিছু নেই তা নয়, পজিটিভ কিছু আছে, পজিটিভ মানে ভগবান আছেন। এখানে শূন্য থেকে সৃষ্টি এই মতকে নস্যাৎ করে দেওয়া হল। শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি না হলে বিনাশের পরেও শূন্য হয়ে যাবে না।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ, যেখানে সৃষ্টি নেই সেখানেও আমি আছি। সৃষ্টি কত দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত? যত দূর ইন্দ্রিয়গোচর। ইন্দ্রিয়গোচরের বাইরে আমিই আছি। বিজ্ঞানীরা আজকাল হিসাব করছে এই সৃষ্টিটা কতটা লম্বা চওড়া। একটা হিসাব দিয়ে দেওয়া হল। এরপর যদি জিজ্ঞাসা করা হয় স্পেসের বাইরে কি আছে? এর কোন উত্তর নেই। আবার বলছেন এই ব্রহ্মাণ্ডটা বেড়েই চলেছে। ব্রহ্মাণ্ডটা কিসে বাড়ছে? তখন বিজ্ঞানীরা বলছে এই প্রশ্নটা হয় না। এবার চিন্তা করে দেখুন, যে ব্রাহ্মণদের এরা দিনরাত গালাগাল দিচ্ছে, যে ব্রাহ্মণরা এই শাস্ত্রাদি রচনা করেছিলেন, তাঁদের কি তুখোড় ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল। একবারও ওনারা বলছেন না যে এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, বলছেন ব্রহ্মাণ্ড সীমিত। তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কে আছেন? ভগবানই আছেন। তাহলে কোথায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে? তখন বলবেন, ভগবানের যে নখ আছে, সেই নখের যে নখাগ্র আছে, পুরো এই ব্রহ্মাণ্ড ততটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তুমি যখন অনন্তের কল্পনা করতে পারবে না, তখন তুমি এবার হিসাব করে নাও ভগবান কতটুকু। এই অনন্তকে বোঝানোর জন্য বলা হয়, সৎ পদার্থ যেটা, এখানে সৎ বলতে ভগবানের পদার্থ বোঝায়, এই সৎ পদার্থ সব জায়গাতেই আছে, এর কখন নাশ হয় না। যা কিছু হচ্ছে সব তাঁর ভেতরেই হচ্ছে। যেমন জল কোথাও বাষ্প হয়ে যাচ্ছে কোথাও জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। যখন বরফ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা তাকে বলছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যেখানে জলের মত আছে সেখানে বলছি সূক্ষ্ম রূপ, আর যখন বাষ্প হয়ে

আছে তখন বলছি সব জায়গায় তিনিই আছেন। তাই ভগবান বলছেন, সৃষ্টি রূপে যা কিছু দেখছ সব আমি। আর সব কিছু বাদ দেওয়ার পর যা থেকে যাবে সেটাও আমি।

এরপর খুব কূট একটা শ্লোকের আলোচনা করা হচ্ছে। মায়া বলতে ভগবান বলছেন, আমার বাইরে যা কিছু প্রতীতি হচ্ছে সেটাই মায়া। যে জিনিষটা নেই অথচ দেখাচ্ছে আর যেটা আছে অথচ দেখা যাচ্ছে না, এটাই আমার মায়া। তারপর বলছেন দিনের আলোতে যেমন নক্ষত্রদের আকাশে দেখা যায় না, অথচ নক্ষত্র দিনের আকাশেও বিদ্যমান থাকে। আমাদের ঋষিরা জানতেন যে নক্ষত্ররা শুধু রাতের আকাশেই দেখা যায় আর দিনের আকাশে তারারা সব লুকিয়ে থাকে। সূর্য যখন মধ্য গগনে নক্ষত্রগুলি তখনও সেখানেই আছে। ভাগবত তাই বলছে সূর্য থাকলে আকাশে তারা দেখা যায় না, ঠিক তেমনি জগৎ আছে কিন্তু ঈশ্বরকে দেখা যায় না। বলছেন – চন্দ্রমা আকাশে একটাই আছে কিন্তু চোখের দোষের জন্য দুটো দেখায়। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক নবাব আলি পাতৌদি অক্সফোর্ডে পড়ার সময় দুর্ঘটনায় তাঁর একটা চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোখের অপারেশন ভালোভাবে হয়ে যাওয়ার পর যখন ক্রিকেটে ব্যাট করতে নামলেন তখন দেখছেন দুটো বল। তিনি সমস্যায় পড়ে গেলেন। ক্রিকেটে ওই গতিতে বল আসছে, সেই বলকে তিনি দুটো দেখছেন। তারপর তিনি প্র্যাক্টিস করে করে দেখলেন প্রথম যে বলটা দেখছেন ওটা মিথ্যা, পেছনে যে বলটা আসছে ওটাই আসল বল। সারা ক্রিকেট জীবনে তাঁর এই সমস্যা থেকে গিয়েছিল। ওই সমস্যাকে নিয়ে অনুশীলন করে করে শেষে তিনি রঞ্জি থেকে শুরু করে টেস্ট ক্রিকেট খেলে কত নাম করলেন। দুটো বল দেখা, দুটো চাঁদ দেখা এগুলো চোখের গোলমাল ও মাথার গোলমালের জন্য হয়। আমার সামনে এই বোতলটা দেখছি, এটা কেন বোতল দেখছি? মাথার গোলমালের জন্য। মাথার গোলমাল কেন? কারণ পরমেশ্বরকে এখানে দেখা যাচ্ছে না। তাই ভগবান বলছেন পরেমশ্বর ব্যতিরেকে যা কিছুর প্রতীতি হচ্ছে সেটাই মায়া। এই যে সৃষ্ট জগৎ সামনে পরিদৃশ্যমান, কিন্তু জগৎ নেই অথচ দেখাচ্ছে, মানে যেটা নেই সেটা দেখাচ্ছে। আবার যেটা আছে সেটা দেখাচ্ছে না, পরমেশ্বরই আছেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পারছি না, এটাই মায়া। শাস্ত্রের পরিভাষায় এর নাম আবরণ বিক্ষেপ। আবরণ মানে, যেটা আছে সেটাকে ঢেকে দেয়, বিক্ষেপ মানে যেটা নেই সেটাকে সামনে ছুঁড়ে দেয়। মায়া মানেই এই – আবরণ বিক্ষেপ। আমরা কামিনী-কাঞ্চনে বেশী মোহগ্রস্ত হই বলে কামিনী-কাঞ্চনকেই মায়া বলা হয়। কিন্তু জগতের সব কিছুই মায়, জগৎটাই মায়া। কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখা যাবে এগুলো সব পরমেশ্বরেরই রূপ তখন আর মায়া থাকবে না।

কি রকম আবরণ বিক্ষেপ? বলছেন – এই বিচিত্র যত কিছু দেখছ এটাই বিক্ষেপ। আর আবরণ কি? ঈশ্বর সর্বত্র, সর্বদা, সর্বব্যাপক রূপে বিদ্যমান অথচ তাঁকেই দেখা যাচ্ছে না। ভগবান বলছেন এটাই আমার মায়া। এই যে আকাশতত্ত্ব – আকাশতত্ত্বটা কি? টেবিলে যে বোতলটা রয়েছে এর মধ্যে আকাশ রয়েছে, বাইরেও আকাশ রয়েছে। বোতলটার মধ্যে আকাশ ঢুকে গেছে। এখন যদি বোতলটা এখানে না থাকত, আকাশ এখানেও থাকত। মানে আকাশ এখানে আছে অথচ বোতলে ঢুকেছে, ঠিক তেমনি ঈশ্বর আত্মারূপে সর্বত্র বিদ্যমান অথচ শরীরের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে ঢুকে আছেন। তাই বলছেন – আমি সর্বত্র আছি, সমস্ত প্রাণীর মধ্যেও আছি, তাদের শরীরে প্রবেশ করেছি, সেইজন্য সে চৈতন্য, এটাই আমার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রাণীরা যদি না থাকত তাহলে কি আমি ওখানে থাকতাম না? না, আত্মরূপে আমি সব জায়গায় আছি। যেমন এই বোতলে বাতাস ভর্তি আছে, কিন্তু বোতল যদি এখানে না থাকত তাও এখানে বাতাস থাকত। বাতাস বোতলের বাইরেও আছে ভেতরেও আছে। কিন্তু আমরা ভেতরের বাতাসকেই শুধুমাত্র বুঝি। আকাশের ব্যাপার আরো মজার। যেমন এই ডাস্টারটা এখানে তার আকার অনুযায়ী space নিয়ে বসে আছে। ডাস্টার যদি এখানে না থাকত এই space এখানেই থাকত। ঠিক তেমনি মানুষের ভেতরে চৈতন্য শক্তি অন্তর্যামী রূপে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু আত্মরূপে সব জায়গাতেই আছেন অথচ মনে হচ্ছে তিনি শুধু মানুষেই আছেন। এটাই ভগবানের বৈশিষ্ট্য। আমি যদি দেহ দৃষ্টিতে দেখি তাহলে দেখছি আমার এই শরীরের মধ্যে ভগবান অন্তর্যামী রূপে ঢুকে আছেন। কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে যদি দেখি তাহলে পরমেশ্বর ঢুকবেন কোথায়। সবটাই তো পরমেশ্বর। সেইজন্য আধ্যাত্মিক পুরুষরা কখন কোন কিছুকে বস্তু জ্ঞানে দেখেন না, সব কিছুকেই তাঁরা আত্মার স্বরূপ জ্ঞানে দেখেন।

এই পুরো জিনিষটা মানুষ বুঝবে কিভাবে? এনারা তাই দুটো পথের কথা বলে দিলেন। নিষেধ পদ্ধতি আর অন্বয় পদ্ধতিতে। কিরকম – নেতি নেতি – এটা ব্রহ্ম নয়, এটা ব্রহ্ম নয়। এই যে দেহ – এটা কি ভগবান? অবশ্যই না। এই মন, এটা কি ভগবান? নিশ্চই না। এই ভাবে বিচার করে করে যখন ভগবানে পৌঁছে গেলেন তখন দেখছেন তিনিই সব কিছু হয়েছেন। এটাকেই বলা হয় নেতি নেতি পথ। দ্বিতীয় পথ হল ইতি ইতি। আমি আগেই মেনে নিয়েছি ভগবানই আছেন কিন্তু এখনও উপলব্ধি হয়নি, কিন্তু সব কিছুতেই আমি আরোপ করে যাচ্ছি এই বোতলটাও ঈশ্বর, এই চেয়ারটাও ঈশ্বর, যা কিছু আছে সবই তিনি। যে পথেই যাই না কেন শেষে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন নিত্য থেকে লীলা আবার লীলা থেকে নিত্য। সেই নিত্য থেকে আবার নামতে হবে। কিভাবে নামবে? এটাও ভগবানের রূপ, শরীরটাও ভগবানের রূপ, মনটাও ভগবানের রূপ। এটাই প্রকৃত বিজ্ঞান, এটাই ঈশ্বরোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান লাভ।

চতুঃশ্লোকীর মূল উদ্দেশ্য এটাই বলা যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। আর যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন। তাঁর বাইরে কিচ্ছুটি নেই। এটাই হল সমস্ত ভাগবতের সার। প্রথমে নেতি নেতি করে সেই পরমাত্মায় পৌঁছাতে হয়, ওখানে যখন পৌঁছে গেলেন, তখন আবার দেখাবে তিনিই সব কিছু হয়েছেন। ঠাকুর খুব সহজ সরল ভাষায় সুন্দর উপমার সাহায্যে এই জিনিষটাকেই বলছেন – মানুষ যখন ছাদে যায়, তখন এক এক ধাপ সিঁড়ি ত্যাগ করতে করতে ছাদে যায়। যখন ছাদে পৌঁছে গেল তখন দেখে ছাদও যে জিনিষ দিয়ে তৈয়ারী সিঁড়িও সেই জিনিষ দিয়েই তৈরী করা হয়েছে। যে ইট, চুন, সুড়কি দিয়ে সিঁড়ি তৈরী সেই ইট, চুন, সুড়কি দিয়ে ছাদও তৈরী হয়েছে, কোন তফাৎ নেই। এটাকেই ঠাকুর বলছেন লীলা থেকে নিত্য আবার নিত্য থেকে লীলা, কিন্তু 'সা' থেকে 'নি'তে যাওয়ার পর 'নি'তে বেশীক্ষণ থাকা যায় না, তাই এক ধাপ নীচে নেমে আসতে হয়, ঠিক তেমনি নিত্যে পৌঁছে আবার লীলাতে এসে ভগবানের লীলা আস্বাদ করতে হয়। ঠাকুরের দর্শনের সাথে ভাগবতের দর্শন এখানে এক হয়ে যায়।

ভাগবত পুরাণের দশটি লক্ষণ

এরপরে শুকদেব পুরাণের দশটি বৈশিষ্ট্যকে ব্যখ্যা করছেন। আগে যেখানে পুরাণের পঞ্চলক্ষণমের কথা বলা হয়েছিল, ভাগবত সেখানে দশটি লক্ষণের কথা বলছে। *অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ। মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।।২/১০/১।* সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটি হল ভাগবত পুরাণের লক্ষণ। *সর্গ* মানে, ঈশ্বরের প্রেরণায় তিনটে গুণের মধ্যে যে আলোড়ন উত্থিত হয় আর তাদের রূপান্তর প্রাপ্তির ফলে যে চব্বিশটি তত্ত্বের জন্ম হয়, যা দিয়ে পুরো সৃষ্টিটা চলবে সেটাকেই বলছেন সর্গ। ব্রহ্মা যখন ওই চব্বিশ তত্ত্বের দ্বারা এই চরাচর জগৎ এবং জীবের সৃষ্টি করেন, এটাকে তখন বলা হয় *বিসর্গ*। বিসর্গের অর্থ হল জীবের উৎপত্তি। কিন্তু পুরাণের প্রতিসর্গ মানে বিনাশ। সব কিছুকে ধারণ করে রাখাটা হল *স্থান*। এই জীবজগতের মর্যাদা রক্ষার জন্য ভগবান বিষ্ণুর যে উৎকর্ষ তাকেই স্থান বলা হয়। জগতের সমস্ত জীব যার যেমনটি দরকার ঠিক সময় পেয়ে যাচ্ছে এটাই *পোষণ*। আমার এই শরীরটা খাওয়া-দাওয়া পাওয়ার জন্য চলছে, আমি যে ঠিক সময় খাবার-দবার পেয়ে যাচ্ছি এটাকেই বলছেন পোষণ। জীবের যে বাসনা তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে কর্মফলজনিত বন্ধনে ফেলে দেয় এর নাম *উতি*। এক এক জন মনুর অধীনে যে প্রজা পালন ও রক্ষা হয় সেটাকে বলছেন *মন্বন্তর*। ভগবানের অবতারের লীলাচরিত্র ও তার অনুবর্তী মহাত্মাগণের কথাকে বলা হয় *ঈশকথা*। ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শয়ন করেন তখন জীবের যে নিজের উপাধি সহ লয় হয় তারই নাম *নিরোধ*। অজ্ঞানের বিনাশের সাথে সাথে নিজের স্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের নাম *মুক্তি*। আমাদের মধ্যে নানা রকমের বোধ হয়ে চলেছে – কর্তৃত্ববোধ, ভোক্তৃত্ববোধ, অনাত্মবোধ ইত্যাদি যে বোধ গুলো হচ্ছে এগুলোকে পরিত্যাগ করে নিজের স্বরূপ পরমাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই মুক্তি। যেখান থেকে জগতের উৎপত্ত ও লয় হচ্ছে সেটাই *আশ্রয়*। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম থেকেই জগতের উৎপত্তি আর সেখানেই জগতের লয় হচ্ছে, তাই ঈশ্বর বা ব্রহ্মই হলেন সব কিছুর আশ্রয়। আশ্রয় তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, ইন্দ্রিয়াভিমানী জীব, ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এই

তিনটের মধ্যে একটির অভাব হলে কোন কিছুই উপলব্ধি হবে না। যিনি এই তিনটিকেই জানেন সেই পরমাত্মাই সকলের অধিষ্ঠান। তাঁর আশ্রয় তিনিই স্বয়ং, অন্য কেউ নয়। এরমধ্যে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল – জীবাত্মা নিজের নিরোধ করবে। নিরোধ মানে, জাগতিক যা কিছু আছে সেটাকে আটকানো। জাগতিক সব কিছু নিরোধ করে নিজের মুক্তির চেষ্টা করবে। আর সব শেষে আশ্রয়, মানে ঈশ্বরের কথা। এগুলোকে যখন কোন শাস্ত্র তুলে ধরবে তখনই তাকে পুরাণ বলবে।

ভগবানের ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ এবং বিরাট পুরুষ থেকে বিভিন্ন রকমের সৃষ্টির বর্ণনা

এর মধ্যেই শুকদেব আবার আরেকটা ছোট্ট সৃষ্টির বর্ণনা দিচ্ছেন *পুরুষোহণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ। আত্মনোহয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ।।২/১০/১০।* যিনি সেই বিরাটপুরুষ অর্থাৎ ভগবান, তিনি নিজে ব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন। কারণ তিনিই তো আছেন, তিনি ছাড়া তো কিছু নেই, সুতরাং যেটা হবে সেটা তিনিই হবেন। তাঁর ইচ্ছে হল আমি এক আমি বহু হব। ইচ্ছা হওয়া মাত্র কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড সুবর্ণ ডিম প্রকট হয়ে গেল। সেই অণ্ডটা আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর দুটো খণ্ড হয়ে গেল। সেখান থেকে ভগবান বেরিয়ে এলেন। ডিম থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তাই ভগবানকে এবার কোথাও থাকতে হবে। তখন তিনি অত্যন্ত পবিত্র জল সৃষ্টি করলেন। আমরা এর আগে কারণ সলিলের কথা বলেছি। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ এই চারটে অবস্থা। মহাকারণ হলেন ভগবান। ভগবান যখন সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন প্রথমে তিনি কারণ সৃষ্টি করেন, তাই এর নাম কারণ সলিল, যা সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম। তার মানে ভগবান থেকেই প্রকৃতির জন্ম, আর ভগবান প্রকৃতির বাইরে। ছবিতে যেমন দেখানো হয় ভগবান বিষ্ণু জলের উপর শয়ন করে আছেন, তবে এই জল সাধারণ সমুদ্রের জল নয়, এর নাম ক্ষীর সাগর, দুধের সমুদ্র। এগুলো আসলে কিছুই না, এটাই কারণ সলিল। মহাকারণকে মুখে বলা যাবে না, মহাকারণই আছেন। এই মহাকারণেরই কোথাও কোথাও কারণের উৎপত্তি হয়। সেই কারণ থেকে আবার জন্ম নেয় সুক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম থেকে স্থূল ভূতের সৃষ্টি হতে থাকে। এই কারণ সলিলে ভগবান শয়ন করে থাকেন, এটাই তাঁর সগুণ সাকার রূপ। তবে তাঁর মহাকারণের রূপ থেকে অনেক ক্ষুদ্র রূপ। মহাকারণই নির্গুণ নিরাকার।

এখানে বলছেন সেই বিরাট পুরুষ যিনি ভগবান, তিনি নর রূপে জন্ম নিলেন। এটা অবশ্য ভাগবতের ব্যাখ্যা, যদিও ভাষ্যকাররা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। যাই হোক, বলছেন, ভগবান নর রূপে জন্ম নিলেন বলে সেই জলের নাম হল নার। আর ওই নারের উপর তিনি বাস করলেন বলে তাঁর নাম হয়ে গেল নারায়ণ। নারায়ণ নামের তাই অর্থ হয়ে গেল যিনি নারের উপর অয়ণ করেন। নার মানে জল, এমনি জল নয়, কারণ সলিল। এখন অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করেন, তখন তো নারী পুরুষের কোন ভেদ ছিলো না, তাহলে তিনি নর রূপ কোথায় পেলেন। পুরাণের এটাই বিশেষত্ব, সাধারণ মানুষকে বোঝানর জন্য পুরাণ সব কিছু তত্ত্বকে পৌরাণিক আখ্যায়িকাতে পাল্টে দেয়। মূল কথা হল ভগবানের আবির্ভাব বিরাট পুরুষ রূপে, সেই বিরাট পুরুষ হলেন নর। তিনি সৃষ্টি করলেন কারণ সলিল, মানে ভগবান জন্ম দিলেন প্রকৃতিকে। সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম প্রকৃতি ছাড়া আর কি হবে! ভগবান এই প্রকৃতিরও বাইরে। কিন্তু সেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতি যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ কিন্তু ভগবানকে দেখা যাবে না। যেমন সম্পূর্ণ ধুলি ও বায়ুমুক্ত কোন চেম্বারে আলো জ্বালালে বোঝা যাবে না যে এখানে আলো জ্বলছে। আলো দেখার জন্য একটা প্রতিফলক দরকার। এবার ওই চেম্বারে একটা পর্দা ফেলে দিলে সেই পর্দাটা পুরো আলোকিত হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ভগবানের আলো ব্যাপ্ত তাই তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি যখন সামনে এসে যায় ভগবানের আলোতে তখন প্রকৃতি ঝলমল করে ওঠে। এই প্রকৃতি থেকে আবার সূক্ষ্ম পদার্থের উৎপত্তি হয়। সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে আবার স্থূল পদার্থের জন্ম হচ্ছে। স্থূল পদার্থ থেকে এই পুরো দৃশ্যমান জগৎ বেরিয়ে এল। আমি যদি এখন ভগবানকে সাক্ষাৎ করতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমে স্থূলকে পার করে সূক্ষ্মে যেতে হবে। এই সূক্ষ্মকেও পার করে আমাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে যেতে হবে। তখন আমি ভগবানের সাকার রূপের দর্শন পাবো। এই সাকার রূপটা আবার ভগবানের সামগ্রিক রূপ নয়। সামগ্রিক রূপে দেখতে হলে আমাকে প্রকৃতিকে অতিক্রম করে মহাকারণে যেতে হবে। এটাই নির্বিকল্প সমাধি। এর আগে আগে যেমন বলা হল দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব এই শব্দগুলো সবই ঈশ্বরের

ইচ্ছাতেই হয়। শুকদেব ভগবানের আরও নানান রকমের সৃষ্টির বর্ণনা করছেন। এই বিরাট পুরুষের মন থেকে চন্দ্রমার জন্ম হল, এই বিরাটের শরীর থেকে পৃথিবী, জল আর তেজ এই ধরণের সাতটি ধাতুর সৃষ্টি হল। সেই বিরাট পুরুষ থেকে নানান রকমের সৃষ্টির কথা বলে যাচ্ছেন।

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলছেন 'আমি তোমাকে সংক্ষেপে ভগবানের দুটো রূপের কথা বললাম, ব্যক্ত রূপ আর অব্যক্ত রূপ'। একটা হল তিনি যখন কারণ সলিলে শয়ন করে আছেন আর দ্বিতীয় রূপ হল এই বিরাট পুরুষ, যার মধ্যে দিয়ে বোঝান হচ্ছে জগতে যা কিছু আছে সবই সেই ভগবানের অঙ্গ। এই দুটোর বাইরে ভগবানের যে রূপ তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যা অব্যক্ত নির্বিশেষ, আদি মধ্যহীন, যেখানে মন ও বাণী পৌঁছাতে পারে না। *অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে অনুবর্ণিতে। উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ।।২/১০/৩৫।* এই যে ভগবানের সূক্ষ্ম রূপ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ এগুলো সবই ভগবানের মায়ার দ্বারা রচিত। ঠিক ঠিক যিনি ভগবান তিনি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয়। ভগবানের যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনি ভগবানের এই সূক্ষ্ম রূপ আর তাঁর স্থূল রূপ এর কোনটাকেই স্বীকার করেন না। ভগবানের বাস্তব যে স্বরূপ তাঁকেই ভক্তরা স্বীকার করেন। *স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্। নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্মাকর্মকঃ পরঃ।।২/১০/৩৬।* ভগবান নিজের শক্তিতে নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় হয়ে ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে বাচক রূপে দেবতা, মনুষ্যাদি প্রাণী ও বাচ্য রূপে তাদের যথাযোগ্য রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকেন। ঠাকুর বলছেন, সাপ হেললে দুললেও সাপ আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকলেও সাপ। বাচ্য ও বাচক মানে শব্দ আর অর্থ, যেমন এখানে আমরা এই গ্লাশ দেখতে পারছি, এই গ্লাশটা একটা শব্দ আর এর অর্থ হল আমরা যেটা চোখের সামনে দেখতে পারছি। ভগবানই শব্দ আর অর্থ এই দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যান।

হিন্দু ধর্ম আর অন্যান্য ধর্মের মধ্যে মৌলিক তফাৎ হল, হিন্দু ধর্মে ভগবান কখনই সৃষ্টি করেন না। বাকী সব ধর্মে বলা হয় ভগবানই সব কিছু সৃষ্টি করেন। ভগবান নিজে সৃষ্টি করলে তাঁর মধ্যে কর্তার ভাব আসবে আর তার জন্য সৃষ্টির যত দোষ ভগবানের উপর এসে যাবে। আমি একটা বাড়ি বানালাম, বাড়িটা যদি ভালো না হয় তাহলে দোষ আমারই হবে। তাই ঈশ্বর যদি সৃষ্টি করেন তাহলে সংসারের যত দোষ সব ঈশ্বরের উপর বর্তাবে। কিন্তু তিনি যদি সৃষ্টি না করেন তাহলে সেই দোষটা আর তাঁর উপরে বর্তাবে না। হিন্দু ধর্মে ভগবান কখন সৃষ্টি করেন না, তাহলে সৃষ্টিটা কে করছে? সৃষ্টি করে শক্তি বা মায়া বা ব্রহ্মা।

ততঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাত্মনঃ। সংনিযচ্ছতি কালেন ঘনানীকমিবানিলঃ।।২/১০/৪৩। যখন বিনাশের সময় হয় তখন ভগবান নিজে কালাগ্নি স্বরূপ রুদ্র রূপ ধারণ করে তাঁর নিজের সৃষ্ট এই চর ও অচর সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে টেনে নেন, যেমন বায়ু আকাশের মেঘমণ্ডলকে নিজের মধ্যে লীন করে দেয়। এটা খুব মজার ব্যাপার যে, যখন নাশ হয় তা কালাগ্নিতেই হয়। বিজ্ঞানীরা যে বিগ্ ব্যাঙের ধারণা নিয়ে এসেছেন সেখানেও বলা হচ্ছে সব কিছু বিরাট অগ্নির মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে লীন হয়ে যায়। শুকদেব বলছেন *অয়ং তু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ সবিকল্প উদাহৃতঃ। বিধিঃ সাধারণো যত্র সর্গাঃ প্রাকৃতবৈকৃতাঃ।। ২/১০/৪৬।* আমি তোমাকে ব্রহ্মা কিভাবে সৃষ্টি করছেন তার বর্ণনা করলাম, প্রত্যেক কল্পে ঠিক এভাবেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়। কল্প মানে ব্রহ্মার একটা দিন, রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ার পর ব্রহ্মা যখন সকালবেলা আবার ঘুম থেকে জাগছেন তখন নতুন একটা কল্পের শুরু হল। মহাকল্পের প্রারম্ভে প্রকৃতির জন্ম হয়। সেই প্রকৃতি থেকে মহত্ত্বাদির সৃষ্টি হয়। কল্প যখন শুরু হয় তখন আগের কল্পের জীবকুলই আবার ফিরে আসে, যাকে বলা হয় *বৈকৃতাঃ*, অর্থাৎ কল্পের সৃষ্টিকে বলছেন বৈকৃতি আর মহাকল্পে প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। তার মানে ব্রহ্মার জন্মের আগে প্রকৃতির জন্ম হয়। ব্রহ্মা যেমনই থাকুন, তিনি ঘুমিয়ে পড়ুন জেগে থাকুন প্রকৃতি তেমনই থাকবে। ব্রহ্মা যখন ঘুমিয়ে পড়বেন তখন সমগ্র জীবকুল ব্রহ্মার মধ্যে লীন হয়ে থাকবে, ব্রহ্মা যখন ঘুম থেকে উঠবেন তখন ওই জীবকুল আবার সৃষ্টির মধ্যে ফিরে আসবে। আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে জীব একবার ব্রহ্মার মধ্যে ঢুকে যাবে আরেকবার বেরিয়ে আসবে। এই করে করে ব্রহ্মার যখন একশ বছর হয়ে যাবে তখন ব্রহ্মার নিজেরই নাশ হয়ে যাবে। ব্রহ্মার শরীর নাশ হয়ে যাওয়ার পর সব কিছু ঈশ্বরে লয় হয়ে যায়, মায়া প্রকৃতি যা

কিছু আছে সব লয় হয়ে যায়। তারপর কি হয় সেটা আর কেউ বলতে পারে না আর কত দিন এইভাবে থাকবে বলা যাবে না। আবার যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা হবে তখন আবার প্রথমে প্রকৃতির উৎপত্তি হবে, সেই প্রকৃতি থেকে এক এক করে মহত্তাদির জন্ম হবে, এবার জগৎ সৃষ্টির উপাদান এসে গেল। তখন সেখান থেকে আবার ব্রহ্মার জন্ম হবে। সৃষ্টির ব্যাপারে এটাও পুরাণের একটা মত।

মন্বন্তর, কল্প ও মহাকল্প বা মহাপ্রলয়ের বর্ণনা

এবারে আমাদের কয়েকটা জিনিষ সংক্ষেপে বুঝে নিতে হবে। আমরা সবাই দিনের বেলা কাজ করি, তখন আমাদের জাগ্রত অবস্থা, আবার রাত্রে আমাদের একটা অন্য রকম অবস্থা আসে। রাতে আমরা কোন কাজ করি না, ঘুমিয়ে পড়ি, একটা মৃতের মত অবস্থা হয়। এই ভাবে চলতে চলতে একদিন আমাদের এই জীবনের পরিসমাপ্তি কাল চলে আসে, human death। বেদেই মানুষের গড় আয়ু একশ বছর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের থেকে যারা ওপরে তারা হলেন দেবতা। দেবতাদেরও দিন ও রাত আছে, আর তাদেরও মৃত্যু হবে। দেবতাদের ওপরে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন মনু। মনুরও আবার জন্ম হবে মৃত্যু হবে। মনুর ওপরে, অর্থাৎ এদের সবার ওপরে আছেন ব্রহ্মা। যিনি ব্রহ্মা তাঁরও জন্ম হবে মৃত্যুও হবে। তারপরে কি আছে? ব্রহ্মার যে cycle যেমন এক মানুষ, দুই মানুষ, তিন মানুষ, এক দেবতা, দুই দেবতা, এক মনু দুই মনু, এক ব্রহ্মা দুই ব্রহ্মা। এরমধ্যে আবার দেওয়া আছে কত বছরে কোনটা হয়। যেটা বলতে যাচ্ছি, সেটা হল – ঈশ্বর যিনি আছেন একমাত্র তিনিই আছেন, তাঁর বাইরে কিছু নেই। তিনি প্রথম রচনা করেন মায়া বা অবিদ্যার, তন্ত্রমতে যাকে শক্তি বলছে। এখান থেকে সৃষ্টি একের পর এক হতে থাকে। তারপরেই শুরু হয়ে যায় ব্রহ্মার এলাকা। ব্রহ্মার লীলা খেলা এক রকম চলে। ব্রহ্মার এলাকার পর শুরু হচ্ছে মনু – তারপর দেবতা, মানুষ ইত্যাদি। আমার আপনার যখন মৃত্যু হবে তখন আমাদের আগের জন্মের কর্মানুসারে আবার আমরা জন্ম নেব। মনু যিনি তিনি হলেন এক একটি মন্বন্তরের রাজা। মন্বন্তর একটা বিশাল কালের পরিব্যাপ্তি নিয়ে চলে। মনুর ইচ্ছানুসারেই সেই মন্বন্তরের সব নিয়ম কানুন তৈরী হবে, সব কিছু চলবে, সব কিছু ঠিক হবে। সব শেষে আসে ব্রহ্মা। ব্রহ্মাতে যখন আসে তখন আবার ব্রহ্মার যখন মৃত্যু হবে তখন সৃষ্টির যত জীব আছে, সমস্ত জীব বীজাকারে একীভূত হয়ে যায়, তখন সৃষ্টির বীজগুলিকে তুলে রাখা হয়। মনুর যেমন মন্বন্তর, ব্রহ্মার তেমনি কল্প। ব্রহ্মার যখন মৃত্যু হয়ে গেল তখন একটা কল্প শেষ হয়ে গেল। বলা হয়, যখন একটা কল্প শেষ হয়ে যায় তখন বেশির ভাগই মুক্তি পেয়ে যায়। মনে করুন এখন যাঁরা ব্রহ্মালোকে আছেন, এই কল্পের ব্রহ্মা যখন মারা যাবেন তাঁর সঙ্গে তাঁদেরও মুক্তি হয়ে যাবে। কিন্তু আসল মুক্তি হয় না, অনেকেরেই মুক্তি বাকি থেকে যায়। ব্রহ্মার একশটি কল্প নিয়ে যে পরিধি কাল তাকে বলা হয় মহাকল্প, মহাকল্পও যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্মাও আর থাকে না, শুধু অবিদ্যা থাকে। ঐ সময় জীবাদি যা কিছু আছে সব অবিদ্যার সঙ্গে এক হয়ে যায়। আর অবিদ্যা ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে যায়। তখন আর কিছুই থাকে না। কল্পে যে ব্রহ্মা থাকেন, সেই কল্পের প্রলয়ের পর ব্রহ্মার অবিদ্যা কিন্তু সক্রিয় থাকবে। একজন ব্রহ্মার যখন মৃত্যু হচ্ছে তখন অবিদ্যাকে আর সৃষ্টি করতে হচ্ছে না, ব্রহ্মা নিজে থেকেই জন্ম নিচ্ছেন। কিন্তু মহাপ্রলয়ের পরে অবিদ্যাও থাকে না, একমাত্র তখন ঈশ্বরই থাকেন। কিন্তু এই মহাপ্রলয়ের পর যে আবার নতুন সৃষ্টিটা হবে তখন আবার নতুন করে অবিদ্যার জন্ম দিতে হয়। যেই অবিদ্যার জন্ম হয়ে গেল তারপরেই আবার ব্রহ্মা আসবে। এই ব্রহ্মার কিন্তু আগের আগের ব্রহ্মার মত কিছু নেই, আগের লীলা শেষ। মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টিটা হবে সেটা একেবারেই নতুন করে রচনা হবে। আমরা যখন দেখলাম ব্রহ্মা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যে এর আগের ব্রহ্মা যা করেছিলেন আমিও তাই যেন করি। এখানে ব্রহ্মা হচ্ছেন একটা কল্প থেকে আরেকটা কল্পের ব্রহ্মা। কিন্তু মহাকল্পের মহাপ্রলয়ের পরে যেটা হবে সেটা একেবারে পুরোপুরি নতুন রচনা। আগের আগের সৃষ্টির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এইসব তত্ত্ব আমার আপনার মত মানুষের মাথা থেকে বেরোয়নি। ঋষিরা ধ্যানের একটা অবস্থায় তাঁদের শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করে যা দেখেছেন বা বুঝেছিলেন, সেটাই আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য এইভাবে সহজ করে বলছেন। এত কিছু কথার মধ্যে যেটা আসল কথা, শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন 'এই যে

তোমাকে এতগুলো কথা বললাম, শুধু এটুকু বোঝানর জন্যে যে ভগবান সৃষ্টি করেন না'। সৃষ্টি যদি ভগবান করে থাকেন তাহলে ভগবানের বৈষম্য দোষ এসে যাবে। আপনি কেন একে ভালো ওকে মন্দ করেছেন বা একে পশু ওকে পাখি, আমাকে মানুষ করেছেন? সৃষ্টির যত দোষ সব ভগবানের উপর এসে পড়বে। ভগবান যদি সৃষ্টি না করে থাকেন তাহলে এগুলো কে করছে। ভগবান বলবেন এগুলো আমার গিন্নী করছেন। যত দোষ সব গিন্নীর ঘাড়ে। গিন্নী কে? এই মায়া। মায়া কি? মিথ্যা। কোনটা মিথ্যা? এই সৃষ্টি বলে কিছু নেই, তুমি ভাবছ বলেই সৃষ্টি দেখছ। তাহলে কে সে? সেটাও ঈশ্বর নিজেই হয়েছেন। কারণ ঈশ্বর আর মায়াতো এক। আর তার মায়া থেকে এই সৃষ্টি বেরিয়ে পড়েছে। এই হল সৃষ্টি তত্ত্ব। কিন্তু মূল বক্তব্য – ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। যা কিছু আছে সব তিনি, সৃষ্টির বাইরে যা সেটাও তিনি। আমাদের আঠারোটি পুরাণ, এই আঠারোটা পুরাণ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ শ্লোক, এই সাড়ে পাঁচ লক্ষ্ শ্লোক জুড়ে আমাদের সবাইকে এই একটা কথাই বোঝাচ্ছেন – বাপু হে! ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, আর ঈশ্বরে ভক্তি করাই জীবনের উদ্দেশ্য।

একজন ব্রহ্মার অধীনে চোদ্দ জন মনু আছেন। পরে যিনি ব্রহ্মা হবেন তাঁর অধীনেও চোদ্দ জন মনু হবেন। আর এক এক জন মনুর এক একটা মন্বন্তর চলবে। দেবতাদের যেটা একশ বছর সেটা হবে মনুর এক বছর। তারপর হবে ৭১ চতুর্যুগ। এই একাত্তর চতুর্যুগ নিয়ে মনুর একটা কাল। একটা কল্প হচ্ছে 4.32 billion years, মানে ৪৩৩ এর পর সাতটা শূন্য বসিয়ে দিলে যত হবে তত বছর। মজার জিনিষ হল কিছু বছর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বিগ্ ব্যাং এর বয়স বলছে 4.5 billion years old। পুরাণের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই। আগামীকাল হয়তো 4.3 এর জায়গায় 15 billion বলে দিতে পারে। আরেকটা মজার ব্যাপার, খ্রীশ্চান ধর্মে বলে এই ব্রহ্মাণ্ডের বয়স মাত্র চার হাজার বছর। যখন পুরাতত্ত্ববিদরা বিভিন্ন পুরাতন সভ্যতা আবিষ্কার করে সামনে নিয়ে এল, খ্রীশ্চান পাদ্রীরা সেগুলো উড়িয়েই দিল, মানতেই চাইল না। কেননা খ্রীশ্চানরা একেবারে বছর সাল ঠিক করে দিয়েছে – ৪০৩২ সালে ভগবান এই সৃষ্টির রচনা করেছেন। আর এখন দেখা যাচ্ছে বেদ তারও আগের রচনা। বিজ্ঞানীরাও বলছে প্রাণী জগতে মানুষ কয়েক লক্ষ বছর আগে এসেছে।

এখানে হিসেবে কোন গোলমাল নেই। আসলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর জাগতিক জ্ঞান দুটো পুরো আলাদা জিনিষ। স্বামীজী ফিজিক্সের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতেন, বিজ্ঞানের ব্যাপারেও অনেক কিছু জানতেন। আর ম্যালেরিয়ার ব্যাপারে তিনি লিখছেন দূষিত জল পান করলে ম্যালেরিয়া হয় সেইজন্য জল ফুটিয়ে খেতে হবে। কিন্তু আজকের ছোট বাচ্চারাও জানে মশা থেকে ম্যালেরিয়া হয়। স্বামীজীর সময় লোকেদের ধারণা ছিল যে জল থেকে ম্যালেরিয়া হয়। স্বামীজীর শরীর চলে যাবার সাত বছর পর রোনাল্ড রস বার করলেন যে ম্যালেরিয়া মশার কামড় থেকে হয়। স্বামীজীর এই একটা ভুল কথার জন্য স্বামীজীর আর সব কথাকে কি ফেলে দেব? কেন ফেলে দেব না? স্বামীজী যেটা বলছেন সেটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর ম্যালেরিয়ার ব্যাপারে যেটা বলেছেন সেটা বিজ্ঞানের জ্ঞান। বিজ্ঞানীরা তখন যেটা বলেছিলেন সেটাই তিনি বলেছিলেন। সেই রকম খ্রীশ্চানদের যাঁরা ঋষি ছিলেন তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা ঠিক ঠিক বলেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপারে অনেক ভুলভাল কথা বলেছেন। এর জন্য তাঁরা দায়ী নন, কারণ তখনকার বিজ্ঞানীদের যা ধারণা ছিল ওনারা সেটাই বলেছেন।

তৃতীয় স্কন্ধ

বিদুর-মৈত্রেয় মুনির সংলাপ *(দুই ধরণের ঋষি, ভাগবতের ভগবান ও বেদান্তের ভগবানের পার্থক্য)*

শুকদেব এখন একটার পর একটা বিষয় নিয়ে বলে চলেছেন আর মাঝে মাঝেই বলবেন – আমি অমুকের কাছে এই রকম শুনেছিলাম, শুকদেব যাঁর কাছে শুনেছিলেন তিনি বলবেন আমি অমুকের কাছে এই রকম শুনেছিলাম, কাহিনীর মধ্যেই একজনের কাছ থেকে আরেকজন আবার তার কাছ থেকে আরেকজন শুনেছেন – এই ভাবে চলতে থাকবে। শেষে এক জায়গায় আসবে যেখানে বলবেন ভগবান স্বয়ং সনকাদি মুনিদের এটা বলেছিলেন। এই কারণে বলা খুব মুশকিল ভাগবত ঠিক কোথা থেকে শুরু হয়েছে, কেননা এর

পাঁচ ছয়টা শুরু আছে। যখনি মনে হবে এখান থেকেই বুঝি শুরু হল, তারপরেই বলবেন, না এখান থেকে শুরু হয়নি। তবে মোটামুটি বলা যেতে পারে তৃতীয় স্কন্ধ থেকেই ঠিক ঠিক ভাগবত কথা শুরু হয়।

তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর আর মৈত্রেয় ঋষির একটা বিরাট সংলাপ আছে। বিদুর মহাভারতের একটি অন্যতম চরিত্র। তিনি মৈত্রেয় ঋষিকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞেস করছেন। বিদুর-মৈত্রেয় সংলাপের যেখানে যেখানে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, বংশানুক্রম ও মন্বন্তর এই পঞ্চলক্ষণম্ আসবে সেগুলো উল্লেখ করে আলোচনা করা হবে। ভাগবতের বৈশিষ্ট্য হল ভক্তি, হিন্দুদের যত শাস্ত্র আছে কোথাও ভাগবতের মত শুধু ভক্তিকেই এত জোর দেওয়া হয়নি। বেদ বেশি করে যজ্ঞ-যাগের কথাই বলছে, উপনিষদে বলছে আত্মজ্ঞানের কথা, বাল্মীকি রামায়ণ তপস্যার কথা, মহাভারত বর্ণাশ্রম ধর্মের আর চারটে পুরুষার্থের কথা বলছে। কিন্তু ভক্তির কথা কোথাও আসেনি। যদিও গীতা মহাভারতের অংশ কিন্তু গীতাতে ভগবদ্ভক্তির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। তাই গীতার দর্শন আর ভাগবতের দর্শনে অনেক মিল পাওয়া যায়। ভাগবতে যা কিছু আসবে সব কিছুকে ভক্তির সঙ্গে জুড়ে দেবে, জ্ঞানের কথা যখন আসবে সেই জ্ঞানের প্রসঙ্গকেও ভক্তির সাথে মিলিয়ে দেবে, কর্মের ব্যাপারেও তাই হবে আবার যোগ বা ধ্যানের ব্যাপারে যখন বলবে তাকেও ভক্তির সঙ্গে জুড়ে দেবে।

পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন *এবমেতৎ পুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল। ক্ষত্ত্রা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ।।৩/১/১।* হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তুমি যে প্রশ্নগুলো করেছ পুরাকালে বিদুরও মহামুনি মৈত্রেয়কে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন। মহাভারতেও এক জায়গায় বিদুর-মৈত্রেয়ের সংলাপ পাওয়া যায়। হস্তিনাপুরের রাজসভায় পাশাখেলার সময় যখন দ্রৌপদীকে অপমান করা হয়েছিল, তখন বিদুর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়ে হস্তিনাপুর ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর মৈত্রেয় মুনির সাথে দেখা হয়। তখন বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। পরে অবশ্য বিদুরকে আবার অনেক বুঝিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। ভাগবতের এখানে অবশ্য বিদুর রাজগৃহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য বনে চলে এসেছেন। এখানে এসে কিছু অতিরিক্ত চরিত্রও যোগ হয়।

এখন বিদুরের বয়স হয়ে গেছে, ধৃতরাষ্ট্ররা মারা গেছেন, যদুবংশের বিনাশ হয়ে গেছে, পাণ্ডবদেরও মহাপ্রস্থানে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। পরমজ্ঞানী মৈত্রেয় মুনি তখন হরিদ্বারা অবস্থান করছিলেন। বিদুর সেখানে গিয়ে মৈত্রেয় ঋষিকে প্রশ্ন করলেন *সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা। বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ।।৩/৫/২।* 'হে ঋষিবর! এই সংসারে সবাই সুখ পাওয়ার জন্য কাজ করে কিন্তু দেখা যায় এত খেটেখুটে কাজ করার পরে সে সুখতো পায়ই না উপরন্তু যে দুঃখ তার ছিল, সেটাও এতটুকু লাঘব হয় না। যদি এই অবস্থা হয় তাহলে এই দুঃখময় সংসারে মানুষের কি করা উচিৎ'। এই যে মানুষ চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, ট্রেনে বাসে রোজ কষ্ট করে চাকরি করতে যাচ্ছে, বিভিন্ন রকম কর্মে নিযুক্ত হচ্ছে, কিসের জন্য? একটু সুখের জন্যই তো এত পরিশ্রম করছে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এতে সুখতো বাড়েই না দুঃখটাও কমে না। মাঝখান থেকে এত খাটাখাটনিতে দুঃখটাও বেড়ে যায়। যখনই মানুষ কোন কাজে হাতে দেয় তখন ঐ একটা কাজ থেকে আরো কত রকমের কাজে জড়িয়ে যায়। এই যারা বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করছে তাদের কত রকমের চাপা টেনশানে ভুগতে হয়, আজ কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, মন্দার জন্য কত কর্মিকে ছাটাই করতে হচ্ছে, আরো কত রকমের ঝঞ্ঝাট এসে যোগ হয়। তখন মনে হয় এর থেকে বাবা গ্রামে চাষবাশ করলে অনেক ভালো হত।

এখানে এসে বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে বলছেন আপনি আমাকে সৃষ্টির ব্যাপারে বলুন। এই কিছুক্ষণ আগে ভাগবত সৃষ্টি তত্ত্বের বিরাট আলোচনা করল কিন্তু আবার এখানে এসে সৃষ্টির ব্যাপারে বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু এর আগে যা কিছু হচ্ছিল সেটা ছিল ভাগবতের ভূমিকা মাত্র। তৃতীয় স্কন্ধ থেকে ভাগবত যেন পুরোপুরি নিজেকে সামনে নিয়ে আসছে। বিদুর বলছেন *জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য। অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য।।৩/৫/৩*। 'এই যে মানুষ কর্মফল হেতু এত দুঃখ-কষ্টে

শ্রীকৃষ্ণবিমুখ হয়ে অধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠে, এদের ওপর কৃপা করার জন্যই আপনাদের মত ঋষিরা এই সংসারে পরিভ্রমণ করে বেড়ান। কেননা আপনাদের তো আর কিছু চাওয়ার নেই, মানুষের মনে একটু শান্তি দেবার জন্যই আপনারা সংসারে আসেন। সেইজন্য আপনি আমাকে উপদেশ দিন যাতে আমার মন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে যায়। সেই সাথে আমি যেন ঈশ্বরের ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করতে পারি আর এই ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করে যেন শান্তি পেতে পারি'।

এখান থেকে আবার ভক্তি ও জ্ঞানের একটা শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। মানুষ কিভাবে ভক্তি পাবে আবার জ্ঞানও পাবে, জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, আর এই আত্মজ্ঞান থেকে সে কিভাবে শান্তি পেতে পারে। ঋষি মুনিরা দুই ধরণের হন, এক ধরণের হলেন যাঁরা আশ্রম ও মঠ তৈরী করে বা কোন নির্জন প্রদেশে জঙ্গলে বা গুহায় বাস করেন। এনারা নিজেদের সাধনা আর তপস্যা নিয়েই থাকেন। যাদের প্রয়োজন হবে তারা তাঁদের কাছে পৌঁছে যাবে। আরেক ধরণের উচ্চমানের মুনি ঋষি আছেন যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করতে থাকেন। জগতের জীবকুলকে দেখে তাঁদের মনে করুণার উদ্রেক হয়, দেখছেন সবাই ঈশ্বরের কথা ভুলে পোকামাকড়ের মত জীবন কালাতিপাত করে চলেছে। ঠাকুরও বলছেন কলকাতার লোকগুলো পোকার মত কিলবিল করছে, তিনিও কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তো মানুষের মধ্যে ঐশী চেতনার বিকাশের জন্য দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিলেন। ঋষি মুনিরা যখন গ্রামে শহরে ঘুরে বেড়ান তখন তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা দেখে, তাঁদের শ্রীমুখনিঃসৃত ঈশ্বরীয় বাণী শ্রবণ করে কারো কারো মন ঈশ্বরীয় ভাবে নড়ে ওঠে। সবারই যে হবে তা নয়। বিদুরও এই কথাই মৈত্রেয় মুনিকে বলে বলছেন আপনি আমাকে সেই উপদেশ দিন যাতে আমার মধ্যে সনাতন জ্ঞানের উদয় হয়। মৈত্রেয় মুনিকে ভক্তির প্রশংসা করে বিদুর বলছেন *স বিশ্বজন্মস্থিতিসংযমার্থে কৃতাবতারঃ প্রগৃহীতশক্তিঃ। চকার কর্মাণ্যতিপূরুষাণি যানীশ্বরঃ কীর্তয় তানি মহ্যম্।।৩/৫/১৬।* 'সেই যে ভগবান, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করেন, আর নিজের মায়া শক্তিকে আশ্রয় করে রাম, কৃষ্ণাদি অবতার হন, আর অবতার হওয়ার পর তিনি যে নানান ধরণের লীলা করেন, সেই ভগবদ্ লীলার কথা আমাকে বলুন'।

এখানে যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় ভাগবতের ভগবান আর বেদান্তের ভগবানের মধ্যে তফাৎ কোথায়? ভাগবতের ভগবান সাংখ্য দর্শন আর উপনিষদের দর্শন এই দুটোকে সংযুক্ত করছে। আমরা ভগবান বলতে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন বুঝি, সাংখ্য আর বৌদ্ধ মতে এনাদের কাউকেই ভগবান বলে মানবে না। তাঁরা বলেন – মানুষ যেমন খেটেখুটে টাকা পয়সা অর্জন করে, মানুষ যেমন পরিশ্রম করে মান, সম্মান, বিদ্যা, বুদ্ধি অর্জন করে, ঠিক তেমনি মানুষ আধ্যাত্মিক তপস্যা করে করে শেষে ভগবান হয়ে যায়, ভগবান মানে সর্বশক্তিমান। এর বাইরে ভগবান বলে কিছু নেই। বেদান্তের যিনি ভগবান তিনি এই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে কোন কিছুতেই নেই, তিনি সব মায়ার পারে, এই যা কিছু হচ্ছে সব মায়ার খেলা। ভাগবতের ভগবান এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় করে একটা নতুন মত নিয়ে এসেছে। ভাগবত বলছে তিনি সেই বেদান্তেরই ভগবান আবার যোগেরও ভগবান। কি রকম ভগবান? বলছেন – মানুষই ভগবান হন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে মানুষ ভগবান হন তিনি আদপেই মানুষ নন। আসলে তিনি ভগবানই কিন্তু মানুষ হয়ে আসেন। কিন্তু ভগবানের তো কোন পরিবর্তন নেই, তিনি কিভাবে মানুষ হন? ভাগবত বলছে – মায়াকে আশ্রয় করে। মায়াকে আশ্রয় করে হন বলছেন, সেটা আবার কি? এটাই শঙ্করাচার্য যখন গীতার ভাষ্য শুরু করছেন সেখানে বলছেন – *স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে* – সেই ভগবান মনে হয় যেন তিনি দেহবান হয়েছেন, মনে হয় যেন তিনি কাজকর্ম করছেন। কিন্তু আসলে তিনি কিছুই করেন না। কারণ তিনি তো ভগবান, ভগবান কিছু করেন না, মায়াতে আবদ্ধ না হলে কিছু করতে পারবেন না। তিনিতো মায়াতে কখন আবদ্ধ হন না। মানুষ আর ভগবানের মধ্যে সব সময় এই পার্থক্যটা থাকবেই। ভগবান যখন মানুষ রূপে আসেন তখনও কিন্তু এই চিরন্তন পার্থক্যটা সর্বদা থাকবে।

কিছু দিন আগে এক মহারাজ মজা করে বলছিলেন – আমাদের মিশনের কোন স্কুলে যদি ক্ষুদিরাম চট্টোপধ্যায়ের ছোট ছেলে গদাই আর বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে বিলে ভর্তি হয়, তাহলে এই দুজন কত দিন আমাদের স্কুলে টিকে থাকতে পারবে? প্রতি সপ্তাহে অভিবাবকদের চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠানো হবে আর ক্ষুদিরাম বাবুকে বলা হবে আপনার ছেলে গদাই রোজ স্কুলের ছেলেগুলোকে নিয়ে আম বাগানে পালিয়ে গিয়ে খেলা করে, এতে ওরতো লেখাপড়া হচ্ছেই না আর অন্য সহপাঠিদেরও পড়াশুনোর ক্ষতি করছে, আপনার ছেলেকে এখান থেকে নিয়ে যান। আর বিশ্বনাথ দত্তকে ডেকে বলা হবে আপনার ছেলে বিলে প্রচণ্ড বদমাইসি করে, কারুর কথা শোনে না, সব বিষয়ে তর্ক করে আর অনেক কুঅভ্যাস আছে, এর প্রভাবে স্কুলের অন্যান্য ছেলেরাও প্রভাবিত হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আপনার ছেলেকে এক্ষুণি স্কুল থেকে নিয়ে যান। মজা করে বলা হলেও এর পেছনে অযৌক্তিক কিছু নেই – গদাধর চট্টোপাধ্যায় আর নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছাত্র হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে ভর্তি হলে ছ'মাসও স্কুলে টিকবে না। এই কথা শুনে অন্য মহারাজরা বলছেন – না এদের নিয়ে কথা চলেনা, এনারা অন্য শ্রেণীর, এনারা ভগবান, ভগবানকে নিয়ে কথা চলে না। মহারাজ তখন বললেন – এই কথাই যদি বলেন, তাহলে যেসব ছেলে বদমাইসি করে তারাও তো বলবে 'বড় হয়ে আমিও তো কোন মহাপুরুষ হতে পারি, আপনি আগেই যদি তাড়িয়ে দেন তাহলে আমি যাবো কোথায়'। আইনস্টাইন সব পরীক্ষাতেই ফেল করতেন, আপনারা রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে ভর্তি করবেন? আমাদের স্কুলগুলোতে ছাত্রদের সব পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হবে, আপনার ছেলে ক্লাশ পালিয়ে যেতে পারবে না, আপনার ছেলে অন্য ছেলেদের নষ্ট যাতে না করে। এই হলে আমাদের স্কুলে আইনস্টাইন, গদাধর আর নরেন্দ্রনাথ কখনই ভর্তি হতে পারবেন না, ভর্তি হলেও ছমাসের মধ্যে তিনজনকেই টিসি ধরিয়ে দেবে।

দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দৃষ্টি = সৃষ্টি

যাই হোক, তখন মৈত্রেয় মুনি সৃষ্টির বর্ণনা করছেন। তিনি সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে প্রথমে পঞ্চলক্ষণমের সর্গ দিয়ে শুরু করছেন। বলছেন – যখন কোথাও কিছুই ছিলো না, তখন একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। ভগবান ছাড়া আর কিছুই ছিল না – এক বাদে দুই নেই। যদি বলে এক বাদে দুই নেই তাহলে ঐ একও নেই। এগুলো হচ্ছে বেদান্তের কূট বিচার। এই বিচারকে বুঝতে গেলে আগে কিছু সাধনা করা না থাকলে আর চিত্তশুদ্ধি না হলে বোঝা খুব মুশকিল। আর এই বিষয়টা আমাদের আলোচনার মধ্যে বার বার ঘুরে আসবে। বুঝে নিতে যদিও কষ্ট হবে তবুও আমাদের বোঝাতে হবে আর যারা বুঝতে চাইছেন তাঁদের শুনে রাখতে হবে।

বলছেন ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই, একমাত্র সচ্চিদানন্দই আছেন। ভগবান ছাড়া যখন আর কিছু নেই – এর মানেটা কি? এক বাদে দুই নেই। যদি এক বাদে দুই না থাকে তাহলে এক কি করে হল? যতক্ষণ দুই না হয় ততক্ষণ এক হতেই পারে না। তাহলে বলতে হয় এক আর দুই এর পারে। সেইজন্য বলা হয় অদ্বৈত – যার কোন দুই নেই। একটা জিনিষ আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে, যেটা আগেও অনেক বার বলা হয়েছে, সেটা হল – সেমেটিক ধর্মালম্বীদের বলা হয় একেশ্বরবাদ – এক ঈশ্বর। কিন্তু বেদান্তের ঈশ্বর অদ্বৈত। যদিও এই জিনিষগুলো ধারণা করতে সময় লাগবে কিন্তু এটা ধারণা না করতে পারলে হিন্দু ধর্মকে বোঝা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। এইজন্য বিদেশীরা হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রগুলো পড়ে উল্টো পাল্টা বুঝে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের অযৌক্তিক মন্তব্য করে বসে। মৈত্রেয় ঋষি বলছেন *ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাহত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ।।৩/৫/২৩।* সৃষ্টি রচনার পূর্বে সমস্ত আত্মার আত্মা যিনি তিনি এক পূর্ণ পরমাত্মাই ছিলেন। তখন না ছিল কোন দ্রষ্টা না ছিল কোন দৃশ্য। অনেকে ভুল করে মনে করে যে ভগবান হলেন subject। কিন্তু ব্রহ্ম subjectও নন objectও নন, তিনি এই দুটোরই পারে। সেটাই এখানে বলছেন তিনি দ্রষ্টাও নন, দৃশ্যও নন, তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পারে। কিন্তু যখন সৃষ্টি হবে তখন তিনি নিজেকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুটো ভাগে বিভক্ত করে নেন। *স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্ দৃশ্যমেকরাট্। মেনেহসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্।।৩/৫/২৪।* এখন তিনি প্রথমে হয়ে গেলেন দ্রষ্টা, অথচ দেখার মত কোন দৃশ্য নেই। দ্রষ্টা

এসে গেছেন কিন্তু তাঁর কাছে দৃশ্য পদার্থ বলে কিছু নেই। তখন ভগবানের যেন সন্দেহ হল কিছুই যখন নেই তাহলে আমিই নেই, তাহলে আমি অসৎ। উপনিষদেও এই ভাবটা এসেছে, প্রথমে অসৎ ছিল। খেতে বসে আমি যদি খাবারে কোন গন্ধ না পাই তাহলে দুটো জিনিষের সম্ভবনা আছে, একটা হল খাবারে হয়তো আদৌ কোন গন্ধ নেই, আর দ্বিতীয় সম্ভবনা আমার নাকে কোন গোলমাল হয়েছে। ভগবানের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা। আসলে কিন্তু এসব কিছুই হয়নি। কারণ ভগবানের কখনই জ্ঞানের অভাব হয় না, সর্বদা তিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি অ-সৎ ছিলেন না, কারণ তাঁর সব শক্তি লীন হয়ে তাঁর মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

যখন দ্রষ্টা হয়ে তিনি কিছু দেখতে পারছিলেন না, তখন তিনি মায়া সৃষ্টি করলেন। মায়াটি কি? দ্রষ্টা আর দৃশ্যের অনুসন্ধান। মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে বলছেন *সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ।।৩/৫/২৫।* এটি একটি খুব কূট শ্লোক। এখানে সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সৎ বলতে এখানে দ্রষ্টাকে এবং অসৎ বলতে দৃশ্যকে বোঝাচ্ছে। দ্রষ্টা আর দৃশ্যের যে অনুসন্ধান করা হয় এটাই মায়া। এখানে জিনিষটাকে ভালো করে বুঝতে হবে। কোন কাজ করতে গেলে আমাদের তিনটি জিনিষের প্রয়োজন – কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া। যখন এক, দুই তিনের ব্যাপার আসে তখন কর্তা আর কর্ম আসবে আর এই দুটোকে link করছে ক্রিয়া। যেখানে কর্ম আর ক্রিয়া আছে, এই অংশটাকে বলছে মায়া। বেদান্তের ভাষায় কর্তাকে বলছে দ্রষ্টা, কর্মকে বলছে দৃশ্য এবং দেখার কাজটাকে বলছে দৃষ্টি। দ্রষ্টা, দৃশ্য আর দৃষ্টি এই তিনটে মিলে হচ্ছে সৃষ্টি। এই মায়া যখন সৃষ্টি হয়ে গেল তখন তিনি এই মায়ার দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি করতে লাগলেন।
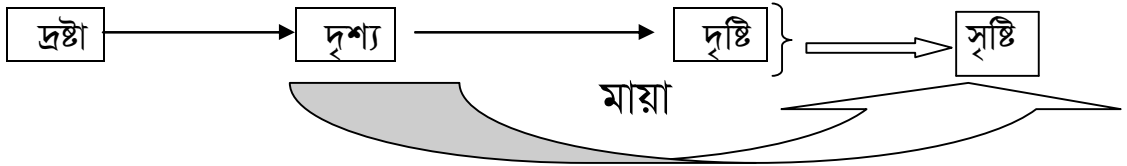
দৃশ্য আর দৃষ্টির মধ্যে আসবে এক দুই তিন চার মানে বহু। যেই দৃশ্য আর দৃষ্টি উড়ে যাবে অর্থাৎ মায়া যখন আর থাকবে না, তখন কি থাকবে – শুধু দ্রষ্টা। শুধু দ্রষ্টা যদি থাকে তখন কখনই এক বলা যাবে না, সেটা হবে এক দুইয়ের পার। আর এক দুইয়ের পার মানে অদ্বৈত।

ঠিক এই তত্ত্বটাই মৈত্রেয় মুনি এই শ্লোকে বিদুরকে বলছেন। যখন কিছুই থাকে না, তখন মায়াও থাকে না। মায়া নেই, সেইজন্য সৃষ্টিও নেই। সৃষ্টি নেই সেইজন্য দেখার প্রক্রিয়া নেই। দেখার প্রক্রিয়া নেই, সেইজন্য কিছুই নেই। এখন আপনি বাড়িতে আছেন কিন্তু বাড়িতে গ্যাস নেই, চাল নেই, ডাল নেই তাই রান্নার ব্যাপারও নেই। বাড়িতে গিন্নী শুয়ে আছেন, তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন 'হ্যাঁরে কি রান্না হয়েছে? কটা পদ রান্না হয়ছে'? বলবে শূন্য। আসলে এই ক্ষেত্রে শূন্য হয় না। কিন্তু আপনিই যখন থাকবেন না তখন সব নিষ্ক্রিয়, মৃতের মত। সরল অঙ্কের উদাহরণ দিয়ে বোঝালে আরও সহজে বোঝা যাবে। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলা শুরু হল, যদি জিজ্ঞেস করে – কটা গোল হল – বলছে জিরো জিরো, মানে এখনও গোল হয়নি। কিন্তু এখন খেলাই শুরু হয়নি, তাহলে কি বলবে? আপনি বলবেন এখন খেলাই শুরু হয়নি। অঙ্কের ভাষায় কি বলবে – নাল্সে ফাই, অদ্বৈতকে যখন বোঝাবে তখন এই নাল্সে ফাইকে বোঝাবে। সৃষ্টিই নেই, যার জন্য দ্রষ্টা নেই, দৃশ্য নেই দেখার প্রক্রিয়া নেই, কিছুই নেই। সেইজন্য তিনি এক দুই এর পারে। যখন বুঝতে হবে তখন মনে রাখতে হবে মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গলের খেলা এখন শুরু হয়নি। কটা গোল হয়েছে? এই প্রশ্নই হবে না। সেইজন্য এক দুইএর প্রশ্নটাই আসে না।

শিক্ষিত, লেখাপড়া জানা লোক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রফেসারদের মত ব্যক্তিদের অদ্বৈতকে যখন এভাবে বোঝান হয় তখন তাঁদেরই মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। এবার চিন্তা করুন গ্রামে যারা চাষবাস করে, লেখাপড়া আদৌ জানে না, সেখানে বছরে একবার দুবার ভাগবত পাঠ হচ্ছে, ভাগবতের এই শ্লোক যখন আসে

তখন তাদের বোঝাতে হবে ভগবান এক দুইয়ের পার, তখন তাঁরা তাদের কিভাবে বোঝাবেন? তখন বলতে হবে ভগবান ক্ষীর সাগরে অনন্তনাগের উপর শুয়ে আছেন, ওখানে আর কিছুই নেই। তখন তারা বলবে হ্যাঁ এটাই ঠিক। ভাগবত এদের জন্যই লেখা। স্বামীজী বলছেন – যারা সব কিছুর পারে চলে গেছে তাদের জন্য পুরাণ নয়।

কিন্তু যাঁরা সাধনা করে যাচ্ছেন, তাঁরা সাধনার শেষ অবস্থায় এটাই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এক বিন্দু পড়াশোনা করেন নি, সাধনা করে তাঁকেও এই জায়গাতেই আসতে হয়েছে, তার আগে তাঁকেও ভাগবতাদি গ্রন্থ শুনতে হয়েছে। শাস্ত্রে এই কথাই ঘুরে ঘুরে আসবে। সাধারণ মানুষ এই জিনিষগুলো বুঝবে না বলে তাকে নানা রকমের পৌরাণিক আখ্যায়িকা তৈরী করে বোঝান হয়। ক্ষীর সাগর আছে – ক্ষীর সাগর কেন? খুব উচ্চতম অবস্থা। ভগবান ওখানে শুয়ে আছেন – মানে তিনি কিছুই করেন না, নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয়কে কিভাবে বোঝাবে? তাই বলছেন তিনি শুয়ে আছেন।

ভগবান যখন শুয়ে আছেন, তাহলেতো কিছুই নেই। আসলে তা নয়। ক্রিয়া শক্তি, অর্থাৎ বেদান্ত যাকে মায়া বলছে, সেটাই নেই। ঘুম থেকে ওঠার পর অনেক সময় মনে হয় আমি কোথায় ঘুমিয়ে ছিলাম, একটা বিভ্রান্তির মত এসে যায়। ভগবানও যখন তাঁর শয়ন থেকে একটু জাগ্রত হয়েছেন, তখন তাঁর চিন্তা হল, এটা কি হচ্ছে। তখন তাঁর মধ্যে ক্ষোভন্, মানে ক্ষোভ উৎপন্ন হল, এটা কি হচ্ছে। যেই মুহুর্তে মনে করলেন এটা কি – সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। যে কোন সাম্য অবস্থায় কোন কর্ম হয় না। থার্মো ডায়নামিক্সে যখন দুটো বডিতে সমান তাপ থাকে তখন কিছুই হবে না। কিন্তু যখন একটা higher heat আরেকটা lower heat হয়, তখন heat transfer হতে শুরু হবে। আর এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই ইঞ্জিন চালান সম্ভব হয়। চারিদিকে যদি জল সমান থাকে তাহলে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাবে না। জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে হলে বাঁধ দিয়ে বাঁধের নীচে ফুটো হলে সেইখান দিয়ে জল যে প্রচণ্ড তোড়ে বেরোতে থাকবে সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরী করতে পারবে। আর জল সমান ভাবে থাকলে কিছুই হবে না। ভগবানও এই রকম সাম্য অবস্থায় ছিলেন, যেই তিনি দেখলেন কিছুই নেই, তাঁর মধ্যে ক্ষোভন্ উৎপন্ন হয় আর তাতেই একটা কম্পন সৃষ্টি হল। এই কম্পন যখন হতে থাকল সৃষ্টিও চলতে শুরু করল। সাম্য অবস্থা থেকে বৈষম্য এসে গেল। এরপর ভাগবতে সেই লম্বা বিবরণ, এটার পর সেটা, সেটার পর এটা শুরু হল।

মৈত্রেয় মুনি কর্তৃক বিদুরকে সৃষ্টির বর্ণনা

যাই হোক এই ভাবে তিনি মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি করলেন, যার কথা আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। মহত্তত্ত্বাদির পর নিজের শরীর থেকে একটার পর একটা সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। যেমন বলছেন, সেই বিরাট দেহে নেত্রগোলকদ্বয়ের দিকে যখন তাঁর ধ্যান গেল তখন তিনি নিজের চোখের শক্তিটাকে বার করে সূর্যের মধ্যে স্থাপিত করে দিলেন। সেই থেকে সূর্য হয়ে গেলেন লোকপতি। সেইজন্য সূর্য আর দৃষ্টিশক্তি একসাথে চলে। আমাদের চোখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন সূর্য। বিরাট দেহের ত্বককে বায়ুতে স্থাপিত করে দিলেন, সেই থেকে বায়ুর মধ্যে স্পর্শ শক্তি এসে গেল। এই ভাবে বিরাট লম্বা বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন। ভগবান তাঁর বিরাট দেহের এই অঙ্গ থেকে একে এটা দিয়ে দিলেন, সেই অঙ্গ থেকে তাকে ওটা দিয়ে দিলেন। মূল বক্তব্য হল, এই জগতে এমন কোন শক্তি নেই যা কিনা ভগবানের শক্তিতে চলছে না। যেমন ভগবানের মন, এই মনকে তিনি চন্দ্রমাতে স্থাপিত করে দিলেন। সেইজন্য চোখের সমস্যা হলে সূর্যের উপাসনা করতে বলা হয় আর মনের গোলমাল হলে চন্দ্রমার উপাসনা করতে বলা হয়।

ব্রহ্মার ব্যাপারে কিছু কথা বলার পর বিদুর প্রশ্ন করছেন – ভগবান হলেন শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ, তিনি নির্বিকার ও নির্গুণ। বালকদের মধ্যে কামনা থাকে আর অপর বালকের সাথে খেলা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু ভগবান তো পূর্ণকাম তাঁর মধ্যে খেলার ইচ্ছা কি করে হবে? আমরা যেমন প্রায়ই বলে থাকি ভগবান খেলার ছলে এই জগৎ রচনা করলেন। কিন্তু পূর্ণকামের মধ্যে খেলার ইচ্ছা কি করে জাগতে পারে? মাণ্ডুক্যকারিকা উপনিষদেও ঠিক একই প্রশ্ন আছে, *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি আপ্তকাম তাঁর কি করে স্পৃহা হবে! এই যে

মায়ার সাথে ভগবানের সংযোগ হচ্ছে, আর আমরা যত অবতারের কথা শুনছি, মনুষ্য শরীর ধারণ করে তাঁদের কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। বিদুর প্রশ্ন করছেন ভগবান কি করে এই অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। ঠাকুরও বলছেন পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। কি করে এটা সম্ভব? ঠিক এই প্রশ্ন অধ্যাত্ম রামায়ণেও করা হয়েছে। মা পার্বতী কৈলাসপতি শিবের কাছে প্রশ্ন করছেন – শ্রীরামচন্দ্র যিনি পূর্ণব্রহ্ম তিনি একটি নারীর জন্য কেন এইভাবে উতলা হয়ে কাঁদছেন? মৈত্রেয় মুনি তখন বিদুরকে বলছেন – ভগবানের মধ্যে কখন অজ্ঞান আসে না। ভগবানের মধ্যে এই যা কিছু তুমি দেখছ এগুলো আমাদের প্রতীতি মাত্র। যিনি ভগবান, যা কিছু সৃষ্টি কার্য চলতে থাকে, যা কিছু সৃষ্টি হয়, এই সব কিছুতে তিনি সাক্ষী রূপে থাকেন। সাক্ষী রূপে থাকেন বলে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তার কোন প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে না। সাক্ষী বলতে বোঝায় – আমি ট্রেনে করে যাচ্ছি। ট্রেন খুব ধীরে ধীরে চলছে, জানলা দিয়ে বাইরে দেখছি মাঠে দুজন লোক মারামারি করছে। এখন তারা করছে মারামারি, একজনের হয়তো নাক দিয়ে রক্ত বেরোল। এতে আমার কি কিছু হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না, আমি শুধু দেখে যাচ্ছি, দেখা ছাড়া আর কিছুই করছি না। ভগবান ঠিক সেই রকম তিনি সব কিছু দেখে যাচ্ছেন, কোন কিছুতেই তিনি জড়ান না।

বলছেন – এটা কি করে হতে পারে যে ভগবান সাক্ষী রূপে শুধু সব দেখে যান! এর জবাবে বলছেন স্বপ্ন অবস্থাতে আপনি যদি দেখেন আপনার মুণ্ডুটা কাটা গেছে, আপনি তখন অবশ্যই ঘাবড়ে যাবেন। আর তার মধ্যেই কান্নাকাটি চেঁচামেচি হৈচৈ সব লেগে যাবে, স্বপ্নে অনেক কিছুই হয়। কিন্তু সেই সময় যদি কোন কারণে আপনার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন মনে হবে – ধ্যাৎতেরিক্কা, এতো কিছুই না। স্বপ্নের মধ্যে যদি কেউ আপনার হাত কেটে দেয়, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আপনি কি হাতকাটা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যাবেন? হবেন না। কেন হবেন না? কারণ আপনি হলেন স্বপ্নের সাক্ষী। স্বপ্নটা আপনি তৈরী করেছেন, স্বপ্নের সৃষ্টি আপনার কারণেই হয়েছে, স্বপ্নে আপনার অনেক কিছু হচ্ছে, আপনিও আবার স্বপ্নে অনেকের অনেক কিছু করছেন। কিন্তু তাতে কি আপনার কিছু হচ্ছে – হচ্ছে না। কেননা স্বপ্নের শুধু সাক্ষী আপনি। সাক্ষীর উপর ক্রিয়ার কোন প্রভাব হয় না। ভগবানেরও এই যা কিছু হচ্ছে সব স্বপ্নের মধ্যে।

এরপর তাই বলছেন *যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ। দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনো নাত্মনো গুণঃ।। স বৈ নিবৃত্তিধর্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া। ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ।।৩/৭/১১-১২।* সাধারণ মানুষ যখন নিষ্কাম ভাবে ধর্মের আচরণ করে, তখন ভগবৎ কৃপায় তার ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি লাভ হলে চঞ্চল মন শান্ত হয়ে যায়। উদাহরণ দিয়ে বলছেন – একটা পুকুরে তরঙ্গ হচ্ছে, আর তরঙ্গায়িত জলে আকাশের চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ছে। প্রথমে দেখাবে পুকুরের জলে অনেকগুলো চাঁদ, তারপরে দেখাবে চাঁদ নড়ছে। এই পুকুরে এতগুলো যে চাঁদ আর সব চাঁদ যে নড়াচড়া করছে তাই বলে আকাশের চাঁদের কি কিছু হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না। সেই একটিই চাঁদ আকাশে স্থির হয়ে আছে। আমরা সবাই প্রকৃতির রাজ্যের মধ্যে আছি বলে আমাদের মনের মধ্যে অনেক কিছুই হয়ে চলেছে, কিন্তু ভগবানের মধ্যে এসব কিছুই হচ্ছে না। সৃষ্টিকে বাস্তব বলে মনে করলে এই সমস্যাগুলো চলে আসে। বেদান্ত মতে সৃষ্টিটাই মায়া।

আমাদের মন চঞ্চল বলে এই জগৎকে চঞ্চল দেখছি। প্রবাদ আছে যে, তোমার স্বভাবটি যেমন হবে জগতের সব কিছু তুমি তেমনটি দেখবে। দুষ্ট লোক জগৎটাকে দুষ্ট দেখছে। আমাদের মন চঞ্চল বলে চারিদিকে এই চাঞ্চল্য দেখছি। পুকুরের জলের চাঞ্চল্যতার জন্য আকাশের চন্দ্রমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু কোন কারণে যদি পুকুরের ঢেউ ওঠাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন পুকুরের জলটা শান্ত হয়ে যাবে। শান্ত জলে একটাই চাঁদ দেখা যাবে, বাকী সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে। মূল কথা হল মনটাকে শান্ত করা। মন অশান্ত কেন হয়? কারণ মন ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে আছে। তাই মানুষ যখন শাস্ত্র এবং গুরু বা আচার্যের উপদেশ বাক্য অনুসরণ করে ধীরে ধীরে নিষ্কাম ভাবে ধর্মাচরণ করতে শুরু করে, তখন আস্তে আস্তে ভগবানের প্রতি তার ভক্তি ভাব জাগতে শুরু করে। ভগবানের প্রতি যখন ভক্তি জাগ্রত হয়, তারপর আবার আস্তে আস্তে মন ভগবানের দিকে সরে আসে। আর শেষে কি হয় – মানুষ যেমন স্বপ্ন দেখতে দেখতে গাঢ়

নিদ্রাতে বা সুষুপ্তিতে চলে যায় তখন তার কাছে এই জগতের যা কিছু আছে সব নাশ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভগবানের দিকে মন পুরোপুরি সরে এলে মানুষের মধ্যে যে রাগ আর দ্বেষ আছে আর যেখান থেকে জন্ম নিচ্ছে সমস্ত রকমের ক্লেশ, সব কিছু ঐখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায়।

সেইজন্য বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন আর তাঁর লীলাকথা সর্বদা শ্রবণ করতে হয়। ভগবানের গুণকীর্তন ও লীলা কাহিনী শুনতে শুনতে মানুষের স্তুপিকৃত সমস্ত দুঃখরাশি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির জন্ম হয়। যখনি ভক্তির জন্ম হল তখন থেকে আস্তে আস্তে মনের সমস্ত চাঞ্চল্যতাও দূর হয়। ভাগবতের মাহাত্ম্য এইটাই। আসলে ভাগবত সেই এক জায়গাতেই নিয়ে যাচ্ছে – আমরা অবিদ্যা কাকে বলে, অজ্ঞান কাকে বলে বুঝবো না, আমরা শুধুমাত্র বুঝি রাগ আর দ্বেষ – রাগ হলো আসক্তি, যে কোন জিনিষের প্রতি ভালোবাসা বা প্রীতি, আর দ্বেষ মানে অপ্রীতি। প্রীতি আমাদের টেনে নিয়ে যায় আর অপ্রীতি ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। কিছু জিনিষের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আর কিছু জিনিষ থেকে বিকর্ষণ। শুধুমাত্র এই দুটোর জন্য সারা দুনিয়া চলছে। এই দুটোই মনের আদি ব্যাধি। যখন আমাদের ভগবানের প্রতি প্রীতি, ভালোবাস, ভক্তি আসে তখন এই দুটো রোগ থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। সমগ্র ভাগবতের মূল উদ্দেশ্য এই একটাই ভগবানের প্রতি ভক্তি অর্জন করানো, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এলেই এই দুটো বৃত্তি চিরতরে নাশ হয়ে যাবে।

মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে বলছেন 'ভগবান স্বয়ং সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমারকে যে ভাগবত শুনিয়েছিলেন, এখন আমি তোমাকে সেটাই শোনাব'। ব্যাসদেব ভাগবতের মূল রচয়িতা নন, আসলে ভগবান নিজেই ভাগবত রচনা করেছেন। ভগবান চার কুমারদের, যাঁরা ব্রহ্মার মন থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাঁরা জন্ম নিয়েই তপস্যা করতে বেরিয়ে গেলেন, তাঁদেরকেই প্রথম ভাগবত শুনিয়েছিলেন। সনৎকুমার আবার সাংখ্যায়ন মুনিকে এই ভাগবত বলেছেন। সাংখ্যায়ন মুনি পরাশর মুনিকে শোনালেন, পরাশর মুনি আবার বৃহস্পতিকে শুনিয়েছিলেন। এই করে করে যখন ব্যাসদেবের কাছে এলো তখন তিনি ভাগবতকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে দিলেন। অর্থাৎ ঠিক ঠিক বলতে গেলে ভাগবত ব্যাসদেবের মৌলিক রচনা নয়।

মূল কথাটা হল – যদি ব্যাসদেবের নিজস্ব রচনা হত তাহলে ভাগবতের কথার কোন দাম থাকতো না। কারণ ভাগবতকে টেক্কা দিতে হবে বেদের সাথে। বেদ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্য আর ভাগবত হল সবার জন্য। ব্রাহ্মণরা বলবে – আমরা বেদ পড়ি, যে বেদ স্বয়ং ভগবানের মুখ থেকে বেরিয়েছে, আর তোমাদের ভাগবততো ব্যাসদেবের রচনা, তাই বেদের তুলনায় ভাগবতের কোন দাম নেই। তাই বলছে – না, ভাগবতকে ব্যাসদেব শুধু লিপিবদ্ধ করেছেন, যে রকম তিনি বেদকে বিভাজন করেছিলেন। আসলে ভাগবত ভগবান নিজে বলেছিলেন, সেইজন্য ভাগবতের এত দাম। বেদ যেমন ভগবান বলেছেন পুরাণও ভগবান বলেছেন। ভগবান না বললে এর কোন দাম হবে না।

আবার সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলছেন। বলছেন – ভগবান ক্ষীর সাগরে যোগনিদ্রায় শুয়ে আছেন। আসলে মানুষ যে অর্থে ঘুমোয় ভগবান সেই অর্থে ঘুমান না। তিনি যোগনিদ্রায় থাকেন। যোগনিদ্রা মানে, যোগে তিনি নিজেকে সমাহিত করে রেখেছেন, দেখে মনে হবে যেন তিনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন, কিন্তু সেরকম নয়, তিনি যোগে আত্মজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে থাকেন। তাঁর সমস্ত শক্তিকে এই অবস্থায় গুটিয়ে এনে তাঁর নিজের মধ্যে প্রসুপ্ত করে রাখেন। কি রকম? যেমন কাঠের মধ্যে তার দাহিকা শক্তি লুকিয়ে থাকে, কাঠের বাইরে থেকে তার দাহিকা শক্তি বোঝা যায় না, কিন্তু যেই আগুনের সংস্পর্শে আসবে তখন কাঠের দাহিকা শক্তি বেরিয়ে আসবে। সেই রকম ভগবানের যে মায়া শক্তি, ক্রিয়া শক্তি ভগবানের মধ্যে সেই সময় অব্যক্ত ছিল, প্রকাশিত ছিল না।

বলছেন – তখন তিনি এক হাজার চতুর্যুগ পর্যন্ত চুপচাপ শুয়ে আছেন। তারপর হঠাৎ কালশক্তির জন্য তাঁর মনে হল – এতদিন ধরে চুপচাপ শুয়ে আছি এবার কিছু কাজ করা যাক। সাধারণ মানুষকে সহজ কথায় সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বোঝাবার জন্য এভাবে বলা হচ্ছে। তখন তিনি বললেন এবার সৃষ্টি কার্য করা যাক। মানুষ যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠে বলে চলো চাষবাস করতে যাই, অফিসে যাই, ঠিক তেমনি ভগবান ভাবলেন

সৃষ্টি করি। যে মুহুর্তে তিনি ভাবলেন সৃষ্টি করি তেমনি তাঁর সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি, আমাদের মত ভগবানের স্থূল শরীর নেই, তাঁর সেই সূক্ষ্ম শক্তিগুলো যেগুলো পুঞ্জিভূত হয়েছিল সেগুলো ঘনিভূত হয়ে পদ্মফুলের রূপ নিয়ে নাভি থেকে বেরিয়ে এলো। সাধারণ মানুষকে সৃষ্টি কিভাবে হয় বোঝাতে গেলে এভাবে না বললে কখনই বোঝান যাবে না। হিন্দী ভাষী এলাকায় বিশেষ করে ইউপি, বিহার, হিমাচল প্রদেশে এই ধরণের অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায়, যে ছবির মধ্যে ভগবান নারায়ণ ক্ষীর সাগরে অনন্তশয়নম্ হয়ে আছেন আর তাঁর নাভি থেকে একটা পদ্মফুল বেরিয়ে রয়েছে। আসলে বোঝাতে চাইছেন সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যশক্তি এখন সূক্ষ্মতর অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এখন এই সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের উৎপন্ন হবে। যেটা একেবারে সূক্ষ্মতর ছিল সেটাই হয়ে গেল সূক্ষ্ম, এই সূক্ষ্ম থেকেই স্থূলের সৃষ্টি হবে। সৃষ্টি যখন হয় তখন এভাবেই হয় – সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্ম আবার সূক্ষ্ম থেকে স্থূল। যখন আবার প্রলয় হবে তখন এর ঠিক উল্টোটা হবে — স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় এভাবেই হয়ে চলেছে।

এখন এত কিছু তত্ত্ব সাধারণ মানুষকে তো বোঝান যাবে না, তাই বলছেন তাঁর শরীর থেকে একটা পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হল। ভগবানতো নিষ্ক্রিয়, তিনি তো সৃষ্টি করবেন না, তাই পদ্মফুল যেন আপনা থেকে নিজে নিজেই প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। শুধু তাঁর ইচ্ছামাত্রেই এই রকম হল। পদ্মফুল হাজার হাজার সূর্যের যে তেজ ও দীপ্তি তার থেকেও অনেক বেশি জ্বলজ্বল করছে। ভগবানের শক্তিকে দেখানোর জন্য পদ্মফুলের এত জ্যোতি। এখন দেখা যাচ্ছে সেই পদ্মের মধ্যে ব্রহ্মা বসে আছেন। ব্রহ্মার মধ্যে নিজের অস্তিত্বের চেতনার জন্ম হল, আমি আছি এই বোধের জন্ম হল। অস্তিত্বের চেতনার জন্ম নিতেই ব্রহ্মা একবার তাঁর সামনের দিকে তাকালেন, দেখলেন কোথাও কিছু নেই, তারপর ডান দিকে তাকালেন, দেখলেন কোথাও কিছু নেই, তারপর বাম দিকে, পেছন দিকে অবলোকন করলেন, দেখলেন কোন দিকেই কিছু নেই। চার দিকে তাকালেন বলে তাঁর চারটি মুখ হয়ে গেল। এখানে এটাই বলত চাইছেন যে যখন প্রথম ব্রহ্মার সৃষ্টি হল তখন কোথাও কিছু নেই। কিছুই নেই, কিন্তু তিনি প্রথম দেখতে পেলেন পদ্মফুল, যেখানে তিনি বসে আছেন, দ্বিতীয় সেখানে ব্রহ্মা দেখতে পেলেন ক্ষীর সাগরের জল, যেখানে পদ্মটা ফুটে উঠল, তৃতীয় দেখছেন আকাশ, আকাশ মানে space, space যদি না হয় তাহলে কোন কিছু হবে না। চতুর্থ জিনিষ তিনি দেখছেন বাতাস, এখানে তিনি দেখলেন বাতাস জলটাকে নাড়াচ্ছে। আর পঞ্চম দেখলেন নিজের শরীর। এই পাঁচটি পদার্থকে তিনি দেখলেন।

সৃষ্টি তত্ত্বের পঞ্চ তন্মাত্রা বা পঞ্চ মহাভূতের এই পাঁচটাকে এখানে এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বেদের নাসদীয় সুক্তে শুধু দুটো জিনিষের কথা বলা হয়েছে – আকাশ আর প্রাণ। প্রাণ মানে energy আর আকাশ মানে space, প্রাণ যখন আকাশের উপর আঘাত করতে শুরু করে তখন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি হতে শুরু করে। সৃষ্টির কার্যে বেদের আকাশ ও প্রাণের যে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা সেটাই পুরাণে এসে একটা আখ্যায়িকার রূপ পেয়েছে – ভগবান শয়ন করে আছেন, শয়ন করার জন্য জায়গা চাই, কোথায় শুয়ে আছেন – বলছেন তিনি অনন্তশয়নম্, তিনি অনন্তের উপরে শয়ন করে আছেন। তিনি সৃষ্টি করেন না, তাই পদ্মফুলকে আনা হয়েছে, সেখানে ব্রহ্মা বসে আছেন। এই কাহিনী যদি না বলা হয় সাধারণ লোক এত কিছু বুঝতে চাইবে না। মূল কথা বেদ যা বলছে ভাগবতেও সেই একই জিনিষ বলছে। মূল জিনিষ কি? তত্ত্ব হচ্ছে দুটি – আকাশ আর প্রাণ। প্রাণ যখন আকাশে গিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করে তখন সৃষ্টির প্রবাহ চলতে শুরু করে। পদার্থ বিজ্ঞানেও আমরা একই জিনিষ পাই। এই energyই পরে matter হয়ে যায়। আইনস্টাইনের থিয়োরিও তাই বলছে – energyই matter হয়ে যায়, আবার matterকে energyতে convert করে দেওয়া যেতে পারে। এনার্জি ছাড়া কিছু নেই, আবার এনার্জি থাকতে গেলে স্পেস দরকার – এই দুটোই স্পেস আর এনার্জি অর্থাৎ বেদের ভাষায় আকাশ আর প্রাণ ছাড়া কিছু নেই।

এটা খুবই আশ্চর্যের যে, বেদে যেখানে সৃষ্টি তত্ত্বের কথা খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে সেখানে ভাগবত কয়েকটা অধ্যায়ের পরে পরেই আখ্যায়িকার মাধ্যমে সৃষ্টি তত্ত্বের এই বিশাল বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। পদার্থ বিজ্ঞান থেমে যাচ্ছে স্পেস আর এনার্জিতে এসে। চৈতন্যকে ফিজিক্স জানেনা, মানেনা আর বোঝেও না। ফিজিক্স যে

চৈতন্যের কথা বলছে বিশেষ করে রজার পেনরোজরা যাকে চৈতন্য বলছেন সেটা আমাদের কাছে জড়। আমরা যাকে বুদ্ধি বলছি সেটাকেই বিজ্ঞান চৈতন্য বলে ধরে নিয়েছে, আসলে বুদ্ধি শক্তিরই একটা দিক। চৈতন্য আর জড় দুটোই ঈশ্বরের। এর মধ্যে আবার জড়ের দুটো দিক – স্পেস আর এনার্জি বা আকাশ ও প্রাণ, আর বুদ্ধি হল one aspect of energy, মনও তাই, মন হল এনার্জিরই একটা দিক। বিজ্ঞানীরা চৈতন্যকে আকাশ ও প্রাণেরই একটা অংশ বলে মনে করেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে চৈতন্যই সব কিছুর কারণ। এই চৈতন্য থেকেই স্পেস বেরোচ্ছে, চৈতন্য থেকেই বেরোচ্ছে এনার্জি। একটা থেকে একটা জন্মালে তো সৃষ্টি এগোবে না, একটা থেকে দুটো জন্মালে তবেই সৃষ্টি এগোবে। Chain reaction যখন হয় তখন একটা থেকে দুটো হতে হয়। একটা থেকে একটা হলে একই জিনিষ থেকে যাবে। ঠিক সেই রকম চৈতন্য থেকে দুটো বের হয় – আকাশ ও প্রাণ। এই দুটো যখন একে অপরের সঙ্গে combine and inter combine করতে থাকবে তখন একটার পর একটা সৃষ্টি হতেই থাকবে। ভাগবত এটাকেই খুব সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বলছে – ভগবান বিষ্ণু অনন্তের উপর শুয়ে আছেন, তখন তাঁর মনে ইচ্ছা হল সৃষ্টি হোক, তখন একটা পদ্মফুল ফুটে উঠল, সেই পদ্মের উপরে ব্রহ্মা বসে আছেন, ব্রহ্মা দেখলেন কোথাও কিছু নেই, তখন তিনি এই পাঁচটা জিনিষ দেখলেন।

আমরা এর আগেও আলোচনা করেছিলাম যে ব্রহ্মা চুপচাপ বসে আছেন, হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন 'তপঃ' শব্দটি। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে তপস্যা করার আদেশ হয়েছে। তখন তিনি হাজার যুগ ধরে তপস্যা করলেন। তারপর ভগবান এসে তাঁকে বললেন 'আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি সৃষ্টি কর' ব্রহ্মা তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন 'এই সৃষ্টি কার্যে আমার যেন কর্তৃত্বাভিমান ও আসক্তি না আসে'। ভগবানও আশীর্বাদ দিয়ে তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তোমার আসক্তি হবে না।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কালকে নিয়েই বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে প্রশ্ন করছেন *যদাত্থ বহুরূপস্য হরেরদ্ভুতকর্মণঃ। কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মন্ যথা বর্ণয় নঃ প্রভো।।৩/১০/১০।* হে ব্রহ্মন্! অদ্ভুতকর্মা ভগবান বিষ্ণুর কাল নামে যে শক্তির কথা আপনি বলেছিলেন সেই শক্তির কথা বিস্তারতি ভাবে আমাকে বলুন। মৈত্রেয় মুনি বলছেন *গুণব্যতিকরাকারো নির্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ। পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ।।৩/১০/১১।* ভগবান কালের সাহায্যে বিষয়ের রূপান্তর করেন। বিষয়ের পরিবর্তনটাই কাল। বিষয়ের এই যে রূপান্তর হচ্ছে এরই নাম সৃষ্টি। সৃষ্টি রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়, সৃষ্টি মানেই রূপান্তর। আসল কথা হল, ভগবান ছাড়া তো আর কিছুই নেই, তিনি আছেন, এখন ভগবানের যে রূপ সেটাকে অন্য ভাবে দেখানোকেই তাহলে সৃষ্টি বলতে হবে। কিন্তু ভগবান তিনি হলেন নির্বিশেষ, কোন বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাঁকে আলাদা করে দেখানো যায় না। অন্য দিকে তিনি হলে অনাদি অনন্ত। ঘুরে ফিরে এই কথাই বার বার আসবে, তাঁকে যতই সগুণ সাকার বলা হোক না কেন সেখানেও তখন বলা হবে তিনি অনাদি অনন্ত। কিন্তু তিনি কি করেন? এই কাল হল তাঁর অধীন, তাঁর অধীনস্ত কালকে আশ্রয় করে *লীলয়াসৃজৎ*, খেলার ছলেই তিনি সব কিছুর সৃজন করেন।

প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় ভগবান কেন খেলা করতে যাবেন, আর খেলার ছলে এই সৃষ্টিই বা কি করে হব? বাচ্চারা যেমন খেলা করে সেই অর্থে ভগবান কিন্তু খেলা করেন না। বাচ্চা যখন খেলা করে তখন বাচ্চার খেলা আলাদা, বাচ্চা আলাদা আর তার খেলার সরঞ্জাম আলাদা। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে, যে কাল ভগবান থেকে অভিন্ন, সেই কালকে আশ্রয় করে তিনি নিজেরই ছোট্ট একটু অংশকে রূপান্তরিত করে দেন। গীতায় ভগবান বলছেন *একাংশেন স্থিতো জগৎ*, ভগবানের সামান্য একটু অংশে এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান রূপে দাঁড়িয়ে আছে। তন্ত্র মতে বলা হয়, এই কালকে যিনি গিলে ফেলেন তিনি মহাকাল, আর যিনি মহাকালের জন্ম দেন তিনিই কালী। কালীই শক্তি, শক্তিই কালী। এই ব্যাপারে পুরাণ আর তন্ত্রে মতে কোন ভেদ নেই। পুরাণ বলছে ভগবান এই কালকে আশ্রয় করে খেলার ছলে সব কিছুর সৃজন করেন। সৃজন করেন এই কথা যখন বলা হচ্ছে তখন শক্তিকেও আসতে হচ্ছে। তাহলে কাল মানে শক্তি। কালকে অনেক অর্থেই নেওয়া যেতে পারে, কাল মানে সময়, কাল মানে যা দিয়ে ঘটনা সমূহকে মাপা হয়, আবার কাল মানে যে সব কিছুকে গ্রাস

করে নিচ্ছে, যেমন আমরা বলি তোমার কাল তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কাল দাঁড়িয়ে থাকা মানে তোমার সময় শেষ হয়ে গেছে। ঘটনা মাপা মানে, তোমার জীবন একটা ঘটনা, তোমার মৃত্যুও একটা ঘটনা, এই দুটোকে যে মাপছে তাকেও কাল বলা হয়। তুমি যেদিন জন্ম নিলে সেদিন থেকে তোমার মৃত্যুদিন পর্যন্ত সময়টাই তোমার জীবনকাল।

এই কালের জন্ম মহাকালের গর্ভ থেকে। আর মহাকালের সাথে যিনি রমণ করেন তিনিই কালী। আবার বলছেন মহাকালকে যিনি জন্ম দেন তিনিই কালী। এগুলো শব্দ মাত্র, শব্দ ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের ভাষায় যদি বলতে হয়, ভগবান আছেন আর তাঁর শক্তি তাঁর সাথেই আছে। ঠাকুর আরও সহজ করে বলছেন জল শান্ত থাকলেও জল আবার হেললে দুললেও জল। যিনি নির্গুণ নিরাকার, যিনি অনন্ত তিনি যেন একটু নড়ে উঠলেন। তাঁর পুরোটা তিনি নড়ে উঠবেন না, কারণ তিনি তো অনন্ত। পুরোটা নড়ে ওঠা বলে দিলে সেই অনন্তকে সান্ত করে দেওয়া হবে। অনন্ত ভগবান তো কখন সান্ত হবেন না। তাই তাঁর কোন সামান্য ক্ষুদ্রতম অংশ নড়ে উঠল।

মনে করা যাক আমরা এখানে যে কজন আছি, আর আমাদের চারিপাশে যা কিছু আছে সব নিশ্চল, নিস্তব্দ হয়ে গেল। কোথাও কিছু নড়ছে না, বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যেতে পারে সব কিছু velocity of lightএ চলতে শুরু করল, মানে time delusionএ চলে গেছে, কোন ঘটনাই আর মাপা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় আমরা বলতে পারবো না আমরা কতটা সময় অতিক্রান্ত করেছি, সময় মাপার কোন ঘটনাই তো নেই। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি গভীরে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছি। আমার কাছে কোন ঘড়ি নেই, মোবাইল ফোন নেই। এই সময় হঠাৎ আমাকে যদি ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হয় তখন কি আমি বলতে পারবো কতক্ষণ সময় আমি ঘুমিয়ে ছিলাম? আগেকার দিনের লোকেরা বলতে পারতেন, বাড়ির বাইরে এসে আকাশের তারার অবস্থান, চাঁদের অবস্থান দেখে বুঝতে পারতেন। কিন্তু ঘরের ভেতরে থাকলে বোঝা যাবে না। এমনিতে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের যদি কোন ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়, আর আমাদের কাছে কোন ঘড়ি নেই, তাহলেও আমরা সময়কে মেপে নিতে পারব। কারণ সময় হল measure of events পরিবর্তনের পরিমাপ। পরিবর্তন যেটা হচ্ছে সেটাকে যখন মাপা হয় সেটাই সময়। জাগ্রত অবস্থায় আমরা খুব সহজে সময় মেপে নিতে পারি। আমি যদি শুধু আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর রাখি তাহলেও আমি বলে দিতে পারব আমি এতটা সময় এখানে বন্দি হয়ে আছি। এখানে একটা ঘটনা চলছে। সমস্ত ঘটনাকে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে সময়ও আর থাকবে না। সময় নেই মানে আর বলা যাবে না এখন কত সময় হয়েছে। স্বামীজীও বলছেন – time is measure of causation। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে মিনিটে আমাদের সত্তর বার নাড়ির স্পন্দন হয়। এবার আমি আমার নাড়ির স্পন্দন সত্তর বার করে গুণতে থাকলে মিনিট পেয়ে যাব। এখানে একটা ইভেন্ট চলছে। কিন্তু যেখানে কোন ইভেন্ট নেই সেখানে সময়কে আর মাপা যাবে না। আইনস্টাইন আমাদের বেদান্তের এই সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়ে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে এলেন।

এবার আমরা যদি ব্রহ্মের কথা ভাবি, যিনি অদ্বিতীয়, অনন্ত তিনিই আছেন। যদি প্রশ্ন করা হয় এখন কত টাইম। ব্রহ্মে কোন ইভেন্টই তো নেই, জিরো ইভেন্ট হলে টাইম কত কিছুই বলা যাবে না। কত দিন এভাবে ছিল সেটাও আমাদের জানার কথা নয়। এরপর তাঁর হঠাৎ ইচ্ছে হল সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হোক মনে করতেই একটা তরঙ্গ উঠল, এবার টাইমের অর্থাৎ কালের জন্ম হল। দেশ, কাল ও কারণই মায়া। দেশ যদি না থাকে তাহলে ক্রিয়া হবে না। ক্রিয়ার পরিমাপকে বলা হয় কাল। ক্রিয়া যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ কাল আসবে না! ক্রিয়া নেই মানে টাইমও নেই। এতদিনে বিজ্ঞান স্বীকার করছে time has a beginning। কিন্তু এই সত্যকে আমাদের ঋষিরা কত হাজার বছর আগেই আবিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেখানে নির্গুণ নিরাকার ভগবান আছেন সেখানে তো কোন ক্রিয়াই নেই, সেখানে কত টাইম হল এই প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। কিন্তু নির্গুণ নিরাকারের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য হতেই দেশের জন্ম হল। দেশ না হলে তো চাঞ্চল্য হবে না। প্রথম সৃষ্টি হল দেশ, দ্বিতীয় সৃষ্টি হল ক্রিয়া বা ইভেন্ট। একটু একটু নড়াচড়া হতে শুরু হল। যেমনি প্রথম

নড়াচড়া হল ওখানেই কালের জন্ম হয়ে গেল। কালীকে তাই বলা হয় শক্তি চঞ্চল হওয়ার আগের মুহূর্ত, অর্থাৎ potential energy থেকে kinetic energy হয়ে যাচ্ছে। নির্গুণ নিরাকার মানে তখন potential energyতে আছে, কালকে তখন মাপা যাবে না। যেমনি ওটা kinetic energyতে চলে গিয়ে movement শুরু হয়ে গেল, এবার আমরা টাইমকে মেপে নিতে পারব। কালের জন্ম হয়ে গেল। কালের জন্ম হয়ে যাওয়া মানে এবার কাল সবাইকে গ্রাস করবে। একটা ঢেউয়ের যখন জন্ম হল তখন সেটা কিছু সময় থাকবে তারপর একটা সময় আবার মিলিয়ে যাবে। তখন বলবে কালেই তার জন্ম, কালেই তার অবস্থিতি আর কালেই তার বিনাশ। যদি বলে ভগাবনেই তার জন্ম, ভগবানেই তার স্থিতি আর ভগবানেই তার বিনাশ, সেটাও ঠিক। আবার যদি বলে শক্তিতে জন্ম, শক্তিতেই স্থিতি আবার শক্তিতেই বিনাশ, তাও ঠিক। যে ভাবেই বলা হোক না কেন তিনটেই ঠিক।

এখানে তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়েছে। সৃষ্টি মানে কি? ভগবানের বাইরে তো কিছু নেই। তাহলে সৃষ্টিটা কোথা থেকে হবে? সেইজন্য বলছেন রূপান্তর, নাম আর রূপের রূপান্তর। চাঞ্চল্য হতেই স্থির সমুদ্রে যে শান্ত জল ছিল সেখানে একটা তরঙ্গ উৎপন্ন হল, তাকে আমরা বলছি ঢেউ। তাহলে ঢেউ কি সৃষ্টি হল? আমাদের দৃষ্টিতে সৃষ্টি হল। কিন্তু আসলে জলের একটা রূপান্তর হয়ে জলের রূপটা পাল্টে গেছে। চাল ছিল, জল ছিল, সেগুলোকে আগুনে দিয়ে ফোটান হয়েছে। কি দারুণ ভাতের সৃষ্টি হল! নতুন কিছু কি সৃষ্টি হয়েছে? কিছুই হয়নি। চালের রূপটা পাল্টেছে, আর সেটার একটা নাম দেওয়া হল ভাত। এই নাম আর রূপের রূপান্তর ছাড়া তো আর কিছুই হয়নি। সেইজন্য বেদান্তে সৃষ্টি বলে কিছু হয় না। আসল সৃষ্টিটা ভগবানও করতে পারেন না, সৃষ্টি করতে হলে ভগবানকে তাঁর বাইরে যেতে হবে। এর আগে চতুঃশ্লোকী ভাগবতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে, ভগবানের বাইরে যেটা আছে সেটা অলীক, মানে মিথ্যা। ভগবানের বাইরে তাহলে কিছু নেই, সব কিছু তাঁর মধ্যেই আছে। তাহলে আমরা যে জগতে এত কিছু দেখছি, পরস্পর সবাইকে দেখছি এগুলো কি? কিছুই না, নাম আর রূপের রূপান্তরের খেলা। এই রূপান্তরণটা আবার সব জায়গাতে হয় না, অনন্তের খুব সামান্য একটু অংশে এই রূপান্তরণ হচ্ছে।

কথামৃতে এই জিনিষটাকেই খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টিটা কি রকম? যেন অনন্ত সমুদ্র, সেখানে কোথাও কোথাও বরফ জমে বিভিন্ন আকার নিয়েছে। ভগবানও যেন অনন্ত সমুদ্র, সেখানে কোথাও কোথাও বরফ জমে গেছে, এটাই সৃষ্টি, এটাই আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ। এই বরফের সব আকৃতি যখন গলে জল হয়ে যাবে তখন আবার সেই নির্গুণ নিরাকারে চলে যাবে। তাহলে সৃষ্টিটা কি? বলছেন সৃষ্টি বলে কিছু হয় না। এখানে ভাগবতেই বলছে *গুণব্যতিকরাকারো*, এই যে সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণের পরিবর্তন হচ্ছে এটাই সৃষ্টি, এর বাইরে সৃষ্টি বলে কিছু হয় না।

মাঝে মাঝে ভাগবত আবার কিছু অদ্ভুত ধরণের মত নিয়ে আসে, ভাগবতের এই সব মতের জন্যই ভাগবত পণ্ডিত আর উপনিষদের পণ্ডিদের মধ্যে বাদবিতণ্ডা লেগে যায়। যেমন পরের শ্লোকে বলছেন *বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া। ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্তিনা।।৩/১০/১২।* বলছেন ভগবান যিনি তাঁরই মায়ার শক্তিতে তাঁকে ব্রহ্ম রূপে দেখান। আমরা এত দিন জানতাম যিনি ব্রহ্ম তিনিই নিজের মায়ার দরুণ ভগবান রূপে দেখান। ভাগবত তত্ত্বটা একেবারে উল্টে দিচ্ছে। যিনি ভগবান তিনি নিজের মায়া শক্তিতে ব্রহ্ম রূপে দেখান। আমাদের কূট তর্কে নেমে কাজ নেই, গীতায় আচার্য শঙ্কর যেভাবে ব্রহ্ম, মায়া, ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করেছেন সেই মতকেই আমরা অনুসরণ করে চলব। এই যে বলা হয় ব্রহ্মই সত্য আর সগুণ সাকার ভগবানের রূপ যেটা তাঁরা মায়ার দরুণ দেখাচ্ছে, এই তত্ত্বকেই মোটামুটি হিন্দু ধর্মে সবাই মেনে চলেন। কিন্তু দ্বৈতবাদীদের সাথে অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে যে লড়াই বাঁধে, সেটা এখানে এই শ্লোকে এসেই লাগে। ভাগবত এখানে একটা নতুন কথা বলছে ভগবানই সত্য আর মায়ার দরুণ ভগবানকে ব্রহ্ম রূপে দেখাচ্ছে, এটাই দ্বৈতবাদীদের মত। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা বলবে ব্রহ্মই সত্য, আর ভগবান বা ঈশ্বর যাঁকে বলা হচ্ছে সেটা সেই ব্রহ্মেরই সাকার রূপ।

যথেদানীং তথাগ্রে চ পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্। সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ।।৩/১০/১৩।
এই জগৎ এখন যে রকম দেখছ, আগেও সেই রকমই ছিল এবং ভবিষ্যতেও এই রকমই থাকবে। তাহলে তো জগতের কি কোন পরিবর্তন নেই? না, কোন পরিবর্তন নেই। কোন্ অর্থে পরিবর্তন নেই বলা হচ্ছে? ভগবান ছাড়া কিছু নেই কিনা। তবে আমরা যে সৃষ্টিটা দেখছি, এই সৃষ্টিটা নয় প্রকার। এই নয় প্রকার সৃষ্টির বাইরে প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয়াত্মক যে সৃষ্টি আছে তা হল দশম। মহতাদি সব কিছুকে বলা হচ্ছে সৃষ্টি। যখনই আলোড়ন হল তখন প্রথম সৃষ্টি হয় মহতের (Cosmic mind)। মহাভারতে এর উপর খুব সুন্দর একটা আলোচনা আছে, যেখানে বলছেন যোগীরা যখন ধ্যান করেন তখন যত ধ্যানের গভীরে যেতে শুরু করেন সেই সময় একটার পর একটা তত্ত্বগুলো বিলীন হতে থাকে, বিলীন হতে হতে যোগী যখন মহৎ তত্ত্বে আসেন তখন দেখেন সব কিছু মহৎ তত্ত্বেরই অঙ্গ।

সত্ত্ব, রজ ও তমো এই তিনটে গুণের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এরা তিনজন এক সঙ্গে থাকবে, আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলে এরা তিনজনেই সমান অনুপাতে থাকে। কিন্তু ভগবানের এমনই শক্তি যে এরা তিনজনের কেউই আর সমানুপাত পরিমাণে থাকতে পারে না। প্রথম যখন এই তিনটে গুণের মধ্যে ভারসম্য নষ্ট হয়ে যায় তখন সত্ত্বগুণের কিছু অংশ সত্ত্বকে ছেড়ে রজোগুণের দিকে চলে আসে। একদিকে সত্ত্বগুণ কমে রজোগুণের একটু আধিক্য বৃদ্ধি পেয়ে গেল। রজোগুণ মানে ক্রিয়া। রজোগুণ একটু বেড়ে যেতেই সৃষ্টি এবার ছুটতে শুরু করল। এবার তমোগুণ পাল্টে আরেকটু সত্ত্বগুণে চলে যাবে, এইভাবে এর কিছু অংশ এতে, ওর কিছু ওতে মিশ্রণ হতেই এর মধ্যের পার্টিকেল গুলোর মধ্যে পরিবর্তন হতে শুরু করে দিল। রজোগুণ কখন সত্ত্বগুণে পাল্টে যাচ্ছে, সত্ত্বগুণ কখন তমোগুণে পাল্টে যাচ্ছে, তমোগুণ কখন রজোগুণে পাল্টে যাচ্ছে, পাল্টে যাওয়াটা ক্রমাগত চলতেই থাকে, এটাকেই বলছেন সৃষ্টি। এইভাবে প্রথম সৃষ্টি হয় মহৎ তত্ত্বের। দ্বিতীয় সৃষ্টি হয় অহঙ্কারের। এগুলোকে আমরা ভাগবতে পরে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করব।

অহঙ্কার থেকে আবার অনেক কিছুর জন্ম হচ্ছে। অহঙ্কার থেকে তৃতীয় সৃষ্টি হয় তন্মাত্রার। সেখান থেকে চতুর্থ সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয়ের। পঞ্চম সৃষ্টি হল ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের। ষষ্ঠ হল পঞ্চবৃত্তিস্বরূপ অবিদ্যার। এই ছয় প্রকার সৃষ্টিকে বলা হয় প্রাকৃত সৃষ্টি। এই ভাবে এক এক করে বলে যাচ্ছেন কোথা থেকে কি কি জিনিষের সৃষ্টি। এইভাবে সৃষ্টি হতে হতে সপ্তম প্রধান বৈকৃতি সৃষ্টি হল ছয় রকমের স্থাবর বৃক্ষের, যাকে বলা হচ্ছে বনস্পতি জগৎ। বনস্পতি জগৎ অর্থাৎ গাছপালারা শুধু স্পর্শ অনুভব করে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস যখন গাছপালা নিয়ে গবেষণা করছিলেন তখন তিনিও দেখেছিলেন যে গাছেদের স্পর্শ অনুভব ছাড়া আর কিছু নেই। মজার ব্যাপার হল খ্রীশ্চান পরম্পরাতে বিশ্বাস গাছপালাদের কোন অনুভব ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমাদের ঋষিরা জানতেন গাছেদের অনুভব ক্ষমতা আছে। এরপর আসছে অষ্টম সৃষ্টি তির্যগযোনি(পশু-পাখি)। পশু-পাখিদের মধ্যে কালের জ্ঞান থাকে না। আহার, নিদ্রা আর মৈথুন এর বাইরে এরা অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না, ঘ্রাণশক্তি দ্বারা সব কিছু অনুধাবন করে। বিচার শক্তি দিয়ে এরা কখন খাওয়া-দাওয়া করবে না। মানুষ হল নবম সৃষ্টি। বলছেন এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এদের খাবার দাবার উপর থেকে নীচের দিকে যায়, গাছপালার খাবার নীচ থেকে উপরের দিকে যায়। এই নয় ধরণের সৃষ্টির সাথে আরেক ধরণের সৃষ্টি হয় যারা হলেন দেবতা, পিতৃগণ, অসুর, গন্ধর্ব-অপ্সরা, যক্ষ-রাক্ষস, সিদ্ধ-চারণ-বিদ্যাধর ইত্যাদি। এদের আমরা চোখে দেখতে পাইনা, কিন্তু এনারাও ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আছেন। এখানে এনাদের কি বিশেষত্ব সেটা অবশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে না, কিন্তু অন্য জায়গায় বলা হয় যে এনারা সূর্য কিরণ, বাতাস ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করেন। আমাদের ঋষিরা স্থাবর যত কিছু আছে, পশুপাখী, মানুষ যত জঙ্গম আছে আর দেবযোনি পিতৃযোনি এদেরকে আলাদা আলাদা তিনটে গোষ্ঠির মধ্যে রেখেছেন।

ব্রহ্মাতো আর ভগবানের মত বিশুদ্ধ নন, তাই সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি অনেক গোলমাল করে বসলেন। এমনকি তিনি একটি নারীকে সৃষ্টি করে তাকেই ভালোবেসে ফেললেন। তখন তাঁর সন্তানরা বলল 'বাবা, এটা আপনি কি করছেন'? তখন তিনি ঐ শরীরটা ছেড়ে আরেকটা শরীর ধারণ করে নিলেন। এই সব কারণেই

হয়তো ভারতবর্ষের কোথাও ব্রহ্মার পূজো হয় না। ব্রহ্মার পূজো ভারতবর্ষ থেকে উঠে গেল, কারণ তিনি নিজের মেয়ের প্রতি কামদৃষ্টি দিয়েছিলেন। সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি এই ধরণের অনেক কিছু গোলমাল করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সৃষ্টির রচনা করে চলেছেন। বিভিন্ন রকমের রচনা। প্রথমে তিনি সৃষ্টি করলেন সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ নামে চার কুমারদের। এই চার কুমারকে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা দেখলেন এঁদের সৃষ্টির ব্যাপারে কোন কাজেই আসবে না। কেননা ঐ চার কুমার ভগবানের একেবার সত্ত্বগুণ থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন বলে তাঁদের শরীর, মন, বুদ্ধি সব সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ। সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ থাকার জন্য এনারা সৃষ্টির কার্যে নিজেদের জড়ালেন না। জন্ম নিয়েই জ্ঞান, বৈরাগ্যের ঐশ্বর্যকে আশ্রয় করে তপস্যায় চলে গেলেন।

সৃষ্টি করার জন্য অনেক কিছুর দরকার হয়। মেয়েকে যখন বিয়ে দেওয়া হয়, তখন নতুন সংসার করার জন্য প্রথমে একটা ছেলে দেওয়া হল, শুধু ছেলে দিলে হবে না, তার জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়, খাটের ব্যবস্থা করা হয়, রান্না করার বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়। ব্রহ্মারও ঠিক তাই অবস্থা, ব্রহ্মা এখন সৃষ্টি রচনা করবেন, সেই সৃষ্টিকে চালাতে হবে, তিনিও তাই অনেক কিছু জোগাড় করতে শুরু করলেন।

তাঁর চারটি মুখ থেকে চারটি বেদ, ঋকবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ আর অথর্ববেদ বেরিয়ে এলো। পুরাণে এখানে বলছে ব্রহ্মার মুখ থেকে চারটে বেদ বেরিয়েছে। অথচ আমাদের পরম্পরাতে বলা হয়ে আসছে ব্যাসদেব এই চারটে বেদকে বিভাজন করেছেন। এখানেই পরম্পরারের সাথে বিরোধ এসে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হল যতক্ষণ না বলা হবে যে বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে ততক্ষণ মানুষ বেদের কথাকে দাম দেবে না। এনারা আবার ব্যাখ্যা দেবেন, সমগ্র বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকেই বেরিয়েছিল, তারপর সেগুলো মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাসদেব এসে এগুলোকে সাজিয়ে আলাদা করে দিয়েছেন। যাই হোক, ঠিক একই ভাবে বেদের যাঁরা যজ্ঞাদি করবেন, হোতা, অদ্বর্জু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা এই চারজন ব্রহ্মার চারটে মুখ থেকে বেরোলেন। যজ্ঞের সময় এই চারজনকে চার ধরণের দায়ীত্ব পালন করতে হয়। যজ্ঞের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে চারজনকে বসতে হয়। হোতার কাজ শুধু যজ্ঞে আহুতি দেওয়া, অদ্বর্জুর কাজ স্তোত্র পাঠ করা, যজ্ঞের যিনি ব্রহ্মা তিনি যজ্ঞের সব কিছু যেন ঠিক ঠিক ভাবে যাতে চলতে থাকে সেইদিকে নজর রাখা, আর উদ্‌গাতার কাজ সামগান করা। ঠিক একই ভাবে ব্রহ্মার চার মুখ থেকে চারটি উপবেদ – আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ এবং স্থাপত্যবেদ বেরিয়েছে। শেষে চারটে মুখ দিয়ে এক সাথে ইতিহাস আর পুরাণের সৃষ্টি করলেন। এর আগে চারটে বেদ তাঁর এক একটা মুখ থেকে বেরিয়েছে কিন্তু ইতিহাস পুরাণ চারটে মুখ থেকে এক সঙ্গে বেরোল, মানে ইতিহাস পুরাণের মাহাত্ম্যকে বাড়িয়ে দেওয়া হল। সেইজন্য পুরাণকে বলা হয় পঞ্চম বেদ। তারপর বিরাট লম্বা তালিকা দিয়ে বলছেন, ব্রহ্মার মুখ থেকে আরও কি কি বেরিয়েছে।

এর মধ্যে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হল *বিদ্যা দানং তপঃ সত্যং ধর্মস্যেতি পদানি চ। আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যমসৃজৎ সহ বৃত্তিভিঃ।।৩/১২/৪১।* ধর্মের চারটে পাদ – বিদ্যা, দান, তপস্যা ও সত্য ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরোল। একই ভাবে চারটে বর্ণ আর চারটে আশ্রম ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে। আর ব্রহ্মচারীদের যে নানান ধরণের বৃত্তি আছে, যা কিনা পরে মনু-স্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে – সাবিত্র্য, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম ও বৃহৎ। তারপরে গৃহস্থদের কি কি কর্ম করতে হবে তাও ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে। গৃহস্থদের চার ধরণের বৃত্তির কথা এখানে বলা হয়েছে, অর্থাৎ গৃহস্থরা চার ভাবে জীবন নির্বাহ করবে। গৃহস্থদের প্রথম বৃত্তি হল বার্তা, বার্তা মানে কৃষি আদি কাজ। দ্বিতীয় যজ্ঞাদি করান। তৃতীয় অযাচিত বৃত্তি, আমি কিছু চাইলাম না, কিন্তু আমাকে কেউ কিছু দিয়ে দিল। চতুর্থ হল শিলোঞ্ছ, শস্য কাটা হয়ে গেলে ক্ষেতে যে শস্য দানা পড়ে থাকে বা বাজারে কেনাবেচার পর যেগুলো পড়ে থাকে সেগুলোকে তুলে নিয়ে কেউ যদি জীবন নির্বাহ করে, এই বৃত্তিকে বলে শিলোঞ্ছ। আগেকার দিনে কিছু কিছু গৃহস্থ ঋষি ছিলেন তাঁরা এইভাবে জীবন নির্বাহ করতেন। এখানে পর পর চারটে চারটে করে জিনিষের কথা বলা হচ্ছে। ব্রহ্মার চারটে মুখ দিয়ে চারটে করে জিনিষ বেরোচ্ছে। সেই রকম বাণপ্রস্থী, কূটীচক, হংস ও পরমহংস এই চার ধরণের সন্ন্যাসীরাও ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে। ঠিক তেমনি দণ্ডনীতি এবং আরও যা কিছু বেরোচ্ছে সব চারটে চারটে করে।

এতক্ষণ ব্রহ্মার মুখ থেকে কি কি জিনিষ বেরিয়েছে বলা হল। এবারে বলছেন ব্রহ্মার শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ থেকে কি কি ছন্দ বেরিয়েছে। তাঁর স্নায়ু থেকে অনুষ্টুপ ছন্দ, ত্বক থেকে গায়ত্রী ছন্দ, হাড় থেকে জগতী ছন্দ, মজ্জা থেকে পংক্তি, প্রাণ থেকে বৃহতি – এগুলো হল আগেকার দিনের প্রধান ছন্দ, পরে পরে আরো অনেক ছন্দ বেরিয়েছে। তারপর স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সব ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে। ব্রহ্মা তারপরে একটু খেলা করতে শুরু করলেন, সেই খেলা থেকে ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, দৈবৎ ও পঞ্চম – সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটি স্বর বেরোল। গানও তাঁর মুখ থেকে প্রথম বেরোল। ব্রহ্মা হচ্ছেন শব্দব্রহ্ম স্বরূপ, প্রথম যেটা বেরিয়েছে সেটা হল শব্দ। সৃষ্টি সব সময় শব্দ থেকে হয়। বাইবেলেও একই কথা বলা হয়েছে – In the beginning was word and word was with God and word was God। বেদও বলছে শব্দই ব্রহ্ম। বৈখরী রূপে তিনি ব্যক্ত – এই যে আমরা কথা বলছি এটাকেই বলে বৈখরী – ব্রহ্মা ব্যক্ত হন বৈখরী রূপে, আর ওঁকার রূপে তিনি অব্যক্ত। তিনি সন্ধ্যা সাবিত্রী সৃষ্টি করেছেন।

এইসব সৃষ্টি করে করে অনেকক্ষণ পরে তিনি চিন্তা করে দেখলেন – আরে, আমি সপ্ত ঋষি মরীচি আদির জন্ম দিলাম কিন্তু সৃষ্টিতো বাড়ছেই না। তাঁর চিন্তার কারণও আছে, কেননা প্রথমে সনকাদি ঋষিদের সৃষ্টি করতেই তাঁরা সৃষ্টির দিকে মনই দিলেন না, পুরো সত্ত্বগুণে সম্পন্ন বলে তপস্যাতে চলে গেলেন। চার ঋষিরা সৃষ্টির কোন কাজে লাগলো না বলে তিনি সপ্ত ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। তাঁদের থেকে কিছু কিছু সন্তানাদির জন্ম হলেও ব্রহ্মা দেখলেন সৃষ্টি যেভাবে বাড়ার কথা সেই ভাবে তো বাড়ছেই না। তিনি খুব হতাশ হয়ে গেলেন। ভগবান আমাকে সৃষ্টির কাজে লাগালেন, আমি একটার পর একটা সৃষ্টি করছি কিন্তু সৃষ্টিতো এগোচ্ছে না, একটা একটা করে সৃষ্টি করলে সৃষ্টি কত আর এগোবে! ব্রহ্মা খুব গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। আমরা যখন কোন কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করি তখন আমাদের শরীর মন অন্য রকম হয়ে যায়। ঠিক সেই রকম ব্রহ্মা যখন গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন তখন দেখা গেল তাঁর শরীর দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ব্রহ্মার শরীরকে বলা হয় 'ক', প্রথম সৃষ্ট হয়েছিলেন বলে তাঁর শরীরকে বলা হয় ব্যঞ্জন বর্ণের প্রথম অক্ষর 'ক'। তিনি বিভক্ত হয়ে গেলেন সেইজন্য হয়ে গেলেন 'য', ব্যঞ্জন বর্ণের শেষ অক্ষর – সেখান থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল 'কায়', কায় মানে শরীর। ব্রহ্মার শরীর দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটা শরীর হয়ে গেল পুরুষ আরেকটা শরীর হয়ে গেল নারী। ব্রহ্মার শরীর যখন পুরুষ আর নারীতে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে তখন সৃষ্টির কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলতে শুরু হয়ে গেল।

ব্রহ্মার শরীরের যে অংশ পুরুষ হয়ে গেল, সেই অংশে তিনি হয়ে গেলেন মনু, আর নারী শরীরে হয়ে গেলেন শতরূপা। এনারাই হলেন প্রথম মানব দেহধারী পুরুষ ও নারী। এর আগে প্রথম যারা হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন চারজন কুমার। তারপর হয়েছেন সপ্ত ঋষি। অবশ্য বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম সৃষ্টির বর্ণনা আছে। কিন্তু আসল যে সৃষ্টিটা শুরু হলো সেটা মনু আর শতরূপা থেকে। এদের থেকে যখন ছেলে মেয়েরা জন্ম নিতে লাগল, এই ছেলে মেয়েরা আবার সেই আগের ঋষি কন্যা আর ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করল। আর সেইখান থেকে নানান রকমের permutation combination শুরু হয়ে গেল। এই জায়গাতে হিন্দু ধর্মের আর অন্যান্য ধর্মের সৃষ্টির ধারণার মধ্যে একটা পার্থক্য ধরা পড়ে। ওল্ড টেস্টামেন্ট বলছে সৃষ্টিতে প্রথম ছিল আদম আর ঈভ, আর কেউ ছিল না। তাদের থেকে যত সন্তানাদি হয়েছে তারা সবাই ভাই-বোন। এখন যদি সৃষ্টিটা এগোতে হয় তাহলে ভাই বোনের বিয়ে হতে হবে, তা না হলে সৃষ্টি এগোবে না। হয় ভাই-বোন তা নাহলে ছেলে আর মা থেকেই সৃষ্টিটা এগিয়েছে। হিন্দুদের যে ধারণা তার মধ্যে এই ধরণের সমস্যা আসবে না। যখনই আদম আর ঈভের থেকে সৃষ্টি এগিয়েছে বলবে তখনই কিন্তু এই গোলমালটা এসে যাবে। হিন্দু ধর্মে এই গোলমাল আসবে না কেন? কেননা ব্রহ্মার সৃষ্টি হচ্ছে মন থেকে। তিনি শুধু চিন্তা করলেন এই রকমের হোক সাথে সাথে সৃষ্টি হয়ে গেল। হ্যারি পটারের কাহিনীতেও ম্যাজেসিয়ান যেটা চিন্তা করছে সঙ্গে সঙ্গে সেটা বেরিয়ে আসছে। শুধুমাত্র তাই নয়, ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি হল মন থেকে, তাঁর পরের সৃষ্টিতে তাঁর শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। শরীর ভেঙ্গে সেখান থেকে যে সন্তানদের জন্ম হল, তাদের আবার inter

marriage হল। এই ধরণের বিয়ে যখন শুরু হয়ে গেল তখন সৃষ্টিতে পুরো একটা পরিবর্তন এসে গেল। Incest এর সমস্যা তাই হিন্দু ধর্মে কখনই আসে না। এটাই হিন্দু ধর্মের একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য।

যাই হোক, এবার মনু আর শতরূপা থেকে পাঁচটি সন্তান হল, তার মধ্যে দুটি পুত্র – প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদ, তিনটি কন্যা – আহুতি, দেবহুতি আর প্রসুতি। ব্রহ্মা আগে প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর প্রচেতাদের করেছেন, সপ্ত ঋষিদের করেছেন, কিন্তু এনারা জাগতিক ধর্ম থেকে এত বেশি বিমুখ ছিলেন যে সৃষ্টির দিকে কোন নজরই দিলেন না। কিন্তু এই মানব দেহধারী যে কন্যা আহুতির জন্ম হল তার সঙ্গে রুচি বলে এক প্রজাপতিকে আগে সৃষ্টি করেছিলেন, তার সাথে বিয়ে দিলেন। দেবহুতিকে কর্দম ঋষির সঙ্গে বিয়ে দিলেন। আর দক্ষ প্রজাপতিকে প্রসুতির সঙ্গে বিয়ে দিলেন। এবারে এদের যে সব ছেলে মেয়ের জন্ম হল এদের আবার বিভিন্ন ঋষিদের সঙ্গে বিয়ে হতে লাগল। এর পর সৃষ্টি খুব দ্রুত গতিতে এগোতে লাগল।

সৃষ্টির অনেক কিছু যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না বলে এনারা নানা রকমের কাহিনী তৈরী করে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসু মনকে শান্ত করে দেন। এই রকম একটা কাহিনীতে বলছেন, প্রথমের দিকে ব্রহ্মা যখন একা ছিলেন তখন তিনি নিজের ছায়া দিয়ে পাঁচ রকমের অবিদ্যার জন্ম দিলেন। কিন্তু এই সৃষ্টিটা ব্রহ্মার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ওই শরীরটা ত্যাগ করে দিলেন। ত্যাগ করে দেওয়া ব্রহ্মার শরীরটাকে যক্ষ রাক্ষসরা গ্রহণ করে নিল। ঐ শরীরটা ছিল মায়ার দ্বারা সৃষ্ট, মায়া দিয়ে তৈরী মানে নোংরা দুষিত জিনিষ দিয়ে তৈরী। যারা প্রথমে ব্রহ্মার ফেলে দেওয়া শরীরটা গ্রহণ করল তারাই আবার ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করার জন্য ছুটে এসেছে। ব্রহ্মা ঘাবড়ে গিয়ে বলছে আমাকে তোমরা ভক্ষণ করো না। এরমধ্যে যারা আক্রমণ করেছে তাদের মধ্য থেকে অনেকে বলল একে খেয়ে নাও, তাদের নাম হয়ে গেল যক্ষ। আর যারা বলল রক্ষা করতে হবে না, একে মেরে ফেল তারা হয়ে গেল রাক্ষস।

ব্রহ্মা একবার এক সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করলেন। সুন্দরীর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার নিজেরই মন সেই রূপে প্রলুব্ধ হয়ে গেল। তখন ভগবান বললেন তোমার মন কলুষিত হয়ে গেছে, তুমি এই শরীর ছেড়ে দাও। যখন ব্রহ্মা সেই শরীর ত্যাগ করলেন তখন সেই শরীরকে আরেকজন এসে ধরে নিয়েছে। সেই রকম ব্রহ্মা একদিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে শয়ন করেছিলেন। ঘুম ভাঙতেই রেগে মেগে হাত পা ছড়িয়ে নিজের ক্রোধময় শরীরটাকে ছেড়ে দিলেন। শরীরটা ঝাড়া দেওয়ার সময় তাঁর মাথা থেকে কিছু কেশ আর শরীরের কিছু লোম মাটিতে পড়ে গেল। সেই কেশ ও লোম থেকে ক্রুর স্বভাবের সর্প ও নাগেদের সৃষ্টি হল। একবার ব্রহ্মার মনে হল আমি খুব ভালো কাজ করেছি, আমি কৃতকৃত্য হয়ে গেছি। তখন ওনার মন থেকে মনুর সৃষ্টি হল। সৃষ্টি যখন ব্রহ্মা থেকে বলা হয়েছে তখন এই সৃষ্টির যাবতীয় জিনিষ ক্রুর স্বভাব, ভালো স্বভাব সব কিছুকে মেলাতে হবে বলে এই ধরনের কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। এরপরেই আসছে বরাহ অবতারের কাহিনী। বিভিন্ন পুরাণে আর ভাগবতেও অনেক অবতারের কথা আছে। প্রথম দিকে যে অবতাররা এসেছিলেন, ভগবান সেখানে সরাসরি অবতার হয়েছিলেন। আর পরের দিকের অবতাররা মানুষের দেহধারণ করে এসেছিলেন।

বরাহ অবতারের সংক্ষিপ্ত কাহিনী *(বৈকুণ্ঠ নামের অর্থ, চার কুমারের অভিশাপে জয় ও বিজয়ের অসুরযোনিতে জন্ম, ঋতম্ ও হিরণ্যাক্ষ বধ)*

প্রথম যে অবতারের কথা পাই তিনি হিরণ্যাক্ষ বধের জন্য এসেছিলেন। এর কাহিনী হল – ভগবান বিষ্ণু বৈকুন্ঠ ধামে অবস্থান করছেন। সনকাদি চারজন কুমার সব সময় এক সঙ্গেই চলাফেরা করেন। চারজনেরই চেহারা বাচ্চা ছেলের মত। সর্বদা জ্ঞান বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। পুরাণের যাঁরা লেখক ছিলেন তাঁরা যাকে ভালো মানুষ বানাবেন তাঁকে যত পারতেন ভালো জিনিষগুলো ঢেলে দিতেন, আর যাকে খারাপ বানাতে হবে তাকে যতটা পারতেন সবটাই বাজে জিনিষ ঢেলে দিয়ে গেছেন। পুরাণের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই কাহিনীগুলোও ঐভাবেই আমাদের কাছে এসেছে।

বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপাল ছিল জয় আর বিজয়। চার কুমার যখন বৈকুণ্ঠে গেছেন তখন জয় আর বিজয় বাচ্চা বাচ্চা ঐ চারজন কুমারদের দেখে একটা ডাণ্ডা দিয়ে তাঁদের পথ অবরোধ করেছে। ডাণ্ডা দিয়ে তাঁদের বাধা দেওয়াতে চার কুমার খুব রেগে গেছেন। রেগে গিয়ে বলছেন 'তোমরা দুজনে মিলে কেন আমাদের বাধা দিলে, ভগবান তো শান্ত স্বভাবের, তাঁর তো কারুর সাথে শত্রুতা নেই, আর আমরা কি তাঁর কোন ক্ষতি করতে এসেছি নাকি'? রাজার দ্বারবানদের স্বভাব কেমন হয় সেই কল্পনাটা এখন ভগবানের দ্বারবানদের উপর নিয়ে আসা হয়েছে, এসব বললে মানুষের বুঝতে সুবিধা হয়। চার কুমার আরো বলছেন 'তোমরা বৈকুণ্ঠনাথের পার্ষদ, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি খুব অল্প। বৈকুণ্ঠধামে থেকেও তোমাদের বুদ্ধি নির্মল হয়নি। তোমাদের ভালোর জন্য একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার'। অনেক সময় ডাক্তাররা রোগ সারছে না দেখে অপারেশন করে দেন। তা এখানে চার কুমার জয় আর বিজয়ের কি অপারেশন করবেন? বলছেন 'যে যোনিতে অনেক পাপ কার্য হয়' – পাপময় যোনি মানে যে যোনিতে শুধু কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটে বেশি বেশি হয় – বলছেন 'সেই রকম পাপময় যোনিতে তোমরা গিয়ে জন্ম গ্রহণ কর'। ঐ রকম পাপ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করলে কি হবে? ভেতরে যে পাপগুলো চাপা পড়ে আছে সেখানে ঐ পাপগুলো তেড়েফুড়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবে। ঐ পাপগুলো বেরিয়ে গেলে তারা আবার ভালো হয়ে যাবে, যেমন অপারেশনের পর রোগীরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

ভগবানের ঘরের বাইরে চেঁচামেচি, শোরগোল হওয়াতে ভগবান নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে চাইলেন কি হয়েছে। যখন দেখলেন এই হয়েছে তখন তিনি নিজেই মুনিদের কাছে ক্ষমা চাইতে শুরু করলেন 'সেবকরা অপরাধ করলে মালিকের দুর্নাম হয়, সেবকের অপরাধ মালিকেরই অপরাধ, সেইজন্য জয় আর বিজয় যে অপরাধ করেছে সেটা আমারই অপরাধ'। ভগবান বিষ্ণু বলছেন *যস্যামৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ সদ্যঃ পুনাতি জগদাশ্বপচাদ্ বিকুণ্ঠঃ। সোঽহং ভবদ্ভ্য উপলব্ধসুতীর্থকীর্তিশ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্।।৩/১৬/৬।* 'আমার নামের এত পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য যে চণ্ডাল পর্যন্ত যদি আমার নামে ডুব দেয় সেও সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র হয়ে যায়, সেইজন্য আমার একটা নাম হয়েছে বিকুণ্ঠ'। বিকুণ্ঠ থেকেই বৈকুণ্ঠ নাম হয়েছে। বিকুন্ঠ মানে – কুণ্ঠা অর্থাৎ মনের নীচতা, মনের ময়লাকে দূর করে মনকে পরিষ্কার, পবিত্র করে দেন তিনিই বিকুণ্ঠ। যিনি মনকে বিকুণ্ঠ করে দেন তিনি যেখানে বাস করেন সেই জায়গার নাম হল বৈকুণ্ঠ। ভগবান বলছেন 'আমার এই বৈকুণ্ঠের যে এত খ্যাতি, সুনাম এটা ব্রাহ্মণ কুমার আপনাদের জন্যই হয়েছে। সেইজন্য কেউ যদি আপনাদের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাতে যদি আমার হাতও থাকে তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই হাতকে কেটে ফেলতে আমি কুণ্ঠিত নই। সেবকের অপরাধে আমার দুর্নাম হয় আর আমার যত সুখ্যাতি হয় তা আপনাদের জন্যই হয়, সেই কারণে এদের দণ্ড দেওয়া উচিৎ। আপনাদের মাধ্যমে জয় ও বিজয়কে এই শাস্তি আমিই দিয়েছি'। এখানে এটাই বলতে চাইছেন, যা কিছু সব ভগবানই করেন, যদিও কুমাররা জয় ও বিজয়কে অভিশাপ দিয়েছেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়েছে, আর এদের মধ্যে যত গোলমাল ছিল সেটাকে ঠিক করার জন্য ভগবানই এইভাবে কুমারদের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। ভগবান বলছেন 'তবে, যদিও আমার ইচ্ছতেই হয়েছে, এরা দৈত্য যোনিতে গিয়ে জন্ম নেবে, দৈত্য যোনিতে কাম, ক্রোধ, লোভ খুব বেশি আছে বলে ক্রোধ আর রাগের তীব্রতায় এদের মনের একাগ্রতা অনেক বেড়ে যাবে'। মানুষ যখন কারুর প্রতি খুব রেগে যায় বা ক্রোধান্বিত হয়ে যায় তখন সেই ব্যক্তির প্রতি তার মনের একাগ্রতা অনেক বেড়ে যায়। অন্য অনেক দিকে ক্ষমতা যদিও কমে যায় কিন্তু যার প্রতি রেগে আছে মাথার মধ্যে শুধু তার কথাই ঘুরতে থাকবে। যে যাকে খুব গভীরভাবে ভালোবাসে আর সেই ভালোবাসার যদি পঞ্চাশ ভাগ কারুর উপর রাগ আসে তাহলে দেখা যাবে যার প্রতি গভীর ভালোবাসা আছে তার থেকে বেশি চিন্তা করবে যার প্রতি তার রাগ এসেছে। ভগবান তাই বলছেন 'ঐ যে তাদের একাগ্রতা বেড়ে যাবে ঐ একাগ্রতার জোরে তারা আমার কাছে আবার ফেরত চলে আসবে'।

ব্রহ্মশাপে জয় বিজয় তখনই শ্রী হীন হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণের অভিশাপ বলে কথা! বড়দের অপমান করলে তাঁরা যে অভিশাপ দেন তাতেও মুখের কান্তিটা নষ্ট হয়ে শ্রী হীন হয়ে পড়ে। জয় বিজয়ের উপর ব্রহ্মশাপ হওয়ার সাথে সাথে তারা বৈকুণ্ঠ ধাম থেকে খসে পড়ে গেল। কোন কোন জায়গায় আছে জয় বিজয় যখন বৈকুণ্ঠ থেকে পড়ে যাচ্ছিল তখন তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল 'হায় ভগবান, আমাদের কি হবে, আমরা কি আর কোন দিনই বৈকুণ্ঠধামে ফেরত আসতে পারব না, আমাদের আপনি কৃপা করুন'। তখন ভগবান বলছেন 'যদি বৈরীভাবে আমার সাধন কর তাহলে তিন জন্মেই ফেরত চলে আসতে পারবে'।

এখন ব্রাহ্মণের অভিশাপে অভিশপ্ত জয় বিজয় গিয়ে জন্ম নিল হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু রূপে দৈত্যকুলে। ভাগবতেই কিছু পরে আসবে ভগবানের নৃসিংহ অবতারের হাতে হিরণ্যকশিপুর বধ হবে। এখন এই হিরণ্যাক্ষ জন্ম নিয়ে হয়ে গেল পাতাল লোকের রাজা। আর পাতাল লোকের সব রাজারা পৃথিবীকে টেনে পাতাল লোকে নিয়ে চলে এল। পুরাণের বর্ণনায় বলা হয় পৃথিবী জলের উপরে অবস্থিত, আর এই জলের তলায় রয়েছে পাতাল লোক। সেইজন্য আমাদের যত কাহিনী আছে তার মধ্যে যখন কেউ যদি পাতাল লোকে যেতে চায় তখন তাদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দেখা যায়। হিরণ্যাক্ষের সময় পৃথিবীকে টেনে পাতাল লোকে অর্থাৎ সমুদ্রের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীকে যখন তার অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে দেওয়া হল, তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হল। এখন পৃথিবীকে পাতাল লোক থেকে টেনে কিভাবে উপরে তুলে আনবেন? তখন ভগবান পৃথিবীকে তুলে আনবার জন্য বরাহ রূপ ধারণ করে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ মারলেন। আমরা যে শূয়র দেখি সে রকমের নয়। এখানে বরাহের বিরাট বর্ণনা আছে কত লম্বা আর চওড়া হতে পারে, পৃথিবীকে তুলে আনতে হবে, বরাহের আকারও তো সেই রকম হতে হবে।

পৃথিবীকে পাতাল থেকে তুলে এনে জলের উপরে এই পৃথিবীকে পুনরায় সংস্থাপিত করে ব্যবহার যোগ্য করলেন আর পৃথিবীর মধ্যে ভগবানের শক্তির আধার সঞ্চার করে দিলেন। পৃথিবী যাতে সমস্ত কিছুকে ধারণ করে রাখতে পারে আর পৃথিবী যাতে নিজের জায়গায় দৃঢ় ভাবে অবস্থান করে থাকতে পারে, তার জন্য ভগবান পৃথিবীর মধ্যে নিজেই তাঁর শক্তি সঞ্চার করে দিলেন। এই জায়গাটা খুবই অনুধাবন যোগ্য। পৃথিবীকে জলের উপর রাখলেন, তার মানে এই নয় যে জলের উপর পৃথিবীকে ভাসিয়ে রাখলেন। ভগবান তাঁর নিজের শক্তির আধারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পৃথিবীকে যেমন উপযুক্ত করে দিলেন আর পৃথিবী অবিচল ও নিজের অবস্থাতে সুদৃঢ় থেকে সমস্ত কিছুকে ধারণ করে রাখতে পারার শক্তিটাও ভগবানই দিলেন।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য পৃথিবী তার কক্ষ পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা কি? এটাই ঋতম্। ঈশ্বরের শক্তির প্রভাবে এই জগতের সব কিছু যে ঠিক ঠিক ভাবে চলছে, তা এই ঋতমের জন্য। ঋতম্ আবার ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদ্য। এই যে ভগবান বলছেন আমিই আমার শক্তিতে পৃথিবীকে ধারণ করে আছি। কেন এইভাবে বলছেন তিনি? তিনি কি পৃথিবীকে হাত দিয়ে আটকে রেখেছেন? না তা নয়, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা তিনি ধারণ করে আছেন। মাধ্যাকর্ষণটা কি? Aspect of Universal Law। আর Universal Law কি? One with God। ভগবান যখন বলেন আমি পৃথিবীকে ধরে আছি, তখন তিনি এই ভাবে ধরে আছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষতো আর এই সব মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপার বুঝবে না। তাদের বোঝাবার জন্য বলবে ভগবান তখন দিগ্‌গজ মানে দশটি হাতিকে দাঁড় করালেন পৃথিবীকে ধারণ করবার জন্য। মানুষ যেমন পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবীটা দাঁড়িয়ে আছে ভগবানের শক্তিতে। এই ভগবানের শক্তিকে আজকে নিউটন বলছেন মাধ্যাকর্ষণ, আগামীকাল ফিজিক্স যদি বলে অন্য কোন কারণে পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে, তাতেও আমাদের কিছু আসবে যাবে না। মাধ্যাকর্ষণও ভগবানের শক্তি আর কাল যদি অন্য কোন শক্তির কথা বিজ্ঞান বলে, সেটাও ভগবানের শক্তি হবে অন্য নামে। পৃথিবী এত প্রাণী, এত স্থাবর জঙ্গমে পরিপূর্ণ, তাতে তো পৃথিবীর বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা, ছিটকে যাওয়ার কথা, কিন্তু বিদীর্ণও হচ্ছে না আর ছিটকে বেরিয়েও যাচ্ছে না, কারণ আমি একে ধারণ করে আছি। যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে তিনি পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন,

সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি one with God in a different form. শুধু এই একটা শক্তিই নয়, নিউক্লিয়ার শক্তি, বাতাসের শক্তি, জলের শক্তি, বিদ্যুতের শক্তি সব ভগবানেরই শক্তি।

পৃথিবীকে যখন তিনি পাতাল লোক থেকে নিয়ে এলেন তখন দেবতা ঋষিরা সব স্তুতি করতে লাগলেন। এদিকে হিরণ্যাক্ষ খবর পেয়ে গেছে, ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীকে পাতাল থেকে নিয়ে চলে এসেছেন। খবর পেয়ে হিরণ্যাক্ষ তাড়া করে এসেছে। এসে দেখছে এক বিশাল বরাহ। ও বুঝতে পেরেছে যে ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে এসেছেন। জেনে শুনেও সে বলছে 'এই বুনো শূয়োর কোথা থেকে এখানে এলো'? ভগবান তখন খুব সুন্দর এখানে উত্তর দিচ্ছেন *সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা যুষ্মদ্‌বিধান্মৃগয়ে গ্রামসিংহান্‌। ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তিস্য বীরা বিকত্থনং তব গৃহ্ণন্ত্যভদ্র।।৩/১৮/১০।* 'তুমি যে আমাকে বুনো শূয়োর বলছ, হ্যাঁ ঠিকই আমি বুনো শূয়োরই বটে আর তোমার মত গ্রামের কুকুরকে আমি খুঁজে বেড়াই। আর তুমি যে বলছ আমি পাতাল থেকে পৃথিবীকে এভাবে বার করে এনেছি আর তোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছি, তুমি ঠিক কথাই বলছ, তুমি যে বলছ তোমার সামনে আমি যুদ্ধে দাঁড়াতে পারবো না ঠিকই, তার কারণ তুমি হচ্ছ এত বড় সর্দার তোমাকে আমরাতো ভয় পাই। তবে একটা কথা, তুমি এত বড় ক্ষমতাবান লোক তোমার থেকে আমি পালিয়ে যাবো কোথায়'। মানুষ কাউকে ভয় পেয়ে পালিয়ে চলে যায় না, লুকিয়ে যায়। 'কিন্তু তুমি এত ক্ষমতাবান যে আমি তোমার থেকে লুকোবটা কোথায়। আমার তো লুকোবার জায়গাই নেই, তাই এসো এবার বরং যুদ্ধটাই হয়ে যাক'।

এবার ভগবান আর হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ শুরু হল। আমাদের শাস্ত্রে, সে রামায়ণ হোক আর চণ্ডীই হোক, যুদ্ধের বর্ণনা যখন আসবে তখন বিশদ আর বিশাল বর্ণনা চলতে থাকবে। হিন্দুরা এমনিতে শান্ত প্রকৃতির কিন্তু যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার সময় তাদের ধারে কাছে কেউ আসতে পারবে না, দুর্দান্ত সব বর্ণনা। এখানেও বিশাল যুদ্ধের বর্ণনা। হিরণ্যাক্ষ এক রকম চেঁচাচ্ছে, আর এদিকে ভগবানও তারও শতগুণ জোরে আরেক রকম হুঙ্কার দিচ্ছেন। এই রকম হতে হতে বরাহ রূপী ভগবান তাঁর সেই বিশাল দাঁত দিয়ে হিরণ্যাক্ষের বধ করে দিলেন। তখন বলছেন *যং যোগিনো যোগসমাধিনা রহো ধ্যায়ন্তি লিঙ্গাদসতো মুমুক্ষয়া। তস্যৈষ দৈত্যঋষভঃ পদাহতো মুখং প্রপশ্যংস্তনুমুৎসসর্জ হ।।৩/১৯/২৮।* সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্তি কামনায় যোগীরা যে চরণের ধ্যান করে সমাধি লাভের চেষ্টা করেন, সেই চরণের পদাঘাতে প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করতে করতে দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ দেহত্যাগ করলেন। সেইজন্য কি হয়, জয় আর বিজয় হল ভগবানের পার্ষদ, যদিও অভিশাপের ফলে এদের অধোগতি হয়েছিল কিন্তু মৃত্যুর সময় প্রভুর শ্রীচরণের দর্শনের ফলে তারা এই অসুর যোনিকে অতিক্রম করে চলে গেল। এরপরে সে রাবণ হয়ে জন্ম নিল, তারপরে সে কংস হয়ে জন্মাল। ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

ব্রহ্মা কর্তৃক বিভিন্ন যোনির সৃষ্টির বর্ণনা

এখানে ভাগবত আবার ফিরে গেছে নৈমিষারণ্যে, যেখানে শৌনক মুনি সূত লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবাকে প্রশ্ন করছিলেন। উগ্রশ্রবা থেকে আবার চলে এসেছে বিদুর ও মৈত্রেয় মুনির সংলাপে। এইভাবেই পুরো ভাগবত একবার শৌনক, একবার অমুক ঋষি হয়ে আবার শুকদেব ও পরীক্ষিতের মধ্যে ঘুরতে থাকবে। আর থেকে থেকেই সৃষ্টির বর্ণনা চলতে থাকবে। শৌনক মুনি প্রশ্ন করছেন পৃথিবীকে তো ভগবান উদ্ধার করে আনলেন, তারপর সেখানে প্রাণীদের সৃষ্টির জন্য সেই সময়কার মনু কি কি উপায় অবলম্বন করেছিলেন আমাকে বলুন। সূত তখন বলছেন বিদুর মৈত্রেয়কে ঠিক এই একই প্রশ্ন করেছিলেন। মৈত্রেয় মুনি তখন অন্য ধরণের সৃষ্টির বর্ণনা করছেন। ব্রহ্মার এই যে শরীর সেটা প্রথমে এক রকমের ছিল, তারপর তাঁর নিজের মেয়েকে ভালোবেসেছিলেন বলে সেই শরীর ত্যাগ করে পুড়িয়ে দিলেন, তারপর আবার একটা শরীর হল, আবার নিজের শরীরকে দুভাগে বিভক্ত করে দিলেন, তখন আবার অন্য রকম শরীর হল। কিন্তু ব্রহ্মা যিনি তিনি থেকেই গেলেন। এখন তিনি করছেন কি বিভিন্ন রকমের অন্য ধরণের সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। এই রকম বিভিন্ন সৃষ্টির একটা বিরাট লম্বা তালিকা আছে। তাতে বিভিন্ন যত যোনি আছে সেগুলো কিভাবে সৃষ্টি হল বলা

হয়েছে। যেমন আগে মানুষের জন্ম হল মনু ও শতরূপা রূপে, ঠিক তেমনি হিন্দু mythology তে যত রকমের সৃষ্ট পদার্থ আছে সব ব্রহ্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন বলছেন – ব্রহ্মা একবার মিষ্টি করে হাসলেন, সেই হাসি থেকে গন্ধর্ব আর অপ্সরাদের সৃষ্টি হল। ব্রহ্মার একটু তন্দ্রা, মানে ক্লান্তিতে ঘুম ঘুম পাচ্ছিল, সেই সময় সেই তন্দ্রা থেকে ভূত পিশাচদের সৃষ্টি হয়েছিল। একবার তিনি হাই তুলেছিলেন সেই হাই থেকে নিদ্রা জন্ম নিল। বলে মানুষের যে নিদ্রা আসে সেটাও ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। কোন মানুষ যদি এঁঠো মুখে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তাকে ভূত পিশাচেরা আক্রমণ করে। কেননা ব্রহ্মার তন্দ্রা থেকে ভূত-পিশাচ গুলির সৃষ্টি হয়েছিল বলে বলা হয় এঁঠো মুখে তন্দ্রা যেতে নেই। সাধারণ মানুষকে যে আচরণগুলো পালন করতে বলা হবে সেগুলো আমি আপনি বলে দিলে তারা পালন করবে না, কিন্তু এখানে যেই বলে দেওয়া হল, ব্রহ্মার যখন তন্দ্রা আসছিল সেই তন্দ্রা থেকে ভূত পিশাচের জন্ম হল, আর যখন তন্দ্রা আসছিল তখন তিনি হাই তুললেন সেই হাই থেকে নিদ্রার জন্ম হল, তুমি এখন যেই ঘুমোতে যাবে সেই নিদ্রা তোমাকে ধরবে, কেননা হাই থেকে নিদ্রা এসেছিল। আর ভূত পিশাচগুলির আগে জন্ম হয়েছে, এখন যেই তুমি এঁঠো মুখে ঘুমোতে যাবে ভূত পিশাচগুলো তোমাকে ধরবে। তাই তুমি এঁঠো মুখে ঘুমাবে না। আরেক জায়গায় আছে, যদি পা না ধুয়ে শুতে যাও তাহলে ইন্দ্র তোমাকে আক্রমণ করবে। এই রকম নানান রকমের কথা বলা হয়। এগুলো মূলতঃ personal hygienic habits, সেটাকে এনারা পৌরাণিক আখ্যায়িকার মাধ্যমে সাজিয়ে দিলেন যাতে মানুষ এগুলো পালন করে।

তারপর ব্রহ্মা যখন নিজেকে তেজোময় বলে মনে করলেন, তখন তাঁর ঐ তেজ থেকে সাধ্যগণ ও পিতৃগণের জন্ম হল – এনারা সবাই দেবতাদেরই এক একটি গোত্র। ব্রহ্মা প্রথম নিজে সৃষ্ট হয়েছিলেন, তিনি যখন ইচ্ছে করেন সামনে থাকেন আবার যখন ইচ্ছে হবে নিজেকে সেখান থেকে অন্তর্ধান করে নিতে পারেন। তাঁর এই তিরোধান শক্তি থেকে বিদ্যাধরদের সৃষ্টি হল। আমরা আগে যেটা বলেছিলাম, ব্রহ্মার যখন সৃষ্টি আশানুরূপ ভাবে বাড়ছিল না, তখন তিনি রেগে মেগে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই ভাবে যখন তিনি নিজের শরীরকে শুইয়ে দিলেন তখন তাঁর শরীর থেকে কিছু লোম খসে গেল। তিনি রেগে মেগে দুশ্চিন্তায় শুয়ে পড়া অবস্থায় লোম গুলো খসে গিয়েছিল বলে সেই লোম থেকে যত সর্প, নাগ ইত্যাদির সব সৃষ্টি হল। *তপসা বিদ্যয়া যুক্তো যোগেন সুসমাধিনা। ঋষীনৃষির্হৃষীকেশঃ সসর্জাভিমতাঃ প্রজাঃ।।৩/২০/৫২* ব্রহ্মা একবার যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পুরো সংযম করে তপস্যা, বিদ্যা, যোগ ও সমাধিতে অবস্থান করলেন তখন তিনি ঋষিদের রচনা করলেন। ব্রহ্মার মনের যখন যেরকম ভাব আসত, মনের সেই বিভিন্ন ভাব থেকে পৃথক পৃথক ধরণের জীব সৃষ্টি হতে থাকল। সেই কারণে ঋষিরাও ব্রহ্মার সমাধি, যোগ, ঐশ্বর্য, তপ, বিদ্যা ও বৈরাগ্য এই গুণগুলো পেয়ে গেলেন। এই গুণগুলো ঋষিদের মধ্যে সব সময় ছিল। এর ওপর আবার ব্রহ্মার শরীর ও মনের যে গুণগুলো ছিলো সেই গুণগুলি ঋষিদের দিলেন, এইজন্য ঋষিরা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। ব্রহ্মার যা কিছু ভালো সব ঋষিরা পেয়েছিলেন। এগুলো হচ্ছে সব secondary creation।

ভগবানের অবতার রূপে কপিল মুনির আবির্ভাব *(দেবহুতি ও কর্দম ঋষির কাহিনী, দেবহুতির গর্ভে কপিল মুনির আবির্ভাব)*

আমরা এর আগে মনু আর শতরূপার নামে উল্লেখ করেছিলাম। শতরূপা আর মনুর একটি মেয়ে ছিল যার নাম দেবহুতি। দেবহুতির বিয়ে হল কর্দম মুনির সাথে। দেবহুতি ছিলেন রূপ, লাবণ্যে অতুলনীয়া এবং সুশীলা ও সদ্‌গুণান্বিতা, ব্রহ্মার সন্তান কিনা। কেননা ব্রহ্মাই হয়েছেন মনু আর শতরূপা। দেবহুতির মনে খুব ভোগ বাসনা ছিল। দেবহুতি তার পতি কর্দম ঋষিকে খুব সেবা করেছিলেন। তাঁর অকপট সেবার জন্য কর্দম ঋষি দেবহুতির উপর খুবই প্রসন্ন হয়েছিলেন। কর্দম ঋষি দেবহুতিকে বলছেন 'তুমি কি বর চাও বল'। দেবহুতি বর চাইল 'আমি ভোগ করতে চাই। আর আমি এমন ভোগ করতে চাই, যে এই রকম ভোগ কেউ কোন দিন যেন না করতে পারে'। ঋষি বললেন 'ঠিক আছে তাই হবে'।

ঋষি তাঁর যোগ শক্তির বলে বিভিন্ন ঋতুর জন্য একটা আদর্শ রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দিলেন, যাকে বলে বিমান। সংস্কৃতে বিমান শব্দের প্রকৃত অর্থ উঁচু বাড়ি। আবার বিমান শব্দের আরেকটি অর্থ বাতাসে যা চলতে পারে, যাকে আমরা উড়োজাহাজ বলি। বিমান শব্দের অর্থ দু ভাবে করা হয় বলে আমাদের অনেকের সংশয় হতে পারে। বিমানকে তাঁরা উঁচু বাড়ির অর্থে লিখেছেন কিন্তু আবার কোথাও উড়োজাহাজ অর্থেও বলা হয়েছে। যেমন পুষ্পক রথের আসল কাহিনী হল, রাবণের একটা খুব সুন্দর উঁচু বাড়ি ছিল যার নাম ছিল পুষ্পক। সেখান থেকে হয়ে গেল উড়োজাহাজ। যদিও উড়োজাহাজ অর্থ করছে কিন্তু আসলে বিমান শব্দের সংস্কৃর অর্থ উঁচু অট্টালিকা।

এই রকম এক বিমান দেবহুতিকে বানিয়ে দেওয়ার পর সেইখানে দেবহুতি কর্দম মুনির সাথে মনের মত ভোগ করতে শুরু করলেন। তাঁরা আবার নানান ধরণের শরীর ধারণ করে ভোগ করতে থাকলেন। মানে এক শরীরে মজা হচ্ছে না তাই একাধিক শরীর ধারণ করে বিভিন্ন শরীরের মাধ্যমে আরো বেশি বেশি মজা উপভোগ করতে লাগলেন। কিন্তু কর্দম মুনি দেবহুতিকে বলেছিলেন 'দ্যাখো, তোমার যখন সন্তান হয়ে যাবে, তখন আমি কিন্তু আবার তপস্যায় চলে যাব'।

এরপর কর্দমের থেকে দেবহুতির তিনটে কন্যা সন্তানের জন্ম হল। সন্তানের জন্ম হয়ে যাওয়ার পর কর্দম মুনি বলছেন 'এবার আমাকে তপস্যায় চলে যেতে হবে, কেননা তোমার সাথে এই কথাই ছিল, যখনি তোমার সন্তান হয়ে যাবে আমি তপস্যায় চলে যাব'। কর্দম মুনির কথা শোনার পর দেবহুতি খুব ভেঙ্গে পড়লেন। ভগ্ন হৃদয়ে দেবহুতি কর্দম মুনিকে বলছেন 'আপনি যা যা বলেছিলেন সবই আমাকে দিয়েছেন, যত রকমের ভোগ থাকতে পারে তার সবই আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি, আর আমার সন্তানও হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েরা বড় হবে, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। বিয়ের পর ওরা চলে যাবে, তারপর আমাকে একা থাকতে হবে। তখন আমার যে শোক দুঃখ হবে সেটা কি করে দূর হবে! কেননা ভোগ বাসনা থেকে আমার এখন নিবৃত্তি আসেনি। তার জন্য আপনাকে আমি কোন দোষ দিচ্ছি না, কেননা আপনি যা যা কথা দিয়েছিলেন সব কথাই রেখেছেন। কিন্তু আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ওরা চলে যাবে, আমাকে একা থাকতে হবে, আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা আমার করে দিন'। দেবহুতি আরো বলছেন 'ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে আমি এতদিন আপনার সঙ্গে শুধু ভোগই করে গেলাম, কিন্তু সংসার থেকে যে সব থেকে বড় ভয়, সেই মৃত্যু ভয় আমার কি করে যাবে? মানুষ যখন অসৎ পুরুষের সঙ্গ করে, তা জেনে হোক আর অজান্তেই হোক, সে আরো সংসার বন্ধনে পড়ে যায়। আর সৎ পুরুষের যখন সঙ্গ করে, তা অজান্তেই হোক আর জেনেই হোক, তখন সৎসঙ্গের প্রভাবে তার মধ্যে অনাসক্তির ভাব উদয় হয়। কিন্তু আমারতো এখন সব গোলমাল হয়ে গেল, আপনি চলে যাবেন, আমার মেয়েরাও চলে যাবে, তারপরতো আমার কিছুই থাকল না, আর আমার মনতো এখনো ভোগেই পড়ে রয়েছে'।

এরপর দেবহুতি বলছে *নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।৩/২৩/৫৬।* 'যে মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু কাজ করে সেই কাজ দিয়ে ধর্ম সম্পাদন হয় না, বৈরাগ্য জন্ম নেয় না, ভগবানের সেবাও হয় না, এই রকম মানুষ তো বেঁচে থেকেও মৃতের সমান'। ধরুন একজন বৃদ্ধা সে কোন রকমে খাওয়া দাওয়া করে, নিজের জামা কাপড় কাচে, এই যে কাজগুলো ঐ বৃদ্ধা করছে তা দিয়ে তার কোন ধর্ম সম্পাদন হচ্ছে না, কারণ ধর্ম সম্পাদন করতে গেলে কিছু বিধি আছে, আর এই কাজ দিয়ে কোন বৈরাগ্যও উৎপন্ন হচ্ছে না, সাধনা করলে তবেই তো বৈরাগ্য আসবে। সব শেষে তৃতীয় এই কাজের দ্বারা ভগবানের কোন সেবাও হচ্ছে না। আমরা সাধারণত দৈনন্দিন যে সব কাজ করে চলেছি সেই কাজগুলো করার পর কি আমাদের মনে কোন ধরণের বৈরাগ্য আসছে? ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কোন বৈরাগ্যই আসেনি, আর ভগবানের প্রতি প্রীতিও জন্মাচ্ছে না। এই করে আমাদের জীবনে কি লাভ হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না। একটা মৃত দেহের সঙ্গে তো এর কোন পার্থক্যই নেই।

দেবহুতি নিজের স্বামীকে বলছে *সাহং ভগবতো নূনং বঞ্চিতা মায়য়া দৃঢ়ম্। যত্ত্বাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্ষেয় বন্ধনাৎ।।৩/২৩/৫৭।* 'হে স্বামী! ভগবানের মায়া আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আপনার মত একজন মুক্তিদাতা মহাত্মা, এত বড় ঋষির সঙ্গ করে এতদিন কি শিখলাম – শুধু সংসার বন্ধন শিখলাম। স্বয়ং ব্রহ্মা আপনাকে নিজে সৃষ্টি করেছেন, সেই আপনার সঙ্গ করে কোথায় আমি মুক্তি পেয়ে যেতাম, সেই দিকে না গিয়ে একমাত্র ভোগের মধ্যে ডুবে থেকে আমি সংসার বন্ধনে পড়ে গেলাম, এখন আমার তো সব শেষ হয়ে গেলে, আপনার সঙ্গ করে আমার তো কোন লাভই হল না। হে প্রভু, এখন আমার কি হবে'!

দেবহুতি যে সমস্যার কথা এখানে বললেন, ভক্তদের কাছে এটা সত্যিই খুবই কঠিণ সমস্যা। সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে এসে ভক্তরা ক্রিকেটের গল্প, লালু কি করছে, মমতা কি করছে, এইসব খোশ গপ্পোই করে। ঠাকুর বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। ভক্তরা সারাদিন তো মূলো খেয়েই চলেছে, তাই এখন আর কি করবে! মহারাজদের কাছে গেলে মূলোর ঢেকুরই উঠবে। ভক্তদের ঢেকুর খেয়ে খেয়ে সাধু বাবাজীরাও ঐরকম হয়ে যায়। সাধু মহাত্মাদের কাজ হল মানুষের কাছে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করা, তাঁদের কাজ হল মুক্তির দিকে ভক্তদের ঠেলে দেওয়া। ভক্তরা নিজেরাও বন্ধনে আর সন্ন্যাসীদেরও বন্ধনে ফেলে দেয়। স্বামীজী বলেছেন – আদর্শ শিক্ষকের কাজ হল ছাত্র যে স্তরে পড়ে আছে সেই স্তরে নেমে গিয়ে ছাত্রদের সেই অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে আসা। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষকরা ছাত্ররা যে স্তরে আছে, সেই স্তরে নেমে যান। কিন্তু সেখান থেকে তাদেরও তুলে আনতে পারেন না আর নিজেও আর ওখান থেকে উঠে আসতে পারেন না, ওখানেই থেকে যান। এই কথাই এখানে বলতে চাইছে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এগুলো খুবই বিপজ্জনক। কারণ সংসার বন্ধনের পঞ্চাশটা পথ বা উপায় আছে কিন্তু মুক্তির একটাই পথ – সেটা হচ্ছে সৎসঙ্গ। আর সাধুদের সঙ্গ করেও যদি সংসার বন্ধনকেই ডেকে নিয়ে আসা হয়, তাহলে আর কি হতে বাকি থাকবে! দেবহুতির মত হবে।

দেবহুতি কর্দমের কাছে শুধু বিলাপ করে যাচ্ছেন, বলছেন আপনার কাছে থেকে আমি মুক্তি পেতে পারতাম কিন্তু তার চেষ্টা না করে আমি শুধু ভোগের মধ্যেই পড়ে থাকলাম। তখন কর্দম ঋষি দেবহুতিকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন 'তুমি আর কান্নাকাটি করো না, আমিতো তোমাকে বিয়ে করেছিলাম আর তোমাকে ভালোও বেসেছিলাম, তুমিও আমার প্রীতি বর্ধনের জন্য নিষ্ঠা সহকারে অনেক কিছু করেছ। এখন তুমি ইন্দ্রিয়সংযম, স্বধর্মানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ধ্যান প্রভৃতি আচরণ করে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের ভজনা করে যাও। এইভাবে আরাধনা করলে শ্রীভগবান তোমার গর্ভে অবতীর্ণ হবেন এবং তিনিই তখন তোমার হৃদয়স্থিত এই অহংকার রূপ বন্ধন ছেদন করবেন'। এই হচ্ছে ভাগবতের অবতারের এক বিশেষ রূপের ধারণা।

কর্দম মুনি দেবহুতিকে উপদেশ ও আশীর্বাদ করে তপস্যায় চলে গেলেন। সেই আশীর্বাদের ফলস্বরূপ কিছু দিনের মধ্যে কপিল মুনি দেবহুতির গর্ভে আবির্ভূত হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন। আসলে কপিল একজন ঋষি কিন্তু ভাগবত তাঁকে অবতার রূপে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কপিল মুনির সব চেয়ে বড় কাজ – সাংখ্যদর্শন। তিনি ছিলেন ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ – গীতায় আছে "*সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ*" মানে সিদ্ধদের মধ্যে ভগবান কপিল মুনি। সাংখ্য মতে কপিল সিদ্ধ হয়ে ভগবান হয়ে গেলেন কিন্তু বেদান্ত মতে তা হবে না। তাহলে কি করে হবে? ভগবানকেই কপিল মুনি হয়ে আসতে হবে, ভাগবত এই মতটাকে এখানে ঢুকিয়ে দিল। কর্দম মুনি বললেন 'তোমার গর্ভে যে সন্তান আসবে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু'। আমরা এখন শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে দেখব? *বসুদেব সুতং*, তিনি বসুদেবের সন্তান, জ্ঞান লাভ করে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। আবার অন্য ভাবে বলা যায় – যিনি ঈশ্বর তিনিই দেবকীর গর্ভে এসেছেন। যদি প্রথম মতকে আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমরা হয়ে যাব সাংখ্যবাদী বা বৌদ্ধ মতালম্বী বা rationalist। দ্বিতীয় মতকে যখনি নিয়ে নেব – না, ভগবানই স্বয়ং জন্ম নিয়ে সাধনা করে ঐ জায়গায় গেছেন, তখন আপনি হয়ে গেলেন ভক্ত বা ভাগবত ধর্মী বা গীতা ধর্মী। আর তৃতীয় একটা মত আছে যারা বলে যা কিছু বিভূতি আছে সেটা তাঁর অংশ থেকেই হয়। এই যে কপিল সিদ্ধ পুরুষ হলেন, এই বিভূতি সেটা তাঁর কৃপাতেই হয়েছেন, এখানে ভবগবানই এক অংশে বা এক রূপে আছেন। কিন্তু ভাগবতের মতে কপিল মুনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু। এবারে কপিল মুনির জন্মের পরের কথা বলছেন।

কপিল মুনির জন্ম হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, কপিল মুনি ছোট থেকেই এমন তপস্যা করেছেন যে বাচ্চা বয়সেই তিনি সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেছেন। কপিল মুনি সিদ্ধ পুরুষ হয়ে যাওয়ার পর দেবহুতি, মানে তাঁর মা স্তুতি করছেন নিজের ছেলের। এটাই হচ্ছে এই অধ্যায়ের এক ব্যাতক্রমী বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ মা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক, কিন্তু কপিল মুনির ব্যাতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এটাই যে তিনিই হচ্ছেন তাঁর মায়ের শিক্ষক। তিনি নিজের মাকে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। এ ধরণের ঘটনা কোথাও পাওয়া যায় না যে সন্তান মাকে ধর্মোপদেশ দেবেন।

দেবহুতিকে কপিল মুনির জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের শিক্ষা

দেবহুতি বুঝে গেছেন যে তাঁর এই সন্তান স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। তাই তিনি সব সময় তাঁকে ভগবন্, ভগবন্ বলেই সম্বোধন করে গেছেন। দেবহুতি বলছেন 'হে ভগবন্! আমি এই অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে আছি, আর আপনি সেই আদি পুরুষ, আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনা, আপনি আমাকে এই অজ্ঞান অন্ধকার থেকে যে করেই হোক উদ্ধার করুন। আমার মধ্যে যে সংসার বৃক্ষের শেকড় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রয়েছে আপনি আপনার জ্ঞানরূপ ধারালো শস্ত্র দ্বারা এই সংসার বৃক্ষকে উচ্ছেদ করে দিন, এছাড়া এই সংসার বৃক্ষ থেকে আমি বেরোতে পারবো না।

মায়ের কাতর প্রার্থনা শুনে কপিল মুনি তখন তাঁর মাকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। কপিল মুনির এই উপদেশ আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে এক বিরাট তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। এই জায়গায় এসে ভাগবত তিনটি অধ্যায়ে তিনটি নতুন তত্ত্ব নিয়ে এসেছে। এর আগে সনতান হিন্দু ধর্মে এই তিনটি ধারণা ছিল না। ভাগবতের এই তিনটি অধ্যায়ের তিনটি তত্ত্বই হিন্দু ধর্মে নতুন করে সংযোজিত হল। আর তার থেকেও বড় কথা, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে আজও এই তিনটি ধারণা সাবলীল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম যেটাকে সামনে আনছেন কপিল মুনি তা হলো ভক্তি। ভক্তি তত্ত্বকে এই প্রথম খুব সুসম্বদ্ধ ভাবে একটা নতুন তত্ত্ব রূপে দেবহুতিকে উপদেশ দিচ্ছেন। হিন্দু দর্শনে ভক্তি তত্ত্বরূপে এর আগে ছিল না।

কিছুদিন আগে ঘাস কাটা আর শাস্ত্র পড়া এই নিয়ে দুজন সাধু নিজেদের মধ্যে মজার ছলে বাদানুবাদ করছিলেন। একজন সাধু বলছিলেন 'এই যে ঘাস কাটা এতে কি কখন মুক্তি হতে পারে'? অপর সাধু বলছেন 'এটা আপনি কি বলছেন, স্বামীজী কর্মযোগের শিক্ষা দিয়েছেন'। তার উত্তরে অন্য মহারাজ বলছেন 'সেবার কাজ তো শূদ্রদের। গীতাতে ভগবান বলছেন *পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রাস্যাপি স্বভাবজম্*। তাহলে ঘাস কাটা কার কাজ হবে? শূদ্রদের কাজই হবে। ঠাকুর কি কখন ঘাস কেটেছিলেন, না স্বামীজী ঘাস কেটেছিলেন? তাঁরা শুধু উপদেশ দিয়ে গেছেন, শাস্ত্রই বলে দিয়েছে শূদ্ররা শুধু সেবা করবে। স্বামীজী বলছেন শূদ্র জাগরণ, তাই এই সেবার আদর্শ। শূদ্রের কাজই হল সেবা করা *পরিচর্যাত্মকং*'। এখানে শূদ্র বলতে জাতপাতের কথা বলা হচ্ছে না, ব্যক্তির মানসিক প্রবণতার দ্বারা ঠিক হয় সে কোন জাতের। কোন মানুষের মধ্যে যদি বিদ্যার প্রতি আগ্রহ থাকে তখন বুঝতে হবে সে মানসিকতায় ব্রাহ্মণ, আবার যখন নিজের শৌর্য বীর্যকে দেখাতে চাইছে তখন তার মানসিকতায় ক্ষত্রিয়, যখন শুধু টাকা পয়সার হিসেব রাখতে চাইছে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে বৈশ্য মানসিকতা, আর যার কাজ কর্মে বেশি মন যাচ্ছে তার মানসিকতায় শূদ্রতার প্রভাব বেশী। বেশির ভাগ লোকই দিনের মধ্যে চার বার করে নিজের জাত পালটায়। সবার মধ্যে সবটাই আছে। তাবে এক এক জনের মধ্যে এই চারটের মধ্যে হয়তো একটার প্রভাব বেশি থাকে।

ভক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শূদ্রের যা কাজ সেই কাজ করে যাওয়া। সেই কাজটা কি? শূদ্রের কাজ সেবা করা। পুরো ভক্তি দাঁড়িয়ে আছে এই সেবার উপর। সেবাটা ঈশ্বরের প্রতি বা ঈশ্বরের ভক্তের প্রতি, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বামীজী সেবার উপর এতো জোর দিলেন কেন? কারণ এখন কলিযুগ – কলিযুগে শূদ্রত্বই পথ। শূদ্রের যে ধর্ম সেটাই এখন যুগধর্ম, এখানে ছোট বড় কিছু নেই। আর এটাই এখন সহজ পথ, যেমন সত্যযুগে ব্রাহ্মণত্ব ছিল সহজ পথ, কলিযুগে শূদ্রত্বই সহজ পথ। শূদ্রত্ব মানে সেবা, স্বামীজী

তাই সেবার উপরেই জোর দিলেন। যে যত সেবা করবে সে তত জীবনে এগোবে। আর যে যত নিষ্কাম ভাবে সেবা করবে সে তত আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে যাবে। কপিল মুনি তাঁর গর্ভধারিণীকে উপলক্ষ করে সমগ্র জগৎকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন। এটাই যুগোপযোগী ধর্ম। উপনিষদ সেবার কথা বলবে না, বেদেও বলা নেই, বাল্মীকি রামায়ণেও নেই আর মহাভারতেও নেই। সেবাও যে আধ্যাত্মিক সাধনার একটা পথ সেটা প্রথম ভাগবতই দেখিয়েছে, যেখানে কপিল মুনি এই সেবা ধর্মের কথা নিজের মাকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

নারদও এর আগে ভক্তির কথা বলেছেন। আমরা সব সময় ভক্তিকে নারদের সঙ্গেই মিশিয়ে দিই। কিন্তু এখানে কপিল মুনি যে ভক্তির শিক্ষা দিচ্ছেন তার সঙ্গে নারদের ভক্তির অনেক পার্থক্য আছে। সবচেয়ে বড় পার্থক্য যেটা সেটা হল নারদ যে ভক্তির কথা বলছেন তা হল ঈশ্বরের নাম-গুণগান করা। কিন্তু কপিলের ভক্তি সেবাধর্মে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তির পর দ্বিতীয় যে জিনিষ কপিল মুনি শেখালেন তাহলো জ্ঞানযোগ, তবে অন্য ভাবে এটাই সাংখ্য মত। সাংখ্য দর্শন পুরোপুরি মনস্তত্ত্বের ব্যাপার।

তৃতীয় তিনি যে শিক্ষা দিলেন সেটা হল যোগ। এই যোগ দর্শনের কথা কপিল মুনিই প্রথম বলেছেন। এক কথায় কপিল মুনি হলেন ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই ভক্তিকেও তিনি কর্মযোগের সাথে এক করে দিলেন। সেবা ভাবে যদি কর্ম না করা হয় তাহলে সেই কর্ম কখনই কর্মযোগ হবে না। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যখনই কর্ম করা হবে তখনই তা একই সাথে সেবা ও কর্মযোগ হয়ে যাবে। আর যখন অনাসক্ত ও নিষ্কাম ভাবে কর্ম করবে তখন সেটাই সাংখ্যে চলে আসবে। কপিল মুনি কত বড় একজন মুনি ছিলেন এখানেই তা বোঝা যায় – একই কর্মযোগকে তিনি দুভাবে দেখালেন এক যখন ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কাজ করছে তখন সেটা ভক্তিযোগ আর দুই যখন অনাসক্ত ভাবে কাজ করবে তখন তা সাংখ্যে চলে যাবে।

স্বামীজী যে চারটে যোগের কথা বলছেন – জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও রাজযোগ, এই চারটে যোগের প্রথম প্রবক্তা রূপে যদি কারোর নাম এক কথায় বলতে হয় তাহলে কপিল মুনির নামই বলতে হবে, তিনি এই চারটে যোগকে ব্যাখ্যা করে একেবারে বেঁধে দিলেন। সেইজন্য স্বামীজী কপিল মুনিকে আমাদের সমস্ত দর্শনের জনক বলছেন। এই চারটে দর্শন কপিল মুনিই দিয়ে গেছেন। উপনিষদ এত কিছু বলতে যাবে না, উপনিষদ একমাত্র সচ্চিদানন্দের কথাই বলবে, তিনিই একমাত্র আছেন, আর কিছু নেই। তুমি স্বাধ্যায়, ধ্যান ও নিদিধ্যাসন করে তোমার আত্মস্বরূপকে লাভ কর। উপনিষদের সাধনার পথ আর ভাগবত যে সাধন পথের কথা এখানে বলছে সেটা একেবারেই আলাদা। ভাগবত তিনটি পথ আনছে – ভক্তি, সাংখ্য ও যোগ। ভক্তি আর সাংখ্য দু ধরণের কর্মের কথা বলছে – একটি হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম আরেকটি হল ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম। মা দেবহুতিকে পুত্র কপিল যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার মধ্যে এই প্রথম চারটে যোগের কথা তিনি বলছেন। সেইজন্য ভাগবতের এই অংশটা প্রত্যেক হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কপিল মুনির সাংখ্য তত্ত্ব

কপিল মুনির সাংখ্য তত্ত্বের কয়েকটি মূল কথা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নিচ্ছি। এই যোগকে বলা হয় অষ্টাঙ্গ যোগ – যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। পরে পতঞ্জলী কপিলের এই অষ্টাঙ্গ যোগকে নিয়ে একটা পুরো আলাদা যোগদর্শন সৃষ্টি করলেন, আমরা যাকে এখন রাজযোগ বলে জানি। পতঞ্জলীর যে রাজযোগ তা পুরোটাই কপিল মুনির এই অষ্টাঙ্গ যোগ থেকেই নেওয়া, আর এতে কোন দোষেরও কিছু নেই। কেননা আগেকার দিনে এটাই হত। যে জিনিষগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, কোন এক ঋষি হয়তো সেগুলোকে সংগ্রহ করে একটার মধ্যে সঙ্কলন করে সহজলভ্য করে দিলেন। পতঞ্জলীও ঠিক তাই করেছেন। ভাগবতের সাংখ্যযোগের সাথে বর্তমান আমরা যে সাংখ্যযোগকে জানি, তার সাথে একটু সামান্য পার্থক্য আছে। এগুলো কিছুই নয়, কারণ যখন দর্শন আরো উন্নত হতে থাকে তখন আগের আগের মত ও ধারণারাও পাল্টাতে থাকে, তার সাথে আরও নতুন নতুন ধারণা এসে যোগ হয়।

আমরা এখন শুধু সাংখ্য তত্ত্বের কথাই বলব। এর আগে সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনার সময় বলা হয়েছিল ভগবান কিছুতে জড়ান না, ভগবান তাঁর মায়া শক্তির সাহায্যে সব কিছু করেন। এই মায়া শক্তিকেই সাংখ্য প্রকৃতি বলছে। বেদান্ত যাকে বলছে মায়া, তন্ত্র যাকে বলছে শক্তি, সাংখ্য তাকেই বলছে প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। ত্রিগুণাত্মিকা মানে তিনটে গুণ – সত্ত্ব, রজো ও তমো। বেদান্তের মায়া আর সাংখ্যের প্রকৃতি পুরোপুরি আলাদা। বেদান্তের মায়া পুরো মিথ্যা আর সাংখ্যের প্রকৃতি একবারে বাস্তব এবং নির্মম সত্য, শুধু যে সত্য তাই নয়, প্রকৃতিই হচ্ছে মালকিন্। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – কাজের বাড়িতে কর্তা বসে ভুরুর্ ভুরুর্ করে তামাক খাচ্ছে, আর গিন্নী সব কাজ করে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে কর্তার কাছে এসে সব খবর দিয়ে যাচ্ছে।

সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই সব খেলা করে। কিভাবে খেলা করে? প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটি গুণ প্রাথমিক স্তরে একেবারে সাম্য অবস্থায় থাকে। কোন কারণে এই তিনটে গুণের মধ্যে সাম্যের অভাব দেখা দেয়। সাম্য যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন সৃষ্টি চলতে শুরু করে। সাম্য নষ্ট হয়ে যেতেই প্রথম আসে মহৎ, universal consciousness। কেন আসছে? কেননা এই প্রকৃতির পেছনে আছেন পুরুষ, যিনি চৈতন্য মানে consciousness। ভারতের প্রথম philosophy হল সাংখ্য কিন্তু এখানে কোথাও কপিল আত্মা বা ঈশ্বর এই শব্দ দুটো ব্যবহার করছেন না। কপিলের দর্শনে ভগবান বলে কিছু নেই। যা কিছু আছে ওই পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ আবার অনন্ত। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন – সাংখ্যকে যদি একটা ধাপ এগিয়ে দেওয়া যায় তখন সেটাই হয়ে যাবে বেদান্ত। বেদান্ত বলছে পুরুষ ছাড়া আর কিছু নেই। বেদান্তে পুরুষ একাই আছেন। কিন্তু সাংখ্যে পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। কত পুরুষ? পুরুষের কোন শেষ নেই। বেদান্তকে যদি প্রশ্ন করা হয় এত multiplicity কেন? বেদান্ত বলবে মায়া, মায়া এসে গেলে বিভাজনের কোন শেষ হবে না। যাই হোক, আমরা সাংখ্য দর্শনের কথা বলছি।

সাংখ্যে পুরুষ হলেন চৈতন্য আর তার তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজ ও তম অর্থাৎ প্রকৃতি হল জড়। চৈতন্য যখন জড়ের সংস্পর্শে চলে আসে তখন কি হয়? একটা সাদা পর্দার উপরে যদি কোন আলো ফেলা হয় তাহলে পর্দাটা আলোকিত হয়ে উঠবে। আলোটা সরিয়ে নিলে কিছুই নেই, সব অন্ধকার। প্রকৃতি আসলে অচেতন, জড়। যেমনি পুরুষ প্রকৃতির কাছাকাছি চলে আসে তখনই সে আলোকিত হয়ে ওঠে। প্রথম চৈতন্য পুরুষ যখন এই প্রকৃতির উপর আসে তখন প্রথম যে জিনিষটার আবির্ভাব হচ্ছে তাকে বলছে মহৎ - universal/cosmic mind or consciousness। প্রকৃতি হল জড়, পর্দার মত, পুরুষের চৈতন্যের আলো জড়ের উপর পড়ল, পর্দাটা আলোকিত হয়ে উঠল, তাই মহৎকে সব সময় আলোকিত মনে হবে, কিন্তু মহৎও আসলে জড়। মহৎ থেকে বেরিয়ে আসছে অহঙ্কার, universal/cosmic ego। আর অহঙ্কার থেকে সৃষ্টি হয় পঞ্চ মহাভূত – পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু আর তেজ (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)। পঞ্চ মহাভূত আবার পঞ্চ তন্মাত্রার জন্ম দেয়। আসলে যেটা হয়, তা হল এই পঞ্চ মহাভূত গুলির মধ্যে পরস্পর মিশ্রণ হতে থাকে। একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় এই মিশ্রণ হয় – একটা জিনিষের অর্ধেক আর বাকি চারটে থেকে $1/8^{th}$ করে mixing হয়। এই মিশ্রণকে বলে পঞ্চীকরণ। মিশ্রণটা কিভাবে হয় বোঝাবার জন্য নীচে এর অনুপাত গুলো দেওয়া হল –

Earth = ½ earth + (1/8 w + 1/8 a + 1/8 f + 1/8s)
Water = ½ water + (1/8 e + 1/8 a + 1/8 f + 1/8 s)
Air = ½ air + (1/8e + 1/8w + 1/8 f + 1/8 s)
Fire = ½ fire + (1/8e +1/8w + 1/8a + 1/8s)
Space = ½ space + (1/8e + 1/8w + 1/8a + 1/8f)

এখানে – Earth পঞ্চ তন্মাত্রার পৃথিবী আর small ‘e’ পঞ্চ মহাভূতের পৃথিবীকে বোঝাচ্ছে। বাকিগুলো এইভাবে করা হয়েছে। তন্মাত্রা আর মহাভূতকে distinguish করার জন্য বলা হয় –শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। যখন পঞ্চভূত বলবে তখন বলবে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে

জল, জল থেকে হবে পৃথিবী। These are the five elements. Sometime they are mentioned as gross elements and sometime they are mentioned as subtle elements. যখন তন্মাত্রা, মানে subtle elements বলে তখন বলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। পঞ্চ মহাভূতের আকাশকে বলবে pure sky আর পঞ্চ তন্মাত্রার আকাশকে বলা যেতে পারে working sky. যেমন চব্বিশ ক্যারেটের সোনা দিয়ে গয়না হয় না, খাদ মেশাতে হয়, তেমনি যেটা pure sky তাতে খাদ মিশিয়ে পেলো working sky.

এই যে তন্মাত্রা তৈরী হল, এর আবার বিভিন্ন রকমের সংমিশ্রণ হয়। যখন এই সংমিশ্রণ হয় তখন তার থেকে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হতে থাকে। আমরা বিভিন্ন লোকের, স্বর্গলোক, পাতাললোক ইত্যাদির যে বর্ণনা পাই, সবই এই বিভিন্ন তন্মাত্রার সংমিশ্রণে তৈরী। তন্মাত্রার তারতম্য অনুসারে কোন লোক হয়ে যায় স্বর্গ, আবার কোন লোক হয়ে যায় নরক। যেমন পৃথিবীর অংশ যদি অনেক বেশি হয়ে যায় তখন ওটাই নরক হয়ে যাবে। আর আকাশের অনুপাত যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে ওটাই বিষ্ণুলোক হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের যেটা জানা সব থেকে বেশি দরকার তা হল – এই তন্মাত্রা দিয়েই তৈরী হয় আমাদের দশটি ইন্দ্রিয় আর মন। এখানে আরেকটা জিনিষ বোঝার আছে – এই যে দশটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হল, তার মধ্যে আমাদের যে নেত্রগোলক আছে, অর্থাৎ যেটা দিয়ে দেখার কাজ হচ্ছে সেটাকে ইন্দ্রিয় বলা হচ্ছে না, এই চোখ হল গোলক, শুধু যন্ত্র মাত্র। এর পেছনে আমাদের মস্তিষ্কে যেই স্নায়ুকেন্দ্রটি রয়েছে, যেখানে রিপোর্টিং হয় সেটাই আসল ইন্দ্রিয়। চোখ, কান, নাক এগুলো কিন্তু প্রকৃত ইন্দ্রিয় নয়, যেমন স্টেথো নিয়ে ডাক্তাররা পরীক্ষা করেন, কিন্তু শব্দটা শুনছে অন্য জায়গায়, স্টেথোটা কখনই শ্রবণেন্দ্রিয় নয়। চোখ, কান, নাক এগুলোও ঠিক সেই রকম। আসলে এদের সব কিছুই হচ্ছে মস্তিষ্কে। এদের কাজ হল মস্তিষ্কে শুধু রিপোর্ট করে যাওয়া। আমাদের মস্তিষ্ক একটি জৈবিক যন্ত্র যেখানে এই দশটি ইন্দ্রিয় আর মন গিয়ে রিপোর্ট করে। তাহলে কি কি দাঁড়াল – দশটা ইন্দ্রিয় + আর মন (১১), পাঁচটি তন্মাত্রা + আর পাঁচটি মহাভূত (১০), + অহঙ্কার, + মহৎকে নিয়ে হচ্ছে ২৩ আর রইল প্রকৃতি – তাহলে মোট সংখ্যা হল ২৪, এই হল সেই বিখ্যাত চব্বিশ তত্ত্ব। যখনই বেদান্ত, সাংখ্য, রাজযোগ এই তিনটে দর্শন আলোচনা হবে তখনই ঘুরে ঘুরে এই চব্বিশ তত্ত্বের কথা আসবে।

সৃষ্টির মূলে এই চব্বিশ তত্ত্ব। জগতে যা কিছু আছে সবই চব্বিশ তত্ত্বের মধ্যে বাঁধা। পুরুষ হলেন পঁচিশতম, যেহেতু পুরুষ তত্ত্বের মধ্যে নন তাই পঁচিশ তত্ত্ব না বলে চব্বিশ তত্ত্ব বলা হয়। প্রকৃতির পেছনে আছেন চৈতন্য পুরুষ, সেই চৈতন্যের আলো পড়ছে প্রকৃতিতে, আর তার ফলে প্রকৃতি চৈতন্যের আলোতে চনমনে হয়ে উঠছে। প্রকৃতি চৈতন্যের আলোতে আলোময় হয়ে উঠছে তার ফলে প্রকৃতির বাকী যা কিছু আছে সব কিছুকেই চৈতন্যময় দেখাবে। এখন পুরুষ যদি সুইচ্ অফ করে দেয় সব অন্ধকার, মানে মৃত, জড় অচেতন পদার্থ হয়ে যাবে। টিউব লাইটে আলো জ্বলছে, আসলে আলোটা কি টিউব লাইটের মধ্যে আছে? ওখানে বিদ্যুৎএর স্পার্ক যাচ্ছে যার ফলে টিউবের মধ্যে যে গ্যাস আছে সেটা জ্বলে উঠছে, যদি সুউচ্ বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আর আলো জ্বলবে না।

অষ্টাঙ্গ যোগের ধ্যান ও সাধনা

এখন বলছেন সাধনা মানে কি। আমাদের যে দশটি ইন্দ্রিয় আছে, এরা যে যে তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী হয়েছে, সেই সেই তন্মাত্রার বিষয়ের পেছনে ছুটছে। যেমন নাক, এটি একটি ইন্দ্রিয়, এর তন্মাত্রা গন্ধ। এখন কি হয়, এই যে পঞ্চ তন্মাত্রা, এগুলো যে জিনিষ দিয়ে তৈরি, আমাদের ইন্দ্রিয়ও সেই জিনিষ দিয়ে তৈরি, চোখ তেজ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, নাক গন্ধ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী। যেমন জল জলের সঙ্গে মিশে যায়, তেল তেলের সঙ্গে মিশে যায়, ঠিক তেমনি নাক গন্ধের সঙ্গে মিশে যায়, চোখ কোন দৃশ্যের সঙ্গে মিশে যায়। এই ভাবে পাঁচটা ইন্দ্রিয় তার পাঁচটা বিষয়ের সঙ্গে মিশে যায়। এদের কখনই আলাদা করতে পারা যায় না। কেন পারা যায় না? কেননা তারা একই element দিয়ে তৈরী। বোতলে জল আছে আর একটা গ্লাশে জল আছে, দুটো জলকে মিশিয়ে দেওয়ার পর আর বলা যাবে না কোনটা বোতলের জল আর গ্লাশের জল কোনটা। কখনই আলাদা করা যাবে না। এটাই মূল সমস্যা। আমি আপনাকে পছন্দ করি, আমার চোখ যেমনি আপনাকে দেখল,

তখন দুটো মিলে এক হয়ে গেল। আসলে সমস্যাটা হয় – বোকা পুরুষ, সে নিজে আলো দিয়ে যাচ্ছে, আলো দেওয়ার পর যা কিছু হচ্ছে, সব কিছুর সঙ্গে পুরুষ নিজেকে এক করে ফেলে। পুরুষ যখন প্রকৃতির সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে তখন কি হয়? নাক গন্ধের পেছনে দৌড়াল, যখন সুগন্ধ আঘ্রাণ করে আনন্দ পাচ্ছে তখন বোকা পুরুষও আনন্দ পাচ্ছে। নাক যখন দুর্গন্ধ পেয়ে নাক সিট্‌কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে পুরুষ বেচারীও একই react করছে। নাক যখন বলে 'আমি দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারছি না, এখান থেকে পালাও'। সে তখন বুদ্ধির কাছে খবর দেয়, বুদ্ধিও এদের জাত ভাই। বুদ্ধি তখন পা কে বলে 'চল পালাই এখান থেকে' পাও সাথে সাথে বলে 'চল পালাই'। তখন পুরুষও বলে 'চল পালাই'। পুরুষ এভাবে কখন একবার দৌড়াচ্ছে, একবার পালাচ্ছে, একবার লাফাচ্ছে, কখন হাঁসছে, কখন কাঁদছে। এই বোকা পুরুষ, বোকাই বলতে হবে, কেননা এর বোকামির একমাত্র কারণ এ সবার সাথে নিজেকে identify করে রেখেছে। আসলে বেচারা কারুর কোন কিছুতেই জড়িয়ে নেই কিন্তু বোকামি করে সবার সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। জড়িয়ে গিয়ে পুরুষও বোকার মত লাফাতেই থাকে। জড়িয়ে যাওয়াটাই মায়া। আপনার সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব হয়ে গেলে আপনার ছেলের ভালো হলে আমিও আনন্দ করব, আপনার ছেলে বখাটে হয়ে গেলে আমারও মন খারাপ হবে। কিন্তু আপনার ছেলের সাথে আমার তো কোন সম্পর্কই নেই, কোন লেনাদেনাও নেই। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হল প্রকৃতির সব কিছু থেকে নিজেকে আলাদা করা, এই আলাদা করাটাই সাধনা। নিজেকে বলা – তুমি এগুলোর সঙ্গে জড়িও না, ও যা করছে ওকে করতে দাও। তখন কি হয়, পুরুষ আস্তে আস্তে প্রকৃতির কাছ থেকে সরতে শুরু করে। একটা সময় আসে যখন দুজন পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। যখন পুরুষ আলাদা হয়ে যায়, তখন এই যে কার্য জগৎ, যে জগৎটাকে সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখছে, সেটা পুরুষের কাছে আর নেই, জগৎটা মিথ্যা হয়ে যায়। তাই বলে কি প্রকৃতি মরে যায়? না, প্রকৃতির কিছুই মরবে না। এক রাজার যেমন হাজার রানী, ঠিক তেমনি এখানে এক রানীর হাজারটা স্বামী। প্রকৃতির এর জন্য কোন চিন্তা নেই, চারটে যদি বেরিয়ে যায় আরো নশ ছিয়ানুব্বইটা আছে।

প্রথম কথা হল আমরা এই জগতের সাথে নিজেদের এক করে বসে আছি। খুব ভালো কথা, এক করে বসে আছি তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু এর জন্য কি আমার আপনার কোন দুঃখ কষ্টের অনুভব হচ্ছে? নাকি বলছি বেশ তো আছি? এইখানে সাংখ্য আর বৌদ্ধ ধর্ম এক। জগতের সাথে এক হয়ে যে সুখ বোধ করছে তার জন্য ধর্ম নয়। কিন্তু যে বলছে জগতে শুধু দুঃখই দুঃখ, আমি আর এই দুঃখ পেতে চাইনা, এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের যদি কোন উপায় থাকে তাহলে আমাকে বলুন। এবার তোমার জন্য ধর্ম এগিয়ে আসবে, তোমাকে শিক্ষা দেবে কিভাবে এই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। দেবহুতি এটাই বলছে – আমার মৃত্যু ভয় আছে, আমার সংসার ভয় আছে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগের আসক্তির জন্য আমি কিছুতেই চিত্তকে সমাহিত হতে পারছি না, যার ফলে আমি ঘোর অন্ধকারময় অজ্ঞানে পতিত হয়ে দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হয়ে আছি। আপনি আমাকে বাঁচান। কপিল মুনি মাকে বলছেন 'মা! তোমার দুঃখ কষ্ট আছে মানছো তো? তুমি এর থেকে মুক্ত হতে চাইছ তো? ঠিক আছে, এই বুঝে নাও এর খেলা। প্রথমে তুমি এগুলি থেকে নিজেকে আলাদা কর'। যখন সে আলাদা করতে শুরু করে, তখন সে বুঝতে শুরু করে আমার যে আমিত্ব সেটা এগুলোর সঙ্গে কোন ভাবেই যুক্ত নয়, এই আমিত্ব আর পুরুষ অভেদ। এই হচ্ছে জ্ঞানযোগ। ঠাকুর যেমন বলছেন নিত্য অনিত্য বিবেক – পুরুষ নিত্য আর ঐ চব্বিশ তত্ত্ব অনিত্য। তোমার মনকে তুমি সর্বক্ষণ পুরুষের সেই চৈতন্যের সঙ্গে যোগ রাখ আর বাকী সব কিছু ভুলে যাও। সাংখ্য যোগ এটাই – পুরুষ আর প্রকৃতিকে আলাদা করা। কপিল যে তিনটি তত্ত্বকে নিয়ে এসেছিলেন – এই হলো তার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম। প্রথমে ভক্তিযোগ বললেন, দ্বিতীয় বললেন সাংখ্যযোগের কথা আর তৃতীয় বললেন অষ্টাঙ্গ যোগের কথা।

এখন কপিল যে কথাগুলি দেবহুতিকে বলছেন তিনি সেই পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলছেন *নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ। আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে।। মদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ।। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।*

ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্।।৩/২৫/৪১-৪৩। ‘আমিই সেই আদি পুরুষ, আমার থেকেই সৃষ্টি বেরিয়েছে, আমার ভয়েই সব কিছু চলছে, আমিই নিয়মন করছি বলে সব কিছু ঠিক ঠাক চলছে। আমি ছাড়া আরে কেউ জীবকে মৃত্যু রূপ মহাভয় থেকে মুক্তি দিতে পারে না। সেইজন্য যে মানুষের মন আমার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে যায়, তারই শান্তি হয় তারই কল্যাণপ্রাপ্তি হয়। তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা আমাতে চিত্ত সমাহিত করাই মানুষের পক্ষে পরম পুরষার্থ’। এই কথাগুলো কপিল মুনি বলছেন। দেখা যায় প্রত্যেক অবতারই একই কথা বলেন। ঠাকুরও বলছেন ‘এই ছোকরাদের দুটো জিনিষ জানলেই হলো – ওরা কে, আমি কে আর ওদের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক’।

এরপর কপিল মুনি মানুষের কতকগুলি গুণের কথা বলছেন যেমন *যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ। সর্বভূতসমত্বেন নির্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ। ব্রহ্মচর্যেণ মৌনেন স্বধর্মেণ বলীয়সা।।৩/২৭/৬-৭।* যমনিয়মাদি যোগাভ্যাসের দ্বারা নিজেকে সংযত করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা, কারুর ক্ষতি না করা, কারুর ক্ষতির চিন্তা না করা, ব্রহ্মচর্য পালন করা, কম কথা বলা, স্বধর্ম পালন করা ইত্যাদি। এগুলোর অনুশীলনে পুরুষ আস্তে আস্তে প্রকৃতির থাবা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে, আর এই বাহ্য জগৎ থেকে আলাদা হয়ে ধীরে ধীরে অন্তর জগতে প্রবেশ করতে থাকে।

এরপর কপিল মুনি অষ্টাঙ্গযোগের ধ্যানের ব্যাপারে বলছেন। ভগবানের বিশেষ বিশেষ রূপের বর্ণনা আছে। তাঁর বিশেষ কোন রূপ আর তাঁর লীলা চিন্তন, রূপ চিন্তন কিভাবে করতে হয় বলছেন। যেমন এখানে বলছেন – ধ্যান করবে হৃদয়ে ভগবান ছোট্ট কিশোর মূর্তি ধারণ করে আছেন, তাঁর বদন সদা হাস্যময়, প্রফুল্ল, সৌম্য আর ভক্তের প্রতি কৃপা বর্ষণের জন্য সর্বদাই তিনি ব্যগ্র। এইভাবে ধ্যান করতে করতে মানুষের মন ভগবানে একেবার স্থির হয়ে যায়। তখন মানুষ শুধু ভক্তি চায়, তাঁর সেবা করা ছাড়া আর কিছু চায় না। *সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।৩/২৯/১৩।* এই রকম নিষ্কাম ভক্ত আমার সেবা ছেড়ে সালোক্য(ভগবানের নিত্যধামে নিবাস), সার্ষ্ট(ভগবানের সমান ঐশ্বর্যভোগ), সামীপ্য(ভগবানের নিকটবর্তিত্ব), সারূপ্য(ভগবানের সমান রূপ প্রাপ্তি) এবং সাযুজ্য(ভগবানের সাথে একাত্মতা লাভ) মোক্ষ পর্যন্ত দিতে চাইলেও নেবে না। তারা শুধু চায়, আমি বেঁচে থাকি আর তাঁর সেবা করতে থাকি। আমি মরার পর বৈকুণ্ঠে যাব, কি স্বর্গে যাব, কি নরকে যাব এইসব চিন্তা আর সে করে না।

ধ্যানের কথা বলতে গিয়ে বলছেন এক রকম ধ্যান নির্গুণ ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় আরেক রকম ধ্যান সগুণ ঈশ্বরে ভক্তির দিকে নিয়ে যায়। কপিল বলছেন, এই দুটো একই জিনিষ, আর এই দুই ধরণের ধ্যানের ফলে যেখানে পোঁছাচ্ছে তাঁকেই ভগবান বলা হয় – সগুণ ব্রহ্ম বল নির্গুণ ব্রহ্ম বল সবই এক – আর তাঁরই নাম ভগবান। গীতার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বার বার এই একই কথা বলেছেন। আমরা অনেক সময় বলি অদ্বৈতবাদীরা ভগবান মানে না, কিন্তু তা নয়। সে নির্গুণ ব্রহ্মই হোক কিংবা সগুণ ব্রহ্মই হোক, অদ্বৈত দুটোকেই মানে। সমস্যা হচ্ছে যারা দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তারা ভগবানের নির্গুণ রূপকে মানতে চায় না। অদ্বৈত পুরোটাকেই নেয় আর এরা ছোট ছোট অংশটাকে নেয়।

‘শিব জ্ঞানে জীব সেবা’ ও ‘যত মত তত পথ’

ভাগবতের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ভাগবত মানবিক মূল্যবোধের উপর খুব বেশি জোর দেয়। ঠাকুরের শিব জ্ঞানে জীব সেবা, যে ভাবকে কার্যে পরিণত করার জন্য স্বামীজী সেবাধর্মকে জগদ্বাসীর কাছে তুলে ধরলেন, ভাগবতেই এই ভাব আমরা প্রথমে পাই। কপিল মুনি তাঁর মা দেবহূতিকে বলছেন *অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চাবিড়ম্বনম্।। যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।। হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।।৩/২৯/২১-২২।* আমি আত্মারূপে সর্বদাই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত, তাই যারা অন্য প্রাণীদের অবজ্ঞা করে এবং সবার মধ্যে সেই ঈশ্বরই আছেন না ভেবে শুধু প্রতিমাতেই আমার পূজা করে তাদের সেই পূজা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সর্ব জীবে,

সর্বভূতে সেই সর্বাত্মা, পরমেশ্বর অবস্থিত, তথাপি সেই জীব সকলকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র প্রতিমা পূজাতেই ব্যাপৃত থাকে, সে কেবল ভস্মেই ঘি ঢেলে যাচ্ছে। সেইজন্য বলছি *অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা।।৩/২৯/২৭।* সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে সমস্ত প্রাণীকে মৈত্রীভাবে যথাযোগ্য দান, মান, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার এবং সমদৃষ্টি রেখে পূজা করা কর্তব্য। এটাই তো শিব জ্ঞানে জীব সেবা।

এরপর যা বলছেন তা অতি গুরুত্বপূর্ণ – শাস্ত্রে যত পথের কথা বলা আছে, তা সে যে পথই হোক না কেন, যে কোন পথ দিয়েই আমার কাছে আসা যায়। আর নানা রকমের যে কর্মকলাপ যেমন যজ্ঞ, তপস্যা, বেদ পাঠ, বেদ বিচার, সংযম, কর্ম ত্যাগ, যোগ, ভক্তি, নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি, সকাম-নিষ্কাম যা কিছু আছে, সব কাজের একমাত্র লক্ষ্য হল আমার কাছে পৌঁছান – that is to spiritual realization।

নিজের পুত্র কপিল মুনির কাছে এত কিছু শোনার পর দেবহুতির মন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, জগতের কোন কিছুর দিকে তাঁর আর মন নেই। স্বামীর সৌজন্য থেকে পাওয়া বিশাল রাজপ্রাসাদ, সম্পদ, ঐশ্বর্য সব কিছু থেকে তাঁর মন উঠে গেছে। দেবহুতি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সাধারণ বস্ত্র পরিধান করে ঈশ্বর চিন্তন করতে করতে বেরিয়ে গেলেন আর খুব কম সময়ের মধ্যে তাঁর মুক্তিও হয়ে গেল। কপিল মুনিরও কিছুই ছিল না, মায়ের এই সব ভোগের জিনিষের প্রতি ফিরেও চাইলেন না। পরে আমরা দেখতে পাই তিনি সাগর সঙ্গমে এসে কুঠিয়া করে তপস্যা করেন। এইখানেই সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে তিনি ভস্ম করে দিয়েছিলেন। পরে ভগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে এসে তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করেন।

বেদান্ত সাংখ্য দর্শন থেকে যা গ্রহণ করেছে

কপিলের মতে ভগবান নেই, ঈশ্বরকে সাংখ্য মানে না। এদের শুধু চৈতন্য আর জড়। সাংখ্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠে, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নড়ে চড়ে না, আর প্রকৃতি জড়, কিন্তু দুজনে মেলে কি করে? এর কোন উত্তর নেই। সেইজন্য সাংখ্য universal philosophy হতে পারল না। সাংখ্যের কাছে সমস্যা একটাই – পুরুষ আর প্রকৃতির মেল হয় কি করে, কেননা তুমি বলছ পুরুষ নিষ্ক্রিয় আর প্রকৃতি জড়, নিজে থেকে নড়া-চড়া করতে পারে না। আবার এদিকে বলছে পুরুষের জন্যই সবাই সক্রিয় হয়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় পুরুষ যাবে কিভাবে প্রকৃতির কাছে? এর উত্তর তারা অন্য ভাবে দেয় – অন্ধ খঞ্জবৎ। একজন অন্ধ আরেকজন খঞ্জ, দুজন দুজনকে সাহায্য করবে – অন্ধ যে সে খঞ্জকে কাঁধে নিয়ে হাঁটবে। কিন্তু এতেও তাদের বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন তার উত্তর পাওয়া যায় না। এদের দুজনকে মেলাবে কে? ভারতে এইজন্য সাংখ্য দাঁড়াতে পারলো না।

সাংখ্যের basic principle গুলো একদিকে বেদান্ত কিছু নিয়ে নিল, আরেক দিকে যোগ কিছু নিয়ে নিল। যোগ এই পুরুষের উপর ঈশ্বরকে নিয়ে এলো। তখন পুরুষ আর প্রকৃতির মেল বলছে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়ে যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন হয়, তখন আর কিছু বলবার থাকে না, কেননা সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। আর বেদান্ত সাংখ্যের পুরুষকেও মানল, প্রকৃতিকেও মানল আবার যোগের ঈশ্বরকেও মানল, সব কিছুকে মেনে নিয়ে তারা বলে দিল ঈশ্বর বাদে আর কিছু নেই। সব তিনিই, তিনিই পুরুষ রূপে, তিনিই আবার প্রকৃতি রূপে – আর এই যে সব আলাদা আলাদা দেখছি, এ সবই মায়া, মিথ্যা, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এই হচ্ছে বেদান্তের philosophy, কিন্তু basic যেটা সেটা সাংখ্য থেকেই এসেছে। সাংখ্য তো উপনিষদের বাইরে কিছু বলছে না। উপনিষদের বাইরে কিছু বললে সেটা আবার বেদান্ত নেবে না। উপনিষদেই আছে, কিন্তু কপিল মুনি সেটাকে একটা systematic way তে রেখে দিলেন। মূল কথা হল, আমাদের সবার যে 'আমি বোধ' এটাই চৈতন্য, কিন্তু বোকার মত এই চৈতন্য দেহ, মন, বুদ্ধি যেগুলো আসলে জড়, এদের সাথে নিজেকে একাত্ম করে দিয়ে এক বলে মনে করে 'আমি দেহ' 'আমি অমুক' ইত্যাদি বলছে। চিজ্জড়গ্রন্থির চৈতন্যকে জড় থেকে আলাদা করে দেওয়াটাই সাংখ্যের মূল উদ্দেশ্য।

চতুর্থ স্কন্ধ

আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্যের স্বরূপটা আর সেই লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছাতে হবে এই দুটো জিনিষই সব শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও কিছু পরে পরেই এই দুটোকে ঘুরে ঘুরে আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। যার ফলে একটা সময় শাস্ত্রের কথা আমাদের একঘেঁয়ে লাগে। কিন্তু তবুও আমাদের এই জিনিষগুলো শুনতে হবে, আর শুনতে শুনতেই একটা সময় থেকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গুলো স্পষ্ট হতে শুরু হবে।

আমরা দেখলাম সৃষ্টি দুই রকমের। ব্রহ্মা প্রথমে মন থেকে কিছু সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মার মন তখন শুদ্ধ সত্ত্বগুণে পূর্ণ থাকার জন্য এঁদের মধ্যেও সত্ত্বগুণের আধিক্য খুব বেশী মাত্রায় ছিল। সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকায় এনারা সবাই হয়ে গেলেন ঋষি। ব্রহ্মা দেখলেন ঋষিদের দিয়ে সৃষ্টির কাজ এগোবে না। ইতিমধ্যে তিনি নিজে একটা গোলমাল করে ফেলেছিলেন বলে তাঁর নিজের শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একটা অংশ পুরুষের আর অপর অংশ থেকে একজন নারীর সৃষ্টি হল। সেখান থেকে সন্তানাদির জন্ম শুরু হল। পুরুষ আর নারী এসে যাওয়ার ফলে সৃষ্টিতে একটা গতি এল। এটিই ব্রহ্মার সৃষ্টির দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। এরপর তৃতীয় আরেকটি প্রক্রিয়া নিয়ে এলেন – সৃষ্টি ব্রহ্মার মন মত এগোচ্ছে না বলে একটা সময় ব্রহ্মার মনে বিরক্তির ভাব জন্ম নিল। এই বিরক্তি থেকে ব্রহ্মার মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভাবের উৎপন্ন হল। মনের এই বিভিন্ন ভাবানুযায়ী আরও বিচিত্র ধরণের জিনিষ সৃষ্টি হতে আরম্ভ হল। বিভিন্ন অধ্যায়ে এইসব সৃষ্টির বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক কাহিনী আসবে। কিন্তু ভাগবতের মূল উদ্দেশ্য একটাই – সব কাহিনী বলে শেষে বলবেন সৃষ্টি কার্যে ঈশ্বরের কোন ভূমিকাই নেই। সৃষ্টির কথা বলবার উদ্দেশ্যেই এত কাহিনী বলা হচ্ছে না, ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বশক্তিমান – এটাকে বোঝানর জন্যই এত কাহিনী বলা। ভগবান সব কিছুর উর্দ্ধে, তিনি তাঁর ভক্তকে কৃপার জন্য সব সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, এগুলোকে বোঝাবার জন্যই এত কাহিনীর অবতারণা।

প্রজাপতি দক্ষ ও শিবের লড়াই – প্রাচীন ধারা থেকে নতুন ধারায় বিবর্তনের সূচনা

একটা কাহিনীর মাধ্যমে বলা হচ্ছে কিভাবে একজন মনুর জন্ম হল। এই কাহিনী আমাদের অনেকেরই জানা। দক্ষ ছিলেন একজন প্রজাপতি। সতী নামে তাঁর এক মেয়ে ছিল। সতী শিবকে ভালোবেসে বিয়ে করেছেন, যা প্রজাপতি দক্ষের একেবারেই পছন্দ নয়। প্রজাপতি দক্ষ একবার একটা যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। নিজের জামাইকে অপমান করার জন্য দক্ষ শিবকে সেই যজ্ঞে আমন্ত্রণই জানালেন না। সতী শিবের নিষেধ সত্ত্বেও সেই যজ্ঞে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সতীকে দেখে দক্ষ মেয়েকে খুব অপমানিত করে শিবের নামে প্রচুর নিন্দা করতে লাগলেন। সতী অপমানিত হয়ে নিজের দেহ ত্যাগ করে দিলেন। সতীর দেহত্যাগের খবর পেয়ে শিব খুব রেগে গিয়ে এক হুঙ্কার দিলেন আর সেই হুঙ্কার থেকে এক মহা শক্তিমান পুরুষের সৃষ্টি হল, তাঁর নাম হল বীরভদ্র। বীরভদ্রকে শিব আদেশ করে পাঠালেন দক্ষের যজ্ঞকে ধ্বংস করবার জন্য। বীরভদ্র এসে যজ্ঞ ধ্বংস করলেন। আর শিব সতীর দেহকে কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন – এই কাহিনী আমাদের প্রায় সকলের জানা। এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কাহিনী। দক্ষ যজ্ঞের কাহিনী বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন ভাবে আসে। কাহিনীতে আমাদের অত প্রয়োজন নেই, আমাদের যেটা প্রয়োজন, তা হল এর ভেতর থেকে হিন্দু ধর্মের তত্ত্বকে বার করে আনা, আর হিন্দু ধর্ম একটা জায়গা থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন রূপে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছে দেখা।

দক্ষ ছিলেন মূলত কর্মকাণ্ডী আর শিব হলেন বেদান্তী। আরও যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হল, শিব প্রথম অবস্থায় ছিলে অনার্যদের দেবতা, বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের দেবতা। কিন্তু পরে শিবকে হিন্দু ধর্মের মূল স্রোতে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন হিন্দু ধর্মের মূল স্রোতে শিবকে জায়গা দিতে গিয়ে কি হল, যেটা সাধারণত সব ক্ষেত্রেই হয়, যখনই কেউ চিরাচরিত ভাবধারাতে নতুন কিছু সংযোজন করতে চাইবে তখন প্রাচীনপন্থীরা সব সময় প্রচণ্ড ভাবে আপত্তি করবে। প্রথম যখন হিন্দুদের কেউ কেউ যিশুকে অবতার রূপে মানতে শুরু করে, তখন traditional হিন্দুরা এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে যিশুকে অবতার রূপে মানতে চায়নি। আজ থেকে একশ বছর আগে যখন বলা হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার, তখনও traditional লোকেরা মেনে নেয়নি। অমৃতবাজার

পত্রিকা প্রথম দিন থেকে স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা করতে শুরু করেছিল। নতুন জিনিষকে, তা যত ভালই হোক না কেন, প্রাচীনপন্থীরা সহজে মানতে চায় না। বেদের সময় দেখা হত, যে দেবতাকে যে সম্মান দেওয়ার কথা, যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার সময় সেটা তাঁর নামে দেওয়া হচ্ছে কিনা, আর সোমরসাদি যেটা উৎসর্গ করা হত, সেই দেবতার নামে উৎসর্গ করা হচ্ছে কিনা। যে কোন কারণেই হোক বৈদিক যুগে যজ্ঞের ভাগ শিবকে দেওয়া হতো না। কোন দেবতাকে যদি যজ্ঞ ভাগ না দেওয়া হয় সেটা সেই দেবতার পক্ষে অসম্মানজনক। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে – to give cold shoulder, কারুর বাড়িতে যদি কোন অতিথি আসতেন, তাকে যদি মালিকের পছন্দ না হত তাহলে তাকে মাংসের ঘাড়ের অংশটা দেওয়া হত। একেই ঘাড়ের অংশে মাংসের থেকে হাড় বেশি থাকাতে চিবোতে কষ্ট হত আর তার ওপর ঠাণ্ডা, খেতে আরো বেশি কষ্ট হত। চিবোতেই পারবে না। যাকে অপমান করতে চাইত, খাওয়াতে চাইত না, তাকে ঐ cold shoulder দিয়ে দেওয়া হত। সেই রকম যজ্ঞে শিবের উপস্থিতিকে দেবতা ও প্রজাপতিরা পছন্দ করতেন না, অপমান করার জন্য তাই শিবকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হত না।

যাই হোক দক্ষ ছিলেন খুব বড় নামকরা কর্মকাণ্ডী, আর সেই যুগে তাঁর প্রচুর নাম-যশ। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সতীকে দেখে দক্ষের শিবকে মনে পড়তেই শিবকে খুব গালাগাল দিতে লাগলেন – আমার এই সুকন্যা ছিল, আমার এই মেয়েকে শিব বিয়ে করেছে, যে কিনা একটা গেঁয়ো, অসভ্য, শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়, জামা কাপড়ের কোন ছিরি নেই ইত্যাদি গালাগাল দিয়ে তিনি বললেন 'এই শিব দেবতাদের মধ্যে অধম, নিকৃষ্ট, আর আমি অভিশাপ দিচ্ছি এ যেন কোন দিন যজ্ঞ ভাগ না পায়'। শিব খুব রুষ্ট হয়ে তিনি আবার একটা পাল্টা অভিশাপ দিলেন। *য এতন্মর্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি। দ্রুহ্যত্যজ্ঞঃ পৃথগ্ দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ।।৪/২/২১।* 'এই যে মরণধর্মী শরীর, যা কিনা বিনাশশীল, আর এতেই যার অহঙ্কার, নিজেকে এই শরীরের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে আর শঙ্কর থেকে যার দ্বেষ উৎপন্ন হচ্ছে, সে যেন চিরদিন তত্ত্বজ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে'।

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা শুধু ভক্ত সম্মেলন করে যাচ্ছেন। অনেকে আছেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝতে চাইছেন, আবার অনেকে হিন্দু ধর্মের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস জানতে চাইছেন, কেউ বা শুধু পূজা-অর্চনা নিয়েই থাকতে চাইছেন। বিভিন্ন ধরণের মানসিকতার ভক্ত চিরকালই ছিল এখনও আছে, তবে এর রূপটা পাল্টে গেছে। বেদ প্রথমে ছিল কর্মকাণ্ড, যজ্ঞ করাই কর্মকাণ্ডের প্রধান অঙ্গ। বৈদিক যুগেও বিভিন্ন ধরণের মানসিকতার মানুষ ছিলেন। কিন্তু কর্মকাণ্ডের প্রচণ্ড দাপটের জন্য যার যে ধরণের মানসিকতাই থাকুক না কেন যজ্ঞ করা বা দেবতাদের আহুতি দেওয়া, স্বর্গে যাওয়া এগুলোর কেউ বিরোধিতা করতে সাহস পেতেন না। শিবের এই অভিশাপ হিন্দু ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। পরের দিকে যেসব ঋষিরা এলেন তাঁরা বললেন – তুমি যে এত যজ্ঞ করছ, এত আহুতি দিয়ে চলেছ তাতে তোমার কিছুই হবে না, এতে তুমি শুধু স্বর্গাদি পাবে। এই জৈবিক শরীর যেমন নশ্বর তেমনি স্বর্গাদিও নশ্বর, এরও বিনাশ আছে। এই অনিত্যের বাইরে যে নিত্য আছে সেটাকে পাওয়ার চেষ্টা কর। কিভাবে পাবে? শুধু আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে। শিব বললেন তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান।

হিন্দু ধর্মে মূল প্রবাহে এবার শিবের আবির্ভাব হয়েছে। শিবতো একজন উপরি দেবতা, দেবতাদের যে সম্মান দেওয়া হয়ে আসছে, শিবকে সেই সম্মানও দেওয়া যাবে না। অথচ শিবকে একটা উঁচু সম্মানীয় স্থান দিতে হবে। তাহলে কিভাবে স্থান দিতে হবে? সেইজন্য শিবকে পুরোপুরি করে দেওয়া হল তত্ত্বজ্ঞানের মালিক। আমরা তত্ত্বজ্ঞান যে অর্থে বুঝি, সেই অর্থে বলতে গেলে শিব হলেন প্রথম তত্ত্বজ্ঞানের দেবতা। পরের দিকে এই তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিবের সঙ্গে বেশি করে এই তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাপারটা যুক্ত হয়ে আছে। তত্ত্বজ্ঞানের মূল ও শেষ কথা নির্গুণ নিরাকার, নির্গুণ নিরাকারের তো কোন দেবতা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু শিবকে এই তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে বলে দেওয়া হল, যারা যজ্ঞ যাগ করবে আর ভগবান শিবকে দ্বেষ করবে তাদের কোন দিনই তত্ত্বজ্ঞান হবে না। আর প্রজাপতি দক্ষ এই যজ্ঞ যাগই করছেন,

তিনি আবার বেদের কর্মকাণ্ডীমার্গের একজন বড় প্রবক্তা। এদিকে এও বলে দেওয়া হল, কর্মকাণ্ডীদের থেকে তত্ত্বজ্ঞানীরা শ্রেষ্ঠ।

শিব বলছেন 'যারা বেদের যজ্ঞ যাগ নিয়ে আছে, আর ফলের আশায় বেদের বিভিন্ন মন্ত্রের উচ্চারণ করে চলেছে, তারা যেন এগুলোই সব সময় করতে থাকে আর গৃহস্থাশ্রমেই যেন চিরদিন বদ্ধ হয়ে থাকে, আর কখনই এদের মন যেন কর্মকাণ্ডের বাইরে না যায়'। এই হচ্ছে শিবের অভিশাপ। এই অভিশাপের পরিণতি কি? তুমি এখন যে অবস্থায় আছ, এর থেকে কখন উঁচু অবস্থায় যেতে পারবে না। আমরা বলতে পারি – এ এমন কি খারাপ, ভালইতো হল, আমি যজ্ঞ করতে পারছি, স্বর্গে যাওয়ার পথও প্রশস্ত হচ্ছে, এটাই তো শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু শিবের এই অভিশাপ হল পুরাতন ধারা থেকে একটা নতুন ধারাতে বিবর্তনের সূচনা। যেখানে এতদিন যে জিনিষটাকে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছিল সেটাকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। যারাই যজ্ঞ যাগ করে স্বর্গপ্রাপ্তির আশা করছে তারা হল নিকৃষ্ট। আধুনিক যারা তারা যে কোন জিনিষকে বলে গেঁয়ো, ঠিক সেই রকম এখানেও তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে আধুনিক, নতুন তত্ত্ব, আর তোমাদেরটা গেঁয়ো, মানে পুরনো। তোমাদের এই কর্মকাণ্ড গেঁয়ো আর জ্ঞানকাণ্ড আধুনিক।

শিব আরও বলছেন 'এই দক্ষ আর তার অনুগামীরা, এরা দেহকেই যেন চিরদিন আত্মা মনে করতে থাকে'। প্রজাপতি দক্ষের পৌরাণিক কাহিনী বহু দিন আগেকার কিন্তু আমরা এখনও দেহকেই আত্মা মনে করি। শারীরিক দিক দিয়ে যে আনন্দ লাভ হয় আমরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। শিব বলছেন 'দক্ষের মন যেন সব সময় নীচের দিকেই থাকে, আর এর মুখ ছাগলের মত যেন হয়ে যায়'। এখনও দক্ষের অনেক ছবিতে তার শরীরটা মানুষের কিন্তু মুণ্ডুটা ছাগলের দেখা যায়। শিবের অভিশাপের ফলে মাথাটা ছাগলের হয়ে গেছে। ছাগল মানে, বোকা, বিচার বুদ্ধিহীন। আরও বলছেন 'যারাই এই দক্ষের অনুগামী হবে তারা এই সংসারের জন্ম-মৃত্যু চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে'।

শিব তো অভিশাপ দিয়ে দিলেন, কিন্তু অভিশাপ দিলেই তো সব হয়ে যাবে না। কেননা যাদের অভিশাপ দিচ্ছেন তারাও তো শক্তিশালী, ক্ষমতাবান। যেমন ওখানে ভৃগুর মত বিরাট মুনি যজ্ঞ করাচ্ছিলেন, যিনি কিনা আবার ব্রহ্মার সন্তান। ভৃগুও পালটা অভিশাপ দিয়ে শিবকে বলছেন 'যারা শিবভক্ত, শিবের যারা অনুগামী, তারা সবাই সমস্ত শাস্ত্রের বিরোধিতা করবে আর এরা সব শঠ ও ধূর্ত হবে' ইত্যাদি। এখানে যেটা দেখার বিষয় তা হল দুটো thought current এর conflict, একটা কর্মকাণ্ড আরেকটা জ্ঞানকাণ্ড। সন্ন্যাসী মুখ্যতো কিছুই করেন না। কিন্তু যে তিলক কেটেছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে জপের মালা নিয়ে ঠক্ ঠক্ করে জপ করে যাচ্ছে, তখন বোঝা যায় ইনিই ঠিক ঠিক ধার্মিক লোক। সেইজন্য সন্ন্যাসীকে দেখে অনেকে মনে করে এতো কিছুই করে না, না করছে যজ্ঞ আর না করছে কোন পূজা, বসে বসে খায় আর লেকচার দিয়ে বেড়ায়, এরাই তো পাখণ্ডী। আর সন্ন্যাস ধর্মে যেহেতু কোন আচার উপাচার নেই তাই সন্ন্যাসীর পাখণ্ডী হয়ে যাওয়ার সম্ভবনাও থাকে। তাই বলছেন যাদের কোন শুচি অশুচি জ্ঞান নেই তারাই গিয়ে শিবের ভক্ত হবে গাঁজা মদ খাবে ইত্যাদি। পরে যারা শিবের ভক্ত হয়েছে তাদের প্রবৃত্তি কি রকম ছিল তারই একটু বর্ণনা পাওয়া গেল। সব শেষে ভৃগু বলছেন 'যত শিবের ভক্ত আছো সবাই গিয়ে গায়ে ছাই মাখো, গলায় হাড়ের মালা লাগাও, আর নেশ ভাঙ করো'।

এরপর নানান কাণ্ড ঘটতে লাগল। সতী মারা গেছেন। সতীর দেহকে নিয়ে শিব তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছেন। এখন কি করে সতীকে শিবের কাছ থেকে ছাড়ান যাবে। তখন বিষ্ণু এসে চক্র দিয়ে সতীর দেহকে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। আর এদিকে আগে যে প্রলয় হয়েছে তাতে দক্ষ মারা গেছে, ভৃগুর দাড়ি উড়ে গেছে, একজন ঋষির দাঁত ভেঙ্গে গেছে, এগুলোতো খুব অন্যায় হয়ে গেছে। নানান রকমের কাণ্ড চলছে। ইতিমধ্যে মিটমাট করার জন্য ভগবান বিষ্ণু হস্তক্ষেপ করলেন। এদিকে আবার শিব অত সহজে ছাড়তে চাইছেন না। তখন বলছেন ভৃগু মুনির দাঁত উড়ে গেছেতো কি হয়েছে, আর যার দাঁত ভেঙ্গে গেছে, যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া

হবে চাল ডাল, ঐগুলো বেটে দেওয়া হবে। আর দক্ষ মারা গেছে তার কি হবে? ঠিক আছে ঐ একটা ছাগলের মুণ্ডু লাগিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এইভাবে সব মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর ভগবান বিষ্ণু সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছেন 'দ্যাখো, তোমরা শিবকে বুঝতে ভুল করেছ কারণ *অহং ব্রহ্মা চ শর্বশ্চ জগতং কারণং পরম্। আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ।। আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোহনং গুণময়ীং দ্বিজ। সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্।।৪/৭/৫০-৫১।* আমিই হলাম ব্রহ্মা, আমিই আবার শিব, আমিই সবার আত্মা, আমিই ঈশ্বর, আমি সাক্ষী, আমি স্বয়ং প্রকাশ আবার আমি উপাধিশূন্য, সেই আমিই আবার ব্রহ্মা এবং মহাদেবাদিদেব শিব। আমার নিজের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে আশ্রয় করে আমিই সেই কর্মের অনুরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর এই তিন নাম গ্রহণ করে তিন ধরণের কার্যের প্রবর্তন করে থাকি। এর আগে কপিল মুনির আলোচনাতেও এই একই ধরণের বক্তব্য দেখতে পেয়েছিলাম, যেখানে কপিল মুনিও শেষের দিকে বলছিলেন – আমিই হলাম স্রষ্টা, আমিই সেই পুরুষ। যদিও এখানে স্বয়ং ভগবান নিজেই এই কথাগুলো বলছেন। কিন্তু যে কোন মানুষ যখন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তাঁরও এই বোধটাই হয়। সেইজন্যে উপনিষদের আত্মজ্ঞানী ঋষিকে বার বার বলতে শোনা যায় '*মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*' সব কিছু আমার থেকেই বেরিয়েছে। এটা সাক্ষাৎ ভগবানের কথা নয়, তিনি নিজে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন কিনা। আত্মজ্ঞানী দেখেন এই পুরো জগৎ আমার থেকেই বেরিয়েছে, আমিই সব কিছু হয়েছি। ঠাকুর নরেনকে বলছেন – ওরে নরেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ আর ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্ত মতে নয়। বেদান্ত মতে মানে কি? যিনি বৈদান্তিক তিনি সত্যিকারের দেখেন তাঁর থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। যাঁরা ভক্ত তাঁরা দেখেন সব ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছে – যদিও দুটো আলাদা ভাব কিন্তু একই তত্ত্ব। ভাগবত এই দুটো ভাবকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে, তাই ভাগবতের কিছু চিন্তা ভাবনা ভক্তির ভাবে পূর্ণ আবার কিছু কিছু এমন শ্লোক আছে যা একেবারে কট্টর বেদান্তের ভাবে পরিপুষ্ট। এই সংশয়টাকে দূর করবার জন্য ভাগবত করে কি – যাঁরাই এই ধরণের কথা বলছেন, মানে আমিই সেই ঈশ্বর, আমার থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, তাঁকে অবতার বানিয়ে দিয়েছেন। যিনি ভগবান তিনিই মানুষ হয়ে নানা লীলা করেছেন, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ – এই মানুষ আর নারায়ণ একই লোক, না কি তিনি সাধক থেকে সিদ্ধ হলেন, এটাকে আমরা কখন আলাদা করতে পারবো না। ভাগবত বলে যিনি ভগবান তিনি এভাবেই আসেন, একমাত্র ঈশ্বরই পারেন এই level এসে এই ভাবে এই ধরণের কথা বলতে।

ভগবান বিষ্ণুও ঠিক এভাবেই বলছেন 'আমি জগতের পালন করি, রচনা করি আর সংহার করি। আর আমিই কর্মানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হই'। যখন আমি রচনা করি তখন আমি ব্রহ্মা, যখন পালন করি তখন আমি বিষ্ণু, আর যখন সংহার করি তখন আমি শিব। বলছেন – আমিই সেই বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম স্বরূপ। অজ্ঞানীরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে আলাদা দেখে। *যথা পুমান্ন সাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ। পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ।।৪/৭/৫৩।* মানুষ যেমন নিজের হাত, পা, মাথাকে নিজের থেকে আলাদা দেখে না, ঠিক তেমনি যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, যাদের জ্ঞান লাভ হয়েছে তারা কিন্তু কখনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে আলাদা দেখে না। সেই পরমাত্মা যখন সৃষ্টি করছেন তখন তিনি ব্রহ্মা, তিনিই যখন পালন করছেন তখন বিষ্ণু, আর যখন সংহার করেন তখন তিনি শিব'। কোন জীব যখন ঐ অবস্থায় পৌঁছে যায়, যেখানে সে কোন ভেদ দেখে না, তখনই সে শান্তি পায়। এই ধরণের কথা ভাগবতে ঘুরে ঘুরে আসবে। যদি বলে শান্তি লাভ করার কি উপায়? শান্তি লাভ করার একমাত্র উপায় কোন ভেদ দৃষ্টি না রাখা। ভেদ দৃষ্টি থেকেই অশান্তির জন্ম। কিসের ভেদ – জীব আর শিবের ভেদ। যেখানেই ভেদ থাকবে সেখানেই অশান্তি।

যাই হোক, এদিকে দক্ষ মারা গেছে। মারা গেছে মানে সেতো আবার অন্য জায়গায় জন্ম নেবে, কারণ শিবের অভিশাপে সে মৃত্যুধর্মা হয়ে গেছে, দক্ষের তো আর মুক্তি নেই। এতক্ষণ যাদের জ্ঞান ভক্তি আছে তাদের কথা বলেছে। এখন বলছে যারা কর্মকাণ্ডী তাদের মৃত্যুর পর কি হবে? কখন মানুষ হয়ে জন্মাবে, কখন গরু, ছাগল, সাপ, বিছে হয়ে জন্মাবে, আর যদি খুব তপস্যাদি করা থাকে তাহলে যেটা সব থেকে শ্রেষ্ঠ পদ

আছে, মনু হবে। কিন্তু তোমাকে এর মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হবে, মুক্তি তোমার নেই। এই দক্ষ বেচারা এই রকম ফেঁসে গেছে, তার আর মুক্তি নেই, আবার যখন জন্মাবে তখন হয়তো মনু হয়ে জন্মাবে।

ব্রহ্মার অধর্মের সন্তানদের বর্ণনা

এরপর আসছে ধ্রুবের কাহিনী। মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলছেন। ব্রহ্মা প্রথম যখন সনকাদি চার কুমার ব্রহ্মচারীদের সৃষ্টি করলেন, এরা সংসার ধর্ম না করে জন্ম নিয়েই তপস্যা করতে চলে গেলেন। এরপর নারদও বিয়ে করলেন না। ঋভু, হংস, অরুণি, যতি এই রকম অনেক ঋষি, যাঁরা ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট, তাঁরা কেউই বিয়ে করলেন না। আসলে ব্রহ্মা সৃষ্টি করার আগে প্রচণ্ড তপস্যা করার ফলে তাঁর মধ্যে এত সত্ত্বগুণ এসে গিয়েছিল যে, যার জন্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও সেই সত্ত্বগুণ প্রচুর পরিমাণে চলে এসেছিল। তার ফলে সংসার ধর্ম পালন করার জন্য যে রজোগুণ দরকার, এঁদের মধ্যে সেই রজোগুণটাই ছিল না। সেইজন্য সবাই তপস্যাতেই চলে গেলেন। এই পর্যন্ত বলেই ভাগবত কাহিনীটাকে ঘুরিয়ে দিল।

বলছেন – ব্রহ্মা প্রথমে ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন সনকাদি, নারদ ঋষিদের সৃষ্টি করে, এখন তিনি অধর্মকেও সৃষ্টি করলেন। মানে ধর্ম যেমন ব্রহ্মার পুত্র তেমনি অধর্মও ব্রহ্মার পুত্র। হিন্দু ধর্মের এটাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য – জগতে যা কিছু, ভালো মন্দ, সাধু-শয়তান, ধর্ম-অধর্ম সবটাই তাঁর, ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই একই তত্ত্ব, জগতের সব কিছু ভগবান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। গীতাতে আছে – *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ* – মনে রাখাটাও তাঁর আর ভুলে যাওয়টাও তাঁর। জীবনটাও তাঁর মৃত্যুটাও তাঁর। ঈশ্বরের স্বরূপের ব্যাপারে এটাই শেষ কথা। ভালো-মন্দ দুটোই যদিও ভগবানের সৃষ্টি কিন্তু এই দুটোর কাজ আলাদা আলাদা হবেই। খ্রীষ্ট ধর্মে – ভালোটা ভগবানের, মন্দটা শয়তানের। কিন্তু হিন্দু ধর্মে তা না, মন্দটাও তাঁরই। এটাই হল an unique difference between Hinduism and other religions.

বলছেন অধর্ম ব্রহ্মার সন্তান, আর তার বউ হল মৃষা, মৃষা মানে মিথ্যা। অধর্ম আর মৃষা স্বামী-স্ত্রী, এদের সন্তান হল দম্ভ, এখানে দম্ভ মানে আমি এই বোধ। আর তাদের এক মেয়ে তার নাম হল মায়া, মায়া হচ্ছে ঠগিনী, যে ধূর্ত। এই দম্ভ আর মায়াকে আরেকটা অশুভ শক্তি নিঃঋতি নিয়ে গেছে, নিঃঋতি হল যে ঋতম্ অর্থাৎ ভগবানের আইনকে অমান্য করতে চায়। সেখান থেকে লোভ আর নিকৃতির জন্ম হল, নিকৃতি মানে যেটা নিকৃষ্ট। সেখান থেকে ক্রোধ আর হিংসা। সেখান থেকে আবার কলি, এখানে কলির অর্থ হল কলহ, ঝগড়া-ঝাটি। আর একটা বোনের জন্ম হল, যার নাম হল দুরুক্তি, দুরুক্তি মানে গালাগাল দেওয়া। দুরক্তি থেকে ভয়, মৃত্যু এদের জন্ম হল। আবার ওদের থেকে যাতনা আর নরকের জন্ম হল। নেতিমূলক যা কিছু আছে, সব নেতিমূলক জিনিষের জন্মদাতা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা এদের সকলের পিতামহ, অধর্মের জন্ম দিয়েছেন আবার মৃষার জন্ম তিনিই দিয়েছেন।

যত খারাপ বৃত্তির কথা বলা হয়, এই নেতিমূলক বৃত্তিগুলোকে মানুষ যখন ছেড়ে দেয়, তখনই মানুষ পূণ্য সম্পাদন করে। কোন মানুষ যদি তিনবার এই পাঁচটি শ্লোক পাঠ করে তাহলে তার মনের মনিলতা দূর হয়ে যায়। মনের মলিনতা দূর হয়ে যায় যে বলছে, এটা কিন্তু খুব অনুধাবনীয়। আমাদের মনের মধ্যে একটা সাবধান বাণী প্রতিধ্বনীত হতে থাকবে – ব্রহ্মা থেকে অধর্মের জন্ম, মৃষার জন্ম, তাদের থেকে আরো সব খারাপ জিনিষ গুলো জন্ম নিচ্ছে, তার মানে অধর্ম আর মৃষা গোলমেলে জিনিষ। বাচ্চা ছেলে যখন একা একা ট্রেনে যায় তাকে যেমন সাবধান করে দেওয়া হয় – ট্রেন যখন দাঁড়াবে তখন ট্রেন থেকে নামা ওঠা করবে না, জানলার বাইরে মুখ হাত বার করবে না, যদি তোমাকে রাস্থায় কেউ খেতে দিতে চায় সেটা নিও না – এই যে বাচ্চাকে নানা রকমের শিক্ষা দেওয়া হয়, এটাও এই রকম শিক্ষা দেওয়া হল। এগুল সব কটাই গোলমেলে জিনিষ, আর এগুলি যদি বার বার মনে করতে থাক তাহলে এগুলো থেকে তুমি সাবধান থাকবে আর এদের বিপরীত পথ সৎ পথে যাবার জন্য সচেষ্ট হবে।

ধ্রুবের উপাখ্যান

এবার ধ্রুবের গল্পটা সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। উত্তানপাদ ছিলেন ব্রহ্মার সন্তান। তাঁর দুটি বউ – সুনীতি আর সুরুচি। ধ্রুব হল সুনীতির পুত্র। কিন্তু সুরুচি হল পাটরানী। সুরুচির যে উত্তম নামে ছেলে, ভবিষ্যতে সে হবে যুবরাজ। একদিন উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে নিজের কোলে বসিয়ে আদর করছিলেন। এই সময় ধ্রুবও রাজার কোলে উঠতে চাইছিল। কিন্তু রাজা ধ্রুবের দিকে কোন নজরই দিতে চাইছিলেন না। ধ্রুবকে রাজার কোলে ওঠার চেষ্টা করতে দেখে গর্বিতা রানী সুরুচি ধ্রুবকে বলছে 'দ্যাখো, তোমার সে সৌভাগ্য কোথায় যে বাপের কোলে বসবে। হ্যাঁ, অনেক পূণ্য করে যদি আমার গর্ভে জন্ম নিতে, তাহলে তোমার সেই সৌভাগ্য হলেও হতে পারতো'। সুরুচিকে রাজা ভালোবাসতেন আর তিনি পাটরানীর বশীভূত ছিলেন। ধ্রুব মাত্র পাঁচ বছরের শিশু, সেতো এত কিছু বুঝতে পারেনি, বুঝতে না পেরে কেঁদে ফেলেছে। রাজা উত্তানপাদ নীরব দর্শক হয়ে রইলেন। ধ্রুব কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গেছে। মা তাকে বলছে 'বাবা! তোমাকে তোমার সৎ মা ঠিকই বলেছেন, এখানে আমার অবস্থা দাসীর মত'। বালক ধ্রুব তখন মায়ের কাছে জানতে চাইছে আমাদের এই দুঃখ, কষ্ট, অপমানের থেকে নিস্তার পাবার উপায় কি? মা বলছেন, এর একমাত্র পথ ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করা।

ধ্রুব বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। যখন বাবার কাছে কিছু পাবো না, মা যখন বলেছেন বিষ্ণুর কথা, তাহলে আমি বিষ্ণুর কাছেই যাই। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ধ্রুব একা একা চলেছে। যেতে যেতে পথে তার নারদের সাথে দেখা হল। নারদ ধ্রুবকে বলছেন 'তোমার মা যে তোমাকে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করতে বলেছেন, তা ঠিকই বলেছেন, আর তুমি যা কিছু চাইবে তা ভগবান বিষ্ণুই একমাত্র দিতে পারেন, তাই তুমি বিষ্ণুর ধ্যান কর। সব থেকে ভালো হয় তুমি যদি যমুনার পবিত্র তীরে মধুবন নামে যে পূণ্য স্থান আছে সেখানে চলে যাও, কেননা এই স্থান ভগবান শ্রীহরির নিত্য-নিবাস'। এখানে আবার স্থান মাহাত্ম্য নিয়ে আসা হয়েছে। মহাভারত ও ভাগবতে এই ধরণের প্রচুর স্থান মাহাত্ম্যের বর্ণনা জায়গা করে নিয়েছে। স্থান মাহাত্ম্য মানে – কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে জপ-ধ্যান করলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়, আর কিছু কিছু জায়গায় করলে অত তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায় না। তাই নারদ ধ্রুবকে বললেন 'তুমি ওখানে গিয়ে সাধনা কর, তুমি শীঘ্রই ফল পাবে'।

প্রথমে নারদ ধ্রুবকে নিরুৎসাহ করতে চেয়েছিলেন – তুমি বাচ্চা ছেলে, এই বয়সে কোথায় তুমি খেলা-ধূলা করবে, আর তা না করে কিনা রাগ করে ঘর-বাড়ি ছেড়ে একা একা বনের মধ্যে তপস্যা করতে এসেছ। তোমার এখন অল্প বয়স, তুমি বাড়ি ফিরে যাও ইত্যাদি। ধ্রুব কিছুতেই নারদের কথা শুনবে না। নারদ দেখলেন এ ছেলে সহজে দমে যাবার পাত্র নয়। তাই তাকে উপদেশ দিতে লাগলেন, কিভাবে সাধনা করতে হবে। বললেন – তুমি প্রাণায়াম করবে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নেবে আর ছাড়বে, আর কুম্ভক করবে, কুম্ভকে থাকার সময় তুমি এই বিষ্ণু মন্ত্র জপ করবে '*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*', আর সাত দিন সারা রাত ধরে এই মন্ত্র জপ করলে আকাশে যে সিদ্ধরা বিচরণ করেন তাঁদের তুমি দর্শন পাবে'। এগুলোকে বলা হয় milestone in spiritual life। যাঁরা জপ-ধ্যান করেন, তপস্যা করেন তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সিদ্ধাই আসতে শুরু হয় আবার কিছু কিছু দিব্য দর্শনও হয়। নারদ এই ধরণের একটা সিদ্ধির কথা বলছেন – পবিত্র জায়গায়, সাত রাত যদি কেউ এই মন্ত্র জপ করে সাধনা করে তারা সাত রাত পরেই দেখতে পারবে আকাশ মার্গ দিয়ে সিদ্ধরা যাচ্ছেন। তার মানে মনটা যে স্থূল জগতে পড়ে ছিল, সেখান থেকে মনটা সূক্ষ্ম জগতে ঢুকে পড়ে। নারদ এরপর বলছেন 'এই সিদ্ধিটা যখন তুমি পেয়ে যাবে, তুমি তখন বুঝে নিলে যে সাধনার একটা ধাপ তুমি এগিয়ে এলে। এরপর তোমাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে ভগবানের পূজা অর্চনা কিভাবে করতে হয়, ভগবানের কোন ফুলগুলি বেশি প্রিয়। সচন্দন তুলসীপত্র ভগবানের খুবই প্রিয়। শালগ্রাম শিলা জোগাড় করে তাতে তুলসি চন্দন ও ফুল দিয়ে পূজা করবে। এই ভাবে ভক্তিভরে পূজা করে বাকী সময়টা ভগবানের লীলা কথা, অবতার রূপে তিনি যে লীলা করেন সেই সব পাঠ করবে আর চিন্তন করবে'।

এবং কায়েন মনসা বচসা চ মনোগতম্। পরিচর্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎপরিচর্যয়া।। ৪/৮/৫৯।।
'সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে যে শ্রীহরির অধিষ্ঠান তাঁকে যখন ভক্ত মন, বাণী ও শরীর এই তিনটে দিয়ে আরাধনা করে ভগবান তখন করেন কি সেই ভক্তের ভক্তি ভাবটা বাড়িয়ে দেন'। ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রে এটি একটি খুব উল্লেখযোগ্য দিক। ঠাকুরও বলছেন, ঠাকুরের কথা শুধু না, ভক্তি শাস্ত্রেরই কথা – ভক্তি দুই রকমের, একটা বৈধী ভক্তি আরেকটি পরা ভক্তি। বৈধি মানে বিধি ভক্তি, গুরুদেব বা আচার্য যেমন যেমন বলে দিয়েছেন, সেই মত এত জপ, এই উপাচারে এত পূজো, এত উপবাস করে যাওয়ার নাম বৈধি ভক্তি। তারপর আসে ভালোবাসা, ঐ ভালোবাসা আসার পরেও নিয়ম মত সব করে যাবে। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা সম্পর্ক হয় তখন স্ত্রী নিয়ম মত সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছে, স্বামীও স্ত্রীর যা যা প্রয়োজন খাওয়া পড়ার সব ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে যে ভালোবাসা হতে হবে, তার কোন মানে নেই। ভালোবাসাটা পুরো আলাদা জিনিষ। এই রকম করতে করতে যখন দুজন দুজনের প্রতি যে ভালোবাসা আসে তখন অন্য জিনিষই হয়ে যাবে। একজন একজনের প্রতি সব দায়ীত্ব পালন করার পরেও দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেই ভালোবাসাটা নেই। একটা নিয়মানুসারে যন্ত্রের মত যেন একজন একজনের প্রতি কর্তব্য কর্ম করে যাচ্ছে। কিন্তু ভালোবাসা যদি এসে যায় তখন তারা কিন্তু কখনই নিজেদের পৃথক বলে ভাববে না। ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্কও ঠিক একই। প্রথমে চলে নিয়মমাফিক, নিয়মমাফিক করে করে যখন একটু শ্রদ্ধা আসবে তখন হবে বৈধী ভক্তি, তখন এত পূজো, এত ভোগ, এত নৈবেদ্য, এত জপ এসব না করলে মন ভেঙ্গে যাবে। এইভাবে করতে করে যখন ভগবান দেখেন – হ্যাঁ, ভক্ত তার শরীর, মন, বাণী দিয়ে আমারই চিন্তা করছে, আমারই কথা বলছে, আমার জন্যই সব কাজ করছে, তখন তিনি ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগিয়ে দেন। ঐ ভক্তি ভাব যখন একবার জেগে গেলো তখন সব নিয়মের কর্মগুলো খসে পড়ে।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক অগ্রগতি যেটা হয় সেটা এই নিয়মমাফিক আচার অনুষ্ঠানের জন্য কখনই হয় না। এগুলো ঠিক যেমন – মন্দিরের সামনে কতকগুলি কাঙ্গালী দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে – দুটো পয়সা দাওনা বাবু, অনবরত দাওনা বাবু, দাওনা বাবু বলে চেঁচিয়ে চলেছে। বাবু দেবেন ঠিকই, কিন্তু কাকে কখন দেবেন ঠিক নেই। যতক্ষণ না দেন, ততক্ষণ কিছুই হবে না। কিন্তু যিনি নিষ্টাপূর্বক দিনের পর দিন, বছরের পর বছর করে যাচ্ছেন, পুরো নিষ্টা নিয়ে যখন লেগে থাকেন তখনই তাঁকে তিনি ভক্তির ভাব দেন। একদিন দুদিন করলাম তারপর দশ দিন করলাম না, এতে কিছুই হবে না। কিছুই যে হবে না তাও নয়, ঈশ্বরের সাধন ভজন করার একটা সংস্কার অবশ্যই তৈরী হয়। আবার এক এক দিন খুব নিষ্ঠা নিয়ে জপ-ধ্যান করলে ভগবানের প্রতি এমন একটা টান অনুভব হয় যে মনে হয় এই মুহুর্তে আমি ভগবানের জন্য সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে বেরিয়ে চলে যাই। ঐ মুহুর্তে কিন্তু যেটা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে, কিন্তু ওটা ক্ষণিকের জন্য, ঐ সব ক্ষেত্রে আমরা গণ্ডগোল করে বসি, মনে করি যেন সত্যি সত্যিই এতদিনে ভগবান কৃপা করে আমার ভেতরে তাঁর প্রতি ভক্তি ভাব জাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভগবানের চিড়ে অত সহজে ভেজে না। ওটা আসতেও যতক্ষণ যেতেও ততক্ষণ।

নারদ তাই বলছেন 'তুমি যখন অনেক দিন ধরে, কয়েক দিন বা কয়েক মাস করলাম তাতে হবে না, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যখন করতে থাকবে, ভগবান তখন একটা সময় তোমার হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগিয়ে দেবেন। ঐ ভাব যখন তোমার মধ্যে এসে যাবে তখনই ভগবানের প্রতি তোমার নিরবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা চলতে থাকেব। তখন তুমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ যা চাইবে তিনি তোমাকে তা দিয়ে দেবেন'। এটি ভাগবত ধর্মের একটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ দিক। যে ভক্ত শরীর, মন ও বাণী নিয়ে ভগবানে ঠিক ঠিক আশ্রয় নিয়েছে তার আর কোন চিন্তা নেই, ওর হবেই হবে। আসলে সবটাই তাঁর কিনা।

এরপর নারদ ধ্রুবকে তপস্যা করার জন্য উপদেশ দিলেন। গুরুর উপদেশ মত ধ্রুবও তপস্যা করতে চলে গেলেন। শিশু মন বলে মনটা বেশি দিকে ছড়ান ছেটান ছিল না, তাই খুব সহজে ঈশ্বরের উপর মনটা একাগ্র করতে পেরেছিলেন। প্রথমে ধ্রুব শব্দাদি বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে টেনে নিলেন। হাত, পা, চোখ এদের নিজস্ব বিষয়ের প্রতি ছুটোছুটিটা বন্ধ করে দিলেন। কান দিয়ে গান শোনা, চোখ দিয়ে কোন সুন্দর দৃশ্য

দেখা ইত্যাদি কাজগুলো একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় যেটা করলেন – মন ইন্দ্রিয়কে সঞ্চালন করে সেইজন্য মনকে সেই ইন্দ্রিয়াদি থেকে তুলে নিলেন।

আমরা এর আগে চব্বিশ তত্ত্বের কথা আলোচনা করেছিলাম। চব্বিশ তত্ত্বে সবার নীচে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের ঠিক উপরে তন্মাত্রাগুলো, মানে বিষয়। প্রথমে ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়ের থেকে টেনে আনতে হয়। তখন বোঝা যায় যে বিষয়গুলো আসলে কিছুই নয়। বিষয়ের ওপরে রয়েছে পঞ্চ মহাভূত। সাধকের মন প্রথমে ছিল ইন্দ্রিয়ের উপর, তিনি এখন সাধনা করে ইন্দ্রিয় থেকে মনকে সরিয়ে নিলেন। মন এখন আর বিষয়ের দিকে যাবে না। কিন্তু মনকে তো কোথাও না কোথাও থাকতে হবে, কারণ মনের তো এখনও লয় হয়ে যায়নি। এখন তাহলে মন কোথায় থাকবে? মন তখন চলে যায় পঞ্চ মহাভূতে, ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ ও ব্যোমে। এই অবস্থায় মনের প্রচণ্ড ক্ষমতা বেড়ে যায়। যেমন, আমরা সবাই যদি এখন physical levelএ থাকি, তাহলে এই একই অবস্থায় আইনস্টাইন রয়েছেন mental levelএ। এরও ওপরে সৃষ্টি যেখানে হয়, অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতে মন চলে যাওয়ার পর তিনি তখন পঞ্চ মহাভূতের সঙ্গে এক হয়ে যান, এখন তিনি যা ইচ্ছে করবেন তাই করতে পারবেন, যদি বলেন এক বোতল জল হোক, সঙ্গে এক বোতল জল হয়ে যাবে। কি করে এই ক্ষমতা চলে এসেছে? কারণ তখন তিনি পঞ্চ মহাভূতের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন, পঞ্চ মহাভূতের তিনি মালিক হয়ে গেছেন। আমরা এখন master of physical worldএর স্তরে রয়েছি। আমাকে যদি বলা হয় এক গ্লাশ জল নিয়ে আসার জন্য, আমি একটা গ্লাশ নিয়ে কল থেকে বা কলসি থেকে জল ঢেলে এক গ্লাশ জল নিয়ে আসব।

এই জায়গাতে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে, ধ্যান কি করে হয়। এখানে গ্লাশ আছে, জল আছে, আর আমি আছি অথবা আমার হাত আছে। কিন্তু হাতটা কি দিয়ে তৈরী – পঞ্চ মহাভূত দিয়ে তৈরী, জলও তাই দিয়ে, বোতলটাও তাই দিয়ে তৈয়ারী। আমি যদি পঞ্চ মহাভূতের মালিক হয়ে যাই তাহলে কি হবে? আমার মন যদি বলে জল নিয়ে এসো, তখন হাত পা নাড়তে হবে না, জলকেও থাকতে হবে না, জল আপনা থেকেই হাজির হয়ে যাবে। কারণ এই জগতে যা কিছু হয়েছে এই পঞ্চ মহাভূত থেকেই সব সৃষ্টি হয়েছে, আর আমি এখন ওটারই মাস্টার। এই যে বলে যোগীরা চমৎকারী দেখায়, অনেক সিদ্ধাই দেখায়, এই সিদ্ধাই দেখানোর জন্য আমাদের পঞ্চ মহাভূত পর্যন্ত যেতে হবে না, তার অনেক আগেই, এই ইন্দ্রিয় জগতেই এই সব সিদ্ধাই এসে যায়। যখন পঞ্চ মহাভূতে চলে গেল সেতো তখন পুরো নিজেকে এই জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছে, জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কোন হুঁশই নেই, এই অবস্থায় সে এখন স্রষ্টার ভূমিকার কাছাকাছি চলে গেছে, ব্রহ্মার মতই প্রায় হয়ে গেছে। আর এর ওপরে, অর্থাৎ মহাভূতের ওপরে রয়েছে অহঙ্কার। যোগী যখন অহঙ্কারে পৌঁছে যান, তিনি তখন mind of every one. অহঙ্কার তত্ত্ব মানে universal mind. এই অহঙ্কার থেকে পরের ধাপে যাওয়াটা খুব মুশকিল, কেননা এর পরেই আসছে মহৎতত্ত্ব। মহৎএর সঙ্গে যখন নিজেকে এক করে নেবে সে তখন হিরণ্যগর্ভ হয়ে গেল, ব্রহ্মার সঙ্গে এক হয়ে গেল। যোগী নীচের যা কিছু সব ছেড়ে দিয়েছেন, এখন তিনি আর ব্রহ্মা দুজনের শক্তি সমান হয়ে গেল। যখন এই ধাপকেও ছাড়িয়ে যাবে তখন সে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যাবে, শাস্ত্রের ভাষায় বলে প্রকৃতিলীন পুরুষ। যে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গেল। এটাকেও যখন সে ছেড়ে দেয় তখনই তার আত্মজ্ঞান হয়ে যায়, আত্মজ্ঞান মানে সেই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

আমরা দুই এক ঘন্টা ধ্যান করে মনে করি এটুকু করলেই আত্মজ্ঞান আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। কিন্তু এখন আত্মজ্ঞান কোথায় পড়ে আছে বোঝা গেল। প্রত্যেকটি স্তরগুলোকে নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করলে বুঝতে পারা যায় আমরা কোন স্তরে পড়ে আছি। আত্মজ্ঞান লাভের আগের শেষ স্তরে এসে সাধকের মধ্যে স্রষ্টার ক্ষমতা চলে আসে। তিনি যদি তখন ইচ্ছে করেন নতুন সৃষ্টি হোক, তক্ষুনি তিনি তা করে দিতে পারবেন, কেননা তাঁর মধ্যে সেই ক্ষমতা এসে যাবে। এগুলো কোন কল্পনা নয়, বাস্তবিকই এটা হয়। এই যে লোকে সিদ্ধাই ফিদ্ধাইয়ের কথা বলে, এগুলো কিছুই না, যে কেউই যদি প্রতিদিন গুরুর নির্দেশ অনুসারে ঠিক

ঠিক জপ করে যায়, কয়েক দিনের ভেতর তার মধ্যেও এই ক্ষমতা চলে আসবে। তবে এই সিদ্ধাইগুলো তত্ত্বজ্ঞান লাভে কোন সহায়কই হয় না, বরং সাধকের সাধনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সাধক যখন মহাভূতে চলে যান তখন তিনি যে বস্তুর চিন্তন করবেন সেটি সেখানে না থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে হাজির হয়ে যাবে। কারণ তিনি তখন পঞ্চ মহাভূতের মালিক হয়ে গেছেন আর পঞ্চ মহাভূততো সব জায়গাতেই আছে। ধ্যান করা মানে disassociate করা। ধ্যানে আমরা ঈশ্বর চিন্তন করে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকার চেষ্টা করি ঠিকই কিন্তু আসলে ধ্যান হল সরে আসা। যেমন আমাদের মন এখন এই শরীরের ওপরে পরে আছে, ধ্যান করতে করতে এই শরীর থেকে আমাদের মন সরে আসে। সহজ রাজযোগের প্রথম অধ্যায়ে সেখানেও স্বামীজী এই কথাই বলছেন। ধ্যান করার সময় চোখ বুজলেই চোখের সামনে থেকে এই বহির্জগত অদৃশ্য হয়ে গেল। মনের জগত থেকেও যখন আস্তে আস্তে সরতে শুরু করে তখন সে আমাদের মস্তিষ্কে যে sense organs গুলো আছে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। তারপর ঐ sense organs থেকেও যখন সরে আসে তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে বস্তুগুলো আছে, সেই পঞ্চতন্মাত্রা গুলো পরিষ্কার দেখতে পায়। তখন দেখে এই জগৎ পঞ্চতন্মাত্রার খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অবস্থায় তার মধ্যে প্রচুর ক্ষমতা চলে আসে। এই ক্ষমতার লোভকেও যখন ধ্যান করে ছেড়ে দিতে সক্ষম হয় তখন সে পঞ্চ মহাভূতের সঙ্গে এক হয়ে যায়। পঞ্চ মহাভূতকেও যখন ছেড়ে দেয় তখন সে অহঙ্কারের (Cosmic Ego) সঙ্গে এক হয়ে যায়। অহঙ্কারের সঙ্গে এক হয়ে গেলে সে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানে বুদ্ধির সঙ্গে এক হয়ে যায়। বুদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেলে সে সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ওই অবস্থাকেও যখন সে ছেড়ে দিতে সক্ষম হবে তখনই তার আত্মজ্ঞান লাভ হবে অর্থাৎ মুক্তি বলতে যা বোঝায় সেই মুক্তি তার হয়ে যাবে। আমরা মনে করি কত সহজ। একটু জপ ধ্যান করে সামান্য উদ্দীপন হলেই মনে করি সব মেরে এনেছি। কিন্তু কোথায় কি? সব ফাঁক্কা। ঠাকুর বলছেন – এগিয়ে পড়, একটু এগিয়ে পড়লে চন্দন কাঠের বন, চন্দন কাঠের বনকে ছাড়িয়ে গেলে পাবে রূপার খনি, রূপার খনি পর আছে সোনার খনি, সোনার খনির পরে কত কি আছে। আমরা চন্দন কাঠের বনে পৌঁছে মনে করি মুক্তি যেন জলতরলবৎ। তবে এগুলোতে আমাদের শারীরিক আর মানসিক চাহিদাগুলো কমতে থাকে। নির্বিকল্পে গিয়ে কোন চাহিদাই আর থাকবে না। নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া আর সব অবস্থাতে তার শারীরিক ক্রিয়া কর্ম চলতে থাকে, তবে কর্ম অনেক কমে আসতে থাকে, কারণ তখন তার শারীরিক চাহিদাই অনেক কমে আসে।

ধ্রুব দেবর্ষি নারদের উপদেশ মত পবিত্র ভাবে উপবাসী থেকে একাগ্র চিত্তে পরমপুরুষ নারায়ণের উপাসনায় রত হলেন। এর আগে আমরা যে ধ্যানের কথা আলোচনা করলাম, ধ্রুবও ঠিক সেই ভাবে তাঁর মনকে ইন্দ্রিয় থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এইভাবে তিনি এক এক করে মহৎতত্ত্বাদি আর তার যে আধার প্রকৃতিকে অতিক্রম করে অর্থাৎ তন্মাত্রা, মহাভূত, অহঙ্কারাদিকেও তিনি ছাড়িয়ে গিয়ে সেই পুরুষ বা পরব্রহ্মের অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। *যদৈকপাদেন স পারতথিবার্ভকস্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী। ননাম তত্রার্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে।।৪/৯/৭৯।* ধ্রুব এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে তপস্যা করছিলেন, ফলে ধ্রুবো যে এক পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের অগ্রভাগের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, সেই বুড়ো আঙ্গুলের চাপে পুরো পৃথিবীটা টলমল করতে শুরু করে দিল। উপমা দিয়ে বলছেন কোন নৌকার উপর যদি একটা হাতিকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন হাতির দোলানিতে নৌকা টলমল করতে থাকে সেই রকম পৃথিবীটাও ধ্রুবের বুড়ো আঙুলের চাপে বেসামাল হয়ে গেল। এই রকমটাই হওয়ার কথা, হতে বাধ্য, কেননা ধ্রুব এখন পুরো ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক করে নিয়েছেন, পুরো ব্রহ্মাণ্ডের ভার পৃথিবী তো সহ্য করতে পারবে না। একটা ব্ল্যাক হোলকে যদি পৃথিবীর বুকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাতে পৃথিবীর কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রহ্লাদকে যখন তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু পাহাড় থেকে ফেলে দিল তখন প্রহ্লাদের তো কিছুই হলো না উল্টে যে পাথরের উপর গিয়ে তিনি পতিত হলেন সেই পাথর গুলোই গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে গেল। কেন এই রকম হল? কারণ প্রহ্লাদ তখন ওই তত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। বিষাক্ত সব সাপ যখন প্রহ্লাদের গায়ে ছেড়ে দেওয়া হল, প্রহ্লাদের কিছুই হলো না? কারণ তখন তিনি সেই ঈশ্বর সর্বভূতে সমান, এই চিন্তার সঙ্গে একীভূত করে নিয়েছিলেন বলে সাপের বিষ প্রহ্লাদের উপর কোন ক্রিয়াই করতে পারলো না। সমুদ্রে যখন ফেলে দেওয়া হল,

প্রহ্লাদ তখন বায়ুতত্ত্ব হয়ে অণিমা শক্তিতে এমন হাল্কা হয়ে গেলেন যে তিনি সমুদ্রের জলে ভাসমান হয়ে রইলেন। এগুলো এমন কিছুই আশ্চর্যের নয়, মানুষ যেমন যেমন চিন্তন করে মনকে যে যে অবস্থায় নিয়ে যাবে তার শরীরটাও সেই ভাবে বিশেষ রকমের হয়ে যাবে, ঈশ্বরের যে ভাবটা চিন্তা করবে তার শারীরিক গঠণও সেই ভাবানুযায়ী গঠিতে হয়ে যাবে। তবে তিনি চাইলে ঈশ্বরের এই শক্তিগুলোর প্রকাশ হবে না।

ধ্রুব এই অবস্থায় অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে এক করে প্রাণায়াম করে যাচ্ছে – যখন দম বন্ধ করে কুম্ভক করছে, তখন সমস্ত প্রাণির দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত প্রাণীকুলের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে সব দেবতারা ভগবানের কাছে ছুটে এসেছেন। ভগবান তখন ঠিক এই কথাই বলে দেবতাদের আশ্বাস প্রদান করে তাঁদের উৎকণ্ঠা দূর করছেন *মা ভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যয়ান্নিবর্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম। যতো হি বঃ প্রাণনিরোধ আসীদৌত্তানপাদির্ময়ি সংগতাত্মা।।৪/৯/৮২।* হে দেবগণ! তোমাদের কোন চিন্তা নেই আমি আছি। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব আমার ধ্যান করছে বলে এই রকম হচ্ছে। ধ্যানের মাধ্যমে সে নিজের চিত্তকে বিশ্বাত্মা অর্থাৎ আমার মধ্যে সমাহিত করে দিয়েছে, আমার সঙ্গে তার অভেদ ধারণা সিদ্ধ হয়েছে। যার ফলে ধ্রুব নিজে প্রাণ নিরোধ করার জন্য তোমাদের সকলের প্রাণবায়ুই বন্ধ হয়ে গেছে। তোমরা সবাই নিজের নিজের লোকে ফিরে যাও। আমি এক্ষুণি ধ্রুবকে গিয়ে তার তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করছি।

দেবতারা ভগবানের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করে ভয়মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন আর ভগবান গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে ভক্ত ধ্রুবকে দর্শন দেওয়ার জন্য মধুবনে গমন করলেন। শ্রীভগবানের দিব্যদর্শন লাভ করে বালক ধ্রুব যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ভগবানের খুব সুন্দর স্তুতি করতে লাগলেন – *যোহন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না। অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্ প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্।।৪/৯/৬।* আপনি সর্বশক্তিমান, আপনি আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়ে আপনার চিৎশক্তি দ্বারা আমার বাণী, আমার হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণসমূহকে চেতনায়িত করেছেন, সেই অন্তর্যামী পুরুষোত্তম ভগবান আপনাকে আমি প্রণাম করি। এইভাবে ধ্রুব ভগবানের বিশাল এক স্তুতি করে বলছেন যে ব্যক্তি আপনার পরমানন্দঘনমূর্তির দর্শন লাভ করে তার হৃদয় সমস্ত রকম কামনা শূন্য হয়ে যায়। সেই কামনা শূন্য হৃদয়ে সে নিরন্তর আপনারই ভজনা করে যান, তাদের কাছে রাজ্যাদি ভোগ্যবস্তু তুচ্ছ হয়ে যায়।

ধ্রুবের স্তুতিতে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বলছেন – *বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্যবালক। তৎপ্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত।।৪/৯/১৯।* 'আমি তোমার হৃদয়ের সব সঙ্কল্পই জানি, তবুও আমি তোমাকে বলছি, যদিও সেই পরমপদ লাভ অত্যন্ত কঠিন কিন্তু আমি তোমাকে তোমার মনের সঙ্কল্পানুযায়ী সব প্রদান করছি, তোমার কল্যাণ হোক। ধ্রুব তখন বলছেন 'আপনিতো সবই জানেন, আমার বাবা আর সৎ মা আমাকে অপমান করেছিল, তাই এখানে এসে আপনার আরাধনা করছিলাম, কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে এইটাই চাইছি যে আপনি আমাকে এমন করে দিন যেটা কেউ কোন দিন পায়নি'। ভগবান তখন বলছে 'ঠিক আছে আমি তোমাকে সেই অবিনাশী লোক দিয়ে দিচ্ছি, যে লোককে আশ্রয় করে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র প্রদক্ষিণ করে ঘুরবে'। যাকে কেন্দ্র করে সব কিছু ঘুরছে সেই কেন্দ্রটা ভগবান ধ্রুবকে দিয়ে দিলেন। মানে সব কিছুর বিনাশ হয়ে যাবে কিন্তু ঐ যে আশ্রয় মানে মূল কেন্দ্রের কখনই বিনাশ হবে না। বিনাশ হবে না কোন অর্থে? ব্রহ্মার অর্থে, ব্রহ্মারও যেমন একদিন বিনাশ হবে তোমারও একটা সময় বিনাশ হবে, ভগবানের অজর, অমর, অব্যয় সত্তা তুমি পাবে না। শেষ যে লোক আছে সেটা তোমার, ওর ওপরে আর কেউ যেতে পারবে না। ভগবান বলছেন বিভিন্ন কল্পগুলোর নাশ হবে কিন্তু তুমি সেই ভাবেই থাকবে, তোমাকে কেন্দ্র করেই এই কল্পগুলোর পরিবর্তন হবে। সেই থেকেই কবির ভাষায় রচিত হল – তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা। এটা ঘটনা – সপ্তর্ষী মণ্ডলের যে সপ্তম নক্ষত্র, তার উত্তর দিকে যে উজ্জ্বল তারাটি দেখা যায় সেটিই হলো আকাশের ধ্রুবতারা, তার অবস্থান কখনই পরিবর্তন হবে না। আমাদের হিন্দুদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন বছরের

বিভিন্ন সময়ে আকাশের সমস্ত তারার অবস্থান পাল্টে যায়, কিন্তু ঐ একটি তারা আছে যার অবস্থান কখনই পাল্টায় না। প্রাচীন কালে জাহাজের নাবিকরা সমুদ্রে ঐ তারাকে লক্ষ্য রেখেই তাদের গতিপথ ঠিক করত।

ভগবান ধ্রুবের ধর্মের একটা গতি করে দিলেন, সাথে সাথে তিনি তার অর্থকেও ঠিক করে দিচ্ছেন। বলছেন – তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও, তোমার বাবার এমন গোলমাল হবে যে রাজ্যের দায়ীত্ব ভারটা তোমার হাতেই সমর্পণ করতে বাধ্য হবেন। রাজা হওয়ার পর তুমি ছত্রিশ হাজার বছর পর্যন্ত রাজত্ব করবে। আর তোমার ইন্দ্রিয়গুলো কখনই শিথিল হবে না। ভগবানতো এই আশীর্বাদ দিয়ে দিলেন, কিন্তু ধ্রুবের বউ ছেলেদের কি হল তার কথা আর উল্লেখ নেই। ধ্রুব যদি ছত্রিশ হাজার বছর রাজত্ব করে, তার বউতো একশ বছর পর মরে যাবে। তার ছেলেগুলো আরো দেড়শো বছর পর মরে যাবে। তারপর তার নাতিরা মরে যাবে। মহাভারতে এক জায়গায় এক ঋষির বর্ণনা পাই যিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনি তো অনেক দিন বেঁচে আছেন, তা এই দীর্ঘায়ুতে আপনার অভিজ্ঞতার কথা একটু বলুন। তার উত্তরে সেই ঋষি বলছেন, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব চোখের সামনে মরে যায়, শত্রুর অভ্যুদয় আর প্রিয়জনের পতন এগুলো সব দেখতে হয়। এর রহস্য হল যে, মানুষ এই জগতে অনেক দিন বেঁচে থাকতে চায়। ধ্রুবকে দীর্ঘায়ু দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রতি ভক্তি জাগানো। ভগবানে ভক্তি করলে তোমার কাছে যেটা মূল্যবান মনে হয় সেটাও তুমি পেয়ে যাবে, ভগবানের দিকে মন আনার জন্যই এই ভাবে বলা হল।

ভগবান ধ্রুবকে নিজে থেকে বর দিয়েছেন, আর অন্য দিকে তাঁর ভক্তের মান রাখার জন্য কাহিনীও সেই দিকে অগ্রসর হয়েছে। ধ্রুবের ছোট ভাই উত্তম একদিন শিকারে গিয়ে কয়েকজন যক্ষের হাতে মারা গেছে। পুত্রের শোকে তার মা সুরুচি পাগল হয়ে গেল। উত্তানপাদ মনে মনে ভাবলেন আমার পুত্র ধ্রুবকে আমি অত মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছিলাম, সেই পাপেই আমার এত দুর্গতি। উত্তানপাদ ধ্রুবকে সিংহাসনে বসিয়ে জঙ্গলে তপস্যা করতে চলে গেলেন।

ধ্রুব অত তপস্যা করেছিলেন বলে তাঁর মন থেকে সমস্ত হিংসা দ্বেষ চলে গিয়েছিল। কিন্তু উত্তমের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর ধ্রুবর মনে অত্যন্ত ক্রোধের উৎপত্তি হল। একদিকে ভাইয়ের মৃত্যুজনিত তীব্র শোক অন্য দিকে তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহাতে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি ঐ যক্ষদের সবাইকে শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক নিরপরাধ যক্ষদেরও বধ করলেন। কিন্তু ধ্রুবের পিতৃপুরুষ স্বায়ম্ভু মনু এসে ধ্রুবকে আটকালেন, আর ধ্রুবকে বললেন 'তোমার ভাইকে মেরেছে বলে এতগুলো নিরীহ প্রাণীর জীবন হানি করতে যেও না, কারণ ভগবান নিজেই মানুষের আয়ুর বৃদ্ধি ও ক্ষয় করেন'। আসল ব্যাপার হলো, উত্তমের জীবন হয়তো খুবই স্বাভাবিক ছিল, কোন উচ্ছৃঙ্খলতা হয়তো ছিল না, কিন্তু মায়ের মনে এত পাপ আর এত হিংসা ও আসক্তি থাকার জন্য এই রকম কর্ম করেছে। মায়ের সেই পাপে তার ছেলের আয়ুটা ভগবান কমিয়ে দিয়েছেন, অন্য দিকে হয়তো পুষিয়ে দিয়েছেন। যদিও ভগবানই এই কাজগুলো করেন কিন্তু কোন কর্মই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সেইজন্য কোন প্রাণীর উপর দোষারোপ করা উচিৎ নয়।

এরপরে একটা শ্লোক আসে, যেটা বলার জন্যই আগে এতো কথা বলা হলো। *কেচিৎ কর্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ। একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে।।৪/১১/২২।* এই পরমাত্মাকেই মীমাংসকরা, মীমাংসকরা মানে কর্মকাণ্ডীরা কর্মস্বরূপ বলে, তাদের মতে জগতে ভগবান-টগবান বলে কিছু নেই যা আছে তা শুধু কর্মই আছে। ভালো কাজ কর, ভালো ফল পাবে, এটাই হলো মীমাংসকদের মত। চার্বাকরা, মানে জড়বাদীরা এটাকে বলে স্বভাব। স্বভাব মানে নিজে থেকেই হচ্ছে। গরম পড়া, ঠাণ্ডা পড়া, বৃষ্টি হওয়া, চার্বাকরা বলবে, গরমের সময় গরম হবে এতে কারুর কোন হাত নেই, মীমাংসকরা বলবে আকাশে এই সময় সূর্যের খুব তেজ বলে এতো গরম হয়েছে। আর বৈশেষিকরা, এদের মত হল সব কিছু কালের নিয়মে, মানে সময় হয়েছে তাই হচ্ছে, তাদের কাছে পরমাত্মা হল কাল। জ্যোতিষীরা এটাকেই বলে দৈব, কপালে ছিল তাই হয়েছে। যারা ভোগবাদী অর্থাৎ কামশাস্ত্রী, তারা এটাকেই বলে কাম। সেই পরমাত্মা, ভগবান, তাঁকে বিভিন্ন মতালম্বীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েই দেখে। এই কথা বলে স্বায়ম্ভু মনু বলছেন – যে যেভাবেই তাঁকে

বিশ্লেষণ করুক না কেন, কোন ইন্দ্রিয় অথবা প্রমাণের সাহায্যে এই পরমাত্মাকে জানা যায় না, তিনি এই জগতে কি করতে চান তাও কেউ জানে না। আসলে যিনি সকলের মূল কারণ তাঁকে তাঁর সৃষ্ট জীবেরা কি করেই বা জানবে! এই যক্ষরা তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী হতেই পারে না, কারণ মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ তো একমাত্র ঈশ্বর, তিনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। তুমি তোমার ক্রোধকে সংবরণ কর এবং আর নিরীহ প্রাণীর হত্যা করে তোমার পাপের বৃদ্ধি বন্ধ কর।

বেন রাজার কাহিনী

তারপর ধ্রুব রাজা হয়ে অনেক বছর রাজত্ব করার পর বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎকল পিতার রাজকার্য গ্রহণে ও রাজসম্পদে অনীহা প্রকাশ করলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রমি-পুত্র বৎসরকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। এইভাবে ধ্রুবের বংশধরেরা একের পর এক রাজত্ব করতে লাগলেন। এরমধ্যে এই বংশে বেন নামে এক অত্যন্ত দুর্বিনীত পুত্রের জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই বেন খুব অত্যাচারী ছিল, এমন নিষ্ঠুর ছিল যে যখন বেন কোন জঙ্গলে শিকারের জন্য যেত তখন বেনের আতঙ্কে সেখানকার লোকেরা সব পালিয়ে যেত। বেনের অত্যাচারের নানান ঘটনা শুনে ওর বাবা রাজা অঙ্গ সংসারের প্রতি বিরাগগ্রস্ত হয়ে সকলের অগোচরে সাম্রাজ্য ছেড়ে জঙ্গলে চলে গেলেন। রাজা হওয়ার আগে থেকেই প্রজারা বেনের দ্বারা অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়ে দিনের মধ্যে অনেক বার বেনের বাবা রাজা অঙ্গের কাছে অভিযোগ করতে আসত। আর এখন তো বেন রাজা হয়ে গেছে। রাজা হয়েই রাজ্যে সব যজ্ঞ যাগ বন্ধ করে দিল। সবাইকে বেন এই কথাই প্রচার করে দিল, শাস্ত্রে বলেছে রাজার মধ্যেই সব কিছু আছে সুতরাং আমার পূজা ছাড়া আর কিছু করতে হবে না। নিজেকে সর্ব বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে মহাপুরুষদেরও অপমান করতে লাগল।

ঋষি, মুনিরা এসে রাজা বেনকে অনেক বোঝালেন, এই ধরণের অন্যায় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ থেকে বিরত হওয়ার অনেক উপদেশ দিলেন *ধর্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃকায়বুদ্ধিভিঃ। লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যথানন্ত্যমসঙ্গিনাম্।।৪/১৪/১৫।* যদি শরীর, মন ও বাণী দিয়ে ধর্ম আচরণ না করা হয় তাহলে সব কিছুর নাশ হতে বেশি দেরী হবে না, শুধু তাই নয়, এতে আপনার নিজেরই শক্তির বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু এর বিপরীতে মানুষ শোকরহিত লোক প্রাপ্ত হয় এবং যে নিষ্কাম তাকে সেই ধর্ম মোক্ষ পর্যন্ত দিতে পারে। বেন ঋষিদের কথা কিছুই মানবে না, উপরন্তু সে ঋষিদের বলছে ‘এই যে যত দেবতা আছে, যাদের আশীর্বাদে মানুষ স্বর্গে চলে যায় আর যাদের অভিশাপে মানুষের নরকপ্রাপ্তি হয়, সেই সমস্ত দেবতাই রাজার শরীরে বিদ্যমান। আমার মধ্যেই সব দেবতা বিরাজ করছে, শুধু আমার জন্য কর্ম কর আর আমার পূজা কর’।

বেনের এই সব অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনে ঋষিরা খুব রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে তাঁরা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন। এতো ভালো বংশে, যে বংশে ধ্রুবের মত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিলে, সেই বংশে এই রকম পাপী কোথা থেকে কিভাবে এসে জন্ম নিয়েছে! এই ধরণের ঘটনা এখনও অনেক বংশে দেখা যায়। বাপ-ঠাকুর্দা বংশ পরম্পরায় বেদ উপনিষদ গীতা পাঠ করে এসেছেন, তারপর তাঁদের বংশে এমন এক সন্তানের জন্ম হল যে কিনা ঈশ্বর-ফীশ্বর কিছুই মানে না। যাই হোক ঋষিরা এমন হুঙ্কার দিলেন যে সেই হুঙ্কারে রাজা বেন মরেই গেল। এখন ঋষিদের হুঙ্কার বেন মরে গেল, না ব্রাহ্মণরা বেনকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিল, কে বলবে! তবে এটাই ভারতের প্রথম regicide, regicide মানে রাজাকে প্রজাদের তরফ থেকে মেরে ফেলা। ভারতে রাজাদের মেরে ফেলার প্রচুর ঘটনা আছে, এ রকমটি অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। এই দেশের মাটিতে মহাত্মা গান্ধীকে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে, ইন্দিরা গান্ধীকে বুলেট দিয়ে ঝাঁঝড়া করে দিয়েছিল, রাজীব গান্ধীর শরীর বোমাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এগুলো তো এই কয়েক দশকের ঘটনা। আর মুসলমানরা যখন রাজা ছিল তখনতো তারা পরের পর শুধু রাজাদের হত্যা করেই গেছে।

যাই হোক, বেন রাজা তো মরে গেল, এখন রাজত্ব চলবে কি করে! রাজ্যের যত চোর ডাকাত ছিল সবাই মিলে চারিদিকে লুঠ তরাজ শুরু করে দিয়েছে। ব্রাহ্মণরা দেখলেন রাজার যে মৃত শরীরটা পড়ে আছে, এই মৃত শরীরের মধ্যেই তো রাজশক্তি সুপ্ত রয়েছে। ব্রাহ্মণরা তখন তাঁদের যোগ শক্তিকে প্রয়োগ করে রাজার

ঊরুতে সবেগে মন্থন করতে শুরু করলেন। মন্থন করতে করতে রাজার ঊরু থেকে কাকের মত একটা কালো কুচকুচে, খর্বকায়, চোখ দুটো লাল, চুল তামার মত, নাক চ্যাপ্টাওয়ালা মানুষ বেরিয়ে এলো। *তং তু তেহবনতং দীনং কিং করোমিতি বাদিনম্। নিষীদেত্যব্রুবংস্তাত স নিষাদস্ততোহভবৎ।।৪/১৪/৪৫।* সেই খর্বাকৃত মানুষটা ভয়ে ভয়ে বলছে – *কিং করোমি*, আমি কি করব আদেশ করুন। ঋষিরা বলছেন – *নিষীদ* – মানে, চুপ করে বসো। তাকে প্রথমে 'নিষীদ' বলে সম্বোধন করা হয়েছিল, সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল নিষাদ। পরে এই নিষাদের বংশের লোকরাই আদিবাসী হয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করতে শুরু করে। এই নিষাদ জন্ম নেওয়ার সময়েই রাজা বেনের সমস্ত ভয়ংকর পাপের দায় নিজের উপর নিয়ে নিল। তার ফলে এই নিষাদ থেকে যে প্রজাতির সৃষ্টি হল তার সবাই হয়ে গেল নৈষাদ, আর এরা সব হিংসা, লুটপাট, পাপ কর্ম করে বলে এদের শহরে ঢুকতে দেওয়া হত না। সেই থেকে তারা সব সময় জঙ্গলে, পাহাড়ে বাস করতে থাকল। এটা আর কিছুই না, সাধারণ মানুষ যখন প্রশ্ন করে, জঙ্গলে আর পাহাড়ে যে সব উপজাতিরা বাস করে, এরা কিভাবে সৃষ্টি হল? এই প্রশ্নের একটা যুক্তি সম্মত উত্তর দিয়ে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসু মনকে শান্ত করার জন্য বলা হল রাজা বেন থেকে এরা বেরিয়েছে, রাজা পাপ কর্ম করত, এরাও তাই সেই রকম স্বভাবের হয়েছে। বাচ্চা ছেলে যেমন কৌতুহল বশতঃ বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করে কাক কালো কেন, পায়রা সাদা কেন। ঐটুকু বাচ্চাকে কি করে বোঝাবে! এইভাবেই কল্প কাহিনীগুলো তৈরী হয়। এখন ঋষিদের কোন গ্রামের অজ্ঞ লোকরা জিজ্ঞেস করেছে – আচ্ছা, ঐ পাহাড়ের উপর কালো কালো লোক দেখলাম, ওরা কোথা থেকে এসেছে, ওরা কেন এত হিংস্র, ভগবান থেকে এই রকম কি করে সৃষ্টি হল, ভগবান এই ধরণের হিংস্র মানুষ কেন বানালেন, নিশ্চয় কোন গণ্ডগোলের ব্যাপার আছে। তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এনারা এই সব কাহিনীর আশ্রয় করে বুঝিয়ে দিলেন। এটাই হচ্ছে পুরাণের মাহাত্ম্য, শুধু কতকগুলি কাল্পনিক কাহিনী না বলে সেই কাহিনীকে মাধ্যম করে আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষাটাও দিয়ে দিলেন।

পৃথু রাজার কাহিনী *(পৃথিবী থেকে সম্পদ আহরণের নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন, কৃষিকার্যে লাঙলের ব্যবহার শুরু)*

এখনতো বেন রাজার পাপগুলো বেরিয়ে গেলো। এবার তার পূণ্যগুলিও বার করতে হবে। ঋষিরা তাই রাজার দুটো হাতকে খুব করে মর্দন করতে আরম্ভ করলেন। মর্দন করার ফলে সেখান থেকে একজন স্ত্রী আর একজন পুরুষের জন্ম হল। একই শরীর থেকে নারী আর পুরুষের জন্মের এই ধারণা অনেক পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায় আর শুধু যে আমাদের দেশেই এই ধরণের কল্পনাকে আশ্রয় করে কাহিনী তৈরী হয়েছে তা নয়, হিন্দু ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় কাহিনীতেও এই ধারণা পাওয়া যাবে। এই কল্পনার উৎসটা কোথায় আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু একই শরীর থেকে নারী আর পুরুষের জন্মের ঘটনা প্রাচীনকালের অনেক কাহিনীতেই পাওয়া যায়, এখান থেকেই হয়তো মানুষের মধ্যে এই ধারণার জন্ম নিয়েছে যে নারী আর পুরুষে কোন ভেদ নেই। প্রথম যে নারীর সৃষ্টি হয়েছিল সেখানেও ব্রহ্মারই শরীর দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে নারী ও পুরুষের সৃষ্টি হয়েছিল। আবার এখানে বেন রাজার হাতটা ভেঙ্গে পুরুষ আর নারীর জন্ম হল। একটি কল্প কাহিনীতে আছে এক রাজকুমার ঠিক করে নিয়েছিল যে সে বিয়ে করবে না, কেননা মেয়েরা পুরুষদের বড্ড তাচ্ছিল্য করে। তখন সেই রাজকুমার বলছে – আমারই শরীরের হাড় দিয়ে যদি কোন নারীকে সৃষ্টি করা যায় তবেই আমি সেই নারীকে বিয়ে করব। সে এক লম্বা কাহিনী।

যাই হোক বেনের মৃত শরীরের একটি হাতকে মন্থন করে যে পুরুষের জন্ম হল তাঁর নাম দেওয়া হল পৃথু। ঋষিরা পৃথুর শরীরের কিছু চিহ্ন দেখে বুঝলেন ভগবান শ্রীহরির অংশ লোকরক্ষার নিমিত্তে পৃথু রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর অপর হাত মন্থন করে যে নারীর জন্ম হল তিনি অবশ্যই তাহলে ভগবান শ্রীহরির নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর অংশ হবেন। সেই নারীর নাম হল অর্চি। পৃথু এখন রাজা হয়ে ধীরে ধীরে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে আগে বেন রাজার সময় যত গণ্ডগোল হয়েছিল তার সমস্ত পাপ, তার সাথে সাথে পৃথিবীতে জনসংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল, সব মিলিয়ে যার ফলে পৃথিবীর উপর অত্যাধিক চাপ বেড়ে গেল। এই চাপ বৃদ্ধির দরুণ পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তিও কমে

গেল, যার ফলস্বরূপ পৃথিবী অন্নহীন হয়ে গেল, চারিদিকে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সমস্ত প্রাণীকুল কোন খাবার-দাবার না পেয়ে অনাহারে মরতে শুরু করেছে। শেষে নিরুপায় হয়ে রাজ্যের সব প্রজারা গিয়ে রাজা পৃথুর কাছে বলছে – আমরা খেতে পাচ্ছি না, আপনি আমাদের বাঁচান। ভাগবতে এর খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে *বয়ং রাজঞ্জাঠরেণাভিতপ্তা যথাগ্নিনা কোটরস্থেন বৃক্ষাঃ। ত্বামদ্য যাতাঃ শরণং শরণ্যং যঃ সাধিতো বৃত্তিকরঃ পতির্নঃ।।৪/১৭/১০।* পৃথিবীতে কোন গাছপালা নেই, অন্ন নেই, আর যে ভাবে গাছের ফোকরে আগুন লাগলে গাছটা আস্তে আস্তে জ্বলে শেষ হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে আমাদের ফোকরে, মানে পেটে খিদের আগুন লেগে গেছে, সেই আগুনে আমরাও জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। আমরা আপনার শরণাপন্ন, কারণ আপনি শরণাগতের রক্ষাকর্তা এবং আমাদের জীবন-ধারণের উপায় নির্ধানকারী অন্নদাতা, আপনি আমাদের বাঁচান।

প্রজাদের এই করুণ ক্রন্দন শুনে মহারাজ পৃথু দীর্ঘক্ষণ এই বিষয়ে চিন্তা করে অবশেষে এই অন্নাভাবের কারণ বুঝতে পারলেন। নিজের বুদ্ধিবলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, পৃথিবীই সমস্ত রকমের অন্ন ও ওষধির বীজ সমূহকে নিজের ভেতরে গ্রাস করে রেখেছে। তখন তিনি মহাক্রুদ্ধ হয়ে একটা ধনুক ওঠালেন আর তাতে একটা মহাশক্তিশালী তীরের সন্ধান করলেন আর বললেন 'আমি পৃথিবীকে উদ্দেশ্য করে এই তীর নিক্ষেপ করে পৃথিবীকে শেষ করে দেব'। পৃথুকে এইভাবে তীর সন্ধান করতে দেখে পৃথিবী ভয়ে একটা গরুর রূপ ধারণ করে কম্পিত কলেবরে পালাতে লাগল। পৃথিবী দিকবিদিক শূন্য হয়ে স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ যেখানেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথুও তার পিছু ধাওয়া করে সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে। ত্রিভুবনের কোথাও পৃথিবী বেনপুত্র পৃথুর থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় না পেয়ে ত্রস্ত ও দুঃখিত হয়ে পালাবার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হল। একটা জায়গায় স্থিত হয়ে পৃথিবী তখন মহারাজ পৃথুকে বলছে – আপনি সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা, আপনি শরণাবৎসল, আমি অত্যন্ত দীন এবং নিরাপরাধ, তাও আপনি আমাকে কেন বধ করতে চাইছেন? আমি একেই স্ত্রীলোক, তারপর আমি এখন একটা গরু, আপনি ধর্মজ্ঞ পুরুষ হয়ে কেন অবলা স্ত্রী এবং গরুকে বধ করতে চাইছেন? পৃথু বলছে 'এটা তোমার একটা ছলনা, তার থেকেও বড় কথা তুমি আমার শাসন উল্লঙ্ঘন করেছ। তুমি যারই রূপ ধরো না কেন, আমি তোমাকে মারবই'।

পৃথিবী তখন রাজাকে বলছে 'হে রাজন্! আমি এখন গরু হয়ে আমার যা কিছু আছে সব আমার এই গাভীর শরীরে লুকিয়ে রেখেছি, এখন কেউ যদি বাছুর হয়ে আমায় দোহন করে তাহলে আমি যা কিছু লুকিয়ে রেখেছি সব বেরিয়ে আসবে'। পৃথু তখন মনুকে আহ্বাণ করে বলল 'আপনি বাছুর হয়ে এর সব কিছু বার করে নিয়ে আনুন'। মনু তখন পৃথিবীলোকের যা যা দরকার সেই সব কিছু দোহন করতে শুরু করলেন। সেখান থেকের মানুষ আর যত প্রাণীর যা যা দরকার সব বেরোতে শুরু করল। ঋষিরা বৃহস্পতিকে বাছুর বানালেন। তিনি বেদরুপী পবিত্র দুগ্ধ, মানে পৃথিবীর যে দুধ, সেখান থেকে বেদকে বার করে আনলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে বাছুর বানালো, ইন্দ্র অমৃত, বীর্য, ওজস ও শরীরের বল ও শক্তিকে পৃথিবী থেকে বার করে আনলেন। দৈত্য আর দানবরা প্রহ্লাদকে বাছুর বানাল, প্রহ্লাদ লোহার পাত্রে মদ, তালের রস বার করে রাখল। গন্ধর্বরা সঙ্গীতাদি বার করে আনল। কপিল মুনি অণিমাদি সিদ্ধিগুলো পৃথিবী থেকে বার করে আনলেন। এই রকম আরো অনেকে অনেক কিছু বার করে আনল। এই কাহিনীর মধ্যে একটা যে খুব উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক দিক, তা হল আমাদের জীবনচর্চা আর জীবনধারণের জন্য আমরা যা কিছু পাই তার সব কিছুই আসছে এই পৃথিবীলোক থেকে। পৃথিবী থেকে বিভিন্ন প্রাণীরা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো কিভাবে উৎপন্ন করে নিতে পারে, সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হল Paleolithic age to Neolithic age এ কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথমে মানুষ বনচর হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াত, যা পেত তাই খেত। যখন জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করল, পৃথিবী আর যোগান দিতে পারছিল না, তখন মানুষের মনে প্রথম এলো চাষবাস করার চিন্তা। পৃথুই হলেন প্রথম যিনি পৃথিবীতে চাষবাসের সূচনা করেছিলেন। চাষের কাজে যে লাঙল ব্যবহার করা হয় সেই লাঙল আর ধনুক দেখতে অনেকটা একই রকম। তাই এই কাহিনী থেকে একটা ধারণা করা যায় যে, লাঙলের ব্যবহার

পৃথুই সম্ভবত প্রথম প্রচলন করে কৃষিকার্যে একটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পৃথু এত বড় ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন যে তিনি তার যেটুকু সম্পদ ও ক্ষমতা ছিল সেটাকে কাজে লাগিয়ে আরো বেশি করে মানবজাতির দৈনন্দিন জীবন ধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে যোগান দিতে শুরু করেছিলেন। তারপরে বাকিরা, ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অসুররাও পৃথুর নতুন কার্যধারা ও পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে নিজের নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো বার করতে লাগলেন।

প্রচেতা ও রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী

মৈত্রেয় ঋষিকে বিদুর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর তার উত্তরে মৈত্রেয় একের পর এক কাহিনী বলে যাচ্ছেন। পৃথুর বংশেই এক সময় প্রচেতারা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পৃথুর বংশে এক রাজা ছিলেন যার নাম ছিল প্রাচীনবর্হি। সমুদ্রের কন্যা শতদ্রুতির সাথে প্রাচীনবর্হির বিবাহ হয়। শতদ্রুতির রূপের এত ঐশ্বর্য আর দৈবী গুণ ছিল যে যার ফলে দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর সবাই ওর বশে এসে গিয়েছিল। একাধারে দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর সবাইকে বশ করার ফলে সেই নারীও খুব ক্ষমতার অধিকারিণী হয়ে গিয়েছিল। এই প্রাচীনবর্হি থেকে শতদ্রুতির গর্ভে দশটি পুত্র সন্তানের জন্ম হল – যাদের নাম হল প্রচেতা। কেন প্রচেতা নাম হল, এখানে অবশ্য তা বলা নেই, হয়তো অন্য কোন পুরাণে বর্ণনা করা হবে। পুরাণের কাজই তাই, হঠাৎ কেউ একটা প্রশ্ন করল, এটা কেন হল? তার উত্তর দিতে গিয়ে একটা কাহিনী দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেইজন্য পুরাণে কাহিনীর শেষ নেই। পুরাণ পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে যায়। পুরাণের এটাই বৈশিষ্ট্য, কাহিনী যত খুশী বাড়িয়ে যাওয়ার পুরো স্বাধীনতা দেওয়া আছে। বিভিন্ন পুরাণে এই প্রচেতাদের নিয়ে যে কত কাহিনী আছে মনে রাখাই মুশকিল। মহাভারতেও প্রচেতাদের অনেক কাহিনী পাওয়া যাবে।

যাই হোক, প্রচেতারা দশ জনই খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ওনারা বলেই দিলেন আমাদের দ্বারা সংসার ধর্ম পালন করা যাবে না, আমরা তপস্যায় চললাম। দশজন প্রচেতা ঠিকই করে নিয়েছিলেন আমরা সবাই এক সঙ্গে থাকব, কখনই আমরা আলাদা হবো না। তারপর দশজনেই একসাথে সমুদ্রের তলায় ঘোর তপস্যায় ডুবে গেলেন। তপস্যা শেষ করার পর ওনাদের ওপর আদেশ হল তোমাদের এবার গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে হবে। তপস্যা থেকে প্রচেতারা ফেরত আসছেন সেই সময় পথে মনোরম এক সরোবরের কাছে শিবের সাথে দেখা হল। শিব তাঁদের দেখেই বললেন 'হ্যাঁ, আমি তোমাদের সবাইকে জানি, তোমরা রাজা প্রাচীনবর্হির পুত্র। তোমাদের সবার কল্যাণ হোক। তোমরা ভগবদ্ভক্ত, এই কারণে তোমরা আমার কাছে ভগবানের মতই প্রিয়'। প্রচেতারা শিবকে মনের খেদ নিয়ে বলছেন 'আমাদের ওপর আদেশ হয়েছে গৃহস্থ ধর্ম পালন করার জন্য, কিন্তু কি করে আমরা সংসার ধর্ম পালন করি'? শিব তখন তাঁদের একটা বিরাট লম্বা পবিত্র, মঙ্গলময় ও মোক্ষদায়ক স্তুতি শোনালেন, এই স্তুতির নাম 'যোগাদেশ'। 'যোগাদেশ' পঁয়ত্রিশটা শ্লোক নিয়ে একটা স্তব। শিব বলছেন *তে বয়ং নোদিতাঃ সর্বে প্রজাসর্গে প্রজেশ্বরাঃ। অনেন ধ্বস্ততমসঃ সিসৃক্ষ্মো বিবিধাঃ প্রজাঃ।।৪/২৪/৭৩।* 'ব্রহ্মা যখন প্রজাপতিদের আদেশ করে বললেন তোমরা সৃষ্টি বাড়াও, প্রজা বৃদ্ধি কর, তখন প্রজাপতিরা এই স্তবের সাহায্য নিয়ে সৃষ্টি কার্য করতে লাগলেন, তাই এই স্তব এমনই যে যদি তোমরা এই স্তব পাঠ কর তবে তোমাদের সংসার-কার্য করতে আর কোন কষ্ট হবে না'।

প্রচেতাগণরাও এই স্তব পাঠ করে সংসার ধর্ম করতে লাগলেন। সেই থেকে এই স্তবের মহিমা হয়ে গেল যে, এই স্তব পাঠ যে করবে তার সন্তানাদি হবে, টাকা হবে, শ্রী হবে, সম্পদ হবে ইত্যাদি। কি হয় আমাদের জানা নেই, তবে পুরাণের সব স্তবের সেই একই বক্তব্য, সেই নারায়ণের কথাই বলবে – হে প্রভু তোমার থেকেই সব সৃষ্টি, তুমিই একমাত্র আছ। নতুন যে কিছু বলা হচ্ছে তা নয় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাব নিয়ে বলছেন। কিন্তু যে জিনিষটা আমাদের জানা দরকার তা হল এই সমস্ত মন্ত্র সব সিদ্ধপুরুষদের অনুভূতি লব্ধ। আর সিদ্ধপুরুষদের মন্ত্র মানেই যখন ভক্তিভাবে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে আবৃত্তি করা হবে তখন কিন্তু মন্ত্রের যে ক্রিয়াশক্তি আছে সেটা কাজ করবেই করবে।

এখানেই আবার রাজা পুরঞ্জনের এক বিচিত্র কাহিনী আসে। মহাভারতেও এই পুরঞ্জনের কাহিনী আছে। খুব অদ্ভুত ও মজার গল্প। যদিও মহাভারতের কাহিনী ভাগবতের কাহিনী থেকে একটু অন্য রকমের। পুরাকালে পুরঞ্জন নামে এক রাজা ছিল। কোন এক কারণে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুরঞ্জনকে নারীর শরীর প্রাপ্ত হতে হয়েছিল। নারী হয়ে যাওয়াতে এক বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। এখন সে কোন মুখে তার রাজ্যে ফেরত যাবে। ইতিমধ্যে অন্য এক প্রভাবশালী রাজা এই নারীকে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। তার আবার ছেলে মেয়ে হয়েছে। সে এক বিরাট জটিল কাহিনী জট পাকিয়েই আছে। পরে ইন্দ্র এর নিষ্ঠা দেখে পুরঞ্জনকে বলছেন – তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আমি তোমাকে নারী বানিয়েছিলাম, এখন তুমি ইচ্ছে করলে আবার পুরুষ শরীর নিয়ে নিতে পার। তখন পুরঞ্জন বলছে – আমি নারী হয়ে সুখ ভোগ করে যে তৃপ্তি পেয়েছি, পুরুষ শরীরে আমি কখন এই তৃপ্তি পাইনি, আমাকে নারীই থাকতে দিন।

এটাকেই ভাগবতে আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লম্বা কাহিনী বলে বলে একটা জায়গায় এসে বলছেন – এই যে বিরাট লম্বা কাহিনী বলা হল, এর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। পুরঞ্জন মানে যিনি একটা শহর নির্মাণ করেন – পুর + অঞ্জন। নগরীর নির্মাণ কে করেন? জীবাত্মা। এই জীবাত্মা এই দেহের সৃষ্টি করেন। কিরকম দেহের সৃষ্টি করেন – যখন যেরকম দরকার হবে, কখনো এক পা, কখনো দুই পা, কখনো তিন, কখনো চার কিংবা পাঁচ পা, যখন যেমন দরকার সেই রকম শরীর ধারণ করেন। কিন্তু এই জীবাত্মা দুই পা-ওয়ালা জীব হতে বেশি পছন্দ করে। এর একজন সব সময়ের জন্য বন্ধু আছে যার নাম অবিজ্ঞাত, সে হল ঈশ্বর। এইভাবে পুরঞ্জনের যে পুরো গল্পটা বলা হল এর তাৎপর্যটা একটা অধ্যায় জুড়ে বলছে। সহজ কথায় বললে এর অর্থ হচ্ছে – পুরঞ্জন মানে জীব, জীব নিজে কামনা করে বলে এই শরীর তৈরী করে। যেমন যেমন তার কামনা হবে সেই কামনা চরিতার্থ করার উপযোগী শরীর তৈরী করে নেবে। এখানে যেটা মূল তাৎপর্য, তা হলো – পুরাণকাররা যখনই কোন কাহিনী তৈরী করেন তখন তাঁরা কয়েকটা নির্দিষ্ট নীতি ও নিয়মকে ধরে কাহিনীকে সাজিয়ে দেন। সেই কাহিনী এত বিরাট আর এত জমাট বাঁধা যে পড়তে আরম্ভ করলে মনে হবে যেন দৌড়াচ্ছে, আর তার ফলে এই কাহিনীর মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক সত্যকে সামনে নিয়ে আসতে চাইছেন, সেটাই হারিয়ে যায়। তবে কোথাও কোথাও গিয়ে এর আসল তত্ত্বটাকে এনারা ব্যাখ্যা করে দেন। যেমন পুরঞ্জনের এই কাহিনীতে জীবাত্মা আর ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য মানবীয় শরীরের প্রতিটি অঙ্গের কি কি কাজ তার সুন্দর বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন।

যাই হোক প্রচেতারা শিবের উপদেশ শিরোধার্য করে সমুদ্র মধ্যে অবস্থান করে 'যোগাদেশ' অর্থাৎ নারায়ণ স্তুতি জপ করতে করতে তপস্যা করতে শুরু করলেন। এই ভাবে দশ সহস্র বৎসর তপস্যান্তে পুরাণ পুরুষ ভগবান নারায়ণ প্রচেতাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সৌম্যমূর্তিতে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। এরপর মারিষা নামের এক কন্যা তাঁদের দেওয়া হল। দশ প্রচেতারা সবাই মারিষাকেই বিয়ে করলেন, আর সেখান থেকে নতুন প্রজা সৃষ্টি হতে শুরু করল। এই যে নতুন প্রজার সৃষ্টি হল এরা বৈদিক কর্মকাণ্ডে খুব দক্ষ ছিল। সেইজন্য এদের নাম হল দক্ষ। তখন প্রজাপতির আসনে এই দক্ষকে অভিষিক্ত করা হল, আর তাকে প্রজা সৃষ্টির সব দায়ভার অর্পণ করলেন। মহাদেব যে দক্ষকে মেরেছিলেন, সেই পরে মনু হয়ে জন্ম নিয়েছিল, সেই মনুই পরে দক্ষ হয়ে আবার প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন। প্রথম যে দক্ষ হয়েছিলে সে খুব সাধারণ ছিল। কিন্তু পরের মন্বন্তরে তখন সে মনু হয়ে প্রজাপতি রূপে সৃষ্টির কার্য করতে লাগলেন – এ খুব জটিল ব্যাপার।

এর পর প্রচেতারা ভগবানের নির্দেশে দিব্য দশ লক্ষ বছর ধরে রাজ্য ভোগ করার পর তাঁদের বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হওয়াতে পত্নী মারিষার দায়ীত্ব পুত্রদের উপর অর্পণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সমুদ্রতটে আত্মবিচারের দ্বারা পরমতত্ত্ব লাভের জন্য তপস্যায় রত হলেন। একদিন প্রচেতাদের তপস্যা স্থলে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হয়ে বলছেন *তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ। নৃণাং যেনেহ বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ।।৪/৩১/৯।* ইহলোকে যে মানুষ জন্ম, কর্ম, বাণী, মন এগুলি দিয়ে সর্বান্তরাত্মা সর্বেশ্বর শ্রীহরির সেবা করে সেই মানুষই ঠিক ঠিক সফল, আর বাকি সব কিছু বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। *কিং জন্মভি স্ত্রিভির্বেহ*

শৌক্লসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ। কর্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা।।৪/৩১/১০। যদি নিজ স্বরূপজ্ঞানের প্রদাতা শ্রীহরিকে লাভ করা না যায় তাহলে এই শ্রেষ্ঠ ত্রিবিধ জন্মের অর্থাৎ মাতা-পিতার থেকে পবিত্র দৈহিক জন্ম, উপবীত সংস্কার দ্বারা লব্ধ পবিত্র সাবিত্র জন্ম এবং যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার পর যাজ্ঞিক জন্মে কি লাভ! অর্থাৎ নারদ বলতে চাইছেন, যারা জন্ম গ্রহণ করেছে, যাদের উপনয়ন হয়েছে এবং যজ্ঞে দীক্ষিতও হয়েছে অথচ কর্ম দিয়ে, দীর্ঘায়ু দিয়ে, শাস্ত্র জ্ঞান দিয়ে, তপস্যা দিয়ে, বাণীর চাতুর্যতা দিয়ে, মেধাশক্তি দিয়ে, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে, বেদ অধ্যয়ণ করে, ব্রত করে এত কিছু করেও মানুষ যদি আত্মজ্ঞানের সাধনা না করে তাহলে এই সব কিছুই পণ্ডশ্রম মাত্র। শঙ্করাচার্য এক জায়গায় বলছেন – *শরীরং সুরূপং সদারোগমুক্তং* – শরীর খুব ভালো, রোগমুক্ত সুস্থ শরীর, টাকা পয়সা সব আছে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি মন নেই, তাহলে এগুলো থেকে লাভ কি হলো, বলছেন *ততঃ কিম্ ততঃ কিম্*, সবই নষ্ট। নারদ সেইজন্য বলছেন ‘হে প্রচেতাগণ! মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে হরির প্রতি কিভাবে মন লাগানো যায়, এই চিন্তা করা। হরিতে যদি মন না লাগানো যায়, তাহলে সব কিছু থেকেও এই মনুষ্য জন্ম বৃথা হয়ে যাবে’।

পঞ্চম স্কন্ধ

ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ শুরু করার আগে আমাদের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এই স্কন্ধে প্রিয়ব্রত ও জড় ভরতের কাহিনী আসবে। এ ছাড়াও কাহিনীর মাধ্যমে আমরা সেই সময়কার কিছু ভৌগলিক চিত্রের বর্ণনা পাই। এখানে একটা কথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে, যেটা এর আগেও অনেকবার বলা হয়েছে, পুরাণ আর বেদের মূল তত্ত্বে কোন পরিবর্তন নেই। এখন ঋষিরা গাছের তলায় বসে আছেন, তাঁদের কেউ এসে প্রশ্ন করছেন ‘আচ্ছা চন্দ্রমা দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কেন’? তখন ঋষিরা এর কি উত্তর দেবেন, তখনতো জ্যোতির্বিজ্ঞান অত উন্নত ছিল না। অথচ মজার ব্যাপার তখনকার দিনে আমাদের ঋষিদের তিথি নক্ষত্রের গণনা এত সঠিক ছিল যে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়, কোথাও কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। ইদানিং বিজ্ঞানীরা চান্দ্র ক্যালেণ্ডার কিংবা সৌর ক্যালেণ্ডারের যে গণনা Atomic Clock দিয়ে নির্ধারণ করেন তার সাথে ঋষিদের গণনার বিশেষ কোন তারতম্য পাওয়া যায় না। সূর্য একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আছে, ঠিক যতদিন পর সূর্য ঐ জায়গায় আবার আসবে সেটাই একটি বছর। কিন্তু আমাদের এখন যে mathematical division আছে তার সঙ্গে আবার এই হিসাবটা কোন ভাবেই মেলে না। সবচেয়ে কাছের যেটা মিল হয় সেটা হল ৩৬৫ দিনে এক বছরে। তার আগে আমাদের দিন ও রাতকেও মেলাতে হবে। এই ৩৬৫ দিনকে আবার একটা হিসাবের মাধ্যমে সপ্তাহে, মাসে আনতে হবে। কিন্তু আমাদের ঋষিরা জানতেন যদি এটাকে মিনিটেও নিয়ে যাওয়া হয় তাহলেও মিলবে না। তাঁরা দেখলেন শুধু মিনিটে কেন সেকেণ্ডকে ধরলেও মিলবে না। তাই তারা পল, ক্ষণ ইত্যাদি করে করে একেবারে ঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে মিলিয়েছেন। এখন যে Atomic Clockএর হিসেব দিয়ে যে জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা ঠিক আমাদের ঋষিরা যে জায়গাতে নিয়ে গিয়েছিলেন মোটামুটি প্রায় একই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবার অন্য দিকে অনেকে লুনার ক্যালেণ্ডার অনুসরণ করে। চাঁদ যে বিন্দুতে এখন আছে, ঠিক ঐ বিন্দুতে যখন আবার আসবে, সেটাই হবে lunar one year. লুনার ক্যালেণ্ডারের অসুবিধা হচ্ছে – এই হিসাবে লুনারের এক বছর হয় ৩৬০ দিনে আর সৌর বৎসর হল ৩৬৫ দিন, এই দুই ক্যালেণ্ডারের হিসাব তাই কিছুতেই মিলবে না। এগুলোকে মেলাবার জন্য আমাদের ঋষিরা অনেক চিন্তা ভাবনা করেছিলেন।

বাচ্চা ছেলে বাবাকে যদি এইসব নিয়ে জিজ্ঞেস করে তখন বাবা বলে দেবে – বাবা! তুমি আরেকটু বড় হয়ে নাও তখন সব বুঝতে পারবে। কিন্তু ঋষিদের কাছে যারা প্রশ্ন করত তারাতো আর বাচ্চা ছিল না, তাদেরকে তো আর বলা যাবে না যে বাবা তোমরা একটু বড় হও তখন বুঝবে। তাই ঋষিরা সহজ করে বোঝাবার জন্য একটা আখ্যায়িকাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। যাঁরা পুরাণ লিখেছিলেন তাঁরা ভারতবর্ষের বাইরে যান নি। ওনারা জানতেন ভারতবর্ষের চারিদিকে সমুদ্র আছে, কিন্তু সমুদ্রের পরে কি আছে? অথবা যখন পশ্চিম দিকে যাচ্ছেন তখন তাঁরা দেখছেন যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই শুধু বিস্তির্ণ জমি, তার পরে

কি আছে? তার খবর তাঁদের কাছে অত পরিষ্কার ভাবে জানা ছিল না। এনাদের সপ্তদ্বীপের সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল। সাতটা দ্বীপ, প্রত্যেকটা দ্বীপই আলাদা আলাদা আর এই সাতটা দ্বীপ সাতটা সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে আজকে যে মহাদেশগুলির কথা আমরা বলি তার সাথে এনাদের এই সপ্তদ্বীপের কল্পনার সাথে অনেক মিল পাওয়া যায়। একটা ব্যাপারে আমাদের খুব সজাগ থাকতে হবে যে, পুরাণে ইতিহাস, ভৌগলিক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে বর্তমানকে মেলাতে গেলে আমাদের কিন্তু খুব মুশকিলে পড়তে হবে। তাই পুরাণের এই ধরণের বর্ণনাগুলোকে বর্তমান ধারণার সঙ্গে মেলান উচিত নয়। ওনাদের কাছে যেসব প্রশ্ন করা হতো, সেই সময়ের তাঁদের যে জাগতিক জ্ঞানের পরিধি ছিল সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তাঁরা সেই সব প্রশ্নের একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিতেন। এখনতো এনারা বলে দিলেন সাতটা দ্বীপ আছে আর সেই দ্বীপগুলিকে সাতটা সমুদ্র ঘিরে রেখেছে। কিন্তু যখন তাঁদের কাছে প্রশ্ন আসে এই সাতটা দ্বীপ কেন এল, সাতটা সমুদ্রই বা কেন এল আর সাতটা সমুদ্র কেমন – এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা যে কাহিনীর সাহায্য নিয়ে এলেন তার মধ্যে প্রিয়ব্রত চরিত্র পাচ্ছি। এর আগে আমরা যেমন দেখলাম পৃথুর কাহিনী।

প্রিয়ব্রত চরিত্র *(জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ, প্রিয়ব্রতকে সপ্তর্ষি ঋষির উপদেশ, চিৎ ও জড়ের গ্রন্থি, কেল্লা থেকে কামরিপু আদি ছয় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই)*

প্রিয়ব্রত একজন খুব নামকরা রাজা ছিলেন। সম্রাট হয়েও তিনি ছিলেন পুরোপুরি আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন পুরুষ। ধার্মিকতা আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আধ্যাত্মিকতা হল, যিনি শরীর, মন, প্রাণ, আত্মা পুরোপুরি ঈশ্বরকে দিয়ে দিয়েছেন, ঈশ্বর বই তিনি আর কিছু জানেন না। তার খাওয়া পড়া কোন কিছুর দিকেই মন নেই, এক ঈশ্বরেই শুধু মনটা পড়ে আছে। ঋষিরা এই ধরণের ছিলেন। ধার্মিকতা মানে, যারা বিভিন্ন আচার, উপাচার, নিয়ম পালন করে চলেছে – এত জপ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, এতবার প্রণাম করতে হবে, এত দান করতে হবে – যারা এই সব করে যাচ্ছে তারা শুধু ধার্মিক ব্যাক্তি।

আমাদের নিশ্চই মনে আছে রাজা পরীক্ষিৎকে শুকদেব ভাগবত কথা শোনাচ্ছেন। রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করছেন 'হে মুনিবর! শুনেছি রাজা প্রিয়ব্রত একজন একনিষ্ঠ জ্ঞানী ভক্ত ছিলেন – *প্রিয়ব্রতো ভাগবত আত্মারামঃ কথং মুনে। গৃহেহরমত যন্মূলঃ কর্মবন্ধঃ পরাভবঃ।।৫/১/১।* তিনি ছিলেন আত্মারাম, আত্মা ছাড়া আর কিছু জানেন না, আর সর্বদা আত্মচিন্তনে ডুবে থাকেন – মানে আমাদের ভাষায় বলতে গেলে সন্ন্যাসী। রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করছেন – ওখান থেকে তাঁর কি এমন হল যে, যে সংসারে আসক্ত হলে মানুষ নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তিনি কীভাবে সেই গৃহস্থাশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হলেন? যিনি সর্বকর্ম ত্যাগ করে দিয়েছিলেন তিনি আবার কর্ম বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। যিনি সর্বদা আত্মচিন্তনে থাকতেন সেখান থেকে সরে এসে কর্মমার্গে নেমে গেলেন। পথতো মাত্র দুটি – প্রথমটি জ্ঞানমার্গ, যেখানে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই বা আত্মা ছাড়া কিছু নেই, একই জিনিষ। যিনি জ্ঞানমার্গের তিনি কর্ম থেকে বিরতি নিয়ে নেন। দ্বিতীয়টি কর্মমার্গ, যাঁরা এত উচ্চ অধিকারী নন তাঁরা মধ্যম শ্রেণী, মধ্যম শ্রেণীরা বলে আমিতো অত দূর চিন্তা করতে পারছি না, তাই আমি গৃহস্থ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মে থেকে শাস্ত্রে যে রকম কর্ম করতে বলা হয়েছে সেইভাবে কর্ম করে যাব, আর যা কিছু কর্ম করব তার সব ফল সব ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে দেব। যা কিছু কর্ম করা হবে সব ঈশ্বরের নামে করা হবে, বিয়ে করলাম ঈশ্বরের নামে, সন্তানাদি হল ঈশ্বরের নামে, তাদের প্রতিপালন ঈশ্বরের নামে, চাকরি করব ঈশ্বরের নামে। কিন্তু সমস্যা হল এই ভাবটাই পরে এসে এমন জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে শুরু করল, ডাকাতি করব ঈশ্বরের নামে, গলা কাটব ঈশ্বরের নামে, চুরি করব ঈশ্বরের নামে – যা কিছু আছে সব ঈশ্বরের নামে করব। চুরি, ডাকাতি সব করে তার ফলটাও ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিচ্ছে – মানে শঠতা কোন্ পর্যায়ে চলে গেছে! শাস্ত্র কোথাও বলে না যে তুমি ঈশ্বরের নামে চুরি করে, ডাকাতি করে তার সব ফল ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করে দেবে। যাই হোক চুরি করাটাও যদি ঈশ্বরের নামে করে, পরে হয়তো মন পাল্টালেও পাল্টে যেতে পারে।

জ্ঞান আর কর্মের সমন্বয় আমাদের দীর্ঘকালের এক সমস্যা। জ্ঞান আর কর্ম এই দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত, কখনই এক সঙ্গে চলে না। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতা ও উপনিষদের ভাষ্যে জ্ঞান আর কর্মের সমন্বয়ের যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন। শুধু সমালোচনা করেই থেমে যাননি, তিনি তাঁর প্রখর যুক্তি দিয়ে সর্বকালের জন্য মীমাংসা করে দিয়ে গেছেন যে জ্ঞান আর কর্ম কখনই এক সঙ্গে চলে না। এটাই পরীক্ষিৎএর প্রশ্ন ছিল – যিনি জ্ঞানী বা জ্ঞান মার্গে ছিলেন, মানে খুব উচ্চ মার্গের সন্ন্যাসী, তিনি হঠাৎ তাঁর পথ পাল্টে নিলেন, পথ পাল্টে নিয়ে হয়ে গেলেন গৃহস্থ। আর যিনি নিত্য অনিত্য বিচার করে করে শুধুমাত্র আত্মচিন্তনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের উচ্চ অবস্থায় আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন, সেখান থেকে হঠৎ পিছু হটে গিয়ে তিনি কর্মমার্গের পথ নিতে গেলেন কেন?

এই কাহিনীগুলো আমাদের পরম্পরাতে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। পরেও আবার এই ধরণের কাহিনী আসবে যেখানে অজামিলের কথা বর্ণনা পাবো। অজামিলের কাহিনী খুব নামকরা কাহিনী, কথামৃতেও অজামিলের নাম উল্লেখ আছে। প্রথম জীবনে অজামীল খুব পাপী ছিল কিন্তু মৃত্যুর সময় নিজের ছেলের নাম নারায়ণ বলে ডেকেছিল বলে তাতেই তার মুক্তি হয়ে গিয়েছিল। সেই অজামিলের কাহিনীতেও বলা হচ্ছে এটা পুরাণ কথা, অর্থাৎ যাঁরা লিখছেন এটা তাঁদের সময়কার কথা নয়, তাঁদেরও বহু আগেকার ঘটনা কিন্তু পরম্পরায় চলে আসছে। প্রিয়ব্রতের কাহিনীও ঠিক এই রকম বহু আগেরকার ঘটনা। রাজা পরীক্ষিৎ কখনও হয়ত শুনেছিলেন যে প্রিয়ব্রত নামে এক খুব নামকরা রাজা ছিলেন আর তিনি উচ্চকোটির একজন সাধক ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বিয়েথা করে সংসার ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে কর্মাদি করতে শুরু করেছিলেন। এই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। এখন শুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রিয়ব্রতের কাহিনীটা বলছেন।

প্রিয়ব্রত ছিলেন মনুর পুত্র, সম্পর্কে ব্রহ্মার নাতি। প্রিয়ব্রত ব্রহ্মসত্র দীক্ষা নিয়েছিলেন। ব্রহ্মসত্র দীক্ষা কিছুটা সন্ন্যাসের মত। যে ব্রহ্মসত্র দীক্ষা নিয়ে নেয় সে বলে আমি শুধু ব্রহ্মের চিন্তনই করব, বিয়ে থা করব না, গৃহস্থ ধর্ম পালন করব না, একমাত্র ব্রহ্মচিন্তনে নিজেকে ডুবিয়ে রাখব। তখনকার দিনে সন্ন্যাস তত প্রচল ছিল না, সন্ন্যাসের বদলে এর নাম ছিল ব্রহ্মসত্র দীক্ষা। প্রিয়ব্রত যখন ব্রহ্মসত্র দীক্ষা নিতে যাবেন তার আগে তিনি তাঁর শরীর, মন, ইন্দ্রিয় সব সংযম করে সমস্ত চিত্তটা ভগবান বাসুদেবে সর্মপিত করে দিয়েছেন। আর সমাধিযোগে তিনি নিজেকে ভেতরে টেনে নেবেন, অর্থাৎ এর পরেই তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে যাবে। ঠিক সেই মুহুর্তে তাঁর পিতা স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে আদেশ করে বললেন 'ওসব নির্বিকল্প সমাধ-টমাধি লাভের সঙ্কল্প ত্যাগ করো, তোমার এরকম করলে চলবে না, তোমাকে রাজ্যপালন করার জন্য বিয়েথা করে সংসার ধর্ম পালন করতে হবে'। মনু কেন এই রকম আদেশ করলেন প্রিয়ব্রতকে? ব্রহ্মা যখন আদেশ পেলেন তাঁকে সৃষ্টির কাজ করতে হবে, তখন তিনি প্রথমে তাঁর মন থেকে সব সৃষ্টি করতে থাকলেন। কিন্তু এতে সৃষ্টি খুব মন্থর গতিতে এগোচ্ছিল। ব্রহ্মা দেখলেন এভাবে তো সৃষ্টি এগোচ্ছেই না। তখন তিনি নিজের শরীরকে পুরুষ আর নারীতে বিভাজন করে দিলেন। তারপর ব্রহ্মা প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলেন আর দ্বিতীয় পর্যায়ের যত সৃষ্টির দায়ীত্ব প্রজাপতিদের দিয়ে বলে দিলেন 'তোমরা সংসার ধর্মে প্রবেশ করে তাড়াতাড়ি প্রজার বৃদ্ধি কর। পৃথিবীতে জনসংখ্যা নেই, জনসংখ্যার বৃদ্ধি করতে হবে'। মনুও তাই প্রিয়ব্রতকে এই কথা বললেন, সংসারে লোকজনের অভাব, তাই ব্রহ্মার আদেশানুসারে তোমরা সকলে বিয়েথা করে এত প্রজার সৃষ্টি করতে থাক যাতে পৃথিবী প্রজাসমূহে ভরে যেতে পারে। প্রিয়ব্রত দেখলেন পিতার এই আদেশের ফলে আমি তো সংসারের মহাজালে ফেঁসে যাবো।

প্রিয়ব্রত ভাবলেন একদিকে পিতার আদেশ আর অন্য দিকে সেই আদেশ পালন করতে গিয়ে স্ত্রী পুত্র এই সংসার প্রপঞ্চে আমার মন নেমে যাবে, আমি পরমার্থ তত্ত্ব থেকে সরে যাব, ঈশ্বরকে ভুলে যাব। বেলুড় মঠের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী মঠের অল্প বয়সী সন্ন্যাসীদের একবার খুব একটা দামী কথা বলেছিলেন 'পুরানাদিতে দেখবে কোন মুনি বা ঋষি কোন সুন্দরী নারীকে দেখে মাথা ঘুরে গেল আর সেখান থেকে তার পতন হয়ে গেল। তা তোমাদের কি মনে হয়, ঋষি মুনিদের সত্যিই কি এভাবে পতন হতে পারে'? প্রবীন

মহারাজ তখন নিজেই এর উত্তর দিচ্ছেন 'এরকম কখনই হয় না, যাঁরা খুব উচ্চ ঋষি মুনি এই ধরণের পতন তাঁদের কখনই হয় না। আধ্যাত্মিকতার একটা উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে গেলে এই ধরণের পতনের কোন সম্ভবনাই আর থাকে না। তবে পুরাণাদি সাধারণ মানুষদের জন্য লেখা। সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার জন্য এই ধরণের কথা বা কাহিনীকে আনা হয়। আর এটা বলার জন্য যে তোমার পূর্বজরা তো উল্টে পড়ে গিয়েছিল আর সেখানে তুমি কোন ছাড়, হাতি ঘোড়া গেলে তল, মশা বলে কত জল। তা তোমরা হচ্ছ মশা, আর হাতি ঘোড়া যে তলিয়ে গেলে তা নয়, একটা আখ্যায়িকার মাধ্যমে তোমাকে সাবধাণ করে দেওয়া হল, তুমি বাপু নিজেকে বেশি সাহসী ভেবে বসো না'।

প্রিয়ব্রত, যিনি ব্রহ্মার নাতি, যিনি নির্বিকল্প সমাধি ছুঁইছুঁই অবস্থায়, তিনি স্ত্রী পুত্রে জড়িয়ে গিয়ে তলিয়ে যাবেন কল্পানাই করা যায় না। এঁদের মত পুরুষরাই যদি ফেঁসে যায় তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে, আমরাতো তাহলে কোথাও দাঁড়াতেই পারব না। সাবধাণ করার জন্যই এই কথা বলা হচ্ছে, প্রিয়ব্রতেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আমাদের মত লোকেদের কি অবস্থা হতে পারে তা কল্পনাই করা যাবে না।

আমরা রাজা বলতে প্রায়ই যেটা ভুল করি যে রাজা মানেই ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবে থাকবে। কিন্তু রাজাদেরও সেই সময় অনেক দায়ীত্ব পালন করতে হয়। মনুস্মৃতিতে বর্ণনা আছে রাজাকে কত রকম দায়ীত্ব পালন করতে হয়, যাকে রাজধর্ম বলা হয়। আবুল ফজল তার লেখা বাদশা আকবরের জীবন-চরিত্রে বলছেন আকবর দিনে রাতে ঘুমোতেনই না। রাতে আটটা নয়টা নাগাদ আর ভোরের দিকে এক ঘন্টার জন্য ঘুমোতেন। ব্যাস্, এই দু ঘন্টা ঘুম আর বাকি সময় রাজকার্য করতেন। আবার সারা রাত মোল্লা, পাদরী, আর অন্যান্য ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করতেন। এই করে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি এত বড় তত্ত্বজ্ঞ হয়েছিলেন যে পণ্ডিতরা পর্যন্ত তাঁর সামনে আসতে ভয় পেত। একটা ঘটনা আছে। একজন খুব বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। আকবরের খুব ইচ্ছে হলে তাঁর সঙ্গে ধর্ম জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু পণ্ডিত বললেন 'আপনি মুসলমান, বিধর্মী, আপনার বাড়িতে আমি ঢুকবোই না'। এখন কি করা যায়, আকবর আবার রাত্রিতেই কথা বলবেন দিনের বেলায় কথা বলবেন না। আকবরের বাড়িতে ছাদের ওপরে একটা কপিকল তৈরী করা হল। আর আকবরের বাড়ির বাইরে পণ্ডিত মশাই একটা খাটিয়ার উপরে বসলেন। কপিকলের সাথে খাটিয়ার চারটে পায়ায় দড়ি বেঁধে খাটিয়া শুদ্ধু পণ্ডিত মশাইকে ছাদের ওপরে তোলা হল। ছাদের উপর নামান হলো না, খাটিয়া আকাশে ঝুলছে আর আকবর ছাদে আরাম কেদারায় বসে আছেন। ঐ অবস্থায় ওদের মধ্যে সারা রাত ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হত। রাজারা যে শুধু ভোগের মধ্যেই থাকতেন তা নয়। এনারা নিজেদের ঐ অবস্থার মধ্যেও ঋষিদের মত থাকতেন।

এখন ব্রহ্মা, যিনি ঈশ্বরের পরেই প্রথম সৃষ্ট, তাঁর একটাই চিন্তা, সংসার কিভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই যে জগৎ প্রপঞ্চ, এর মধ্যে কে মুক্তি পেল কি পেলো না ঐ ব্যাপার নিয়ে তাঁর কোন মাথা ব্যাথা নেই, তাঁর এক চিন্তা সৃষ্টিটা এগোচ্ছে কিনা। তাঁকে সৃষ্টির দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে কিনা। যখন দেখলেন প্রিয়ব্রতের সংসারের দিকে কিছুতেই মন যাচ্ছে না তখন তিনি বেদ আর সপ্তর্ষী মণ্ডলের সাত জন ঋষিদের সবাইকে নিয়ে নেমে এলেন শুধু প্রিয়ব্রতকে বোঝাবার জন্য – আরে তুমি এত বড় আধার, তোমার এই আধার থেকে যদি তুমি সৃষ্টি না কর তাহলে গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। ঋষিরাও এসে বোঝাচ্ছেন – 'আমাদের বেদে সবই আছে, প্রবৃত্তিমার্গ যেমন আছে নিবৃত্তিমার্গও আছে। আমরা আছি, ব্রহ্মা আছেন, তুমি আছ, আমরা সবাই ঈশ্বরের অধীন। প্রভু যে রকমটি চাইছেন আমরা সেই রকম পুতুলের মত নেচে যাচ্ছি, তিনি যেমন যেমন আদেশ করছেন আমরা সেইভাবেই পুতুলের মত সব কিছু করে চলেছি। তাঁর বিধানকে তপস্যা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, যোগ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, টাকা পয়সা দিয়ে, ধর্ম দিয়ে বা অন্য কোন ভাবে কেউই পাল্টাতে পারে না'।

আমরা যে প্রায়ই বলি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এই ভাবটা এসেছে পুরাণ থেকে। পা পিছলে পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙে গেলে বলব ঈশ্বরের ইচ্ছা। লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ নিতে গিয়ে আমার পা গেলো ভেঙে, এখন আমি বলছি – ঈশ্বরের ইচ্ছায় লটারীর একটা বড় পুরস্কার পেয়ে আমার খুব ভালো হল। আর পরের মুহূর্তে

ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা পা গেল ভেঙে। তাহলে বলতে হয় এই ঈশ্বরেরতো মাথা খারাপ। আমরা যেভাবে ঠাকুরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলি এটা পৌরাণিক ভাবধারা থেকে এসেছে, এই ধরণের চিন্তা বা ধারণার কথা আমরা উপনিষদে পাই না। উপনিষদে ঈশ্বরই নেই তাঁর আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কোথা থেকে আসবে!

এরপর তাঁরা প্রিয়ব্রতকে বলছেন *ন তস্য কশ্চিত্তপসা বিদ্যয়া বা ন যোগবীর্যেণ মনীষয়া বা। নৈবার্থধর্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ।।৫/১/১২।* তিনি যে শরীরটা দিয়েছেন, সে মানুষের শরীরই হোক, কি গাধার শরীরই হোক, এই শরীরের দ্বারা, তপস্যা, বিদ্যা, যোগবল কিংবা বুদ্ধিবল দ্বারা অথবা ধর্ম বা অর্থের জোরে একাকী কিংবা অপরের সাহায্যে ভগবান শ্রীহরির বিধানকে কেউ অন্যথা করতে পারে না। মানুষ সহ সব প্রাণীকে জন্ম, মৃত্যু, মোহ, শোক, ভয়, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করার জন্য অব্যক্ত ঈশ্বর প্রদত্ত শরীর ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ সেই ঈশ্বর তাঁর দুটি রূপ – চৈতন্য রূপ আর জড় রূপ। এই দুটো তিনিই হয়েছেন। আর তিনি এমন জড়িয়ে যান, যে জড় আর চৈতন্য দিয়ে এই শরীর তৈয়ার হয়েছে তিনি সেই শরীরকে নিজের শরীর বলে মনে করছেন। চৈতন্য ও জড় মিশে তৈরী হয় চিজ্জড়গ্রন্থি। এই চিজ্জড়গ্রন্থির জন্যই যত খেলা চলছে। এই টেবিল, বই, পাখা সব জড় আর আপনি আমি সবাই চিজ্জড় – চৈতন্য আর জড় মিশে রয়েছে। টেবিল, বই, পাখাতেও চৈতন্য আছে, কিন্তু এত সুক্ষ্ম অবস্থায় যে ধরা যায় না। ঠিক তেমনি যারা আরো উচ্চস্তরের জীব যেমন ইন্দ্রাদি দেবতাদের মধ্যে যে জড় পদার্থ নেই তা নয়, তাদের মধ্যেও জড় পদার্থ আছে, কিন্তু খুব অল্প মাত্রায় বিদ্যমান। আমাদের সকলের উদ্দেশ্য হল এই চিৎকে জড় থেকে পুরোপুরি আলাদা করে দেওয়া। বলছেন – চিৎ আর জড় এই দুটো তিনিই করেছেন, শুধু যে তিনি করেছেন তা নয়, তিনিই এই দুটো হয়েছেন, আর এই যে বোধ আমি আলাদা আপনি আলাদা, এই বোধটাও তিনিই দিয়ে রেখেছেন, এবং এই দুটো তাঁর ইচ্ছাতেই চলে। কেন তিনি এই আলাদা বোধ দিয়ে রেখেছেন, এর উত্তর জানা যাবে না। কিন্তু চিৎ আর জড় এই দুটো কে আলাদা করা যায়, এই দুটোকে আলাদা করাটাই আমাদের সবার সাধনা।

বলছেন – ভগবান আমাদের যে যোনীতে জন্ম দিয়েছেন সেখান থেকেই আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। সেজন্যে তুমি এগুলো নিয়ে বেশি ভেবো না, তুমি এখন মানুষ যোনিতে আছ, এখন তোমার কাজ প্রজা বৃদ্ধি করা, সেই দায়ীত্ব থেকে তোমার সরে আসা অনুচিত। বলছেন – মন আর পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই ছয় শত্রুকে পরাজিত না করতে পারার জন্য জীব এদেরকেই অনুসরণ করতে থাকে। আর যিনি বুদ্ধিমান তিনি এই ছয় শত্রুকে দমন করে আত্মাতেই রমণ করেন, তখন সংসার জীবনও তাঁর কোন অনিষ্ট করতে পারে না। বলছেন, *যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো গৃহেষু নির্বিশ্য যতেত পূর্বম্। অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জিতারীন্ ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ।।৫/১/১৮।* যারা এই ছয় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, তাদের কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভালো। দুর্গের মধ্যে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে প্রবল পরাক্রম শত্রুকেও পরাজিত করতে পারা যায়। যখন শত্রু হীনবল ও দুর্বল হয়ে যায় তখন বিদ্বান ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে বিচরণ করতে পারেন। ঠাকুরও বলছেন সংসারে থেকে সাধন ভজন করা মানে কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা, আর সন্ন্যাসী যেন খোলা ময়দানে যুদ্ধ করা। কিন্তু আগে কেল্লায় বসে যুদ্ধ করা অভ্যাস করতে হয়, তারপর দরকার হলে খোলা ময়দানে লড়তে হবে। এও ভাগবতেরই উপমা – গৃহস্থ যেন কেল্লায় বসে যুদ্ধ করা। বলতে চাইছেন, যতক্ষণ শত্রু দুর্বল আর ক্ষীণ না হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ কেল্লায় বসেই যুদ্ধ করতে হবে, কেল্লার বাইরে আসতে নেই। তোমার শত্রু কোন গুলো? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এই সব শত্রু, আর এই শত্রুগুলো যখন তোমার ক্ষীণ হয়ে যাবে তখন বেরিয়ে আসবে, তখন তুমি সন্ন্যাস নিতে পারো। এখন তুমি কেন বাইরে আসতে চাইছ, এখন তোমার শত্রুরা বলবান, তুমি বেরিয়ে এলেই তোমাকে শেষ করে দেবে। তার আগে তাই ঈশ্বরের শ্রীচরণের বন্দনা করে, তাঁর চিন্তন করে নিজেকে শক্তিমান রূপে তৈরী কর। শক্তিমান হওয়ার পর তুমি বাইরে এসে যুদ্ধ করার কথা ভাবতে পারো।

যাই হোক, ব্রহ্মা বলছেন, ব্রহ্মার সাথে এত বড় বড় ঋষিরাও প্রিয়ব্রতকে বোঝাচ্ছেন, তাই এখন আর উপায় নেই, এত গুণী বিদ্বান লোকেরা উপদেশ দিচ্ছেন, কি আর করবেন। বিয়ের পর বেশির ভাগ ছেলেরা

এসে কাঁদে আর বলে আমার জীবনতো সর্বনাশ হয়ে গেল বিয়ে করে। তা বিয়ে করলি কেন? কি করব! বাবা মা বলল তাই করতে হল। সারা জীবন বাবা মার কোন কথা শোনেনি, পড়াশুনোর ব্যাপারে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোন কথা শুনবে না, একমাত্র বিয়ে করার সময় বাবা মার আজ্ঞাবহ হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে শুর শুর করে বসে পড়বে, আর বলবে বাবা মা বিয়ে দিল বলে বিয়ে করলাম। প্রিয়ব্রতেরও ঠিক একই অবস্থা। ঋষিরা যখন বলছেন বিয়ে করে নাও, তখন প্রিয়ব্রত বলছেন – আচ্ছা আপনারা যখন বলছেন আমি তাহলে বিয়েটা করেই নিই। কিন্তু প্রিয়ব্রত সাধারণ লোক ছিলেন না। তিনি বিয়ে করলেন, প্রজা বৃদ্ধিও করলেন। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হল, এই পৃথিবীতে অর্দ্ধেক সময় সূর্য থাকে আর অর্দ্ধেক সময় অন্ধকার থাকে, এরকম কেন হবে! আমাদের একটা পৌরাণিক বিশ্বাস যে সুমেরু পর্বত বলে এক পর্বত আছে, সূর্য এই সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে। যখন সুমেরুর পর্বতের সামনে থাকে তখন পৃথিবীত দিন হয় আর পর্বতের পেছনে চলে গেলে পৃথিবীতে রাতের অন্ধকার নেমে আসে। এতে প্রিয়ব্রত খুব রেগে গেলেন, না এভাবে তো চলতে পারে না, আমি চব্বিশ ঘন্টাই দিন করে দেব। উনি খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, সূর্যের উপরে রেগে গিয়ে রথ নিয়ে সূর্যের পেছনে তাড়া করেছেন।

এই ধরণের কাহিনী গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতেও পাওয়া যায়। সূর্য তাঁর সাতটি ঘোড়ায় টানা রথ নিয়ে প্রতিদিন পরিক্রমাতে আকাশে বেরিয়ে যান। একদিন তাঁর এক ছেলে বলল আমাকে একটা দিনের জন্য পরিক্রমা করার সুযোগ দিন। সেই ছেলে যেমনি রথের লাগাম টেনেছে ঘোড়াগুলো বুঝে গেল আরে এতো এক আনাড়ি লোক। তখন ঘোড়াগুলো তাকে নিয়ে অন্য দিকে দৌড়াল – এও অনেক বিরাট লম্বা কাহিনী।

প্রিয়ব্রত ঠিক করলেন আমি চব্বিশ ঘন্টাই দিন করে দেব। তিনিও একটা রথ নিয়ে সূর্যকে ধাওয়া করলেন। খুব শক্তিশালী রথ, যেমনি রথ মাটির উপর দিয়ে চলতে শুরু করেছে চাকার চাপে পৃথিবীর বুকে বিরাট বিরাট গর্ত সৃষ্টি হতে লাগল। এই করে তিনি পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে দিলেন। পৃথিবী সম্বন্ধে পুরাণের ঋষিদের যে কি কল্পনা ছিল সেটা আমাদের কাছে এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। আর আদপে তাঁরা পৃথিবীকে গোলাকার মনে করতেন কিনা, সেটাও বলা যাবে না। গ্রীকরা যেমন পৃথিবীকে চ্যাপ্টা গোলাকার মনে করত, এনারাও হয়তো ঐ রকম কিছু মনে করতেন। যাই হোক, প্রিয়ব্রত যখন ওই রথ নিয়ে পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে দিলেন তখন সেই রথের চাকার চাপে যে সাতটি গর্তের সৃষ্টি হল, সেখান থেকে সাতটি সমুদ্র তৈরী হয়ে গেল। যেহেতু চাকার চাপে এক দিকের মাটি ধসে গিয়ে গর্ত হয়েছিলে তার ফলে এক দিকে সমুদ্র আর অন্য দিকে সমুদ্রকে ঘিরে সাতটা দ্বীপের সৃষ্টি হল।

এই সাতটা দ্বীপের প্রথম দ্বীপের নাম জম্বু দ্বীপ, আমাদের ভারতবর্ষ এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। আর এর চারদিকে নোনা জলের সমুদ্র। তারপর হচ্ছে প্লক্ষ দ্বীপ এর চারিদিকে আখের রসের সমুদ্র। তৃতীয় দ্বীপের নাম শাল্মীল, এর চারিদিকে মদের সমুদ্র। চতুর্থ কুশদ্বীপ, এর চারিদিকে ঘিয়ের সমুদ্র। পঞ্চম দ্বীপের নাম ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, এর চারিদিকে দুধের সমুদ্র। ষষ্ঠ দ্বীপ শাকদ্বীপ, এই দ্বীপের সমুদ্র ঘোলের। শেষে সপ্তম দ্বীপের নাম পুস্কর দ্বীপ, এর চারিদিকে যে সমুদ্র তার জল মিষ্টি। এগুলো পুরোপুরি কাল্পনিক, খুব একটা আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। হিন্দুদের পুরাণ শাস্ত্রে এই সাতটা দ্বীপ আর সমুদ্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই পৃথিবীতে কি আছে? সাতটা দ্বীপ আর সাতটা সমুদ্র। এরা কিভাবে এলো, এই নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এনারা এই ভাবে কাহিনীর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন। এর মধ্যেই একটা শিক্ষা দিয়ে দিলেন যে একজন রাজা, তার মন ছিল ঈশ্বরের দিকে, সেখান থেকে তাকে কিভাবে প্রবৃত্তি মার্গে নিয়ে আনা হল, আর ঈশ্বরে মন ছিল বলে তার এত শক্তি, শক্তিমান হতে গেলে ঈশ্বর চিন্তন করতে হয়।

এরপর প্রিয়ব্রত নানান রকমের ভোগ চিন্তন করার পর তার আবার মনে পড়ল – আরে আমি কত পবিত্র শুদ্ধ জীবন যাপন করছিলাম, আমার জীবন ছিল বৈরাগ্যপূর্ণ। হায়! আমার ইন্দ্রিয় সমূহ অবিদ্যাজনিত বিষয়রূপ অন্ধকূপে আমাকে নিক্ষেপ করেছে! অনেক হয়েছে, আর নয়। যেই তাঁর পূর্ব কথা মনে পড়ে গেল,

তিনি আবার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে এবার নারদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে চিরদিনের জন্য নেমে পড়লেন ঈশ্বর চিন্তনে।

শুকদেব পরীক্ষিৎকে এই কাহিনী বলে বলছেন *তস্য হ বা এতে শ্লোকাঃ, প্রিয়ব্রতকৃতং কর্ম কো নু কুর্যাদ্বিনেশ্বরম্। যো নেমিনিম্নৈরকরোচ্ছায়াং ঘ্নন্ সপ্ত বারিধীন্।।৫/১/৩৯।* হে পরীক্ষিৎ! পরম্পরাতে মহারাজ প্রিয়ব্রতের মহিমা বর্ণনা করে এই রকম কিছু প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে, যেখানে বলছেন – মহারাজ প্রিয়ব্রত যে কাজ করলেন, এই যে সাত সমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ সৃষ্টি করলেন, এই কাজ ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কারোর পক্ষে করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির কাজ একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন, তিনি ছাড়া আর কেউই করতে পারে না। সেইজন্য বিজ্ঞান, কারিগর, শিল্প, সাহিত্যে যে খুব অভ্যুদয় হয় তা ঈশ্বরীয় শক্তি ছাড়া কখনই সম্ভব হয় না। খুব উচ্চমানের সাহিত্য, শিল্পের যে রচনা হয় তখনও তা ঈশ্বরীয় শক্তিতেই হয়। সাধারণ মানুষ যে কবিতা বা সাহিত্য রচনা করে, সেই সব রচনা লোকে কয়েক দিন পড়বে তারপর ভুলে যাবে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কত হাজার হাজার সাহিত্য রচিত হয়েছে তারমধ্যে কটি উপন্যাস বা কাব্যগ্রন্থ মানুষ মনে রেখেছে! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র যে সব সাহিত্য রচনা করে গেছেন সেগুলির মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তি আছে বলে এখনো সাধারণ মানুষ তার কদর করে যাচ্ছে। আর আমাদের যদি বলা হয় ১৯৫০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে কয়েকটি কালজয়ী রচনার নামে করতে, আমরা খুঁজেই পাবো না। এই সময়ে সেই রকম কালজয়ী সাহিত্য বলতে গেলে আসেইনি। বাংলার যে উপন্যাস সেটা যখন বাংলার বাইরে যাবে তখনইতো লোকে জানতে পারবে। এখন কন্নর ভাষায় কজন নামকরা উপন্যাস আছেন আমরা কেউই জানিনা। কেননা তাদের সৃজনী শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসছে না। তাহলে তারা যে লিখছেন সেই শক্তি কোথা থেকে আসছে? আমাদের যে ইন্দ্রিয় ভোগের দিকে পড়ে আছে, সেই ইন্দ্রিয় থেকে আসছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বলেই পৃথিবীর সাহিত্য পিপাসু মানুষ তাঁর নাম জানেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে যে নান্দনিক সৃজনশীলতা, যার জন্য তিনি বিশ্বের বহু দেশের মানুষের কাছেই পরিচিত। যাঁর মধ্যে যত বেশি ঈশ্বরীয় শক্তি থাকবে তাঁর মধ্যে তত বেশি সৃজনী প্রতিভা থাকবে। কালিদাসের নাম আমরা সবাই জানি, কিন্তু আমাদের মধ্যে সংস্কৃতের অনার্সের ছাত্র ছাড়া কজন কালিদাসের রচনা পড়েছে? কেউই পড়েনি কিন্তু কালিদাসের নাম সবাই জানেন। এটাই হল ঈশ্বরীয় শক্তি, সাধনা দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে দাঁড় করিয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণ কজন পড়েছে সারা ভারতে! কিন্তু সমগ্র ভারতবাসী বাল্মীকির নামে জানে। শুকদেব এইটাই বলছেন – প্রিয়ব্রত যে কাজটা করলেন, এই কাজ ঈশ্বর ছাড়া কেউ করতে পারবে না। প্রিয়ব্রতের এমন ক্ষমতা ও পারদর্শিতা ছিল যে তিনি চাইলেই যে কোন লোকের অধীশ্বর হতে পারতেন, সে স্বর্গই হোক কি পাতালই হোক। কিন্তু তিনি ঐদিকেই গেলেন না, সব ছেড়ে তিনি ঈশ্বরে সমস্ত মন অর্পণ করে দিলেন। এই হল প্রিয়ব্রত চরিত্রের কাহিনী।

এখানে যেমন প্রিয়ব্রতের কাহিনী বলা হল, ঠিক এই রকম আরো কয়েকজন রাজাকে নিয়ে কিছু কাহিনী বলা হয়েছে, যেমন আগ্নীধ্রের চরিত্র, তারপর নাভি বলে এক রাজা ছিলেন তাঁর চরিত্রের কথা, রাজা ঋষভদেবের কাহিনী, এছাড়াও কয়েকজন ঋষির কথাও পঞ্চম স্কন্ধে বলা হয়েছে। ভারতের প্রাচীন কাল থেকে এই কাহিনীগুলো পরম্পরায় চলে আসছে।

জড় ভরতের কাহিনী

রাজা ঋষভদেবের সন্তান ছিলেন রাজা ভরত। ভারতের পুরাণ ইতিহাসের কাহিনী গুলিতে আমরা দুজন ভরত রাজার নাম পাই, একজন হলেন ঋষভদেবের পুত্র ভরত, আরেকজন হলেন শকুন্তলার পুত্র ভরত। এই দুই ভরতকে নিয়ে আমাদের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব ও সংশয় আছে। অনেকে বলেন আমাদের দেশ ভারতবর্ষ নাম হয়েছে ঋষবদেবের সন্তান ভরতের নামে। কিন্তু অনেক পরম্পরায় বলা হয় শকুন্তলার পুত্র ভরতের নামেই আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে।

ভারতবর্ষ যে একটি অভিন্ন রাষ্ট্র এই ধারণাটা আমাদের পুরাণেই এসে গিয়েছিল। পুরাণেই উল্লেখ আছে যে জম্বুদ্বীপের পুরোটাই ভারতবর্ষ। বিদেশী সাহেবরা বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণা ঢুকিয়ে অনেক সমস্যা তৈরী করে গেছে। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবিদের একাংশও বিদেশীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলেন বিদেশীরা যা বলে গেছে সেটাই ঠিক আর আমাদের মুনি ঋষিরা অতীতে যা বলেছেন তার সবটাই উদ্ভট মস্তিষ্ক প্রসূত। সাতশ বছর আগে শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে জনক রাজাকে 'সম্রাট জনক' বলে সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ জনক শুধু যে রাজা ছিলেন তাই নয়, তাঁকে সম্রাটও বলা হত। সম্রাট মানে কি? সম্রাট মানে পুরো ভারতবর্ষের রাজা। আমাদের এখনকার কিছু ইতিহাসবিদদের ধারণা সম্রাট অশোকের আগে ভারতবর্ষকে একটি অভিন্ন রাষ্ট্র বলে গণ্য করা হত না, আবার অনেকের মত হল ঔরঙ্গজেব বা ইংরেজদের আগে ভারতবর্ষের কোন অভিন্ন রাষ্ট্রের ধারণাই ছিল না। এটিও একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আমাদের পুরাণ, বেদ, উপনিষদাদিতে যদি স্বচ্ছ দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই একটি অভিন্ন রাষ্ট্র ছিল। কিছু বুদ্ধিজীবিদের কাজই হল বিদেশ থেকে আমদানী করা আদর্শকে মূলধন করে ভারতের সম্বন্ধে উল্টোপাল্টা কথা বলে যাওয়া। ভারতের কোন শাস্ত্র এরা পড়েও দেখে না, যদিও বা পড়ে শুধু শাস্ত্রের নেতিবাচক দিকটাই তাদের নজরে পড়ে। ঠাকুর বলেছেন কাক বড় সেয়ানা, কিন্তু পরের বিষ্ঠা খেয়ে মরে। প্রথমেই এরা বলবে India as a Nation নাকি কোন দিনই ছিল না। আমাদের শুদ্ধ, পবিত্র, স্বার্থশূন্য সর্বত্যাগী ঋষিরা, যাঁরা তাঁদের সমগ্র জীবন মানবজাতির মঙ্গলার্থে তপস্যা আর সাধনায় উৎসর্গ করে দিলেন, তাঁরা কিনা আবোল তাবোল, উদ্ভট সব কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন! আর যাঁদের জীবনটাই ভোগসর্বস্ব তাঁরা নাকি সব খাঁটি কথা বলে গেছেন! অভিন্ন ভারতের ধারণা শুধু যে শাস্ত্রের এক জায়গাতেই উল্লেখ করা হয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন শাস্ত্রে অনেকবার অনেক ভাবে বলা হয়েছে। ভরত যে দেশের সম্রাট ছিলেন সে দেশের নাম ভারতবর্ষ, যার সীমানা আসমুদ্রহিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বুদ্ধিজীবিদের বক্তব্য এগুলো নাকি সব গালগপ্পো। সম্রাট অশোক বার্মা থেকে আফগানিস্থান আর এদিকে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত একটা দেশ একা শাসন করে গেলেন, এটাও তাহলে ধাপ্পা? আবার বলে ইংরেজরা না আসা পর্যন্ত নাকি ভারতের কথা কেউ জানতই না ভারতবর্ষ কাকে বলে।

যাই হোক, আমরা ভাগবতের কথায় ফিরে আসি। ঋষভদেবের ছেলে ভরত রাজা হয়ে বহুদিন যাবৎ খুব দক্ষতার সাথে রাজত্ব করার পর বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি নিজের সন্তানদের উপর সব কিছু দায়ীত্বভার অর্পণ করে হরিহর ক্ষেত্রে গিয়ে গণ্ডকী নদীর তীরে নিজেকে তপস্যার মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। পাটনার কাছে শোনপুর বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে হরিহর ক্ষেত্র অবস্থিত। ওখানে এখনও বিরাট বড় মেলা হয়। এর পাশ দিয়ে নেপাল থেকে বয়ে আসা গণ্ডকী নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমরা পুরাণে এক জায়গায় পাব একটা হাতিকে কুমির ধরে নিয়েছিল। সেই সময় হাতি ভগবান নারায়ণের স্তব করেছিল, তাতে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর চক্র দিয়ে কুমিরের গলাটা কেটে হাতিকে রক্ষা করেছিলেন। সেই থেকে গ্রাহ মুক্তির জন্য এই স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে। মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে তখন হরিহর ক্ষেত্রে গেলে সেটা নাকি কেটে যায়। গ্রহ থেকে গ্রাহ মুক্তি। ভরত এই গণ্ডকী নদীর তীরে হরিহর ক্ষেত্রে নিজেকে তপস্যায় লাগিয়ে দিলেন।

সংক্ষেপে কাহিনী হল, রাজা ভরত রাজ্যভার পুত্রদের উপর অর্পণ করে হরিহর ক্ষেত্রে তপস্যা করছেন। স্থানটা এমন একটা নির্জনতায় মোড়া যেন মনে হবে জগতের বাইরে কোথাও বসে আছি। ঐ রকম জায়গায় ভরত হঠাৎ একদিন দেখতে পেলেন একটা বাঘ একটা হরিণকে তাড়া করেছে। হরিণটা ছিল গর্ভবতী। বাঘের তাড়া খেয়ে হরিণ লাফ দিয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু লাফ দেবার সময় তার প্রসব হয়ে যায়, আর বাচ্চা হরিণকে জন্ম দিয়েই হরিণটা মারা যায়। ভরতের দৃষ্টি থেকে এই ঘটনা এড়াইনি। ভরত কাছে গিয়ে মাতৃহারা অসহায় হরিণের বাচ্চাটাকে তুলে আশ্রমে নিয়ে এসেছেন।

ভরত এখন নির্জন গভীর জঙ্গলে সন্ন্যাস জীবন-যাপন করছেন। কিন্তু ওই অবস্থাতেও তিনি কোন রকমে যেখান থেকে যা পেরেছেন জোগাড় করে তাই দিয়ে হরিণ শিশুটিকে খুব যত্ন করে বাঁচালেন। যিনি

নিজের সুখ, সমৃদ্ধি, সাম্রাজ্য, স্ত্রী সন্তান পরিবার সব কিছুর মায়ার বন্ধনকে ছিঁড়ে ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসেছেন সেই সর্বত্যাগীর ভেতরে যত ভালোবাসা মায়া মমতার সংস্কার জমা ছিল সব একত্র হয়ে এখন এই হরিণ শাবকের উপর উপচে পড়ল। বেলুড় মঠের এক বরিষ্ঠ মহারাজ প্রায়ই বলতেন, সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে বা যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই দয়া থেকে মায়া জন্মায়। কোন সন্ন্যাসী নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে দিব্যি আছেন হঠাৎ হয়তো কাউকে দেখলেন সে খুব কষ্টে আছে। এই কষ্ট দেখা থেকে সন্ন্যাসীর মধ্যে দয়ার জন্ম হল, করুণা হল। তারপর একটার পর একটা হতে হতে তার ওপর মায়া জন্মে যাবে। তখন তাঁর মনে হবে সে যেন আমারই থাকে, সে যেন আর কোন দিকে না যায়, আমি না দেখলে ওকে কে দেখবে! এইভাবে দয়া থেকে মায়া এসে পড়ে। মানুষ যে বন্ধনে পড়ে তার সবচেয়ে বড় কারণ এই দয়া। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যার অর্থ হল, তুমি কোন ছেলে বা মেয়েকে reform করার জন্য বিয়ে করো না, তারজন্য অনেক Reform House আছে। তুমি মনে করছ ছেলেটার সিগারেট খাওয়া ছাড়াবে, মদ খাওয়া ছাড়াবে – এগুলো করার জন্য আলাদা জায়গা আছে, সমাজ আছে, তারা করবে। আসলে এটাই হয় আমরা কাউকে করুণা বা দয়া করতে গিয়েই ফেঁসে গিয়ে মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ি।

ভালোবাসা যে কি রকম মিষ্টি মধুর হতে পারে ভাগবতের ভরত রাজা আর হরিণ শিশুর কাহিনী না পড়লে বোঝা যাবে না। ভালোবাসার এত নিখুঁত, কাব্যিক আর সূক্ষ্ম বর্ণনা পুরাণের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এখানে সবটাই গদ্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু মনে হবে যেন কবিতার রসকেও ছাপিয়ে গেছে। ভাগবত বিভিন্ন ছন্দে রচনা, পদ্যেও আছে আবার গদ্যতেও আছে। মহাভারত, বাল্মীকি রামায়ণ আবার পুরোটাই পদ্যে রচিত।

হরিণ শাবকটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে। সাবলীল ছন্দে লাফালাফি, ছুটোছুটি করছে। ভরতের সঙ্গে হাঁটবে, ভরতের সঙ্গে ঘুমোবে, ভরতও হরিণ শাবকের সঙ্গে সব কিছু করবে। যখনই সুযোগ পাবে ভরতের কোলে উঠে যাবে, তা না হলে গালে গালটা লাগিয়ে দেবে, আদুরে নরম মিষ্টি মুখ দিয়ে ভরতের মাথায়, মুখে ঘসতে থাকবে। তার আব্দারের কোন শেষ নেই। ভরতও তাঁর বৃদ্ধ বয়সের যত ভালোবাসা হরিণের শিশুটির উপর গিয়ে পড়েছে, বুড়ো বুড়িরা নাতি নাতনীদের নিয়ে যেমন করে এখানেও ঠিক সেই জিনিষ চলছে। দু মিনিটের জন্যও শাবকটিকে ভরত চোখের আড়াল হতে দিতেন না। যদি অনেকক্ষণ না দেখতে পান তাহলে চিন্তা আর উদ্বিগ্নতা ভরতকে অস্থির করে তুলতো। বাচ্চাটা গেল কোথায়! ওকে বাঘে খেয়ে ফেলেনি তো! শিকারীদের হাতে মারা গেল নাতো! কুকুরে তাড়া করে নিয়ে যায়নি তো! – দুশ্চিন্তার আর শেষ থাকত না। আহা! যদি এখানে ঘরের কাছেই কচি কচি ঘাস থাকত তাহলে ওকে দূরে কোথাও যেতে হত না চোখের সামনেই এইখানে চরে বেড়াত আর কচি কচি ঘাস খেত। মানে হরিণ শিশুকে কেন্দ্র করে সমস্ত রকমের দুশ্চিন্তা, সুচিন্তা, ভালোবাসা ভরত রাজাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

হয়তো কোন দিন হরিণটা অনেকক্ষণ চোখের আড়ালে ছিলো। ভরত চুপচাপ বসে বসে ভাবতে শুরু করলেন – কি আর করবে, ওতো হরিণ, জঙ্গলের জীব, সে নিজের বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি ভাইদের ছেড়ে আমার কাছে কেনইবা থাকতে যাবে, জ্ঞাতিদের ছেড়ে আমাকে কেনইবা আনন্দ দিতে যাবে। এই জায়গার শ্লোকটি এত অপূর্ব! *ক্ষেলিকায়াং মাং মৃষা সমাধিনাহহমীলিতদৃশং প্রেমসংরম্ভেণ চকিতচকিত আগত্য পৃষদপরুষবিশাণাগ্রেণ লুঠতি।।৫/৮/২১।* যেমন প্রেমিক প্রেমিকা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, ঝগড়া করে যেরকম মান-অভিমান করে, ঠিক তেমনি রাজা ভরত হরিণের সঙ্গে মান-অভিমান করত। কিরকম? রাগ দেখাবার জন্য রাজা ভরত পালকি মেরে ধ্যানে বসে যেতেন, আর দেখাতেন যেন সমাধিতে চলে গেছেন। একজন রাজপুরুষ আরেক জন হল জঙ্গলের একটি পশু শাবক। এদের দুজনের মধ্যে যে প্রেম আর সেখান থেকে যে মান-অভিমানের পালা চলতে থাকল, সেই দৃশ্যকে ভাগবত কি অপূর্ব ভাবে বর্ণনা করছে, বলছে – হরিণ শাবকের হাল্কা হাল্কা শিং বেরিয়েছে। ওর সেই জলবিন্দুর মত কোমল শৃঙ্গ দিয়ে সমাধিবান পুরুষকে সোহাগ মিশ্রিত ঘর্ষণ করতে থাকত। হরিণ শাবকের এই নরম কোমল সোহাগ মাখা ঘর্ষণ পাওয়ার জন্য রাজা

ভরত সমাধির ভাণ করে আছেন, আর হরিণ শাবক এসেছে মিটমাট করতে। হরিণ শিশুর প্রতি ভরতের যে কী গভীর ভালোবাসা, ভুলেই গেছেন এখানে আমি কেন আমার রাজ্যপাট, সুখ সমৃদ্ধি, স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে এসেছি। ঋষভদেবের মত ঋষির সন্তান তিনি, আর একজন কৃতকৃত্য রাজা হয়েও তিনি বিরাট জ্ঞানী ছিলেন, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে নদীর তীরে বসে তপস্যা করবেন বলে এখানে এসেছেন, তার মত এই উচ্চ জ্ঞানী পুরুষ শুধু মাত্র একটা হরিণের বাচ্চাকে নিজের অভিমান দেখানোর জন্য ধ্যানে বসে যাচ্ছেন।

একজন মহারাজ তাঁর স্মৃতিচারণে বলছিলেন, উনি স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে এক জায়গায় থাকতেন। একদিন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে ওনার কি নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেছে। সেদিন রাত্রে আর ঐ মহারাজ খেতে যাননি, খেতে না গিয়ে বিছানায় বসে জপে বসে গেলেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। তিনি ঐ মহারাজের ঘরে এসে বলছেন, ওনার ভাষা খুব সুন্দর ও মজার ছিল আর খুব রসিকও ছিলেন, তিনি বলছেন You fool! this is not the time to meditate, come for food. মুর্খ এটা কোন ধ্যানের সময় নয়, চল খেতে চল। অভিমান হলে মানুষতো এটাই করে, যেটা করণীয় নয় সেটাই করতে শুরু করে। তা এখন কোনটা করণীয় নয়? হঠাৎ এখন বসে সমাধিতে মন দিয়ে দিলাম, এটা এখন করণীয় নয়, ধ্যানের একটা পদ্ধতি ও সময় আছে। এসব কিছুই না, শুধু হরিণকে দেখাবার জন্য, যাও আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না, বলে ধ্যান করার ভাণ করে বসে গেলেন। শুধু তাই নয় ভরত রাজা বলছেন – এই পৃথিবীর কি সৌভাগ্য তার বুকে এই ছোট্ট হরিণের পা পড়ছে। যা কাব্যিক বর্ণনা করা হয়েছে কল্পনা করা যায় না। মানুষ তার নাতি নাতনীর জন্য যা করে, বা প্রেমিক পুরুষ তার প্রেমিকাকে নিয়ে যা করে ঠিক তাই তাই রাজা ভরত করতে লাগলেন।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন ভরতের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। হরিণ শিশুটি তাঁর শেষ শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে। পশুরাও বুঝতে পারে যে তাঁরা প্রিয়জনের একটা কষ্ট বা দুঃখ হচ্ছে। হরিণের চোখে জল। আর শেষ শয্যায় শায়িত হয়ে ভরতের শুধু একটিই চিন্তা আমি চলে গেলে এই হরিণের কি হবে, কার কাছে যাবে, হয়তো বাঘের পেটে চলে যাবে, নয়তো শিকারীরা মেরে ফেলবে। শুধু হরিণ হরিণ আর হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর শরীরটা চলে গেল। যিনি এত বড় ঋষির পুত্র, এত বড় রাজা ছিলেন, সব কিছু ত্যাগ করে শুধু ব্রহ্ম চিন্তনে সমাধিতে লীন হয়ে থাকার জন্য এই নির্জন জায়গায় এসেছিলেন, কিন্তু এখন সে হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে শরীর ত্যাগ করে দিলেন। গীতাতে আছে *যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজতন্তে কলেবরম্* - যে যার চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করবে মৃত্যুর পর সে তারই সত্তা পায়। রাজা ভরত এখন হরিণের চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করেছে তাই আবার হরিণ হয়ে জন্ম নিয়েছে। হরিণ হয়ে জন্ম নেওয়ার পর তাঁর চেতনা ফিরে এলো। আরে এ আমি কোথায় ফেঁসে গেলাম। তপস্যা করা ছিল বলে তাঁর সেই চেতনাটা থেকে গিয়েছিল। এই চেতনা থাকার ফলে সে আর হরিণের দলের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করল না। হরিণ যোনিতে তাঁর কর্ম কিছুটা কাটল।

হরিণ জন্মের পর তিনি আবার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন – গীতাতে আছে, *শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে*। যারা যোগভ্রষ্ট, যোগ অভ্যাস করতে করতে কোন কারণে যোগে সিদ্ধ না হয়েই মরে গেল, তখন এদের একটা ভালো ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়। গীতাতেও ভগবান বলছেন *অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্*, আরো যারা ভাগ্যবান তারা যোগীদের পরিবারে গিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। যারা যোগভ্রষ্ট তাদের তাই হয়।

এখন মানুষ হয়ে ভরত যে পরিবারে জন্ম নিয়েছেন সেই পরিবারের গোত্র অঙ্গিরাস। অঙ্গিরাস গোত্র খুব উচ্চ কুলের গোত্র এবং এই গোত্রের অনেক প্রাচীন পরম্পরা আছে। তাছাড়া এই বংশের অনেক ভালো ভালো গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতে যে গুণগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বোঝাচ্ছে তাঁরা সত্যিই আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন পরিবার ছিল। যেমন বলছেন – শমঃ, দমঃ, তপঃ, স্বাধ্যায়, বেদ অধ্যয়ন, ত্যাগ, সন্তোষ, তিতিক্ষা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া, অনসূয়া মানে অপরের দোষ না দেখা, আত্মজ্ঞান, আনন্দ, এই গুণগুলো

তাঁদের মধ্যে পরিপূর্ণ ছিল। এই পরিবারের সবার ইন্দ্রিয় সংযম ছিল, কষ্ট সহিষ্ণুতা ছিল, মন নিয়ন্ত্রিত ছিল, অতিথিদের প্রতি সেবাপরায়ণতা ছিল; এত গুণ তাঁদের ছিল।

ভরত যে ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম নিয়েছে সেই ব্রাহ্মণের দুই স্ত্রী। প্রথম পত্নীর নটি সন্তান ছিল আর দ্বিতীয় পত্নী থেকে যমজ পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র সন্তানটিই সেই ভরত, হরিণ থেকে এবার অন্তিম জন্মে মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভগবানের কৃপায় পূর্ব জন্মের সব কিছু তাঁর মনে আছে। তাই খুব সচেতন ও সতর্ক, গতবার খুব ফেঁসে গিয়েছিলাম, এবার আর যেন কোন বন্ধনে না জড়িয়ে পড়ি। এর ফলে যাতে কোন বাধা-বিঘ্ন না উপস্থিত হয় সেইজন্য তিনি লোকজন এমনকি আত্মীয়-স্বজনদের থেকেও দূরে দূরে থাকতেন। আর কোন কিছুতে তিনি মন দেন না, ভালো খাওয়া, শোয়া, পড়া, কোন চাহিদাও আর নেই। নিজেকে পাগল, মূর্খ, এবং বোবা-কালার ভাণ করে সবার সামনে ঘুরে বেড়ান আর সর্বদা ভগবানের স্মরণ মনন নিয়ে থাকেন। এই রকম উদাসীনতা দেখে তাঁর পিতা ছেলেকে তাড়াতাড়ি উপনয়ন দিয়ে দিলেন। অনেক চেষ্টা করে তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হল, কিন্তু ভরত কিছুতেই লেখাপড়াতেও মন দিতেন না। আসলে যিনি জন্ম থেকেই বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁকে আর কে কি শিক্ষা দেবে! আর যাতে কোনভাবে বদ্ধ না হয়ে পড়ি সেই চিন্তায় তিনি সব সময় সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতেন। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে বেদ অধ্যয়ন করবে না, কোন যজ্ঞ-যাগ করবে না, সেই ছেলের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সবারই উদ্বিগ্ন হওয়ারই কথা। সবাই মনে করছে এই ছেলেটা একটা বোকা বুদ্ধু গবেট। অন্য দিকে প্রথম পত্নীর নটি পুত্রই কর্মকাণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ মন করে খুব যজ্ঞ-যাগ করত, আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না।

কালের বিধান অনুযায়ী ঐ ব্রাহ্মণ একদিন তাঁর ইহজীবন ত্যাগ করে চলে গেলেন। পিতার অবর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাইরা দেখছে এ ছেলেতো কোন পড়াশুনা না করে একেবারে মুর্খ হয়ে গেছে, ভাইয়েরা গিয়ে ওকে বলল 'তোকে আর বেদ পড়তে হবে না, তুই এখন বাড়ি কাজকর্মে মন দে'। উনি কোন দিকেই মন দেন না, খাওয়া পড়াতেও মন নেই, সবাই মনে করত এ বুঝি একটা পাগল না হয়তো ব্যোমভোলা। তাঁকে কেউ যদি পাগল বলত তিনি ঐভাবেই তার সঙ্গে ব্যবহার করতেন, কেউ যদি মুর্খ, গবেট বলত উনিও তার সঙ্গে সেই ধরণের আচরণ করতেন। যে যেরকম ভাবে ওনাকে ডাকত তিনি তার সঙ্গে সেই রকমের ব্যবহারই করতেন যাতে ওরা আনন্দ পায়। কিন্তু একটি মুহূর্তও তিনি তাঁর আত্মস্বরূপের চিন্তন থেকে সরে থাকতেন না। এমনিতে যে যা বলবে তিনি তাই করে দিতেন। কেউ যদি বলে আমার ঐ পুঁটলিটা মাথায় করে নিয়ে আয় তো, তিনি তক্ষুণি সেটা মাথায় করে নিয়ে আসতেন। কোন কাজেই তিনি না করতেন না, সবই নিঃসঙ্কোচে আর নির্দ্বিধায় করে দিতেন। তাঁর চালচলন হাবভাব সব জড়ের মত বলেই হয়তো সবাই তাঁকে জড়ভরত বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছিলেন।

বৌদিরা ওনাকে ঠিকমত খেতে না দিলেও ওনার শরীরটা খুব হৃষ্টপুষ্ট ও হাড্ডাগোড্ডা ছিল। দাদারা ঠিক করল – এটাতো একটা মুর্খ অপদার্থ, একে দুটো রুটি খেতে দেব আর আমাদের ক্ষেতে কাজ করাব। দাদারা ওকে তাদের ক্ষেতে পাহারা দেওয়ার কাজ দিল। তখনকার দিনে প্রচুর জঙ্গল ছিলো। যাতে হরিণ, শূকর ইত্যাদি বন্য পশুরা ক্ষেতের ফসল নষ্ট না করে দেয়, তাই ওকে ঐ পাহারা দেওয়ার কাজে লাগাল। তখন উনি ক্ষেতে পাহারা দিচ্ছেন, আর বীরাসনে বসে ব্রহ্ম চিন্তন করতে থাকলেন। এখন আর কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে পারে না। গ্রামের বাইরে ক্ষেতের ধারে নিশ্চিন্ত মনে ঐভাবে তিনি ব্রহ্ম চিন্তনে ডুবে থাকতেন।

সেই সময় একবার একটা ডাকাত দলের তাদের একটা মানুষের দরকার ছিল বলি দেওয়ার জন্য। তারা কোথাও বলি দেওয়ার জন্য কাউকে খুঁজে পাচ্ছিল না, তা ঐ সময় জড়ভরতকে হাড্ডাগোড্ডা দেখে তুলে নিয়ে এসেছে বলি দেওয়ার জন্য। উনিও আনন্দ মনে ওদের সাথে চলে এসেছেন। এবার ডাকাতরা ওদের আখরায় মা চণ্ডীর সামনে ওনাকে বলি দেবে। এখন এনাকে যে বলি দেবে, তিনি একেই ব্রাহ্মণ তার ওপর আবার ব্রহ্মভাব সম্পন্ন। মায়ের যে বিগ্রহের সামনে বলি দেওয়া হবে সেই মা ভদ্রকালী এতো রেগে গেলেন যে তাঁর চোখ নড়তে শুরু করে দিল, যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ভ্রু নাচতে লাগল, তাঁর সমস্ত শরীর

রাগে প্রচণ্ডভাবে কাঁপাতে লাগলেন। তারপর তাঁর যে মুর্তি ছিলো সেই মুর্তি ভেঙ্গে দিয়ে তিনি সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হলেন আর যে ডাকাতরা বলি দেবার জন্য এনাকে নিয়ে এসেছিল তাদেরই গলা কেটে তাদেরই রক্ত পান করতে করতে সহচরিণীদের সাথে নৃত্যগীত শুরু করলেন।

পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন *ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত মহদ্ভুতং যদসম্ভ্রমঃ স্বশিরশ্ছেদন আপতিতেঽপি বিমুক্তদেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্বসত্ত্বসুহৃদাত্মানাং নির্বৈরাণাং সাক্ষাদ্ভগবতানিমিষারিবরা-য়ুধেনাপ্রমত্তেন তৈস্তৈর্ভাবৈঃ পরিরক্ষ্যমাণানাং তৎপাদমূলমকুতশ্চিদ্ভয়মুপসৃতানাং ভাগবত-পরমহংসানাম্।।৫।৯/২০।* যিনি ভগবান, তিনিই স্বয়ং ভদ্রকালী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবী মুর্তির রূপ ধারণ করে আসেন আর ভালো মানুষদের রক্ষা করেন। যাঁর দেহাভিমানরূপ হৃদয়গ্রন্থিই ছিন্ন হয়ে গেছে, যিনি সমস্ত প্রাণীজগতের সুহৃৎ, যিনি কারোর প্রতি বৈরী ভাব পোষণ করেন না, স্বয়ং ভগবান এই রকম বিভিন্ন রূপ ধারণ করে তাঁকে রক্ষা করেন। যিনি ভগবানের শরণাগত ভক্ত, সেই পরমহংস যে নিজের শিরশ্ছেদনের সময়েও বিচলিত হবেন না, এটা কোন আশ্চর্যের কথা নয়। এই কাহিনীটাকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা শাক্ত মতের ঝলক দিয়ে কালী আর কৃষ্ণকে এক করে দেওয়া হল। যিনি কালী তিনিই কৃষ্ণ। আমরা এখানে নরবলির উল্লেখ পেলাম। যদিও তিনি বলি গ্রহণ করেন কিন্তু যাঁরা ভালো লোক, ঈশ্বর চিন্তন করেন তাঁদেরকে এভাবে বলি দেওয়া চলবে না।

যে দেশে ভরত জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই দেশের রাজার নাম ছিল রহূগণ। রাজা শুনেছেন যে কপিল মুনি ভগবানের জ্ঞানশক্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি নিজের কিছু প্রশ্ন নিয়ে এবং মুনির মুখে তত্ত্বজ্ঞানের বচন শুনবার জন্য পাল্কীতে বসে চলেছেন সেই কপিল মুনির উদ্দেশ্যে। যে পাল্কীতে করে যাচ্ছিলেন তাদের পাল্কী বাহকের একজন লোক কম হয়ে গেছে। দৈববশে তখন রাজার পাল্কী বাহকদের সর্দার ভরতকে দেখতে পেল ক্ষেতের ধারে চুপচাপ বসে আছে। সর্দারের মনে হল এ বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট আর শক্তিশালী। ভরতকে তারা জোর করে ধরে এনে পালকি বহনের কাজে লাগিয়ে দিল। পালকি বহন করতে হবে, তা জড়ভরতের কাছে কোন ব্যাপারই না। নির্বিবাদে পাল্কী কাঁধে নিয়ে চলেছেন। এখন যাবার সময় উনি করছেন কি, রাস্থার মধ্যে কোন পিঁপড়ে, কিংবা পোকা মাকড় যাতে পায়ের তলায় চাপা পড়ে মরে না যায় সেই ভাবে সাবধানে চলেছেন। হয়তো পায়ের সামনে একটা পিঁপড়ে দেখল তখন পা টা একটু অন্য রকম ভাবে ফেললেন। এতে তাঁকে একটু এঁকেবেঁকে চলতে হচ্ছে। তার ফলে পাল্কীটাও বেঁকে বেঁকে চলছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছিল, ওরা যেরকম হেঁইয়া হো করে একটা গতিতে চলেছে, জড়ভরত সেই রকম তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না, তিনি তাঁর নিজের মত মন্থর গতিতে চলেছেন।

পাল্কী এই ভাবে নিয়ে যাচ্ছে বলে রাজ রহূগণ খুব রেগে গেছে। কাহাড়দের বলছে ‘কি হচ্ছে কি, পাল্কী ঠিকমত চলছে না কেন’? কাহাড়রা বলছে ‘হুজুর আমাদের কোন দোষ নেই, এই একজন নতুন এসেছে, এর জন্যই এই রকম হচ্ছে’। তখন রহূগণ জড়ভরতকে এক নজর দেখে ব্যঙ্গ করে তাঁকে বলছে ‘নিশ্চয়ই তুমি খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, সেইজন্য তোমাকে তোমার বন্ধুরা সাহায্য করছে না। আর তুমি এত দূর থেকে বয়ে নিয়ে আসছ, পরিশ্রান্ততো হওয়ারই কথা’। অথচ পাঁচ মিনিটও হয়নি যে ভরতকে পাল্কী বাহকের কাজ দেওয়া হয়েছে। রহূগণ ব্যঙ্গ করে বলছেন ‘তা দেখছি তোমার শরীরটাও তো রোগা প্যাট্‌কা আর তার ওপরে জরাতেও তুমি বশীভূত হয়ে পড়েছ, তা তুমি আর কি করবে বল’! এইভাবে বিপরীত কথা ব্যঙ্গচ্ছলে বলে জড়ভরতকে রাজা অপমান করে যাচ্ছিল।

রাজা নানান ভাবে ব্যঙ্গ করে চলেছে কিন্তু জড়ভরতের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, তিনি নিজের আনন্দে পথ চলছেন। ভরত রহুগণের এসব কথার কোন প্রত্যুত্তর করেননি। কোন মানুষকে যদি কেউ অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায়, তার সব থেকে ভালো উপায় হল তার কথার কোন উত্তর না দেওয়া। উপেক্ষা করা হল কাউকে সবচাইতে নিকৃষ্ট ভাবে অপমানিত করা। যত মারামারি হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই উপেক্ষা থেকেই হয়। কেউ আমাকে হয়তো কুটূক্তি করছে, আমি যদি তাকে উপেক্ষ করতে থাকি, দেখা যাবে কিছুক্ষণ

পরে সে আমাকে মারতে আসছে। যদি আমি কিছু বলে দিতাম তাহলে কিন্তু মারতে আসত না। রাজা রহূগণও খুব রেগে গিয়ে বলছে 'আমি রাজা! আমার কথার কোন উত্তর দিচ্ছো না! দেখছি, তোমার গলাটা আমাকে কাটতে হবে'।

জড় ভরত এবং রহূগণ রাজার সংবাদ

এবার জড় ভরত রাজা রহূগণকে উত্তর দিতে শুরু করলেন। ভাগবতের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশটাকে বলা হয় – জড় ভরত রহূগণ রাজার সংবাদ। এর মধ্যে বেদান্তের একেবারে উচ্চতম তত্ত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখন আর ভক্তির কোন ব্যাপার নেই, একেবার উচ্চতম বেদান্তের কথাই চলবে। আমরা শুনে আসছি ভাগবতে শুধু মাত্র ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা শুধু উচ্চতম বেদান্ত তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণ পাই।

ভরত বলছেন *ত্বয়োদিতং ব্যক্তমবিপ্রলব্ধং ভর্তুঃ স মে স্যাদ্যদি বীর ভারঃ। গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা পীবেতি রাশৌ ন বিদাং প্রবাদঃ।।৫/১০/৯।* 'হে রাজা, আপনি আমাকে যা বলছেন ঠিকই বলছেন, আপনি যে ব্যঙ্গ করছেন তা নয়, ঠিকই বলছেন। যদি কোন ভার যুক্ত বস্তু হয় তাহলে তাকে বহন করবার জন্য বাহক থাকবে। যদি কোন পথ হয় তাহলে সেটা যারা চলে ফিরে বেড়ায় তাদের জন্য, যদি শরীর মোটা হয় তাহলে সেটা শরীরের জন্য। কিন্তু এসব কোনটাই আপনার জন্য নয়। সেইজন্য আপনি যে আমাকে ব্যঙ্গ করছেন, তুমি বইতে পারছো না, তুমি রোগা, তুমি বৃদ্ধ, এগুলো আপনি ঠিকই বলছেন। কেননা আমিও মনে করি না যে আমি যৌবনে আছি, আমিও মনে করি না যে আমি হাড্ডাগাড্ডা আছি, আর আমিও মনে করি না যে আমি কোন ভার যুক্ত বস্তু বইছি। কারণ আমার কোন শরীর নেই। আমি আত্মা, আমার বোধ আত্মার সঙ্গে। আপনি যে আমাকে বিদ্রুপ করছেন, এটা কোন বিদ্রুপ নয়, এটাই ঘটনা। আমার যদি শরীর বোধ হয় তবেই না আমি বলব যে আমি রোগা কি আমি মোটা, কিন্তু আমার তো শরীর বোধই নেই। অন্যরা আমাকে মোটা মনে করছে আর আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করে বলছেন আমি রোগা। আমার কাছে এটা কোনভাবেই ব্যঙ্গ নয়, এটা আমার কাছে বাস্তব। কারণ আমি রোগাও না মোটাও না। রোগা মোটা এগুলো কারা বলবে? যারা শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে তারাই তো এই ধরণের কথা বলবে, কিন্তু আমার তো শরীরের সাথে কোন সম্বন্ধই নেই, আমি তো সেই আত্মা'।

স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ ক্ষুত্তৃড়্ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ। নিদ্রা রতির্মন্যুরহংমদঃ শুচো দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি।।৫/১০/১০। মোটা, রোগা, সুস্থ, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ইচ্ছা, যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা ইত্যাদি যা কিছু আছে এগুলো সব দেহভিমানী জীবের ধর্ম। কিন্তু আমার মধ্যে কোন জীবের ধর্মই নেই, আমি সেই শুদ্ধাত্মা, আমার এসবের কোন বোধ নেই। *জীবন্মৃতত্বং নিয়মেন রাজন্ আদ্যন্তবদ্যদ্বিকৃতস্য দৃষ্টম্। স্বস্বাম্যভাবো ধ্রুব ঈড্য যত্র তর্হ্যুচ্যতেহসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ।।৫/১০/১১।* আপনি যে জন্ম-মৃত্যুর কথা বলছেন তাতো যত পরিণামশীল পদার্থ আছে এই দুটো তো তাদের ধর্ম, সব বিকারী বস্তুরই আদি ও অন্ত হয়। আপনি যে বললেন আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিনি, কিন্তু যেখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক আছে সেখানেই তো আজ্ঞা পালনের নিয়ম প্রবর্তিত হতে পারে। *বিশেষবুদ্ধের্বিবরং মনাক্ চ পশ্যাম যন্ন ব্যবহারতোহন্যৎ। ক ঈশ্বরস্তত্র কিমীশিতব্যং তথাপি রাজন্ করবাম কিং তে।।৫/১০/১২।* আর আপনি যে আমাকে বলছেন গলা কেটে দেবেন, মেরে দেবেন, এগুলো হচ্ছে ব্যবহার। কারণ আমার শরীর নেই, তাই আমার মৃত্যুও নেই। আপনি যে বলছেন আপনার কথা আমি কেন শুনিনি, তা স্বামী আর সেবক এই বোধ তখনই হয় যখন সেখানে জীব বোধ থাকে। আমারতো জীবাত্মা বলে বোধই নেই, তাই আমার মধ্যে রাজা-প্রজার ভেদবুদ্ধি নেই, সুতরাং আমি আপনাকে প্রভু বলে কি করে মানতে পারি! আমি যদি আপনাকে প্রভু বলে নাইই মানি, তাহলে এখানে কি করে নিয়ম উল্লঙ্ঘন হল! আর নিয়ম উল্লঙ্ঘন নাইই হয় তাহলে আপনি আমাকে কি দণ্ড দেবেন! আর যদি আপনি দণ্ড দেনও তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। কেননা আমি জীব নই, আমার কিছুই তাতে যায় আসে না। পরমার্থ দৃষ্টিতে যদি দেখেন তাহলে কে রাজা আর কেই বা ভৃত্য। আপনিতো সব কিছু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে

দেখছেন, কিন্তু আমার দৃষ্টি ব্যবহারে নেই, আমার দৃষ্টি একমাত্র পরমার্থে। তবুও হে রাজন্! যদি আপনার মধ্যে প্রভুত্বের অহঙ্কার থেকে থাকে তো বলুন আমি আপনার কি সেবা করব’!

উন্মত্তমত্তজড়বৎস্বসংস্থাং গতস্য মে বীর চিকিৎসিতেন। অথঃ কিয়ান্ ভবতা শিক্ষিতেন স্তব্ধপ্রমত্তস্য চ পিষ্টপেষঃ।।৫/১০/১৩। জড় ভরত বলে চলেছেন – আপনি যে বলছেন আমাকে শিক্ষা দেবেন, কিন্তু আপনি আমাকে কি শিক্ষা দেবেন! কিন্তু আমি মত্ত, উন্মত্ত ও জড়ের মতই আমি আমার নিজের স্থিতিতে থাকি। স্থিতিতে থাকা মানে আমার যে স্বরূপ সেই আত্মাতে স্থিত থাকা। আসল কথা হল, তুমি নিজেই জড়, তুমি নিজে প্রমাদি, তুমি নিজেই হোতা, আর সেই তুমি কিনা আমাকে শিক্ষা দিতে চাইছ! তা কি শিক্ষা দেবে আমাকে? আমাকে শিক্ষা দেওয়া মানে একটা জিনিষ বেটে দেওয়া হয়েছে সেটাকে আবার বাটা। যেটা জড় পদার্থ তাকেই তো তুমি শিক্ষা দেবে, কিন্তু আমিতো আগেই ব্রহ্মভাবে অবস্থিত আছি। তুমি নিজেই জড়, তাও তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে চাইছ, তার মানে, গমকে পিষে আটা করে দেওয়া হয়েছে, এখন তুমি বলছ সেই পেষা গমকে তুমি আবার পিষবে, এতে তোমার লাভটা কি হবে!

জড় ভরত রাজা রহূগণকে এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান শুনিয়ে মৌন হয়ে গেলেন। সব কথা শুনে রাজা হতবাক্ হয়ে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল্কী থেকে নেমে এসে হাত জোড় করে বলছেন ‘আপনি কে আমাকে বলুন? আপনি কি সেই কপিল মুনি, না দত্তাত্রেয়, আপনি কোন্ ঋষি নিজের পরিচয় গোপন করে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন আমায় বলুন। আমি রাজা, আমি ইন্দ্রের বজ্র বা মহাদেবের ত্রিশুলকেও ভয় করি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ঋষি মুনিদের আমি খুব ভয় করি। আর আপনি এইমাত্র যে কথাটা বললেন জীবের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমি তো সংসারের প্রপঞ্চ মার্গকেই সত্য বলে মনে করি, কাল্পনিক কলসিতে কেউ জল আনতে পারে না। *স্থাল্যগ্নিতাপাৎপয়সোহভিতাপস্তত্তাপতস্তণ্ডুলগর্ভরন্ধিঃ। দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ তৎসংসৃতিঃ পুরুষস্যানুরোধাৎ।।৫/১০/২২।* উনুনের উপর কোন জল সমেত একটা পাত্র রাখা হলে উনুনের অগ্নির তাপে পাত্রের জলটাও গরম হয়। ঠিক সেই একের ধর্ম অন্যে অনুবর্তনক্রমে আত্মার উপাধিভূত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ আর মনের সান্নিধ্যে আত্মাও এই উপাধিগুলির ধর্ম গ্রহণ করে নেয়, সেইজন্য আপনি দুটোকে আলাদা কি করে বলবেন। রাজার এই মতটা হল নৈয়ায়িকদের মত। নৈয়ায়িকরা মনে করে বুদ্ধিই হচ্ছে চৈতন্য, আর বেদান্ত ও সাংখ্য মতে বুদ্ধি জড়। তারপর রহূগণ বলছেন ‘আগুন আর জল এই দুটো যখন মিশে যায় তখন জলটা গরম হয় আর আগুনটা ঠাণ্ডা হয় ঠিক তেমনি আত্মা যখন শরীরের সঙ্গে মিশে যায় তখন আত্মার কিছু ধর্ম শরীরে এসে যায়, আর শরীরের কিছু ধর্ম আত্মাতে চলে যায়। সেইজন্য আত্মা নিশ্চয়ই শরীরের কিছু সুখ দুঃখ ভোগ করে। এগুলোই নৈয়ায়িকদের মত। ‘আর আপনি যে বলছেন আপনাকে আমার শিক্ষা দেওয়াটা পেষা জিনিষকে পিষে দেওয়ার মত, কিন্তু তা কেন হবে? আমি রাজা, আমার কাজই হচ্ছে দণ্ড দেওয়া, এতে আমার কি ভুল হয়েছে, আমি তো আমার ধর্ম পালন করেছি’।

রহুগণের কথার জবাবে এবার জড় ভরত জবাব দিচ্ছেন *অকোবিদঃ কোবিদবাদবাদান্ বদস্যথো নাতিবিদাং বরিষ্ঠঃ। ন সূরয়ো হি ব্যবহারমেনং তত্ত্বাবমর্শেন সহামনন্তি।।৫/১১/১।* ‘রাজা, আসলে তুমি হলে অজ্ঞানী, অথচ পণ্ডিতের মত কথা বলতে চাইছ, কিন্তু তোমাকে কখনই জ্ঞানীর মধ্যে গণ্য করা হবে না। যে অজ্ঞানী তার কখনই তত্ত্ববিচারে তর্কবিতর্ক করার অধিকার নেই। তুমি অজ্ঞানী হয়ে তত্ত্ব বিচার করতে চাইছ অথচ রাজার ব্যবহারকে ছাড়তে পারছ না। কেননা তত্ত্ব বিচারের সময় কখনই ব্যবহারকে আনা হয় না’। ভাগবতের এই মন্তব্যটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। তত্ত্বটা কি? তত্ত্ব হল ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই, এটিই একমাত্র তত্ত্ব। কিন্তু ব্যবহারের সময় কি হচ্ছে? আমি আলাদা আপনি আলাদা। এই দুটোই সত্য কিন্তু দুটি পৃথক বাস্তবতা। একটা হল পারমার্থিক সত্য আরেকটি ব্যবহারিক সত্য। পারমার্থিক সত্য হল ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই – এটাই সর্ব শেষ সিদ্ধান্ত, এ ছাড়া আর কোন কথা নেই। আর ব্যবহারিক সত্যতে আমি আছি, আপনি আছেন, সবাই আছে।

যখন আপনি তত্ত্ব কথা বলছেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে কথা বলছেন, তখন কোনভাবেই ব্যবহারকে আনা যাবে না। ঠিক তেমনি যখন ব্যবহারের নিয়ে কথা বলছেন তখন পারমার্থিক ভাবকে আনা ঠিক হবে না, যদি না আপনি খুব উচ্চকোটির হন। স্বামীজী practical Vedanta এর উপর বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন মানুষ যদি সর্বদা মনে দৃঢ় ধারণা করে রাখতে পারে যে সে হচ্ছে সেই পরমাত্মা, তখন তার শক্তি অনেক বেড়ে যাবে, তখন সে কারুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না। এর অর্থ হচ্ছে ব্যবহারের সময়েও যদি আপনি পরমার্থকে নিয়ে আসেন, সেটা হবে সার্বিক কল্যাণের বিষয়। কিন্তু যেখানে তত্ত্ব বিচার হচ্ছে সেখানে কখন কোন মতেই ব্যবহার চিন্তন চলবে না। এই ব্যাপারে আমরা অনেকে গোলমাল করে ফেলি। একদিকে আপনি জানতে চাইছেন তত্ত্বের কথা আর অন্য দিকে আপনি ব্যবহারিক দৃষ্টি নিয়ে বসে আছেন, এ জিনিষ কোন মতেই চলবে না। আপনি যখন আচার্যের কাছে গিয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা জানবার জন্য প্রশ্ন করবেন তখন এটাই হবে আপনার প্রথম শর্ত, আপনার ব্যবহারিক সত্তাকে ভুলে যেতে হবে।

জড় ভরত বলছেন – যেমন লৌকিক ব্যবহারটাই শেষ কথা নয়, ঠিক তেমনি বেদে যে সব বাক্য বলা হয়েছে সেই কথাগুলোও শেষ কথা নয়। কারণ ঐ কথাগুলো হচ্ছে গৃহস্থদের জন্য, তারা যে যজ্ঞাদি করবে তার জন্য। এই বাক্য দিয়ে মানুষ কখনই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারবে না। এখানে জড় ভরত বেদের কর্মকাণ্ডকে নিয়ে বলছেন, যে কর্ম করলে আপনি স্বর্গ পাবেন, বা রাজ্যলাভ হবে, কিংবা আপনি ইন্দ্রপদ পাবেন, জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদের কথা এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু ইতিহাস পড়লেন, কি ভূগোল পড়লেন, বিজ্ঞান পড়লেন, সমাজবিজ্ঞান পড়লেন কিংবা আচার ব্যবহার শিখলেন, বলছেন এগুলো দিয়ে সেই তত্ত্বজ্ঞান হবে না। আপনি সমগ্র বেদে পারঙ্গব হয়ে গেলেন, সমস্ত পূজা পদ্ধতি শিখে নিলেন, বলছেন তাতেও তত্ত্বজ্ঞান হবে না।

উপনিষদই শেষ কথা, কিন্তু যাঁরা যজ্ঞাদি কর্ম, স্বর্গ সুখ, এই জিনিষগুলোকে স্বপ্নের মত যদি হেয় না মনে করেন, তাহলে উপনিষদের কথা তাঁদের জন্য নয়। এক জায়গায় হলধারী ঠাকুরকে বলছেন 'গদাই, তুই যে এই কাঙালীদের এঁটো পাতা কুড়ুচ্ছিস তোর ছেলেপুলের বিয়ে হবে কি করে'? ঠাকুর শুনে খুব রেগে গেছেন 'তুমি একদিকে বেদান্তের কথা জগৎ মিথ্যা বলে বেড়াও আর অন্য দিকে বলছ আমার ছেলেপুলে হবে'! যিনি এই জগৎকে স্বপ্ন ভেবে উড়িয়ে দিয়েছেন, যিনি জানেন আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই আর নিজেকেও আত্মা বলে জেনে গেছেন, এই জগতের কোন কিছু, লৌকিক কর্ম ও বিধিবাদীয় কর্ম বলতে যা কিছু আছে সেগুলো করা তাঁর পক্ষে আর কোন ভাবেই সম্ভব নয়। আপনি যদি বলেন – আমি এখন সাধারণ জাগতিক জ্ঞান তার থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং বেদে প্রতিষ্ঠিত, তাতেও হবে না। এরপর যদি বলেন – আমি বেদকেও ছেড়ে দিলাম এবং উপনিষদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, তাহলেও হবে না। তাহলে কিভাবে হবে? স্বপ্নকে আমরা যেমন ভাবে ত্যাগ করে দিই, ঠিক সেই ভাবে এই জগৎ সংসারের যা কিছু আছে স্বপ্নবৎ আমি তাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তখনই হবে, তার আগে কখনই হবে না। তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্তের জিনিষ নয়, তত্ত্বজ্ঞান আমাদের মনে জাগ্রত হয়। কখন জাগ্রত হয়? যেমন ক্ষেতের সমস্ত আগাছাগুলো পরিষ্কার করে দেওয়ার পর সেই ক্ষেতে বীজ ফেললে চারা গাছ জন্মায়, সেই রকম সংসার রূপ জঙ্গল, আগাছা মন থেকে যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে তখনই উপনিষদের আত্মতত্ত্বকে মনের মধ্যে ধারণা করা সম্ভব হবে। সংসার বৃক্ষকে উৎপাটিত না করলে উপনিষদ কখনই ধারণা করা সম্ভব নয়। এই কথাই অন্যভাবে জড় ভরত রাজ রহূগণকে বলছেন।

মানুষ যতক্ষণ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণে বশীভূত হয়ে আছে ততক্ষণ তার মন তাকে দিয়ে শুভ ও অশুভ কর্ম করাবেই করাবে। গীতাতেও আমরা এই তিনটে গুণের খুব সুন্দর বর্ণনা পাই। এর আগে সাংখ্যে যে চব্বিশ তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে সেখানেও বলছে – চব্বিশ তত্ত্বের বিচার করে শেষে দেখা যায় জগতে যা কিছু আছে সবার মধ্যে এই তিনটে গুণ কম বেশী থাকবেই। যতক্ষণ কেউ এই তিনটে গুণের অন্তর্ভুক্ত ততক্ষণ সে জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। সেইজন্য সর্বক্ষণ বিচার করে চলতে হয়, আমি যে এই কাজটা করছি এই কাজটাও কি সত্ত্বগুণের মধ্যে আবদ্ধ? গীতাতে যে ভগবান অর্জুনকে বলছেন *নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন* – অর্জুন তুমি ত্রিগুণাতীত হও, তার মানে মানুষ যতক্ষণ এই তিনটে গুণের পারে না যেতে পারছে ততক্ষণ তার

পক্ষে জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। যেমন আমরা দয়ার কথা বললাম, এই দয়া সত্ত্বগুণ থেকে আসে, আবার মায়া তমোগুণ থেকে হয়। আগের জন্মে রাজা ভরত খুব উচ্চ অবস্থায় ছিলেন কিন্তু তাঁকে সত্ত্বগুণ দয়া দিয়ে বেঁধে ফেলল। সেই দয়া থেকে তাঁকে তমোগুণে নামিয়ে দিল হরিণের প্রতি মায়া এসে। এই তিনটে গুণ তিন ভাই, সব সময় এক সঙ্গে চলে, কখনই এরা আলাদা হয় না। সত্ত্ব থাকলেই রজ থাকবে, রজ থাকলেই তম থাকবে, তম থাকলেই সত্ত্ব থাকবে। এর মধ্যে কোন একটা গুণ যদি ক্ষমতাবান হয়ে বিবশ করে ফেলে তাহলে বুঝতে হবে সে বিপদে পড়ে গেছে। সেইজন্যই বলা হয় তিনটে গুণকেই পার করতে হবে।

ভরত বলছেন মনই সব কিছু, আর এই মন সত্ত্ব, রজ ও তম তিনটি গুণ দিয়ে নির্মিত। মানুষ যখন বিভিন্ন কর্মের আর মনের বিভিন্ন বৃত্তির আশ্রয় নেয় তখনই সে আবদ্ধ হয়। মনে আমাদের অহরহ নানান ধরণের বৃত্তির জন্ম নিচ্ছে। কখন ঘুমোতে ইচ্ছে হচ্ছে, কখন কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে, কখন কারুর প্রতি ভালোবাসা জন্মাচ্ছে, কখন কারুর প্রতি হিংসা ভাব আসছে, এই রকম কোটি কোটি বৃত্তির জন্ম নিচ্ছে, এই বৃত্তি গুলিই আমাদের কর্মে প্রেরিত করছে। শাস্ত্রজ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা এটাও একটা বৃত্তি। এই বৃত্তি উদিত হয়েছে বলে আমাকে বাড়ি থেকে হেঁটে ট্রেন ধরতে হচ্ছে, বাস ধরতে হচ্ছে, তারপর এই বেলুড় মঠে আসতে হচ্ছে। এতগুলো কর্ম হচ্ছে শুধু জ্ঞান লাভের বৃত্তি হয়েছে বলে। জ্ঞান লাভ কোন্ গুণের বৃত্তি? সত্ত্ব গুণের বৃত্তি। এই সত্ত্বগুণও আমাদের দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আর যদি এই জ্ঞান লাভের ইচ্ছে না থাকত তাহলে বাড়িতে এই সময় হয় আমি ঘুমোতাম তা না হলে খবরের কাগজ পড়ে আর টিভি দেখে সময় কাটাতে হত, এটাই তমোগুণের লক্ষণ। এই হচ্ছে তিন গুণের খেলা। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তিনটে কে পার করা। তিনটে গুণকে পার করতে হলে শুধু ব্রহ্মের চিন্তন বা ব্রহ্মের ধ্যান করে যেতে হবে। ব্রহ্ম চিন্তন করতে না পারলে সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। সত্ত্বগুণকেও যদি আশ্রয় না করতে পারা যায় তাহলে কিন্তু ঘোর বিপদ, কর্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এই জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে হবে।

মূল বক্তব্য হল আমাদের ভেতরে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, জীবাত্মা যিনি, তাঁর সাথে এই মনের কোন সম্পর্ক নেই, আমাদের কোন রকম কর্মের সঙ্গে তাঁর কোন লেনাদেনা নেই। হে রাজা তুমি যে বললে আত্মার ধর্ম শরীরে আসে আবার শরীরের কিছু ধর্ম আত্মাতেও চলে আসে, কিন্তু কি করে আসবে? আত্মা আর শরীর এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। এই তিনটে গুণের প্রভাবে মনই সব খেলা করছে, কারণ মন এই তিনটে গুণ দিয়েই নির্মিত। মনের সঙ্গে তুমি যে নিজেকে একাত্ম বোধ করে রেখেছ, এই বোধটাকে কেটে মনের সাথে তোমার সব সম্পর্কের অবসান করতে হবে। তখন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট যেমন সব কিছু লয় হয়ে যায় সেই রকম তোমার যত রকমের বৃত্তি আছে সেগুলো লয় হয়ে যাবে। যখন তোমার জ্ঞান হবে তখন তোমার বৃত্তিগুলিও লয় হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছি, তোমার এই মনই তোমার সব থেকে বড় শত্রু, কোন সাধারণ শত্রু নয়। তুমি যদি ইচ্ছে করতে তাহলে তুমি এই শত্রুকে দমন করতে পারতে, কিন্তু তুমি তা করনি। তা না করে তুমি উপেক্ষা করে এসেছ আর তার ফলে এই শত্রু দিনে দিনে এত স্পর্ধিত ও বর্ধিত হয়ে গেছে। বাড়িতে যদি একটা ছোট বট গাছের চারা জন্মায় তখন প্রথমেই যদি তাকে শেকড় শুদ্ধু উপড়ে না দেওয়া তাহলে বড় হয়ে গেলে শেকড় এত দূর ছড়িয়ে যাবে যে তখন গাছ কাটতে গেলে বাড়িরই ক্ষতি হয়ে যাবে। তোমার এই বাঁদর মনকে প্রশ্রয় দিয়ে আর উপেক্ষা করে করে এত শক্তিশালী হয়ে গেছে যে তোমার এই আত্মজ্ঞানকে পুরো আবৃত করে রেখেছে। এখনো তোমার সময় আছে, তুমি ঈশ্বর চিন্তন, গুরুসেবা করে করে এই সম্পর্কটা চিরদিনের মত মিটিয়ে দাও।

রাজা রহূগণ এর আগে অনেক পণ্ডিতদের সঙ্গ করেছেন, কিন্তু আজ এত বড় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে কাছে পাওয়ার পর তাঁর সঙ্গ করার সুযোগ ছাড়তে চাইছেন না, এই সুযোগে রাজা নানান প্রশ্ন করে চলেছেন। জড় ভরতও একজন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ। তিনিও রাজার সব কথার উত্তর দিতে দিতে এক জায়গায় বলছেন – এই দেহটা তো মাটির একটা বিকার মাত্র। একটা পাথর আর শরীরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যখন কোন বস্তু এই পৃথিবীর উপরিভাগে বিচরণ করে তখন তাকে ভারবাহী প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হয়। ঠিক তেমনি এই

শরীরকে দুটি চরণ বহন করে যাচ্ছে, এই চরণের উপরিভাগে ক্রমে ক্রমে গোড়ালি, জঙ্ঘা, জানু, ঊরু, কোমর ইত্যাদি অঙ্গ আছে। ঠিক তেমনি *অংসেহধি দার্বী শিবিকা চ যস্যাং সৌবীররাজেত্যপদেশ আস্তে। যস্মিন্ ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানো রাজাস্মি সিন্ধুষ্বিতি দুর্মদান্ধঃ।।৫/১২/৬।* এই দ্যাখো একটা মরা কাঠ, এই কাঠের উপর একটা কাঠের পাল্কী, সেটাও মরা কাঠ, সেই মরা কাঠের মধ্যে একটা মরা শরীর, মানে পার্থিব শরীর রাখা আছে, আর তুমি নিজে আত্মা হয়ে তাঁকে 'আমি সিন্ধু দেশের রাজা' ঐ আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছ। এই অহঙ্কারের জন্য তোমার ভেতরে একটা মদ, মানে দুর্হঙ্কার এসে গেছে। এই দুর্হঙ্কারের ফলে তুমি কি করছ? এত লোককে কষ্ট দিচ্ছ, তোমার নিজের স্বার্থের জন্য তাদের বেগার খাটাচ্ছ আর অন্য দিকে বল তুমি এদের রক্ষক। তোমার মুখে এসব বেদান্তের কথা একেবারেই শোভা পায় না, তুমি যে বড় বড় বেদান্তের কথা বলছ এগুলো শুধু ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। কথামৃতে এর খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে – দক্ষিণেশ্বরে একজন নিজেকে বেদান্তী বলে প্রচার করত আর অন্যদিকে নোংরা কাজ করে বেড়াত। ঠাকুর তাকে একদিন ডেকে বললেন 'তুমি নিজেকে বেদান্তী বলে প্রচার কর কিন্তু তুমি এত নোংরা কাজ কেন কর'? সে তখন ঠাকুরকে বলছে 'এই সংসার যখন মিথ্যা তখন আমার এই কাজগুলো কি কর সত্য হবে'! ঠাকুর বলছেন 'তোমার এই বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি'। এখানেও জড় ভরত তাই বলছেন – একদিকে তুমি রাজা হয়ে অপরকে কষ্ট দিচ্ছ, শোষন করছ, অত্যাচার নিপীড়ণ করছ, আর অন্য দিকে তুমি বেদান্তের লম্বা লম্বা তত্ত্ব কথা বলে যাচ্ছ।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – মুর্খরা জগতকে এভাবে কষ্ট দিতে পারেনি যেভাবে বুদ্ধিমানরা কষ্ট দিয়েছে। আবার অধার্মিকরা জগতকে কখনই এভাবে কষ্ট দিতে পারেনা যেভাবে ধর্মের নামে ধার্মিক লোকরা দেয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান যদি কাঁচা জ্ঞান হয় আর যদি মূর্খদের হাতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান চলে যায় তাহলে সে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর অত্যাচারী হয়ে সব কিছুর সীমাকে ছাড়িয়ে যাবে। সন্ত্রাসবাদীরাও নিজেদের ধার্মিক মনে করে কিন্তু তারা ধর্মের নামে কত নিরীহ লোককে নির্বিচারে হত্যা করে যাচ্ছে। শুধু এরাই নয়, সমগ্র বিশ্বের সব ধর্মেই এই সমস্যা। ধর্মের ইতিহাসে আজও কত বিভৎস নারকীয় কাণ্ড সাক্ষ্য হয়ে আছে যেখানে ধর্মের আড়ালে মানুষ মানুষকে কি অত্যাচারই না করত। ইতিহাসে ধর্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে অন্য কোন কিছুতে এত রক্তপাত হয়নি। হিটলার যেটা করেছেন সেটাও ধর্মের নামে – খ্রিশ্চানিটি আর জিউস্ এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। জড় ভরত রাজা রহূগণকে এই কথাই বলছেন – তুমি গরীব মানুষের উপর অত্যাচার করছ আর অন্যদিকে তোমার মুখে ধর্মের বড় বড় কথা, এর চাইতে বড় শঠতা আর কিছুতে হয় না।

তারপর বলছেন, *জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্। প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি।।৫/১২/১১।* যিনি বিশুদ্ধ পরমার্থরূপ, তিনি অদ্বিতীয়, যাঁর ভেতরে বাইরে সমান আর পরিপূর্ণ জ্ঞান, সত্য বস্তু, তাঁরই নাম ভগবান, পণ্ডিতরা তাঁকেই বাসুদেব বলেন। ভগবানের বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন। তিনি বিশুদ্ধ পরামার্থরূপ, অর্থাৎ তাঁর সবটাই পারমার্থিক ব্যাপার, লৌকিক সত্তার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, সামাজিক যা কিছু দেখছি তা তিনি নন, তিনি পরমার্থরূপে আছেন, তিনিই হলেন highest reality, ultimate reality, তারপর বলছেন অদ্বিতীয়, অর্থাৎ তাঁর মত আর কিছু নেই, তাঁর সঙ্গে কারুর উপমা বা তুলনা হয় না। তাঁর ভেতর বাইরে কোন ভেদ নেই। কিছু জিনিষের যেমন ভেতরটা বেশি ভালো আবার বাইরে খারাপ অথবা বাইরে ভালো ভেতরে খারাপ, কিন্তু তিনি তা নন, তাঁর ভেতর বাহির দুটোই সমান। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ জ্ঞান, অজ্ঞানের লেশমাত্রও নেই। আমরা পৃথিবীতে দিন আর রাত দেখি, আলো আর আঁধার বলতে পারি, কিন্তু যারা সূর্যলোকের বাসিন্দা তারা জানেই না অন্ধকার কাকে বলে। সূর্যে দিন রাত বলে কিছু নেই, সব সময় আলোকজ্জ্বল। সূর্যে যেমন রাতের কল্পনা করা যায় না ঠিক তেমনি ঈশ্বরে কখন অজ্ঞান কল্পনা করা যায় না। তিনিই একমাত্র সৎ বস্তু। তাঁকে কখনই অসৎ বলা যায় না। অসৎ মানে যে জিনিষটা চিরন্তন নয়। যেমন একটা লম্বা চক, চককে দুটো টুকরো করে দিলে ছোট হয়ে গেল, এর ক্ষয় আছে

বিকার আছে, চকটাকে পিষে দিলে গুড়ো হয়ে যাবে, এর মধ্যে অন্য একটা রাসায়নিক কিছু মিশিয়ে দিলে এর রূপ ও বৈশিষ্ট্য পালটে গিয়ে চকের বদলে অন্য কিছু হয়ে যাবে। যে জিনিষের বিকার আছে সেটাই অসৎ। ভগবানের কখনই কোন ক্ষয় বা বিকার হয় না। এসব বলার পর বলছেন – যাঁর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তিনিই ভগবান আর তাঁরই নাম বাসুদেব।

এত কথা বলার পরও রাজা রহুগণের মন শান্ত হচ্ছে না দেখে জড় ভরত একটা বিরাট লম্বা উপমা দিয়ে বলছেন – এই সংসার যেন একটা জঙ্গল আর এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এক সওদাগর যাচ্ছে, যেতে যেতে সে ঐ জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সওদাগর জীবাত্মার উপমা, জীবাত্মা এই সংসারে এসে তার স্বরূপকে হারিয়ে ফেলে কিভাবে কষ্ট পায়, কিভাবে সুখ খোঁজার চেষ্টা করে তার সব বর্ণনা করা হয়েছে। যাই হোক, অনেক ভাবে উপমার সাহায্যে বোঝানর পর রহুগণ বুদ্ধি দিয়ে কিছু ধারণা করতে পারার পর তার মন কিছুটা শান্ত হয়েছে।

কিম্পুরুষ লোকের বর্ণনা

এরপর পুরাণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জড় ভরতের বংশের বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর মা গঙ্গার স্তুতির মাধ্যমে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসার ইতিহাস বলা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়, মাস, বছর নিয়ে অনেক কিছু বলছেন। এর মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় তন্ত্রের অনেক মন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, আর কিছু কিছু লোকের বর্ণনা। মানুষ তার নিজের এই সীমাবদ্ধ অস্তিত্ববোধকে নিয়ে কখন শান্তি পায় না। তার এই অস্তিত্ববোধের সীমানাটাকে বাড়াবার জন্য কিছু আখ্যায়িকার সাহায্য নিতে হয়। এই আখ্যায়িকাই গুলি যখন ধর্ম ও দেবতা-দেবী বাদ দিয়ে বলবে তখন তা হয়ে যায় কল্পকাহিনী বা লোককথা, আর যখন ধর্মকে নিয়ে আসবে, ঈশ্বরীয় ব্যাপার নিয়ে আসে তখন সেটাই হয়ে যাবে পুরাণ। পুরাণ মানেই যে শুধু কাহিনী থাকবে তা নয়, সেখানে নানান লোক অর্থাৎ বিভিন্ন স্বর্গ, নরকের বর্ণনা আসবে। যেমন কিম্পুরুষ নামে একটা লোকের বর্ণনা আছে যেখানে কিম্পুরুষ আর ভারতবর্ষের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

কিম্পুরুষ লোক শ্রীরামচন্দ্রগতপ্রাণ ভক্তপ্রবর মহাবীর হনুমানের বাসস্থান। ভাগবতের মূল চরিত্র যদিও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বা অন্যান্য অবতারদেরও ভাগবতে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই কিম্পুরুষ লোকে হনুমান বাস করেন আর সর্বদা শ্রীরামচন্দ্রের পরম কল্যাণময়ী গুণগাথা শ্রবণ করেন আর স্বয়ং শ্রীরামের স্তুতি করেন। এখানে একটি খুব সুন্দর শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম মন্ত্র আছে – *ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায় নম আর্যলক্ষণশীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিতলোকায় নমঃ সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নম ইতি।।৫/১৯/২।* বলছেন – আমরা ওঁকার স্বরূপ পবিত্র কীর্তি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করছি। আপনার মধ্যে সৎ পুরুষের লক্ষণ, শীল এবং আচরণ বিদ্যমান, আপনি একান্ত সংযত চিত্ত, লোকরঞ্জনকারী, সাধুত্ব পরীক্ষার নিকষস্বরূপ এবং পরম ব্রাহ্মণভক্ত। এইরূপ মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমাদের বারংবার প্রণাম।

ভাগবতে, শুধু ভাগবতেই নয়, প্রত্যেক পুরাণে ঘুরে ঘুরে এই ব্রাহ্মণভক্ত কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। আকবরের জীবনে দেখা যায় তিনি আসলে ধর্মকে খুব একটা মানতেন না। কিন্তু মোল্লা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সবার কথাই শুনতেন। এদিকে পণ্ডিতদের বুদ্ধি অনেক বেশি, মোল্লারা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারত না। এই পণ্ডিতরা আকবরকে বুঝিয়ে দিল যে আপনাদের কোরানে যা আছে সেটা অনেক আগেই আমাদের বেদে বলা আছে। এর ফলে আকবর ধরে নিল যে এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত আছে এদের চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি মোল্লাদের তুলনায় অনেক বেশি। আমার কোরানে যা বলা আছে সেটা যদি হাজার হাজার বছর আগে অন্য ধর্মের শাস্ত্রে বলা থাকে তাহলে কোরানের বিশেষত্বটা আর কোথায় রইল! তাছাড়া অনেক হাজার বছর আগে থাকতেই কোরানে যেটা বলা আছে তারা সেটাকে অনুশীলন করছে আর সেই ব্যাপারে তাদের অনেক দক্ষতা এসে গেছে, তাই আমি এই মোল্লাদের কথা শুনবো কেন! পণ্ডিতরা আকবরকে বোঝাল কোরান যতক্ষণ আরব দেশে

ছিল তখন ঠিকমতই চলছিল, কিন্তু ভারতে এসেই মহা সমস্যায় পড়ে গেছে। দেখছে কোরান যা বলছে তার থেকেও অনেক উঁচু উঁচু দামী দামী কথা বেদে বলা আছে। শুধু যে বলাই আছে তা নয়, এগুলো আবার এখানে হাজার হাজার বছর ধরে চর্চা হয়ে চলেছে, তাই আরব থেকে কোরান ভারতবর্ষের জন্য নতুন কিছু বার্তা নিয়ে আসেনি।

এসব যুক্তি শুনে আকবরের মাথা গেছে ঘুরে। উপরন্তু ব্রাহ্মণরা তার ওপর আগেই প্রভাব ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল। এর ফলে আকবর প্রথমেই যে কাজটি করলেন তা হলো পুরো ভারতবর্ষে গোহত্যা বন্ধ করে দিলেন। আজকে এখানে মুসলমানরা গোহত্যা নিয়ে এত কথা বলে কিন্তু আকবর নিজে মুসলমান হয়ে প্রথমেই ভারতে গোহত্যা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আসলে আকবরের মাথায় এটা একেবারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আপনি যদি ব্রাহ্মণভক্ত হন আর গরু ভক্ত হন তাহলে আপনাকে কেউ আর কিছু করতে পারবে না। আর আকবর তাই হয়ে গেল। তিনি সকালে উঠেই আগে ব্রাহ্মণ দর্শন আর গরুর সেবা করতেন।

হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সেবা আর গো সেবার প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর পুরো কৃতিত্ব ভাগবতের। বেদের সময় ব্রাহ্মণদের যে আধিপত্য ছিল পুরাণে এসে ব্রাহ্মণদের সেই আধিপত্যটা হ্রাস পেয়ে যায় আর সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মটা ছড়িয়ে পড়ে। আগে যাগ যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের জীবিকা চলত। ব্রাহ্মণরা যাতে দক্ষিণা থেকে বঞ্চিত না হয় পুরাণ তাই ব্রাহ্মণ সেবা ধর্মকার্যের অঙ্গ করে দিল। সবাই চাইবে তার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই এই প্রণাম মন্ত্রে বলছেন শ্রীরামচন্দ্র যে অবতার সেটা বড় কথা নয়, তিনি ব্রাহ্মণভক্ত এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ, তাই সবাই ব্রাহ্মণদের ভজনা কর। শুধু তাই না, বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় বিজয়কে সনকাদি মুনিরা অভিশাপ দেওয়ার পর স্বয়ং নারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দ্বারপালদের বলছেন 'আমি নিজেই বাপু একজন ব্রাহ্মণ ভক্ত, এখন সেই ব্রাহ্মণরা তোমাদের অভিশাপ দিয়েছেন, তাই আমার কিছু করার নেই, ব্রাহ্মণের অভিশাপকে আমি আটকাতে পারবো না'। ভগবানের কিছু গুণ নেই শুধু একটাই গুণ তিনি ব্রাহ্মণ ভক্ত। ব্রাহ্মণদের তিনি নাকি ভয় পান। এই হল ব্রাহ্মণদের ব্যাপারে পুরাণের প্রশস্তি যাতে সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণদের দান দক্ষিণা দিয়ে যেতে থাকে।

কিম্পুরুষের বর্ণনা থেকে এসে গেছে ভারতবর্ষের কথা। সেখানে বলছেন, যে সব জীব ভারতে জন্ম নিতে যাচ্ছে তারা বিশেষ পূণ্য করেছে বলেই ভারতবর্ষে জন্ম নিচ্ছে। ভাগবতের এই মন্তব্যকে স্বামীজী বহুবার ব্যবহার করেছেন। তিনি ইংরাজীতে বলছেন 'India is Punya Bhumi' পূণ্যভূমির আর ইংরাজি করে বললেন না। বলছেন, যে আধ্যাত্মিক চেতনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে সাধনা করার জন্য এই মাটিতে ফিরে ফিরে আসতে হবে। প্রথম থেকেই ভারতবর্ষ হল ত্যাগ, তপস্যার দেশ। ভাগবত বলছে, যারা ভোগ করতে চায় তারা অন্যান্য দ্বীপে গিয়ে জন্ম নেয়। ঐ দ্বীপগুলো কোনটা বোঝা যায় না, কিন্তু ওখানে যদি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড বসিয়ে দেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মিলে যাবে। বলছে ওখানকার লোকেরা খুব স্বাস্থ্যবান হয়, খুব ভোগ করতে পারে, অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে।

চতুর্দশভুবনের বর্ণনা *(সৃষ্টির কাল নিরূপণ, বিভিন্ন লোকে বসবাসকারী প্রাণীদের বর্ণনা)*

পুরাণের মতে সব মিলিয়ে চৌদ্দটি লোক, যাকে বলে চতুর্দশভুবন – ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ ও সত্য – এই সাতটা লোক ওপরের দিকে। সত্যলোক সবার ওপরে, কেউ সত্যলোককে ব্রহ্মলোক বলে, কেউ শিবলোক বলে, কেউ বিষ্ণুলোক বলে আর ইদানিং ঠাকুরের ভক্তরা বলে রামকৃষ্ণলোক। সত্যলোক থেকে নীচের দিকে নামতে থাকে, আর ভূঃ-এর নীচ থেকে শুরু হয় অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচের দিকের এই সাতটি লোককে অনেক সময় নরকের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়। আসলে কিন্তু তা নয়, ভাগবতেই পরে বর্ণনা আসবে, বলিরাজকে যখন ভগবান বিষ্ণু পাতালে পাঠিয়ে দেন তখন তার সাথে এই আশীর্বাদও দিয়েছিলেন যে, ইন্দ্রের স্বর্গ থেকেও পাতালে তোমার ঐশ্বর্য বেশী হবে। এগুলো সবই লোক, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক নীচের দিকে লোকে দেবতারা যেতে চান না। বাল্মীকি রামায়ণে আবার পাতালের কোন উল্লেখই নেই, বাল্মীকিও হয়তো পাতাল বলে কিছু আছে জানতেন না। বাল্মীকি রামায়ণে তাই সীতার

পাতালে প্রবেশের কোন বর্ণনাই নেই, পরবর্তি কালে যত রামায়ণ রচিত হয়েছে সেখানে সীতার পাতাল প্রবেশের ঘটনা খুব নাটকীয় ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ ততদিনে মানুষের মধ্যে পাতালের ধারণা এসে গিয়েছিল। চতুর্দশভুবনের নীচের দিকের সাতটা লোকের বর্ণনা পুরাণের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুরাণে পাতাল লোককে একটা মর্যাদার জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। মহাভারতে যদিও পাতাল লোকের কথা পাওয়া যায় কিন্তু সেইভাবে মহাভারত পাতাল লোককে মর্যাদা দেয়নি যে মর্যাদ পুরাণ দিয়েছে। বেদে আবার নরকের উল্লেখ পাওয়া যাবে, শতপথ ব্রাহ্মণে একটা মন্ত্রে আছে যারা গাছ কাটে তারা নরকে যায় আর সেখানে গাছেরা তাদের কাটে। আধ্যাত্মিকতার দিকে থেকে অবশ্য এর কোন গুরুত্ব নেই।

আসলে মানুষ কোন অবস্থাতেই নিজেকে ছোট জিনিষের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় না। সচ্চিদানন্দেরই একটা রূপ মানুষ, ব্রহ্মেরই মুর্ত রূপ। এই কারণে সে কখন ছোটতে আবদ্ধ হতে চায়না। 'বৃ' ধাতু থেকে ব্রহ্ম, 'বৃ' থেকেই হয় বৃহৎ। যেখান থেকে বৃহৎ শব্দ এসেছে সেখান থেকে ব্রহ্ম শব্দ এসেছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে মানুষই ব্রহ্ম। সেইজন্য কাউকে ব্যবহার বা বাক্যের দ্বারা ছোট করে দেওয়া হলে সে খুব কষ্ট পায়। কাউকে বলে দেওয়া হল – তুমি একটা গাধা, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। তখন সে কুঁকড়ে যায়, আস্তে আস্তে তাকে একটা অবসাদ ঘিরে ফেলে, হয়তো তার বাকী জীবনটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদিও বা দেখা যায় তার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়, তবুও যদি তাকে বলা হয় – তুমি চেষ্টা করলেই পারবে, তোমার দ্বারা হবে – এতে হয় কি তার মধ্যে যে বৃহতের চ্যানেলটা আছে সেটা ঐ একটি কথাতেই খুলে যেতে সাহায্য করবে। স্বামীজী তাই বলতেন – মানুষকে সব সময় বড় করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, সব সময় উৎসাহ দিয়ে যেতে হয়। কক্ষণই নেতিমূলক কথা বলতে নেই। মানুষের নোংরা দিকটা কোন সময়েই কাউকে বলতে নেই, সব সময় সবার ভালোটাই বলতে হয়। আপনি কতবার প্রস্বাব করতে যাচ্ছেন, আপনি কতবার থুতু ফেলছেন এগুলো কি কাউকে বলে বেড়ান? এগুলো আবর্জনা, আবর্জনা কারুর সামনে নিয়ে আসতে নেই। কিন্তু প্রমোশন হলে, ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলে ফোন করে সেই খবরটা সবাইকে জানাবার জন্য মনটা ছটফট করতে থাকে। আপনাকে যদি কেউ রাস্থায় একটা চড় মারে, কিংবা অফিসে যদি আপনার বিরুদ্ধে কোন ডিসিপ্লিনারি এ্যকশন্ অথবা যদি কোন স্ক্যাণ্ডাল হয় তখন কি আপনি সবাইকে বলে বেড়ান? এগুলি কাউকে বলতে নেই। কিন্তু মানুষের স্বভাবই হলো অপরের খারাপ জিনিষগুলোর প্রতি নজর দেওয়া। খবরের কাগজগুলো কখন কারুর ভালো জিনিষকে সামনে আনবে না, শুধু মাত্র অপরের বাজে জিনিষগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে কাগজে দেবে। আর অপরের নোংরা জিনিষগুলিকে গপ্ গপ্ করে গিলতে পারাটা আমাদের কাছে এক পরম আনন্দদায়ক। খবরের কাগজগুলোও তাই এই ধরণের খবর ছাপিয়ে চুটিয়ে পয়সা কামিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরকম করা উচিত নয়, যা কিছু ভালো সেটাই সব সময় বলতে হয়।

যাই হোক, অতল থেকে যখন উপরের দিকে আসতে থাকে তখন প্রথম আসে ভূঃ, ভূঃ মানে এই পৃথিবী। ভূঃএর পর ভূবঃ এবং স্বঃ। মজার ব্যাপার হল গায়ত্রী মন্ত্রে যখন বলা *ভূর্ভূবঃ স্বঃ* তখন বেশীর ভাগ মানুষ মনে করে তিনটে লোকের কথা বলা হচ্ছে। সেই থেকে ত্রিলোকের ধারণাটা খুব বিখ্যাত হয়ে গেল, কথায় কথায় বলতে দেখা যায়, 'তিন লোকে এই রকমটি আর পাওয়া যাবে না'। তিন লোক বলতে সবাই মনে করে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আদপেই তাই নয়। তিনটে লোক বলতে সব সময় গায়ত্রীমন্ত্রের ভূঃ ভূবঃ ও স্বঃ বোঝায়। এর পেছনে প্রধান যে কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তা হল, অন্যান্য ধর্মে নরক বা পাতালকে যে ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, হিন্দুধর্মে নরক বা পাতালকে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কোন নেতিমূলক জিনিষকে হিন্দুধর্ম কখনই সামনে নিয়ে আসবে না, তাই ওনারা যখনই বলেন তিন লোক তখন বলবেন এই পৃথিবী একটি লোক, যেখানে সমস্ত প্রাণীজগৎ বাস করে, পৃথিবীর উপরে স্বঃ, মানে স্বর্গ আর স্বর্গ এবং পৃথিবীর মাঝখানের জায়গাটাকে বলছেন ভূবঃ বা অন্তরীক্ষ। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল যখন বলা হবে তখন চৌদ্দটা লোককে এক সঙ্গে ধরতে হবে।

কিছু কিছু পুরাণে হাজার হাজার নরকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে নরকের বর্ণনার যেন শেষ নেই, দুনিয়ায় যত রকমের পাপ আছে আর সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কত ভাবে হয় তার এক বিশাল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আরেকটি মজার ব্যাপার হল পুরাণের মতে চোদ্দটি লোকের মধ্যে সত্যলোক হল শ্রেষ্ঠলোক। কিন্তু আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে শ্রেষ্ঠলোকের ক্ষেত্রে ব্রহ্মলোক এই শব্দটাই ব্যবহার করে এসেছেন। বৈষ্ণবদের কাছে বিষ্ণুলোক সব থেকে উপরে, পরে ভক্তিশাস্ত্রে এরই নাম হয়ে যায় বৈকুণ্ঠলোক, শৈব ভক্তরা সত্যলোককে বলে শিবলোক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরা এখন আবার রামকৃষ্ণলোক নামে একটি নতুন লোক তৈরী করেছেন। ঠিক ঠিক বলতে সত্যলোকেরই এগুলো বিভিন্ন নাম, কারণ সত্যলোকের পর আর কিছু হয় না। যাই হোক, এই চতুর্দশ ভুবন বা চোদ্দটি লোকের ধারণা আমাদের দেশের জনমানসে খুব ভালো ভাবে জনপ্রিয় হয়ে গেছে। বেদ বা পুরাণ যাকে সত্যলোক বলছে, সাধক তাকেই ব্রহ্মলোক হিসাবে দেখবে আবার বৈষ্ণবরাই সেই লোককে বৈকুণ্ঠলোক রূপে দেখবে। এতে বোঝা যায়, এই লোক সমূহ নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপর – একই লোক তিন চার ভাবে দেখাচ্ছে। আবার কিছু গোঁড়া বৈষ্ণব ভক্ত আছে তারা বলবে, বৈকুণ্ঠ সত্যলোকেরও উপরে। এগুলো কথার কথা মাত্র।

এখন কেউ যদি জীবনমুক্ত না হতে পারেন বা মৃত্যুর সময় যদি মুক্তি না পান, অথচ প্রচুর সাধনা করেছেন, মৃত্যুর পর ইনি তখন এই সত্যলোকে যাবেন। মুসলমানরা ভালো কাজ করে যে স্বর্গলোকে যায় সেটাও এই সত্যলোক। কিন্তু কোরানের স্বর্গের বর্ণনা আর পুরাণের বিষ্ণুলোকের বর্ণনার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। তবে আমাদের ইন্দ্রলোকের সাথে কোরানের স্বর্গের অনেক মিল পাওয়া যায়। আবার ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ যে বলা হচ্ছে, এখানে এই স্বঃকে কখনই স্বর্গলোক বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় না। তবে মনে হয় পরের দিকে এই স্বঃকে স্বর্গলোক বলা হয়ে আসছে। যখন কোন কামনা-বাসনা নিয়ে সাধনা করা হয়, যজ্ঞাদি যখন করা হয় সেই ক্ষেত্রে স্বর্গলোকই শেষ লোক। ভুবঃ লোক এমন কিছু নয়, আমাদের অন্তরীক্ষকে ভুবঃ লোক বলা হয়। কিন্তু স্বঃএর উপরে যখন যাবে, যেখানে জনঃ, মহঃ, তপঃ আছে, এই লোকগুলিতে তপস্যা আর বৈরাগ্যের জোরেই যাওয়া যায়। যার যেমন তপস্যা আর বৈরাগ্য আছে সে তেমন তেমন মৃত্যুর পর এই লোকগুলিতে যাবে। আর সত্যলোক হল স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাত্মাদের নীচে যাঁরা সাধক আছেন, অর্থাৎ যাঁরা মুক্তি পাবার যোগ্য কিন্তু কোন কারণে মুক্তি পেলেন না, তাঁদের জন্য। কিন্তু যাঁরা ভক্ত, বিশেষ করে বৈষ্ণবদের কাছে মুক্তি কাম্য নয়, তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া।

এই ধরণের চিন্তার পেছনে আছে ভাগবতের একটি শ্লোক, যে শ্লোকে হিন্দুধর্মের পুরো দর্শনটাকে পাল্টে দিয়ে বলছে, ভগবান নিজে তাঁর মায়া দিয়ে নিজেকে ব্রহ্ম রূপে দেখান, এই তত্ত্ব হিন্দুধর্মের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ সব জায়গায় বলা হয় যিনি ব্রহ্ম তিনিই মায়ার দরুন ঈশ্বর রূপে দেখান। ঠাকুর বলছেন, যিনি কালী, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কৃষ্ণ। আচার্য শঙ্করও বারংবার বলছেন যিনি ভগবান, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা। কিন্তু মায়া যখন একটা আবরণ দিয়ে দেয় তখন ব্রহ্মকে ঈশ্বর রূপে দেখায়। ভাগবত বলছে তা কেন হবে, ঈশ্বর নিজের মায়ার জন্য ব্রহ্ম রূপে দেখান। যাই হোক, সাধকের যদি মুক্তি একটুর জন্য বাকী থেকে যায় তিনি ব্রহ্মলোকে যাবেন। ব্রহ্মলোকে তাঁর ব্রহ্মারই সমান শক্তি হয়ে যায়, কিন্তু তিনি সেই শক্তিটা কখন কাজে লাগান না। এনাদের মন একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে, এই ধরণের সাধকরাই প্রকৃতিলীন পুরুষ হয়ে থাকেন। যদি তাঁর কখন ইচ্ছে হয় তখন তিনি এই পৃথিবীলোকে একজন মহাপুরুষ হয়ে জগতের মঙ্গলার্থে কিছু কাজ করে আবার ব্রহ্মলোকে ফিরে যাবেন। অনেকে মনে করেন আইনস্টাইনের মত কিছু প্রকৃতিলীন পুরুষ রূপে এসে বিজ্ঞানকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যান। শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই যে আসবেন তা নয়, যে কোন ক্ষেত্রে, চিকিৎসা জগতে, সাহিত্য জগতে, সঙ্গীত জগতে যে কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতিলীন পুরুষরা এসে নতুন কিছু অবদান দিয়ে যান। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনিও হয়তো সত্যলোক থেকে এসে সাহিত্য জগতে একটা বিরাট অবদান রেখে আবার সত্যলোকে চলে গেলেন। এগুলো যে সত্যিই এই রকম হয় তা বলা হচ্ছে না, জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হল। ব্রহ্মলোকে যাঁরা থাকেন তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের উপর মন দিয়ে রাখেন, ঈশ্বরের বাইরে আর কোন কিছুর দিকে তাঁরা মন দেন না। ব্রহ্মার যখন মৃত্যু

হয় তখন এনাদেরও মুক্তি হয়ে যায়। এই নিয়ে অনেক মতবাদ আছে। অনেকে মনে করেন ব্রহ্মার একটা দিনের পর যখন রাত হয় তখন মুক্তি হয়, আবার কেউ বলেন ব্রহ্মার যখন মৃত্যু হয় তখন এনাদেরও মুক্তি হয়। মোদ্দা কথা এনারা আর সৃষ্টিতে আসেন না।

ভাগবতে আবার ব্রহ্মলোক নিয়ে কোন কথাই বলা হবে না, ভাগবতের যত কথা সব বিষ্ণুলোক নিয়েই। কারণ ভাগবত পুরাণ ভগবান বিষ্ণুকে আধার করেই রচিত। এর আগে আমরা চার ধরণের মুক্তির কথা বলেছিলাম। প্রথম হল সালোক্য, সালোক্য মুক্তিতে সাধক বিষ্ণুলোকে পৌঁছে যান আর বিষ্ণুর সঙ্গেই থাকেন। শিবলোকে যাঁরা থাকেন তাঁদেরও তাই হয়, *শিবেন সহমোদতে*, তিনি শিবের সঙ্গে আনন্দ করেন। দ্বিতীয় সারুপ্য মুক্তি, ভগবান বিষ্ণুর মতই তাঁর রূপ হয়ে যায় কিন্তু তিনি বিষ্ণু নন। ভাগবতে আবার সার্ষ্টি মুক্তি বলে এক ধরণের মুক্তির কথা বলা হয়, সার্ষ্টি মুক্তিতে ভগবানের সব রকম শক্তি তাঁর মধ্যে এসে যায়, তবে এই ধারণাটা খুব একটা দানা বাঁধেনি। তৃতীয় সামীপ্য, ভগবানের কাছেই থাকে আর তাঁর সাথেই ঘুরে ঘুরে বেড়ান। শেষ ও চতুর্থ সাযুজ্য, সাযুজ্য মুক্তি মানে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। বৈষ্ণবরা কখনই সাযুজ্য মুক্তি চাইবে না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না। এগুলো বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, সাধারণ মানুষের মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা জাগ্রত করা। দুই না থাকলে ভালোবাসা হয় না।

দিন, মাস, বছরের হিসাব

সৃষ্টি হয়ে গেল, সৃষ্টির বিস্তারও হয়ে গেল, এবার এই সৃষ্টি কত দিন থাকবে এর বর্ণনা করা হচ্ছে, সৃষ্টির সময়কালের আলোচনাকে ইংরাজীতে বলে Cosmogony। তখনকার দিনে এক সেকেণ্ডকে ভগ্নাংশ করে তার নাম দিলেন নিমেষ। বিজ্ঞানে ন্যানো সেকেণ্ড আছে, কিন্তু এনারা বলছেন নিমেষ। নিমেষ মানে, চোখের পাতা পড়তে যতটুকু সময় লাগছে, সেই সময়টুকুকে বলছেন নিমেষ। আঠারোটি নিমেষে হয় এক কাষ্ঠা। তিরিশ কাষ্ঠাতে এক কলা। তিরিশ কলাতে হয় একটি মুহুর্ত। তিরিশ মুহুর্তে একটা দিন আর একটি রাত, মানে চব্বিশ ঘন্টা। মানুষের বছর হয় তিনশ ষাট দিনে, তিরিশ গুণিতক বারো মানে তিনশ ষাট। পরের দিকে বরাহমিহির, আর্যভট্টরা বছরের হিসাবকে সোলার ক্যালেণ্ডারের সাথে মেলাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বছরের দিনের হিসাবে চান্দ্র ক্যালেণ্ডার আর সৌর ক্যালেণ্ডারের মধ্যেকার বিবাদের সমস্যাটা চিরদিনই থেকে গেছে। কারণ পৃথিবীতে ভারত একমাত্র দেশ যেখানে এই দুটো ক্যালেণ্ডারের হিসাব একই সঙ্গে চলে। সোলার অর্থাৎ সৌর ক্যালেণ্ডারে অনেক নিয়ম আছে, যেমন চার বছর অন্তর লিপ ইয়ার হয়, চারশ বছর অন্তর একটা করে দিন বছরের সাথে যোগ হয়। সোলার ক্যালেণ্ডারের পণ্ডিতরা বলেন এইভাবে হিসাবের দ্বারা পৃথিবী আর সূর্যের কক্ষ পথের চলার ছন্দটাকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে তিনশ পয়ষট্টি দিন কয়েক ঘন্টা সময় নেয়। এই কয়েক ঘন্টাকে মেলাবার জন্য জুলিয়ন ক্যালেণ্ডারে অনেক রকম হিসাব করা আছে। লুনার ক্যালেণ্ডারে চাঁদ যত দিনে পৃথিবী পরিক্রমা করে সেই হিসাবে বছর ঠিক করা হয়। সেইজন্য লুনার ক্যালেণ্ডারে আঠাশ দিনে এক মাস হয়। হিন্দুদের যত পূজা পার্বণ সব লুনার ক্যালেণ্ডারের হিসাবে হয়। সোলার ক্যালেণ্ডার আর লুনার ক্যালেণ্ডারে ঊণত্রিশ দিনের তফাৎ হয়ে যায়। যার জন্য দেখা যায় রমজান উৎসব এক মাস করে প্রতি বছর পেছোতে থাকে। হিন্দুদেরও এই সমস্যা ছিল। সেইজন্য হিন্দুরা তাদের সব পূজা পার্বনের দিনগুলো পালন করে তিথি হিসাবে। তিথিকে আবার তারিখ থেকে পুরো আলাদা করে দিয়ে তাকে আবার করে দিল সোলার ক্যালেণ্ডার। সেখান থেকে বিক্রম হিন্দু ক্যালেণ্ডার চালু হয়ে গেল। বর্তমান শতাব্দীর আটান্ন বছর আগে এই ক্যালেণ্ডার চালু হলেও সেখানে আবার তারা তিরিশ দিনে মাসের হিসাব নিয়ে এল। মুসলমানদের যেমন ঊনত্রিশ দিন বছরে কমে যায়, হিন্দুদের সেখানে পাঁচ দিন কমে যায়। হিন্দুদেরও বছরের হিসাব পিছিয়ে যায়, কিন্তু কয়েক বছর বাদে বাদে মল মাস দিয়ে পাঁচ দিনের এই ঘাটতিটা পুষিয়ে দেয়। মল মাসে কোন ধরণের পূজা করা হয় না।

মানুষের একটি বছর মানে দেবতাদের একটা দিন। সেই হিসাবে মানুষের তিনশ ষাট বছর মানে দেবতাদের একটি বছর। বারো হাজার দেববর্ষে এক চতুর্যুগ হয়। এক চতুর্যুগে তেত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার মানব বছর। চতুর্যুগ হল কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্যযুগ। বারশ দেববর্ষ সমান কলিযুগ, এর দ্বিগুণ চব্বিশ'শ দেববর্ষ সমান দ্বাপর যুগ, দ্বাপর যুগের দ্বিগুণ ছত্রিশ'শ দেববর্ষ সমান ত্রেতাযুগ আর কলিযুগের চার গুণ আটচল্লিশ'শ দেববর্ষ সমান সত্যযুগ। চতুর্যুগ যখন শেষ হয়ে যায়, অর্থাৎ তেত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার পর সব বেদ বিনাশ হয়ে যায়। সেই সময় কয়েকজন সপ্তর্ষি উপর থেকে এসে আবার ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর বলছেন নরেনকে তিনি সপ্তর্ষি থেকে নিয়ে এসেছেন। তখন বেদ সহ সমস্ত শাস্ত্র কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, এখানেও তাই স্বামীজীকে ঠাকুর বেদ উদ্ধারের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কি বেদ? শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতই এ যুগের বেদ। স্বামীজী এই কারণেই বলছেন – যেদিন থেকে ঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছে সেদিন থেকে সত্যযুগ শুরু হয়েছে। কলিযুগ শুরু হয়েছিলে শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসানের পর থেকে। পরীক্ষিৎকে যখন তক্ষক দংশন করেছে তখনও কিন্তু কলিযুগের প্রভাব বোঝা যায়নি, আরও পরে গিয়ে বোঝা গেছে। তখন কলিযুগ আর দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণ চলছিল। দিন থেকে রাত হতে যেমন একটা সময় লাগে, ঠিক তেমনি একটা যুগ থেকে আরেকটা যুগে পরিবর্তন হতে মোটামুটি চারশ বছর লাগে। এখন সত্যযুগের ঊষাকাল চলছে। এখন যত রকম গণ্ডগোল চলছে এগুলো সব ঊষাকালের অন্ধকারেই হচ্ছে। আর এই যুগের বেদ কথামৃত। ভাগবতে এরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে ঋষিরা এসে বেদ উদ্ধার করে জগতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

একাত্তর চতুর্যুগ সমান এক মন্বন্তর। বর্তমানে আমরা যে মন্বন্তরে আছি এটা সপ্তম মনুর কাল চলছে। চোদ্দটি মন্বন্তর সমান ব্রহ্মার একটি দিন, ব্রহ্মার একটা দিন মানে একটি কল্প। দুটো কল্প মানে ব্রহ্মার একটা দিন আর একটা রাত। এইভাবে ব্রহ্মার তিনশ ষাট দিন অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মার একটি বছর হয়। এই হিসাবে ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর। একশ বছর হয়ে গেলে ব্রহ্মার মৃত্যু হয়ে যাবে। ব্রহ্মার মৃত্যু হয়ে গেলে আবার সেই কারণ সলিল আসবে, সেই কারণ সলিলে ভগবান বিষ্ণু শয়ন করে অনেক খেলা দেখার পর আসবে মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ের পর আবার কবে সৃষ্টি শুরু হবে সেটা আর পুরাণ বলতে পারছে না। বলার কথাও নয়, কারণ কাল মহাকালে চলে গেল, এরপর সময়ের আর কোন হিসাব থাকবে না। কারণ আমি যদি বলি ব্রহ্মার একশ বছর পর ব্রহ্মা বিশ্রামে চলে যাওয়ার আবার একশ বছর পর ব্রহ্মা আসবেন, তখন এই কথাটা অযৌক্তিক হয়ে যাবে। তার কারণ হল, যখন সত্ত্ব, রজ, তমের সৃষ্টি হয় তখনই কালের সৃষ্টি হয়। কালের সৃষ্টি হলে সময়কে মাপা যায়। ব্রহ্মা একশ বছর চলে যাওয়ার পর স্থূল সূক্ষ্মে লয় হয়ে গেল, সূক্ষ্ম কারণে লয় হয়ে গেল আর কারণ মহাকারণে লয় হয়ে গেল। যিনি কাল তিনি মহাকালে লয় হয়ে গেলেন, মহাকাল কালীতে লয় হয়ে গেলেন আর কালী ব্রহ্মে লয় হয়ে গেলেন। তখন তো আর সময়ের কোন হিসাবই থাকবে না। সেইজন্য ব্রহ্মার পর আর কোন হিসাব পুরাণ দেয় না।

ব্রহ্মার একশ বছর সমান ৩০,৯১,৭৩,৭৬,০০০০০০০ মানুষের দিন। সাধনা ও তপস্যা করে ব্রহ্মলোকে যদি কেউ মুক্তির জন্য চলে যান তাহলে তাঁকে এত বছর মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে। ইদানিং কালে বিগ ব্যাঙ থিয়োরি আর চলে না, এখন মাল্টি ভার্স থিয়োর এসে গেছে। এই মাল্টি ভার্স থিয়োরিতে হিসেব করে যেটা এসেছে তার সঙ্গে তেত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার সংখ্যাটা মিলে যায়। গীতায় বলছেন *কল্পক্ষয়ে পুনঃস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্*, এক একটা কল্পে এক একটা সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার একটা দিন মানে সৃষ্টি শুরু হল, আর রাত মানে প্রলয় হয়ে গেল। আবার যখন ব্রহ্ম জেগে উঠছেন তখন আবার সৃষ্টি শুরু হল, এই ভাবে যে এক একটা কল্প শুরু হচ্ছে এই কল্পই আবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনেক উচ্চ সাধকদের এই কল্পান্তে মুক্তি হয়ে যায়। ব্রহ্মলোক কিন্তু ব্রহ্মা যত দিন বেঁচে থাকবেন তত দিন থেকে যাবে। কিন্তু যখন মহাপ্রলয় হবে তখন সব কিছুই লীন হয়ে যাবে। সেইজন্য কেউ যদি আগে মুক্তি নাও পায় কিন্তু ব্রহ্মার একশ বছর পর সবার মুক্তি হয়ে যাবে। তখন তো ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই, তিনি তখন নিরাকার রূপে থাকেন।

এইসব লোকের কথা বলতে গিয়ে শুকদেব বলছেন – কেউ কেউ বলেন যে এই যে সূর্য, তার থেকে অযুত যোজন নীচে রাহু নক্ষত্রের মত বিচরণ করছে। তার মানে এটা শুকদেবের মত নয়, কেউ কেউ বলে থাকেন। যোজনের মাপটা আমাদের হারিয়ে গেছে, যোজনকে কখন বলবে কয়েক মাইল, আবার কখন বলবে একশ ফিটের মত। স্বামীজীও বলতেন – যখন সময় আর দূরত্বের ব্যপার আসতো এদের মাথা যেন ঘুরে যেত, এই দুটোর কোন হিসেব থাকতো না। অমুক রাজা কত বছর রাজত্ব করেছেন বলতে গিয়ে কোটি দিয়েই শুরু হবে, পুরাণে যে কজন রাজার নাম আছে তারা কেউই কোটি বছরের নীচে রাজত্ব করেননি। আর তার রাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল? তখন বলবে একশ কোটি যোজন পর্যন্ত। মূল কথা হল সূর্য থেকে নীচে রাহু। যখন সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পাওয়া গেল, তখন দেবতারা কায়দা করে অসুরদের বঞ্চিত করে অমৃত পান করতে শুরু করেছে। রাহু আর কেতু এরা ছিল অসুর, এরা দেখছে দেবতারা বেশ কায়দা করে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চুপচাপ অমৃত পান করে নিচ্ছে। রাহু আর কেতু দুজনে তখন দেবতার রূপ ধারণ করে দেবতাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে দুজনেই অমৃত পান করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে সূর্য আর চন্দ্র এদের দুজনকে দেখেই বুঝে নিয়েছে – এরাতো দুজন অসুর কিন্তু দেবতাদের ছদ্মবেশ ধারণ করে অমৃত পান করতে বসে গেছে। সূর্য আর চন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রকে খবরটা জানিয়ে দিলেন। ইন্দ্র খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাহু আর কেতুর মুণ্ডুটা কেটে দিলেন। গলা কাটার আগেই রাহু আর কেতু তখন অমৃত পান করে নিয়েছিল কিন্তু অমৃত গলা থেকে নীচে তখন নামেনি। গলা থেকে নামেনি বলে ওদের মাথা থেকে গলা পর্যন্ত থেকে গেল কিন্তু ধড়টা নষ্ট হয়ে গেল। সেই বদলাটা নেওয়ার জন্য রাহু আর কেতু ওরা দুজনে সূর্য আর চন্দ্রের কাছে কাছে থাকে। আর মাঝে মাঝে সূর্য আর চন্দ্রকে গ্রাস করে নেয়। রাহু যখন গ্রাস করে নেয় তখন হয় সূর্যগ্রহণ আর কেতু যখন গ্রাস করে তখন হয় চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করার সময় ভগবান তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে আবার রাহু আর কেতুকে দূরে ঠেলে দেন বলে সূর্য আর চন্দ্র বেঁচে যায়।

এবার বলছেন বিভিন্ন লোকে কারা কারা থাকেন। রাহুর নীচে থাকেন সিদ্ধরা। সিদ্ধ হলেন খুব উচ্চকোটির ঋষি। চারণ, বিদ্যাধর এনারা সব হলেন দৈবী ঋষি। তার নীচে যতদূর বায়ুর গতি আর মেঘ দেখা যায় ততদূর অন্তরীক্ষ লোক। আশ্চর্যের ব্যাপার হল তখনকার দিনের ঋষিরা জানতেন যে বায়ুর গতি সীমাবদ্ধ, একটা নির্দিষ্ট জায়গার পর বায়ুর আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। ঋষিরাও মানতেন যে বৃষ্টি স্বর্গ থেকে নেমে আসে না। তাঁরা জানতেন মেঘ একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা দিয়ে আকাশে ভেসে যায়। আর বলছেন এই যে অন্তরীক্ষ লোক এখানে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত আর ভূতেরা ঘুরে বেড়ায়। সেখান থেকে একশ যোজন নীচে ভূলোক। অন্তরীক্ষ লোকের নীচে আর পৃথিবীর ঠিক উপরে ভূলোকের অবস্থান। হাঁস, গরুড় পাখি, বাজ পাখি ইত্যাদি যত বড় বড় পাখিরা যতদূর উপর দিয়ে যেতে পারে ততদূর পর্যন্ত এই ভূলোকের সীমানা বিস্তৃত। এখানে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন মেঘের উপর দিয়ে কোন পাখি উড়ে যেতে পারে না। আর এটাই কিন্তু সত্য।

বিভিন্ন লোকে যারা বাস করে

উপর থেকে এবার নীচে কি কি লোক আছে বলছেন। অনেকে নীচের লোকগুলিকে নরকের সঙ্গে গোলমাল করে ফেলে। এগুলো মোটেই নরক নয়। উপরে যেমন স্বর্গ লোক, নীচে তেমনি বলে পাতাল লোক। স্বর্গ লোকে যেমন দেবতারা থাকেন আর পাতাল লোকে অসুরেরা থাকে। স্বর্গের যেমন বিভিন্ন শ্রেণী আছে পাতাল লোকেরও বিভিন্ন শ্রেণী আছে, পাতাল লোকের নাম হল – অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই পাতাল লোকগুলিতে বিভিন্ন দৈত্য, দানব, নাগ ইত্যাদি জাতিরা বাস করে। দৈত্য আর দেবতারা সৎভাই। ঠিক তেমনি নাগ আর দেবতারাও সৎভাই। দুজনেরই বাবা সেই প্রজাপতি। কিন্তু প্রজাপতির অনেক স্ত্রী ছিল। তাদের থেকেই দেবতা, অসুর, দৈত্য, দানব, নাগেদের জন্ম।

এখানে বলছেন পাতাল লোকে যারা থাকে সেখানে তারা প্রচুর ঐশ্বর্য ও সন্তানাদি নিয়ে খুব আনন্দে থাকে। এখানে সবাই গার্হস্থ ধর্ম পালন করে, কেউ নিবৃত্তিমার্গ পালন করে না। ওদের পারবারিক বন্ধন খুব দৃঢ়, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব একে অপরকে অত্যন্ত ভালোবাসে, ঝগড়া-বিবাদ হয়ই না।

পৃথিবী থেকে নীচে যাওয়ার সময় প্রথম আসবে অতল। ময়দানবের বল নামে এক পুত্র ছিল, সেই বল এই পাতালের রাজা। সে ছিয়ানব্বুই রকমের মায়া জানে। বলের মায়ার শক্তি ছিল বিচিত্র। একবার সে হাই তোলাতে তিন রকমের স্ত্রীর জন্ম হয়েছিল। প্রথম নারী হলো স্বৈরিণী। স্বৈরিণীরা তাদের যে বর্ণ, জাত সেই বর্ণের লোকেদের সাথেই থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে কামিনী। এরা অন্য বর্ণের লোকদের সঙ্গেও থাকে। শেষ হল পুংশ্চলী – এরা খুব চঞ্চল স্বভাবের, কখন কোথায় কি করবে ঠিক করতে পারে না।

এই তিন ধরণের স্ত্রীরা অতল লোকে যেসব পুরুষেরা থাকে যাদের হাটক বলে, তাদের এক ধরণের মদ খাইয়ে দেয় তারপর এই স্ত্রীরা এদের সঙ্গে যা খুশি করে নিতে পারে। মাদক দ্রব্য খাইয়ে দেওয়ার পরে নেশার চোটে তারা বলতে শুরু করে – আমার মত ক্ষমতাবান কেউ নেই, আমি হলাম সিদ্ধ পুরুষ, আমি রাজা, আমি সবাইকে শেষ করে দিতে পারি ইত্যাদি।

এর নীচে বিতল। বিতলে হাটকেশ্বর মহাদেব, মানে শিবরই একটা রূপ, তিনি তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে থাকেন। আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম যে শিব প্রথমে ছিলেন অনার্যদের দেবতা, পরের দিকে তাঁকে ধীরে ধীরে আর্যদের দেবতাদের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা আগে দেখেছিলাম শিবকে কিভাবে দেবতাদের সর্বোচ্চ আসনে বসান হয়েছিল। কিন্তু এখানে আবার দেখান হচ্ছে শিবকে পাতালের একটি লোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিতল লোকের নীচে সুতল লোক, সেখানে বলি রাজা থাকেন। এক সময় একটা যজ্ঞে বলি রাজা এত দান করতে শুরু করেছিলেন যে ঐ দেখে ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করাতে ভগবান বামন রূপ ধারণ করে বলির কাছে গিয়ে তিন পাদ জমি চাইলেন। বিষ্ণু এক পায়ে পুরো স্বর্গলোক আরেক পায়ে পুরো পৃথিবীলোক মেপে নিয়েছেন, তৃতীয় পা কোথায় রাখবেন? তখন বলি সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা পেতে দিয়েছেন। বলি এখন কোথায় যাবে? বিষ্ণু তাকে বলল তুমি পাতাল লোকে চলে যাও। বলি পাতাল লোকে চলে যাওয়াতে ইন্দ্র তখন খুব আনন্দে লাফাচ্ছে আর বলছে কোথায় বলি, কোথায় বলি বলে। তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন 'তুমি পাতাল লোকে যেখানে দেখবে একা একটা ঘোড়া, বা গাধা কিংবা ছাগল দাঁড়িয়ে আছে বুঝে নেবে ঐটাই বলি'। ইন্দ্র পাতাল লোকে গিয়ে দেখে একটা ঘরের মধ্যে একটা ছাগল একা রয়েছে। ইন্দ্র বুঝে নিয়েছে যে এই সেই বলি। বলিকে দেখে ইন্দ্র তাকে খুব কুটুক্তি করতে শুরু করে। তখন বলি ইন্দ্রকে কয়েকটি খুব মূল্যবান কথা বলছে 'ইন্দ্র! তুমি বেশি লাফিয়ো না, আমরা সবাই কালচক্রের অধীন। আমার সময় খারাপ বলে আজকে আমার এই দুর্গতি। সময় যদি আমার ভালো থাকত তখন তোমার হাতে যদি বজ্রও থাকত আর আমার হাতে সামান্য একটা ডাণ্ডা থাকত, তাই দিয়েই আমি তোমাকে শেষ করে দিতে পারতাম। সেইজন্য বলছি, তুমি হেসো না, বিদ্রুপ করো না, এই শক্তিকে নিয়ে তোমার আস্ফালন করার কিছু হয়নি, কারণ এই শক্তি হল কালের শক্তি'।

হিন্দু ধর্মের এটাই খুব রহস্য, বিশেষ করে ভাগবতেই এই ধরণের গভীর রহস্য আমরা দেখতে পাই। যে বলি এত দান করল, নিজের মাথা স্বয়ং ভগবানকে দিয়ে দিলো, তাকেও কেন পাতাল লোকে যেতে হল খুবই রহস্যের ব্যাপার। যার জন্য এও আছে, বলি যখন পাতাল লোকে চলে যাচ্ছে তখন ভগবান তাকে বলেছিলেন তুমি কি বর চাও। বলি তখন বলেছিল বছরে একদিন যেন আমি পাতাল লোকের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারি। কেরলে যে ওনাম উৎসব হয়, বলা হয় ঐদিন নাকি বলি রাজা বছরে একবার পাতাল লোক থেকে উপরে আসেন। এখানে পাতাল লোকের এক বিরাট বর্ণনা করা হয়েছে। খুব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

যে মানুষ নিজের সব কিছু এমন কি নিজের শরীরকেও সাক্ষাৎ ভগবানকে অর্পণ করে দিল, তার কি কখন এই পরিণাম হতে পারে কখন! আর শেষে কিনা একটা পাতাল লোকের ঐশ্বর্যই কপালে জুটলো! এখানে পাতাল লোককে খারাপ অর্থে বলা হচ্ছে না। বলে, সামান্য একটা হাঁচি দেওয়ার সময়, পা পিছলে পড়ে যাওয়ার সময় কিংবা কোন অসুবিধা বা বিপাকে পড়ে গিয়েও যদি কোন মানুষ একবার ভগবানের নাম নিয়ে

নেয় তার সব কর্ম বন্ধন কেটে যায়। যারা মুমুক্ষু, তারা এত যোগ অভ্যাস করেন, এত চেষ্টা করেন কিন্তু তারাও পারেন না অথচ যিনি একবার ভগবানের নাম নেন তার মুক্তি হয়ে যায়। আর সেই জায়গায় বলি সর্বস্ব ভগবানের চরণে অপর্ণ করে দিল তার কিনা পাতাল লোকের সামান্য ঐশ্বর্য হল! যে এত বড় সংযমী ত্যাগী ভক্ত তার ফল এতটুকু কি করে হতে পারে!

বলছেন – ভগবান বলির এত বড় দান গ্রহণ করে তাকে এমন একটা জিনিষ দিলেন যার ফলে বলি ভগবানকেই ভুলে গেল। তাহলে ভগবান তাকে কি কৃপা করলেন? ঐশ্বর্য পেলেতো মানুষ ভগবানকে ভুলেই যায়। বলি এত বড় দান করার পর ভগবান তাকে এই সুতল লোকের ঐশ্বর্য দিয়ে দিলেন, এতে তিনি বলিকে কি আর কৃপা করলেন! এ যেন অনেক বড় জিনিষ নিয়ে একটা ছোট্ট সামান্য জিনিষ দিয়ে দেওয়ার মত। যখন আর কোন উপায় ছিল না, তখন ভগবান যাচনার ছলে বলির সব কিছু কেড়ে নিলেন। শুধু তাই নয় বরুণ যখন বলিকে তার পাশ দিয়ে বেঁধে নিয়েছেন তখনও বলি বলছে 'ইন্দ্র কি বোকা! ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে সে আমার এই ত্রিলোক রাজ্যটাই চাইল! ভগবানের কাছে তাঁর প্রতি ভক্তি চাইল না! ভগবানের কাছে মুক্তি চাইল না! কি মুর্খ সে! ইন্দ্র যে আমার এই তিনটে লোক পেল, এই লোক কতদিন আর ভোগ করবে। খুব বেশি হলে এক মণ্বন্তর পর্যন্ত। কারণ এক মনু যখন শেষ হয়ে যায় তখন সব কিছুই আবার পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমার পিতামহ প্রহ্লাদকে ভগবান বিষ্ণু যখন তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করতে বললেন, তখন পিতামহ প্রহ্লাদ এই বর চাইলেন যে সব সময় ভগবানের প্রতি তাঁর ভক্তি যেন অটুট থাকে। কিন্তু আমিতো আর আমার পিতামহের মত মহাত্মা নই সেইজন্য ভগবানের কৃপা আমার উপর হলো না। আমার বাসনাগুলো এখন শান্ত হয়নি, এই কারণেই আমি ভগবানের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হয়েছি'। বলির ব্যাপারটা খুবই জটিল। যে নিজের সব কিছু দিয়ে শেষে নিজের মাথাটাও দিয়ে দিলেন আর ভগবান তাঁর সঙ্গে যে রকম করলেন এই নিয়ে নানান রকমের ব্যাখ্যা বিভিন্ন শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনটাতেই একটা সদুত্তর পাওয়া যায় না। মূলতঃ সবাই একটাতেই বেশি জোর দেয়, বলির কোথাও বাসনার বীজ ছিল, ভোগের ইচ্ছা ছিলো, সেইজন্যই ভগবান এই খেলা খেললেন। যেমন ঠাকুর কাশীপুরে পয়লা জানুয়ারীতে কল্পতরু হয়েছিলেন সেদিন সেখানে যে কজন গৃহীভক্ত ছিলেন, তাদের সবাইকে তিনি কৃপা করেননি। যাদের মনে একটু ভোগ বাসনা ছিল তাদেরকে তিনি সেটাই দিয়েছিলেন। এটা এর একটা ব্যাখ্যা হতে পারে।

সুতল লোকের নীচে তলাতল। ঠাকুর গাইতেন – তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন। এই লোকে রাজত্ব করেন ময় দানব। ভগবান শিব এই লোককে সুরক্ষিত রেখেছেন। তাই এই লোকের যত বাসিন্দা আছে তাদের কোন কিছু থেকে ভয় উৎপন্ন হয় না। তলাতলের ঠিক পরেই হল মহাতল, এই মহাতলে, কদ্রু তাঁর সন্তানাদি নিয়ে থাকেন, যিনি প্রজাপতির এক স্ত্রী। তাঁর অনেক সন্তানাদি ছিলো যারা বেশির ভাগই সর্প। আর এই সর্পগুলো সব ভয়ঙ্কর সর্প। এরমধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেন এরা সব নামকরা সর্প, আর এরা সব এই লোকে বাস করে। এরপরে আছে রসাতল, তারপরে পাতাল। পাতাল লোকে শঙ্খ, কুলিক, শ্বেত, মহাশঙ্খ, ধনঞ্জয় ইত্যাদি নামকরা সাপেদের বাস। এদের রাজা বাসুকি। এদের মাথায় যে মণি আছে সেই মণির আলোর ছটায় পুরো পাতাল লোক আলোকিত হয়ে থাকে। এই হচ্ছে বিভিন্ন লোকের বর্ণনা।

ষষ্ঠ স্কন্ধ

ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আমরা বিখ্যাত অজামিল উপাখ্যান পাই। তার আগে পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছে জানতে চাইছেন - আপনি যে আমাকে এতক্ষণ ভাগবতের কথা শোনালেন, মানে আগে যে পাঁচটা স্কন্ধ শোনাল হল তাতে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে? শুকদেব তখন সংক্ষেপে পাঁচটি স্কন্ধের বিষয়গুলি বলছেন – দ্বিতীয় স্কন্ধে নিবৃত্তি মার্গের বর্ণনা করা হয়েছে। নিবৃত্তি মার্গ মানে মানুষ যখন গার্হস্থ ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে একমাত্র পরমাত্মাকে জানবার জন্য যে ত্যাগের পথ অবলম্বন করে। তৃতীয় স্কন্ধে প্রবৃত্তি মার্গের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রবৃত্তি মার্গে মানুষ কর্মের দ্বারা মুক্তির চেষ্টা করে। প্রবৃত্তি হল যখন মানুষ অনেক কিছুর দিকে এগোয়, আর নিবৃত্তি মানে মানুষ সেই সব থেকে সরে আসে। কাজের দিকে মন যাওয়া হল

প্রবৃত্তি। আর কাজ থেকে সরে যাওয়াকে বলে নিবৃত্তি। কিন্তু আধ্যাত্মিক মার্গের দিকে মন গেছে সেটাকেও প্রবৃত্তি বলবে। শব্দের দুটো অর্থ একটা শাব্দিক অর্থ আরেকটা হয় বাচ্য অর্থ। প্রবৃত্তির শাব্দিক অর্থ হল যে কোন জিনিষের দিকে মন দেওয়া অর্থাৎ কোন কিছুতে প্রবৃত্ত হওয়া। আমি এখন ধর্মের দিকে মন দিয়েছি, মানে ধর্মে আমার প্রবৃত্তি এসেছে। কিন্তু যখন প্রবৃত্তি মার্গ বলা হয় তখন তার অর্থ হবে যখন গৃহস্থাশ্রমে গিয়ে কর্ম করে মানুষ একটা সিদ্ধি পেতে চায়। নিবৃত্তি মার্গ হল যখন গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর মত থেকে শুধু ঈশ্বর বা ব্রহ্মের চিন্তন করে যাওয়া। প্রবৃত্তি মার্গের মুস্কিল হল, এই যে ত্রিগুণময় লোক, সত্ত্ব, রজ ও তম গুণে মিশ্রিত এই স্বর্গ, নরকাদি লোক আছে, এর মধ্যে বার বার ঘুরপাক করতে হয়।

চতুর্থ স্কন্ধে প্রথম মণ্বন্তরের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মণ্বন্তর মানে প্রথম সৃষ্টি যখন হয়, প্রথম সৃষ্ট হলেন ব্রহ্মা, ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন মনুকে। প্রথম যে মনু হয়েছিলেন তাঁর বর্ণনা আমরা চতুর্থ স্কন্ধে পাই। পঞ্চম স্কন্ধে বিভিন্ন লোকের বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম স্কন্ধে এছাড়াও অনেক পাহাড়, নদী, কিছু ভৌগলিক বর্ণনা আছে। পঞ্চম স্কন্ধে বিভিন্ন নরকের বর্ণনা আছে, এইসব বর্ণনার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই বলে ইচ্ছে করেই আলোচনা করা হয়নি। মূল কথা নরক মানেই অধঃপতন। এখানে এখন এই নিয়েই আলোচনা করবেন, মানুষের যে অধঃপতন হয় তার থেকে কি করে বাঁচা যায়। পরীক্ষিৎ শুকদেবকে এই প্রশ্ন করেই জানতে চাইছেন মানুষকে যাতে নরকে না যেতে হয় তার জন্য কি কি করা দরকার।

অধঃপতন বা নরকে পতন হওয়া থেকে বাঁচার উপায় *(পাপ কাজ তিন ভাবে হয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, কর্মবীজ নাশের উপায়, পাপমুক্তির নয়টি উপায় ও বাসুদেবের প্রতি ভক্তি ও শরণাগতীর ভাবই শ্রেষ্ঠ উপায়)*

প্রথমে বলছে স্বর্গ নরক দুটোই আছে। পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে দিতে গিয়ে শুকদেব প্রথমে শুধু নরকের ব্যাপারে বলছেন। কিন্তু সমস্যা হল, যে ধর্মে বা যে পথে স্বর্গ থাকবে সেই ধর্মে বা সেই পথে নরকও অবশ্যম্ভাবি ভাবেই থাকবে। যে পথে সুখ থাকবে সে পথে দুঃখ থাকবেই, কিছু করার নেই। এর থেকে কি করে বেরোন যাবে? এখানে বেরোবার কথাতে যা বলছেন তা কিন্তু আধ্যাত্মিক মুক্তির অর্থে নয়। ভালো ভাবে গৃহস্থ ধর্ম পালন করেও যাতে নরকে গিয়ে পড়তে না হয় তার জন্য কি পথ আছে? আসলে নরক থেকে বাঁচার দুটি পথ – একটি পথ হল যখন আধ্যাত্মিক মুক্তি হয়ে যাবে, মানে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেলে তখন আর নরকের কোন প্রশ্নই আসবে না, সেই অবস্থায় স্বর্গও নেই নরকও নেই। কিন্তু এই ধরণের মানুষ কোটিতে খুবই মুষ্টিমেয় কয়েকজন। তাহলে বাকী যারা, অসংখ্য কোটি কোটি মানুষ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে, যারা মুক্তির ব্যাপরটি কি তাই জানে না, আর যারা ভাসা ভাস জানে তাদেরও মুক্তি পাবার কোন আগ্রহই নেই, তারা বলছে আমরা এই জীবনকে এই লোকে আর মৃত্যুর পর স্বর্গ লোকে গিয়েও ভোগ করতে চাই, এদের কি হবে? আপনি তাদের বোঝাবেন যে দ্যাখো ভাই সুখ হলে দুঃখও হবে। তারা বলবে তা হোক না মশাই, একটু না হয় দুঃখ সহ্য করব, এটুকু দুঃখের বিনিময়ে আমি বেশি করে সুখ পেতে চাই। আর তার সাথে যদি পথটা বলে দেন যাতে নরকে না যেতে হয়, তাহলেই আমার চলে যাবে, এর থেকে বেশি কিছু আর আমি চাইনা। বাস্তবে বেশির ভাগ মানুষই এই শ্রেণির। যারা মঠ মিশনে ঘুরঘুর করছে, সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করছে এদের বেশীর ভাগই কেউ মুক্তি চায় না। বেশির ভাগই মনে প্রাণে চাইছে জাগতিক সুখ, ভালো চাকরি, ভালো স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, গাড়ি, বাড়ি, রোগমুক্ত শরীর। ঠিক ঠিক সুখ দুঃখের পারে যেতে চান খুব কম লোক। মূল প্রশ্ন হলো যাতে আমার অধোগতি না হয়। হিন্দুদের যে জন্মান্তরের ধারণা, ভালো কর্ম না করলে সাপ ব্যাঙ পোকা মাকড় হয়ে জন্মাতে হবে, এগুলো যাতে না হয়।

তখন শুকদেব বলছেন – মানুষ তিন ভাবে পাপ কাজ করে, শরীর দিয়ে পাপ করে, মানসিক ভাবে পাপ করে আর বাক্ দিয়ে পাপ কাজ করে। এর মধ্যে শরীরের পাপ সব থেকে গর্হিত, বাচিক পাপ এর থেকে একটু কম আর মানসিক তার থেকে আরো একটু কম। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এর ঠিক উল্টো। মনের পাপ সব থেকে খারাপ, বাচিক পাপ তার থেকে একটু কম আর শরীরের পাপ তার থেকেও কম। যারা কথামৃত নিয়মিত পড়েন তারা বলবেন ঠাকুরতো বলেছেন কলি যুগে মনের পাপ পাপ নয়, কিন্তু তিনি কথামৃতে এর

ঠিক উল্টো একটা কথাও বলেছেন। তা হলো – ঠাকুর বলেছেন গৃহস্থরা মনে ত্যাগ করবে আর সন্ন্যাসী দুটোই ত্যাগ করবে। এর দ্বারা ঠাকুর বোঝাতে চাইছেন তুমি যদি শরীর দিয়ে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ভোগ কর তাহলে কিন্তু তোমার আর আধ্যাত্মিকতা তো থাকলই না উপরন্তু এর ফলে তোমার ভেতরে সাংসারিক সংস্কার আরও দৃঢ় ভাবে গেঁথে গিয়ে তোমার আরও অনেকগুলো জন্মের সম্ভবনা তৈরী করে দেবে। গৃহস্থদের এটাই বলছেন – তুমি বাইরে অনেক কিছু করতে পার কিন্তু মন থেকে সব কিছু ত্যাগ করবে। ঠাকুর তাই সংসারীদের মনে ত্যাগ করতে বলছেন। শরীরের থেকে মনের যে বন্ধন তৈরী হয় সেটা আরো ক্ষতিকর। তুমি বিয়ে করেছ, সন্তান হয়েছে, তাদের প্রতিপালন যা করার করবে কিন্তু মনের মধ্যে অনাসক্ত ভাব অবলম্বন করে সব কিছু করে যাবে। মনের ত্যাগই আসল ত্যাগ, মনে ত্যাগ না হলে আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নই আসবে না।

কিন্তু সন্ন্যাসীদের দুটোকেই ত্যাগ করার কথা বলছেন, বাইরেও ত্যাগ আবার মনেও ত্যাগ। বাইরের ত্যাগ করতে কেন বলছেন? লোকশিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসীর বাইরের ত্যাগ দেখলে সংসারীদের মধ্যেও ত্যাগের ভাব আসবে। কারুর মনে যদি একটু বন্ধন বা বাসনা থাকে, সেটুকু বাসনাই যে তাকে কোথায় উপড়ে ফেলে দেবে বুঝতেও দেবে না। যে মনে ত্যাগ করে দেয় তার সত্যিকারের কিছুই বিকার আসে না। আসলে হয় কি আমাদের সবার মন পাপে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। এর ফলে ত্যাগী পুরুষের অনেক আচার ব্যবহারকে আমরা আমাদের ঐ পাপভাব দিয়েই বিচার করি। তাই মানুষ কি করল আর কি না করল সেটা বড় কথা নয়, দেখতে হয় মনে ঠিক ঠিক ত্যাগের ভাব আছে কিনা।

শুকদেব বলছেন – মানুষ তিন ভাবে পাপ করে যদি প্রায়শ্চিত্ত করে নেয় তাহলে তো ঠিক আছে, কিন্তু যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহলে তাকে নরকে যেতে হবে। তাই বলা হয় যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে হয়। পরীক্ষিৎ বলছেন 'হে প্রভু শুকদেব! আপনি যা বলছেন তা ঠিকই বলছেন, মানুষ জানে যে পাপ করাটা ভালো না, তবুও বাসনা এমন জিনিষ যে অজ্ঞানতাবশতঃ বার বার এই বাসনা মানুষকে পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। আরো বাজে ব্যাপার হলো একটা পাপ কাজ করার পর প্রায়শ্চিত্ত করে নিলো কিন্ত আবার ঐ পাপ কাজের দিকেই তার মন যায়। *ক্বচিন্নিবর্ততেহভদ্রাৎক্বচিচ্চরতি তৎপুনঃ। প্রায়শ্চিত্তম-তোহপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ।।৬/১/১০।* হাতিকে যেমন স্নান করিয়ে দিলে আবার গায়ে ধুলো ছেটাতে থাকে, তাতে কি লাভ হল তার স্নান করে, সেই রকম মানুষের এই সব প্রায়শ্চিত্তাদি হাতির স্নানের মত নিষ্ফল'। এখানে দুটো সমস্যার কথা পরীক্ষিৎ নিয়ে এসেছেন। মানুষের মধ্যে এতো কামনা বাসনা যে সে বার বার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। শুধু তাই নয়, একবার প্রবৃত্ত হয়ে যখন দুঃখ, কষ্ট, আঘাত পেতে থাকে তখন বলে আমি আর এদিকে যাবো না। অনুশোচনা হওয়ার পর প্রায়শ্চিত্ত করে নিল। প্রায়শ্চিত্ত করার পর আবার সে ঐ প্রবৃত্তির মধ্যে ঢুকে যায়, আর ঐ কাজগুলিই করতে থাকে।

পরীক্ষিৎ এই কথা বলার পর শুকদেব বলছেন – *কর্মণা কর্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে। অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্।।৬/১/১১।* কর্মের দ্বারা কর্ম বীজের কখনই মূলোচ্ছেদ হয় না। কারণ অজ্ঞান আর অবিদ্যা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পাপ-বাসনার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভব নয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। এই শ্লোকে শুকদেব আমাদের হিন্দু ধর্মের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরেছেন। কুড়াল দিয়ে একটা বট বৃক্ষকে কেটে দিলে গাছটা পড়ে যাবে, কিন্তু গাছের শেকড়টা থেকে যাবে। কাল সকালেই আবার ফেকড়ি বেরিয়ে যাবে। বৃক্ষের বীজ পড়ে থাকলে সেখান থেকে আবার গাছ দাঁড়িয়ে যাবে। ঠিক সেই রকম কর্মের দ্বারা কর্মের বীজকে কখনই নাশ করা যায় না। কর্ম কর্মকে নাশ করবে না। আপনি একটা পাপ করেছেন তারপর প্রায়শ্চিত্ত করলেন, আপনার ঐ পাপটা নষ্ট হয়ে গেল কিন্তু পাপ কর্মের যে বীজটা থেকে গেছে সেটি নষ্ট হবে না। এই বীজটা কিভাবে নষ্ট হয়? যাঁরা জ্ঞান মার্গের তাঁরা বলবেন জ্ঞানের দ্বারা বীজ নষ্ট হয়ে যায়, যেমন গীতায় ভগবান বলছেন *'যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন'*। স্তুপিকৃত কাঠ রাখা আছে, তার মধ্যে একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ফেলে দিলে সেই স্তুপিকৃত কাঠ নিমেষের মধ্যে ভস্ম হয়ে যাবে। কিন্তু কাঠ দিয়ে কাঠকে ভস্ম করা যাবে না। রাজযোগ বলছে সমাধিবান পুরুষ সমাধি লাভের মধ্য দিয়েই তাঁর

কর্মের সমস্ত বীজ নাশ হয়ে যায়। আবার যারা ভক্তিমার্গের তারা বলবে ঈশ্বরে ভক্তি দিয়ে কর্মের বীজ নাশ হয়। কিন্তু কর্ম দিয়ে কর্মের বীজ নাশ হয় এই কথা কেউ বলবে না। যে গীতা এত কর্মের কথা বলেছে সেখানেও দেখা যাবে না যে কর্ম দিয়ে কর্ম নাশ হবে বলছেন। কারুর মনে হল – এই জন্মে কত পাপ করেছি, যাই এবার একটু তীর্থাদি করে আসি। কাশী, বৃন্দাবন, পুরী, হরিদ্বার ঘুরে এল। এ জন্মের তার যত পাপ সব হয়তো শেষ হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যেই আবার কলকাতায় নিজের বাড়িতে ঢুকবে পরের দিন থেকে আবার গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। এটাই এক মস্ত সমস্যা।

সেইজন্য বলছেন, অজ্ঞান যতক্ষণ আছে ততক্ষণ পাপ বাসনাগুলো কোন মতেই যাবে না। ঠিক ঠিক বীজনাশ হয় একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানে। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, আমি স্বরূপত কে – এই বোধ যখন হবে তখনই সমস্ত কর্মবীজের নাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য শুকদেব বলছেন মানুষ যখন ঈশ্বরের স্বরূপ জেনে যায়, মানুষ যখন আত্মস্বরূপকে জেনে নেয় তখন এটাই সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত। মনুস্মৃতিতে কত রকম প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে কিন্তু মনুও বলছেন আসল প্রায়শ্চিত্ত হয় আত্মজ্ঞানে। মুখে একটু গঙ্গা জলের আচমন করে নিল, কি একটা জগন্নাথের আটকে প্রসাদ খেয়ে নিল তাতেই কি সব শেষ হয়ে যাবে? কখনই হবে না। হবে, কিন্তু আবার হাতির স্নানের পর ধুলো মাখার মত গোলমাল হয়ে যাবে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এই গোলমাল বন্ধ হবে না।

শুকদেব এবারে একটা উপমার সাহায্যে পরীক্ষিৎকে বোঝাচ্ছেন। ভাগবতের উপমাগুলো অতুলনীয়। বলছেন *নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি। এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈ ক্ষেমায় কল্পতে।।৬/১/১২।* রোগী যদি কেবলই সুপথ্য খেতে থাকে তাতেই কি তার রোগ ব্যাধি সেরে যাবে? কখনই সারবে না। যার ডায়বেটিস হয়েছে এখন সে যদি চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেয় তাতে তার ডায়বেটিস সারবে না কিন্তু বাড়বেও না, একটা নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে, একেবারে সেরে যাবে না। ডায়বেটিস সারাবার জন্য তাকে আলাদা চিকিৎসা করাতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করা মানে হচ্ছে শুধু সুপথ্য খেয়ে যাওয়া। আপনি হয়তো বলতে পারেন এর উল্টোও হতে পারে, প্রায়শ্চিত্ত করা মানে ওষুধ খাওয়া। উল্টোটা এইজন্যই বলা যাবে না কারণ এখানে এটাই শাস্ত্রবিধান। শাস্ত্রবিধানটা কি? আমি বলব প্রায়শ্চিত্ত করা মানে ওষুধ খাওয়া, আপনি বলবেন প্রায়শ্চিত্ত করা মানে সুপথ্য খাওয়া, আরেকজন বলবে প্রায়শ্চিত্ত করার কোন মূল্যই নেই, আবার অন্য একজন বলবে প্রায়শ্চিত্ত করার কোন মূল্য নেইতো দূরের কথা একেবারেই ফালতু একগাদা অর্থের অপচয় করা।

প্রায়শ্চিত্ত করার যে প্রয়োজনীয়তা আছে এটার মীমাংসা কে করবে? *‘তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ’*- ভগবান অর্জুনকে বলছেন – কোনটা করবে কোনটা করবে না, এই ব্যাপারে তোমার নিজের বুদ্ধি লাগাতে যেও না, শাস্ত্র কি বলছে একমাত্র সেটাই অনুসরণ করবে। আগে তোমাকে ভাবতে হবে তুমি কি পরম্পরা থেকে এই কথা বলছ? তোমাকে এটা কে শিখিয়েছে? কোথা থেকে এটা তুমি পেলে? আর তোমার এই কথা বলার পেছনে কতটা সাধনা আছে? তুমি বলবে তুমি তোমার মন থেকে পেয়েছ। কিন্তু তোমার মনতো নোংরা আবর্জনাতে ভরা নর্দমার মত, তোমার নর্দমার জল আমি কি করে নিতে পারি। তোমার যদি ধর্মে মতি থাকে, তুমি যদি ধর্ম পালন করতে চাও তবে এই সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য একটি কথাই বলা হয়েছে – *‘তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ’*– শাস্ত্র যা বলছে তাই চুপচাপ মেনে নাও, তোমার নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেও না। সেইজন্য সুপথ্য খাওয়া, প্রায়শ্চিত্তের কি মূল্য এগুলো আমার আপনার কথাতে নির্ধারিত হবে না, শাস্ত্র যেটা বলছে সেটাই হবে। আর শাস্ত্র কি বলছে? তুমি যতই প্রায়শ্চিত্ত কর তাতে তোমার কর্মবীজ কিন্তু নাশ হবে না। তুমি যে পাপগুলি করেছিলে সেগুলো হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে কিন্তু নতুন করে আবার পাপ কার্যে তুমি নামবেই নামবে। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞান কি করে লাভ করা যায় তার চেষ্টা কর।

পর পর দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলছেন *তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ। ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন চ।। দেহবাগ্বুদ্ধিজং ধীরা ধর্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ।।৬/১৩-১৪।* বাঁশবনের জঙ্গলে যদি আগুন লেগে যায় তাহলে পুরো জঙ্গল পুড়ে

ছাই হয়ে যায়। গীতাতেও এই একই কথা বলছেন *‘যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন’*। এখানে বলছেন – মানুষ যদি নয়টি কাজ করে তাহলে শরীর, মন আর বাক্য দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। কি কি নয়টি কাজ? প্রথম হল তপস্যা, তপস্যা মানে কোন একটা শুভ কাজ ঠিক করে নিয়ে সেই কাজটাই দীর্ঘ দিন ধরে করে যাওয়া। যেমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাই হয়ে যাক না কেন, প্রতিদিন ভোরবেলায় মঙ্গলারতিতে যাবেনই যাবেন। শরীর যতই খারাপ হোক মঙ্গলারতিতে যাবেনই। একজন বৃদ্ধ মহারাজ ছিলেন, নড়তে চড়তেও পারেন না, দুজন সেবককে বলা ছিলো, ওরা দুজনে ধরে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিয়ে আসতেন। এটাই তপস্যা। ঈশ্বরের প্রতি যে নিষ্ঠা সেই নিষ্ঠাটাকে এই তপস্যার মাধ্যমে নিয়ে আসা হল, তা যত বিঘ্নই আসুক না কেন, ঐ কাজটাই নিষ্ঠা সহকারে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর করে যাবেন। কেউ ঠিক করে নিলেন সকাল বিকাল রোজ এক ঘন্টা করে জপ করব। এরপর যাই হয়ে যাক, উল্কাপাত হোক কি ভূমিকম্প হোক দীর্ঘকাল ব্যাপি প্রত্যেক দিন যদি এক ঘন্টা করে সকাল বিকাল জপ করে যান, কিছু দিন পর থেকেই তাঁর মধ্যে একটা বিশেষ শক্তি জাগ্রত হবেই, হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য মানে, মনকে এদিক সেদিক যেতে না দেওয়া। ব্রহ্মচর্যের মানে এই নয় যে সে বিয়েথা করবে না, এর প্রকৃত তাৎপর্য হল একটা সুনিয়ন্ত্রিত জীবন। তৃতীয় ইন্দ্রিয় দমন, মানে নিজের হাত, পা, জিহ্বা, চোখ, কান, নাককে সংযমে রাখা। চতুর্থ হচ্ছে মনের স্থিরতা, অর্থাৎ মনকে কোনভাবেই ডান দিক বাম দিক যেতে না দেওয়া। মনের স্থৈর্যতা বোঝা যাবে যখন তাকে কোথাও চুপ করে বসিয়ে দেওয়া হয়, যদি মন অস্থির থাকে তাহলে দেখা যাবে হয় সে হাত নাড়ছে নয়তো পা দোলাচ্ছে। মন যত স্থির হবে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তত শান্ত হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ধীর, স্থির ও শান্ত, এত তীর তাঁর শরীরে এসে বিদ্ধ হচ্ছে তবুও তাঁর চোখেমুখে কোন প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন ছিল না। পঞ্চম দান করা। দান ত্যাগেরই একটা প্রাথমিক রূপ। সংসার তো কেউ একদিনেই ত্যাগ করতে পারবে না, কিন্তু একটু একটু করে দানের মধ্য দিয়ে, গরীব মানুষকে দান করছে, সাধুদের প্রণামী দিচ্ছে এইভাবে সংসার ত্যাগের প্রস্তুতি তৈরী হতে থাকে। ষষ্ঠ হল সত্য – truthfulness, যত বেশী পারা যায় সত্যের প্রতি নিষ্টা রাখা। সত্যে থাকা, সত্য কথা বলা এগুলো বুঝতে অনেক সময় লাগে। অনেক অসংস্কৃত সম্পন্ন ব্যাক্তি আছেন যারা বলেন আমি কিন্তু সত্য কথা বলতে ভয় পাইনা। কার ব্যাপারে সত্য কথা বলতে ভয় পায়না তারা? অপরের ব্যাপারে ভয় পায়না, কিন্তু নিজের ব্যাপারে সত্য কথা বলার সময় ভয়ে মুখ বন্ধ করে রাখে। এরা যখন কারুর সমালোচনা করে তখন যদি তাকে নিষেধ করে বলা হয় ‘ওরকম বলবেন না’। তখন লাফিয়ে উঠে বলবে ‘আপনি জানেন না, আমি সত্য কথা বলতে ভয় পাইনা’। কিন্তু নিজের ব্যাপারে কোন কথা মুখ দিয়ে বেরোবে না। এরা হচ্ছে অত্যন্ত স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ধুর্ত প্রকৃতির লোক। সত্য মানে এই নয় যে আপনি সত্য কথা বলে কারুর ক্ষতি করে দেবেন বা সত্য কথা বলতে গিয়ে আপনার ভেতরের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হয়ে যাবে। এগুলো মিথ্যা কথা বলার থেকে আরও ক্ষতিকর। ভীষ্ম বললেন আমি প্রতিজ্ঞা করছি এই কুরুবংশের সাম্রাজ্য রক্ষা করব। ভীষ্মের এই সত্য রক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে গেল। কুরুবংশের তিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সবাই তাঁকে সম্মান ও মর্যাদ দেন, ভীষ্ম দুর্যোধনকে যদি একটা কষে চড় মেরে দিতেন সেখানেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর সত্যকে আঁকড়ে থাকার জন্য ক্ষত্রিয়কুলের মহা বিনাশ সংঘটিত হয়ে গেল। তাও আমরা ভীষ্মের কত নাম করি, কত শ্রদ্ধা করি। এগুলো খুব জটিল ও সূক্ষ্ম ব্যাপার।

সত্যের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে নিজের রাগ আর দ্বেষ প্রেরিত না হয়ে মিথ্যা কথা না বলা। আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলে আপনার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিতে পারি কিংবা আমি আপনার উপর চটে আছি সেইজন্য আপনাকে একটা মিথ্যা কথা বলে দিলাম। রাগ আর দ্বেষ থেকে প্রেরিত হয়ে যে মিথ্যা কথা বলা হয় তাকেই মিথ্যা কথা বলে, এই দুটোর বাইরে মিথ্যা কথাকে মিথ্যা বলে ধরা যায় না। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন – বাচ্চা ছেলে দুধ খেতে চায় না বলে তাকে বলা হয় ‘বাবা দুধ খাও, দুধ খেলে তোমার চন্দ্রিমা বাড়বে’, মানে তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে, বাচ্চাও তাড়াতাড়ি করে ঢক্ঢক্ করে দুধটা খেয়ে নেয়। শঙ্করাচার্য যেটা ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে, দুধ খেলে তোমার চুল তাড়াতাড়ি লম্বা হবে

'চূড়াবর্দ্ধনম্'। বাচ্চা ছেলেরা চুল খুব ভালোবাসে, তা দুধ খেলে চুল বড় হবে শুনে সে কোন রকমে দুধটা খেয়ে নেয়। এই মিথ্যা কথাকে আদপেই মিথ্যা কথার মধ্যে ফেলা যাবে না। আচার্য বলছেন – শাস্ত্রে যে অনেক রকম কথা বলা হয়েছে তা হল বাচ্চা ছেলেকে দুধ খাওয়াতে চুল লম্বা হবে বলার মত। শ্রীমা ঠাকুরকে এক সময় পাঁচ সের দুধকে ঘন করে এক সের করে খাওয়াতেন। ঠাকুর একদিন জিজ্ঞেস করছেন এখানে কত দুধ আছে। শ্রীমা মিথ্যা করে বলছেন 'কত আর হবে এক সের হবে হয়তো'। ঠাকুরকে খাওয়াতে হবে, কিছুই খাচ্ছেন না, তাই মিথ্যে করে বললেন। অথচ পাঁচ সের দুধকে ঘন করে এক সের করে খাওয়াচ্ছেন। তারপর গোলাপ মাকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, গোলাপ মা বলে দিয়েছেন পাঁচ সের। তখন মাকে ডেকে এনে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন 'গোলাপ বলছে পাঁচ সের আর তুমি বলছ এক সের'। মা বলছেন 'গোলাপ এখানকার মাপ জানে না, এটা এক সের দুধ'। শ্রীমাকে আমরা জগজ্জননী বলি, সেই জগজ্জননী মিথ্যা কথা বলছেন, কি না, মাপের দোষ আছে। দক্ষিণেশ্বরের মাপ এক রকম আর কালিঘাটের মাপ অন্য রকম নাকি? এই ভাবতেই ঠাকুরের মাথায় এলো আমাকে পাঁচ সের দুধ খাইয়ে দিচ্ছে, যেই বুঝে গেলেন অমনি তাঁর পেট খারাপ হয়ে গেল। তখন গোলাপ মা শ্রীমাকে বলছেন 'তুমি আমাকে আগে বলে দাওনি কেন, আমি তো সরল মনে বলে দিয়েছি'। পরবর্তি কালে মাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মা আপনিতো তখন মিথ্যে কথা বলেছিলেন, তাও একবার নয় দু দুবার, একবার পাঁচ সেরকে এক সের আবার পরে বলেছেন এটা অন্য মাপ। তখন শ্রীমা বলছেন 'বাচ্চাকে, রুগীকে খাওয়াতে গেলে যদি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়ে তাহলে সেটা মিথ্যা হয় না'। কেন নয়? রাগ দ্বেষ প্রেরিত নয়, কারুর ভালোর জন্য এই মিথ্যা কথাটা বলা হচ্ছে।

সপ্তম হল পবিত্রতা। ভেতর ও বাইরে দুদিকেই পবিত্রতা। মনের পবিত্রতা হল ভেতরের আর বাইরের পবিত্রতা মানে স্নান করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে স্নানের ব্যাপারটা খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ের। যাদের পারিবারিক একটু সংস্কার আছে তারা কখনই স্নান না করে কিছু খাবে না, অল্প বয়সে হয়তো মানতে চাইবে না, কিন্তু একটু বয়স হয়ে গেলে স্নান না করে না খাওয়ার পারিবারিক সংস্কারটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। অন্যান্য ধর্মে শেষ কবে স্নান করছে কেউ বলতে পারবে না, এই কারণেই হিন্দুরা এদের ম্লেচ্ছ বলে। অষ্টম আর নবম হল যম আর নিয়ম। যম নিয়ম মানে কিছু কিছু সদ্গুণ ও মূল্যবোধের অনুশীলন করা। সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ – কারুর জিনিষ চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা, কারুকে হিংসা না করা ইত্যাদি।

ভাগবত মূলতঃ ভক্তিশাস্ত্র, তাই একটু পরে পরেই ভাগবতে ভক্তির অনেক প্রশংসা ও স্তুতি করা হয়। এত কিছু বলার পর এবার শুকদেব ভক্তির প্রশংসা করে বলছেন *কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কাৎর্স্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ।।৬/১/১৫।* ভগবান বাসুদেবের চরণে যে আশ্রয় নিয়েছে, ঠিক ঠিক শরণাগতি নিয়েছে, যদিও এই রকম লোক খুবই মুষ্টিমেয়, সূর্যোদয়ের কিরণে অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি শুধু বাসুদেবের শরণাগতিতেই তার সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমরা মুখে যদিও বলি হে ঠাকুর আমি তোমার শরণাগত, কিন্তু ঈশ্বরের শরণাগত অত সহজে হওয়া যায় না। প্রথমে বলা হল বিরাট লম্বা লম্বা প্রায়শ্চিত্তের কথা, দ্বিতীয় এই নয়টি সদ্গুণের অভ্যাস করার কথা বলা হল। কিন্তু এসব কিছুই করতে হবে না, সব পাপ শেষ হয়ে যাবে যদি সে কেবল মাত্র ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিকে আশ্রয় করে নেয়। কি রকম ভক্তি? ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতি। আমরা মনে করি রোজ যদি ঠাকুরের চরণে মাথা ঠুকে বলি 'হে প্রভু, আজ থেকে আমি তোমার শরণাগত হলাম', তাহলেই শরণাগতির ভাব এসে যাবে। আসলে কিন্তু তা হয় না। শরণাগতির ভাব আধ্যাত্মিক পথের এক খুব উচ্চ অবস্থা। আমাদের জীবনের অনেক কাঠখড় না পুড়লে ঠিক ঠিক শরণাগতীর ভাব আসে না। তিনি যখন তাঁর ভক্তকে শরণাগতীর ভাব দেবেন ঠিক করেন তার আগে তিনি খুব করে ভক্তকে মার দিতে শুরু করেন। শ্রীমা বলছেন 'আমার ছেলে যদি নোংরা ঘেটে আসে তাহলে তো আমাকেই পরিষ্কার করে কোলে নিতে হবে, কেন না আমি যে মা'। ঠিকই, তিনি যে মা। কিন্তু ছেলে যদি খুব নোংরা ঘেটে আসে তখন মা ধোপা যেমন নোংরা কাপড় আছাড় মেরে কাচে, ঠিক সেই রকম আছাড় মারতে

শুরু করেন। ধোপার মত যখন ভগবান আছাড় মারতে শুরু করেন তখন বোঝা যাবে শ্রীমার কথা, ধুয়ে মুছে নেওয়া কাকে বলে। আমাদের বেশির ভাগেরই অবস্থা ধোপার আছাড় দেওয়ার মত, এত ময়লা যে আছাড় না মারলে ময়লা ছাড়ান যাবে না। এত মার খাওয়ার পরেও সে যদি ভগবানকে ধরে থাকে তাহলে সে বেঁচে যায়। এই যে আমরা যে কথাগুলি বলি ভগবানের আশ্রয় নিলে মানুষ বেঁচে যায়। কিন্তু মানুষ বাঁচে না, বাঁচার কোন সুযোগই নেই। কর্মের তোড় যখন আসে কেউ বাঁচতে পারে না। যে ভগবানের আশ্রয় নিয়েছে তার ওপরেও ধাক্কা আসে, কিন্তু ভগবানকে ধরে আছে বলে ঐ ধাক্কাটাকে সামলে নিতে পারে, বাকীরা পারে না। সেইজন্য শ্রীমা বলছেন 'যেখানে তরোয়ালের ফাল যাওয়ার কথা সেখানে হয়তো একটা চোঁচ ফুটবে'। কিন্তু ফুটবেই, একটু না একটু দেবেই, কম হলেও আঘাত আসবেই।

শুকদেব বলছেন – হে পরীক্ষিৎ, পাপী পুরুষদের পাপের শুদ্ধির যত রকমের পথ আছে, ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ আর তাঁর ভক্তের সেবা করে যে শুদ্ধি হবে অন্য কোন ভাবে এই শুদ্ধি হয় না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – ভাগবত, ভক্ত ও ভগবানের চরণে প্রণাম। কেশব সেনকে ঠাকুর বলছেন 'বলো গুরু, কৃষ্ণ আর বৈষ্ণব'। যদিও কেশব সেন বলছেন 'অত দূর নয়, তাহলে দল-টল থাকবে না'। ভগবান যিনি তিনিই এই ভাগবত হয়েছেন, মানে ঈশ্বরীয় কথা আর ঈশ্বর এক। আর ঈশ্বরের যারা ভক্ত তিনিও ভগবানের সঙ্গে এক। ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় কথা, আর ঈশ্বরের ভক্ত এক। সেইজন্য বলে বৈষ্ণব অপরাধ মানে কখনই কোন ভক্তের নিন্দা করতে নেই। এখানে যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসেছেন, ভেতরে ঈশ্বরের প্রতি একটু ভক্তি এসেছে বলেই এখানে এসেছেন। এখন কেউ যদি বলেন যে অমুক মোটেই সুবিধার লোক না। আরে তিনিও তো ভক্ত, কত দূর থেকে কষ্ট করে এখানে আসেছেন। এটাই বৈষ্ণব অপরাধ। যিনি ভগবানের প্রতি মন, প্রাণ দিয়েছেন সে যত বড়ই ধাপ্পাবাজ হোক সেতো ভক্ত, ভগবান তাকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সেইজন্য কোন ভক্তের নিন্দা করে বৈষ্ণব অপরাধ করতে নেই। সেইজন্য শুকদেব বলছেন – *সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ। সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ।।৬/১/১৭।* এই লোকে ভক্তির পথই শ্রেষ্ঠ পথ, এতে কোন ভয় নেই আর এই পথ পরম কল্যাণময়। যারা সাধু, ভগবান বাসুদেবের প্রতি যাঁরা আত্মপরায়ণ, তাঁরা এই কারণে ভক্তির পথকেই অবলম্বন করেন। অন্য পথে ভরসা কম, আর কষ্টকর। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাচেতসাম্,* যারা জ্ঞান পথকে অবলম্বন করে তাদের কষ্ট অনেক বেশি। ভক্তির পথ সহজ পথ, ঠাকুরও এই কথা বারবার বলছেন। কিন্তু ভক্তির পথ যে কিছুই নয়, দুধ-ভাতের মত হবে, তা নয়। এই পথেও কষ্ট, লড়াই, ঝঞ্ঝাট আছে, কিন্তু অন্যান্য পথে যতটা আছে তার তুলনায় ভক্তি পথে অনেক কম। মানুষের মধ্যে যে প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে, মনের যে আবেগগুলো আছে, সেগুলোকে মোর ঘুরিয়ে ভক্তি পথে এগোলে অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

অজামিল উপাখ্যান *(ধর্ম ও অধর্মের ব্যাখ্যা, পাপকর্মে যারা সাক্ষী থাকেন)*

এইসব বলে শুকদেব ভক্তি পথ যে সহজ পথ তার সমর্থনে পরীক্ষিৎকে একটি পুরনো কাহিনী শোনাচ্ছেন। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন 'এই ব্যাপারে তোমাকে আমি একটা পুরনো ইতিহাস বলব'। শব্দটা হল – '*ইতিহাসং পুরাতনম্*'। এই বলে তিনি পরীক্ষিৎকে অজামিলের কাহিনী বলছেন। *কান্যকুব্জে দ্বিজঃ কশ্চিদ্দাসীপতিরজামিলঃ। নাম্না নষ্টসদাচারো দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ।।৬/১/২১।* বহু প্রাচীন কালে কান্যকুব্জ নগরে অজামিল বলে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। *'কশ্চিৎ দাসীপতিঃ অজামিলঃ'* কোন এক কালে দাসীপতি অজামিল বলে একজন ছিল। এখানে দাসীপতি বলতে বোঝাতে চাইছেন, অজামিল নিচু বর্ণের এক মেয়েকে নিজের ঘরে রেখেছে। অজামিল ছিল ব্রাহ্মণ কিন্তু সে তার ঘরে এক নিচু জাতের মেয়েকে রেখে দিয়েছে বা সেই মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে তার অধীনে আছে। মহাভারতেও অনেক কাহিনীতে এই ধরণের ব্রাহ্মণদের, যারা শূদ্রা মেয়েকে বিবাহ করেছে বা কাছে রেখে দিয়েছে, তাদের অনেক নিন্দা করা হয়েছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের দিনে যাদের শূদ্র বলা হয় আর মহাভারতের যুগে যাদের শূদ্র বলা হত এদের সাথে কিন্তু কোথাও কোন মিল নেই, একেবারেই আলাদা। তখনকার দিনে যারা শূদ্র ছিল তারা আজকের দিনে

বৈশ্য আর ক্ষত্রিয়। মহাভারতের যুগে যখন আর্যরা নিজেদের ভারতের বিভিন্ন দিকে বিস্তার করছিল তখন বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন ধরণের জাতি, উপজাতিদের আর্য সংস্কৃতি ও ভাবধারাতে জায়গা করে দিতে গিয়ে তাদের শূদ্র বানিয়ে রাখল। মনে করুন এখানকার কিছু শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ আফ্রিকার কোন আদবাসি এলাকায় চলে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। এরপর শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষদের সাথে তাদের পরস্পরের মেলামেশা শুরু হল। এরপর তারা গীতা আর উপনিষদের কিছু কিছু কথা শুনে ধারণা করতে থাকল। তারপর সেই আফ্রিকার নিগ্রোদের কেউ যদি পরে ভারতে এসে বলে আমি উপনিষদ শেখাব। তখন কি কেউ তার কাছে উপনিষদ শিখতে বা শুনতে চাইবে? কেউই চাইবে না। যদি এদের কেউ বলে আমি আপনাদের বাড়িতে যজ্ঞ করাব, তখন কি কেউ সেই নিগ্রোকে দিয়ে যজ্ঞ করাবে? না করাবার তো কিছু নেই তারতো বেদ উপনিষদ সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে আছে। তবুও করাবে না। কেন? একেবারে শূদ্র থেকে তাকে কেউ ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিতে পারবে না। আর্যদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়েছিল। তবে কয়েক হাজার এই ভাবধারার সঙ্গে থাকতে থাকতে একটা সময় থেকে তাদের শূদ্র থেকে উপরে স্থান দেওয়া শুরু হয়। এখন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাই আছে, মহাভারতের সময়কার শূদ্র এখন ভারতে আর নেই।

যাই হোক, কান্যাকুব্জ নগরে অজামিল নামে এই ব্রাহ্মণ থাকতেন, তিনি ছিলেন দাসীপতি। এখানেও পুরাণের ধারাকে বজায় রাখা হয়েছে। যখন কাউকে ভালো বানাবে তখন সব ভালো ভালো গুণগুলো তাকে ঢেলে দিতে হবে, আর কাউকে যখন খারাপ বানাতে হবে তখন তাকে সব খারাপ গুণগুলো ঢেলে দিতে হবে। এখানে তাই বলছে, ঐ মেয়েটির সংসর্গে এসে অজামিলের সব কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে অজামিল পতিত হয়ে গেল। এত পতিত হয়ে গেল যে রাস্থা দিয়ে যেসব পথিকরা যেত তাদের সর্বস্ব লুট করতে শুরু করল। এতেও যেন পুরাণের পতিতের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। তাই অজামিল আবার অসদুপায় অবলম্বন করে জুয়াতে সবাইকে হারিয়ে দিত, এই ধরণের আরও অনেক দুর্গুণের বর্ণনা করার পর ‘পতিত’ শব্দের সার্থকতা পেল। মানে যত রকমের খারাপ কাজ হতে পারে অজামিল তার সবই করত।

তারপর অজামিলের বয়স হয়ে গেল, প্রায় ৮৮ বছরের হয়ে গেছে। অজামিলের যে শেষ পুত্র সন্তান হয়েছিল তার নাম রেখেছিল নারায়ণ। এখন তার মৃত্যুর সময় যখন হয়ে গেছে তখন তিন জন যমদূত তাকে নিতে এসেছে। তিন জন যমদূতের বর্ণনা করা হচ্ছে। একজন হাতে দড়ি নিয়ে আছে ফাঁস মারার জন্য, মুখ গুলো বিভৎস ভাবে এবড়ো খেবড়ো, এ্যঁকাব্যঁকা। আর শরীরের লোমগুলো সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে আছে। এদেরকে দেখে অজামিল ভয়ে আঁৎকে উঠেছে। ভয়ে সে খুব জোরে চিৎকার করে ‘নারায়ণ’ ‘নারায়ণ’ বলে ডাকতে লাগল। নিজের ছোট ছেলেকে খুব ভালোবাসত, ভয় পেয়ে ছোট ছেলেকে তার নাম ধরে ডাকছে আর বলছে বাবা আমাকে বাঁচাও। যেই না ‘নারায়ণ’ ‘নারায়ণ’ বলে খুব জোর চেঁচিয়েছে, সেই মুহুর্তে বৈকুণ্ঠলোক থেকে ভগবান বিষ্ণুর দূতেরা এসে সেইখানে হাজির হয়ে গেলেন, সবাই গেরুয়া কাপড় পড়া। বিষ্ণুর দূতেরা এসেই তিন জন যমদূতকে আটকে দিয়ে বলছেন – তোমরা আর একে স্পর্শ করতে পারবে না। বিষ্ণুর দূতরা যমদূতের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। তাদের হাতে যে গদা ছিল তাই দিয়ে যমদূতদের সবাইকে আটকে দিয়েছে।

যমদূতেরা বলছে ‘আপনারা এ কি করছেন? এর সময় হয়ে গেছে, আমরা একে নিতে এসেছি, আপনারা কেন আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছেন বুঝতে পারছি না’? তখন বিষ্ণুর দূতরা বলছে ‘দ্যাখো, তোমরা যদি সত্যি সত্যি ধর্মরাজের মানে যমরাজের সেবক হয়ে থাকো তাহলে আগে ধর্মের কি লক্ষণ আর ধর্মের কি তত্ত্ব তার বিচার করে আমাদের বোঝাও। আর এটাও তোমরা বল দণ্ড কাকে বলে আর দণ্ড পাওয়ার পাত্র কে? আগে এগুলো আমাদের কাছে ব্যাখ্যা কর, তারপর তোমরা একে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে’।

এগুলো সবই আখ্যায়িকা, এই আখ্যায়িকার মাধ্যমে ধর্মের ব্যাখ্যা জগতকে বলা হচ্ছে। যমদূতেরা তখন বলছে – ‘যা বেদ বিহিত তাই ধর্ম আর যা বেদ নিষিদ্ধ তাই অধর্ম। এই জগতে যা কিছু আছে সবই ভগবানের। ভগবানের বাইরে কিছুই নেই। কিন্তু সব কিছু সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে গুণে মিশ্রিত হয়ে

আছে। আর এই তিনটে গুণের মিশ্রণ বেদানুসারেই করা হয়েছে। বেদরূপে যিনি আছেন তিনিই গুণ, নাম, রূপ দিয়ে জগতের সব কিছুকে বিভাজন করেছেন, এটা সাত্ত্বিক, এটা রাজসিক, এটা তামসিক'। আমরা আবার সেই আগের বক্তব্যে ফিরে এলাম – *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে*। এখন যদি বলা হয় আপনি মদ খান না কেন, বিদেশে বা এই দেশেও তো অনেকেই খায়, আপনি কেন খান না? আপনি বলবেন আমাদের পরিবারে মদ খাওয়া নিষেধ। কেন নিষেধ আছে? এইভাবে পিছনের দিকে যেতে যেতে একটা জায়গায় দেখা যাবে যে, শাস্ত্রে মদ খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। শাস্ত্র কেন নিষেধ করেছে? কেননা এটা তামসিক। যে মদ খাবে তার সর্বনাশ হবে। আর ব্রাহ্মণ যদি মদ খায়, তাহলে কি হবে? শাস্ত্র বলছে এক্ষুণি একে ব্রাহ্মণ বর্ণ থেকে বার করে দাও, কেননা এ আর ব্রাহ্মণ নয়, সে এখন শূদ্র হয়ে গেছে। শূদ্র মদ খেলে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি মদ খায় তাহলে তক্ষুণি তাকে ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে বার করে দিতে হবে। ব্রাহ্মণের এমন কোন কাজ করার অধিকার নেই, যে কাজ তমোগুণের সঙ্গে জড়িত। মদ হল তমোগুণ আর মদ খাওয়া তমোগুণীর লক্ষণ। এগুলো কে ঠিক করে দিয়েছে? বেদ। মদটা কি ভগবানের বাইরে? না, সেটাও ভগবানেরই। ইন্দ্রাদি দেবতারাতো খেতেন। ভগবানের তিনটেই আছে – সত্ত্ব, রজ ও তম তিনটেই ভগবানের আছে। কিন্তু বেদ বলে দিয়েছে কোনটা সত্ত্ব, কোনটা রজ আর কোনটা তম, আর তার সাথে সাথে সাবধাণও করে দিয়েছে এই এই কাজ করা চলবে না।

যমদূতরা বলে যাচ্ছে। মানুষ যখন কোন কর্ম করে, তখন সেটা কেউ দেখুক আর নাইই দেখুক, কিন্তু কয়েকজন সেই কর্মের সাক্ষী থাকেন। কে কে সাক্ষী থাকেন? সূর্য, দিনের বেলায় মানুষ যা করে সূর্য সেই কর্মের সাক্ষী থাকবেন। অগ্নি – সন্ধ্যের পর থেকে যা করবে অগ্নি তার সাক্ষী থাকবেন। তারপর আকাশ, বায়ু এরাও সাক্ষী থাকবেন। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ এরাও সাক্ষী থাকেন। তারপর চন্দ্রমা, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন, দিশা মানে দশটি দিক, জল, পৃথিবী, কাল আর ধর্ম। এই কটি জিনিষ আমাদের যে কোন কর্মের সাক্ষী। আদালতে বিচারক জিজ্ঞেস করেন – আপনার কোন সাক্ষী আছে? মানুষের তৈরী আদালতে আবার সাক্ষী ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে এনারা কেউ ভাড়া করা নয় একেবার সর্বক্ষণের চিরন্তন সাক্ষী।

এই সাক্ষীদের কি কাজ? যখন কেউ মারা যাবে তখন তাকে ধর্মরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। ধর্মরাজ জিজ্ঞেস করবেন – তুমি কি রকম কাজ করেছে? সে হয়তো বলল 'হে যমরাজ আমি কোন গোলমালের কাজ করিনি'। ধর্মরাজ কিন্তু খুব ভালোভাবেই জানেন এ অনেক গোলমাল করেছে, তাই বলবেন 'না বাপু! তুমি তো দেখছি অনেক অধর্মযুক্ত কাজ করেছ'। এখন তার কাজের সাক্ষী আনতে হবে। তখন কাকে সাক্ষী আনবে? এতক্ষণ যাঁদের নাম করা হল, এঁদের সবাইকে সাক্ষী আনা হবে। যে কজনের নাম করা হয়েছে এনারা কেউ আমাদের কাছে মৃত বা জড় নন। এখানে যে সূর্যের কথা বলা হয়েছে এই সূর্য রোজ যে সূর্যকে দেখছি সেই physical সূর্য নয়। এই সূর্যের ভেতরে যিনি আত্মা রয়েছেন তাঁর কথা বলা হচ্ছে। সে আত্মার নাম কি? তিনি হচ্ছেন আদিত্য দেবতা। এই পৃথিবীরও একজন দেবী আছেন তার নামও হল পৃথিবী দেবী। আকাশের দেবতা হলেন দ্যু। এই রকম সব কিছুর একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেবতা আছেন, যেমন জলের দেবতা বরুণ, ইন্দ্রিয়ের দেবতা ইন্দ্র ইত্যাদী। সব সময় তাঁরা আছেন, আর সবার সব কাজের তাঁরা সাক্ষী থাকেন, সর্বক্ষণ রেকর্ডিং হয়ে চলেছে। আপনি লোকচক্ষুর আড়ালে কোন গর্হিত কাজ করে মনে করবেন না যে আপনার অন্যায় কাজের কেউ সাক্ষী নেই। কখনই এরকম মনে করবেন না, খুব জবরদস্ত সাক্ষী আছে, আপনি যতই লুকিয়ে, লোকচক্ষুর আড়ালে, কোন নিরিবিলি জায়গায় যা কিছুই করুন না কেন, সব কাজের এক বা একাধিক সাক্ষী থাকবেই থাকবে, কোন ভাবেই পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না।

তাহলে কি দাঁড়াল – সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের বিভাজন বেদ করে দিয়েছে। আমার আপনার দ্বারা কৃত সব কাজ এই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মের মধ্যেই ঘুরপাক করবে। বেদ ঠিক করে দিয়েছে কোনটা সাত্ত্বিক কর্ম, কোনটা রাজসিক কর্ম আর কোনটা তামসিক কর্মের মধ্যে পড়বে। আমি যাই মনে করি না কেন আর যতই বলি না কেন আমি যা করছি সাত্ত্বিক কর্মই করছি, কিন্তু বেদ আগে থাকতে ঠিক করে

রেখেছে কোন কর্ম কোন গুণের মধ্যে পড়বে। আর ভালো-মন্দ যে কাজই করি না কেন সেটা আর কেউ দেখুক আর নাইই দেখুক এই কজন সাক্ষী কিন্তু সব সময় দেখে যাচ্ছেন। এর ফলে কি হয়? প্রত্যেকটি মানুষ যা কাজ করছে তার মধ্যে কে কত সাত্ত্বিক কাজ করছে, কত রাজসিক কাজ করছে, কত তামসিক কাজ করছে সেই অনুসারে প্রত্যেক কাজের মধ্য দিয়ে তিন ধরণের মানুষ বেরিয়ে আসে। প্রথম হলেন পূণ্যাত্মা পুরুষ, দ্বিতীয় হচ্ছে পাপাত্মা পুরুষ আর তৃতীয় হচ্ছে পাপ আর পূণ্য মেশানো পুরুষ। আমরা বেশির ভাগই পাপ পূণ্য মেশানো পুরুষ। আর আছে সুখী পুরুষ, দুঃখী পুরুষ এবং সুখ-দুঃখ মেশানো পুরুষ। এর ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হবে মৃত্যুর পর সে কোন লোকে যাবে বা কোন যোনি প্রাপ্ত হবে। যমদূতেরা বলে যাচ্ছেন – আমাদের স্বামী যমরাজ হচ্ছেন অজন্মা, তিনি সবারই অন্তঃকরণে আছেন। তিনি সব কিছু জানেন তুমি কি করেছ, ভবিষ্যতে কি করবে, সেইজন্য তিনি করেন কি যার যে গতি হওয়া উচিৎ তাকে সেই রকম গতি দিয়ে দেন। যে মানুষ অজ্ঞানবশতঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টি রিপুর পাল্লায় পড়ে কোন কিছু করে, যেমন রেশমের গুটি পোকা নিজের লালা দিয়ে নিজকে ঐ গুটির মধ্যে আবদ্ধ করে নেয় আর সেখান থেকে বেরোতে পারে না, এরাও ঠিক সেইভাবে কর্মের জাল নিজের চারিদিকে বুনে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, আর ওখান থেকে বেরোতে পারে না। যারা রেশমের চাষ করে তারা ঐ গুটি গুলোকে নামিয়ে গরম জলে সেদ্ধ করে, তখন পোকাগুলো মরে যায়। যে পোকাগুলো ঐ গুটি কেটে বেরিয়ে আসে তারাই বেঁচে যায়, ওর সুতো গুলি আর কোন কাজে লাগে না। যমরাজ ঠিক তাই করেন। যারা এই ভাবে রেশমের গুটি পোকার মত আবদ্ধ থাকে তাদের সবাইকে গরম জলে সেদ্ধ করে দেন।

অজামিল তার প্রথম জীবনে ছিল খুব শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তার মধ্যে অনেক গুণই ছিল, শীল, সদাচার, ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় সত্যনিষ্ট, মন্ত্রবেত্তা, পবিত্রতা সবই ছিল। এখানে ভাগবতের বৈশিষ্ট্যটা লক্ষ্যণীয়। একটু আগে তাকে খারাপ করার জন্য যা পেরেছে তাই বলে গেছে। এবার তাকে ভালো করতে হবে, তাই সব ভালো গুণগুলো অজামিলকে দিয়ে দেওয়া হল। যখন গুণ ঢালবে তখন কোথায় তুলে দেবে ভাবাই যায় না, ব্যালেন্স বলে কিছু নেই। যাই হোক একবার তার বাবা তাকে জঙ্গলে কোন এক কাজে পাঠিয়েছেন। সেই জঙ্গলের ধারে একটা জলাশয়ের কাছে অজামিল দেখতে পেলো এক শূদ্র একটা নষ্টা মেয়েকে নিয়ে মদ খেয়ে নাচ করছে। ঐ দৃশ্যটা দেখে অজামিলের মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ভাব এসে তার মাথাটা ঘুরিয়ে দিলো। যাঁরাই আধ্যাত্মিক জীবনে আসেন তাঁদের পক্ষে এই জিনিষগুলি গভীর সমস্যা তৈরী করে। বিজ্ঞানী না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক আধ্যাত্মিক সাধকের জীবন অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধাণের জীবন। পূর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত খুব সচেতন ভাবে নিজেকে খুব সজাগ রাখতে হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে যা যা করা দরকার, যেভাবে চলতে হয়, সবই ঠিক ঠিক চলছে কিন্তু হঠাৎ এমন কিছু ঘটনা বা দৃশ্য চোখের সামনে পড়ে গিয়ে মনের মধ্যে এমন একটা চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে যে, যার থেকে সাধকের জীবনের মোর হয়তো ঘুরে যেতে পারে। হঠাৎ একটা বাসনার জন্ম হয়ে যেতে পারে। সেই বাসনার চরিতার্থ করতে গিয়ে এবার যে সে কি করবে আর কি করবে না কল্পনাই করা যায় না। বেশীর ভাগ সাধু সন্ন্যাসীদের যে পতন হতে দেখা যায়, তাঁদের সবার পতন সাধারণতঃ এভাবেই হয়।

অজামিল একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী। নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন যাপন করছে আর জঙ্গলে হঠাৎ ঐরকম দৃশ্য দেখে তার মাথা গেল ঘুরে। এই কারণেই বাচ্চাদের অশ্লীল বই, নিষিদ্ধ দৃশ্য বা ছবি পড়তে বা দেখতে দিতে নেই। একটা বয়স পর্যন্ত তাদের খুব সামলে রাখতে হয়। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন – দুই বন্ধু মেলায় গেছে। একজন বেশ ভগবানের ছবি ও মুর্তি দেখছে। আরেক বন্ধু একজন মহিলা তার উপপতিকে ঝাঁটা দিয়ে পেটানোর ছবি দেখছে। সেই বন্ধু চিৎকার করে ঐ বন্ধুকে ডাকছে 'আরে কি ঐসব দেখছিস! এদিকে আয় আর এই ছবিটা দেখে যা'। সাধু সন্ন্যাসীদের তাই সিনেমা দেখা, টিভি দেখা, গৃহস্থদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এগুলো মারাত্মক বিপজ্জনক। আরেকটা মুশকিল হল, যেটা দেখা বা করা নিষেধ করা হয়েছে, সেটা যদি চোখে পড়ে যায়, আর সে যদি সাধনার দ্বারা মানসিক আর শারীরিক ভাবে ঠিক মত প্রস্তুতি না নিয়ে থাকে, তাহলে তাকে ঘুরিয়ে চিৎ করে ফেলবেই। গীতাতেও ভগবান

ঠিক একই কথা বলছেন *‘ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে’*। যার মন ইন্দ্রিয় জগতে ঘুর ঘুর করছে – *‘তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি’* – ঝড় উঠলে যেমন নৌকাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, ঠিক সেই রকম যেমনি ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে ঢুকে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনকে একেবারে ঝড়ের মত উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না।

অজামিলেরও ঠিক তাই হল। যেমনি সে ঐ নষ্টা মেয়েকে মদ খেয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে দেখে নিল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনকেও ঝড়ের মত উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তারও ইচ্ছে হল আমিও এই মেয়েকে একটু তুষ্ট করি। ব্যস্, যা হয়, সেই থেকে সে ঐ মেয়েকে খুশী করার জন্য নানান রকমের কৌশল ও উপায় অবলম্বন করতে শুরু করে দিল। কখন মূল্যবান উপহার দিয়ে, কখন ভালো খাওয়া পড়া দিয়ে, দামী উৎকৃষ্ট মদ দিয়ে তুষ্ট করতে শুরু করে দিল। আর মেয়েটির পাল্লায় পড়ে অজামিলের নিজের যা কিছু ছিল সব শেষ হয়ে গেল। ভাগবতের শুরুতে ধুন্ধুকারীর কাহিনীতেও এই একই জিনিষ হয়েছিল। এরপর অজামিল সর্বস্বান্ত হয়ে নানা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল।

এই সব বলে যমদূতেরা বলছে – সৎ পুরুষেরা যে রকমের আচরণ করে সাধারণ মানুষরা তাই করে। কিন্তু এই লোকটি ব্রাহ্মণ হয়ে যা করেছে তা খুবই গর্হিত কর্ম, তাই এর শাস্তি হওয়া দরকার। তখন বিষ্ণুর পার্ষদরা যমদূতদের বলছে ‘হে যমদূতরা! তোমরা জেনে রাখো মানুষের কোটি কোটি জন্মের যে পাপ জমে আছে, সে যদি একবার এই চারটি অক্ষর ‘নারায়ণ’ উচ্চারণ করে তাতেই তার সব পাপ শেষ হয়ে যায়, সে চোর হোক, মদ্যপান করুক, মিত্রদ্রোহি হোক, ব্রহ্মঘাতী হোক, গুরুপত্নিগামী হোক, মানে যত রকমের পাপ আছে সব পাপ যদি সে করে থাকে, কিন্তু সে যদি একবার ‘নারায়ণ’ নাম মুখে উচ্চারণ করে দেয় তার সব পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। যারা ব্রহ্মবাদী ঋষি তাঁরা অনেক কিছু তপস্যা, ব্রত, প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছেন, কিন্তু সে যদি একবার ভগবানের নাম করে তাহলে সেটা তপস্যাদির থেকেও অনেক শ্রেষ্ঠ’। ঋষিরা বড় বড় পাপের জন্য বড় প্রায়শ্চিত্তের আর ছোট ছোট পাপের জন্য ছোট ছোট প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছেন।

তবে এটা ঠিক যে প্রায়শ্চিত্ত করে নিলে ঐ পাপটা পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু হৃদয় তাতে পরিষ্কার হয় না। কিন্তু সে ভগবানের নাম জেনেই করুক আর না জেনেই করুক, একবার ভগবানের নাম নিলে সব পাপ পরিষ্কার হয়ে যায়। জেনে আর না জেনে ব্যাপারটা কি রকম? বলছেন অমৃত কেউ যদি না জেনে পান করে নেয় তাহলে সে অমর হয়ে যাবে। ওষুধ যদি না জেনে সেবন করে তাতেই তার রোগ নিরাময় হয়ে যাবে। ভিটামিন ‘সি’ আবিষ্কারের এক মজার গল্প আছে। অনেক বছর আগেকার কথা, সেই সময় যারা সমুদ্রে জাহাজে অনেক দিন ধরে যেত তাদের বেরিবেরি বলে এক ধরণের রোগ হত। তখনকার দিনে ফ্রীজ ছিল না, তাই মাছ মাংসকে টাটকা রাখা যেত না। শুকনো মাংস খাওয়া থেকেই নাকি এই রোগ হত। কিন্তু দেখা গেল একজন লোক অনেক দিন ধরে জাহাজে যাতায়াত করার পরেও তার এই বেরিবেরি রোগটা হয়নি। ডাক্তাররা খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন এর রোগ না হওয়ার কারণটা কি। অনুসন্ধান করার পর দেখা গেল ঐ লোকটি প্রচুর লেবু খায়। খাবারে তার লেবু থাকবেই। তখন দেখা গেল লেবুর মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যেটা বেরিবেরি রোগের প্রতিশেধক। তখন সেই থেকে নাম হল ভিটামিন সাইট্রাস। ‘সি’ শব্দটা সাইট্রাস থেকে এসেছে। এখন এই লোকটি না জেনে বুঝেই খাচ্ছিল, কিন্তু এর রোগ হল না। আর আজকে আমরা ভিটামিন ‘সি’ জেনে বুঝেই খাচ্ছি। তাই বৈকুণ্ঠের দূতরা বলছেন – ভাই তুমি জেনেই ভগবানের নাম নাও আর না জেনেই ভগবানের নাম নিয়ে থাক, ভগবানের নাম নেওয়ার ফল হবেই হবে।

বিষ্ণুলোকের দূতদের কথা শুনে যমদূতরা পিছিয়ে গেল। অন্য দিকে অজামিলের মনে হতে লাগল সে যেন এতক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেন তার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই তার মধ্যে তীব্র অনুশোচনা জেগে উঠল – ছিঃ! ছিঃ! আমি এত কপট, এত জঘন্য নোংরা কাজ করেছি আর একবার ভগবানের নাম নিতেই আমি পরিত্রাণ পেয়ে গেলাম! আমি আর নোংরা কাজ করব না, এখন থেকে শুধু মাত্র ভগবানের নাম আর তাঁর চিন্তন নিয়েই থাকব। অজামিলের কাহিনী বলার পর শুকদেব বলছেন ‘হে

পরীক্ষিৎ! যে একজন শূদ্রা দাসীর সঙ্গ করে নিজের জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছিল, তারও দেখ ভগবৎ নামের জন্য সেখান থেকে বেরিয়ে চলে আসতে পারল, আর অন্যদের কি হবে ভেবে দেখ। ভগবানের নামের এমনই মহিমা! তোমার যে মূল প্রশ্ন ছিল কিভাবে নরক থেকে বাঁচা যায়। এখন তার উত্তর তুমি পেয়ে গেলে, যে ভগবানের নাম করবে সে নরক থেকে বেঁচে যাবে’। *নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্তনাৎ। ন যৎপুনঃ কর্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোহন্যথা।।৬/২/৪৬।* এই পৃথিবীতে মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে ভগবানের নামকীর্তন ভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ পথ নেই, কারণ ভগবানের নামের শরণ নিলে মানুষের মন আর কর্মে লিপ্ত হয় না। ভগবানের নাম ছাড়া অন্য যে সব প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আছে তাতে রজ ও তমোগুণ জড়িয়ে থাকে বলে মনের মলিনতা থেকে যায় আর পাপের মূলচ্ছেদও হয় না। দক্ষিণেশ্বরে একজন একবার অজামিলের কথা ঠাকুরকে বলাতে ঠাকুর বলেছিলেন ‘অজামিলের আগে অনেক অনেক তপস্যা করা ছিল’। শুনে সেই ভদ্রলোক খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে, আসলে তার ভগবানের নামের উপর খুব বিশ্বাস ছিল। অজামিলের আগে সব গুণই ছিল, শীল, সদাচার, ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, মন্ত্রবেত্তা, পবিত্রতা সবই ছিল। আসলে এসব কিছুই নয়, আগে থেকে কোন সাধনা, তপস্যাদি না করে মনে করছে মৃত্যুর সময় ভগবানের নারায়ণ নাম উচ্চারণ করলেই সব হয়ে যাবে, তা কখনই হয় না। যেটা মূলে আছে মৃত্যুর সময় সেটাই বেরোবে। ঠাকুর এটাই বলতে চাইছেন।

যমদূতেরা যমলোকে ফিরে গিয়ে যমরাজকে নালিশ করেছে, এই রকম ব্যাপার হয়ে গেছে। যমরাজ তখন তাদের বলছেন ‘দ্যাখো! আমিই এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করি কিন্তু আমারও একজন মালিক আছেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁরই নিয়মে সব চলছে। তা আমি যে যা কর্ম করল সেই অনুযায়ী তাকে ফল দিই। কিন্তু যে আমার মালিকের নাম করছে তার ওপর আমার কোন নিয়ম চলে না। যাঁরা বুদ্ধিমান পুরুষ তাঁরা সব কিছুতে এমন ভক্তিভাব স্থাপন করেন, যার ফলে তাঁরা কখনই কোন অন্যায় কাজ করতে পারেন না’। যমরাজের বক্তব্য হল যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তারা কখন অন্যায় কর্ম করে না। সেইজন্য কি হয়, তাঁরা কোন দণ্ডের পাত্র হিসাবে বিবেচিত হন ন। আর যদি কখন ভুলেও তাঁর কোন পাপ হয়ে যায়, কিন্তু যেহেতু সব সময় ভগবানের নাম করেন বলে, তৎক্ষণাৎ সেই পাপটা নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো হলো ভক্তির স্তুতি। ভক্তির স্তুতি করার জন্য এত কথা বলা হল।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেবের আবার অন্য রকম সৃষ্টির বর্ণনা

এরপর পরীক্ষিৎ আবার জিজ্ঞেস করছেন, ‘হে শুকদেব, আপনি প্রথম সৃষ্টি কিভাবে হল বললেন, কিন্তু পশু, পাখি, সাপ এগুলো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটা আমাকে একটু বিস্তৃত করে বলুন’। মূল কাহিনী হল, যখন মনু সৃষ্ট হলেন, সনক, সনন্দন চারজন কুমাররা সৃষ্ট হলেন, এনারা সবাই ব্রহ্মার মন থেকে সৃষ্ট, তারপর ব্রহ্মা নিজের শরীরকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে সেখানে থেকে আবার নতুন ধরণের সৃষ্টি করলেন। তারপর সৃষ্টি করলেন প্রজাপতিদের। প্রজাপতিদের ব্রহ্মা বললেন – স্বামী-স্ত্রীরা যে ভাবে সৃষ্টি করেন তোমরাও সেই ভাবে প্রজা বৃদ্ধি কর।

দক্ষ হলেন প্রথম প্রজাপতি। তিনি প্রথমে খুব তপস্যা করতে লাগলেন। আমাদের হিন্দু সমাজে সন্তানের জন্ম দেওয়াটাও তপস্যা। মুনি ঋষিরা বলতেন যে সন্তান কাম-বাসনা থেকে উৎপন্ন হয়নি, সেই সন্তানই হল ঠিক ঠিক তপস্যার ফল। কেউ যদি সন্তান চান তাহলে আগে তাঁকে তপস্যা করতে হবে। মনুস্মৃতিতে যে গর্ভাধানের কথা আছে সেখানেও এই তপস্যার ভাবের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। একটা ছেলে মেয়েকে ভালোবাসে বা স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে আছে বলেই তাদের সন্তান উৎপাদন করতে হবে এই ধরণের চিন্তা ভাবনা তাঁদের কোন সময়েই ছিল না।

দক্ষও খুব ঘোরতর তপস্যা করছেন। অনেক দিন তপস্যা হয়ে যাওয়ার পর ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষের কাছে এসেছেন, এসে দক্ষকে বলছেন ‘এতদিন সব আমার মন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এবার পুরুষ নারীর

সম্পর্ক দিয়ে সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাও, আর পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে যে প্রজাকুলের জন্ম হবে সেটা ভগবানের মায়াতেই হবে, আরে এদের মূল ধর্ম হবে আমার সেবা করা। আমার শক্তিতেই তাদের জন্ম, আমার সেবা করাই হবে তাদের কর্ম’। দক্ষ দেখলেন তপস্যার ফলে তার মধ্যে সেই শক্তিটা এসে গেছে যে শক্তিতে তিনি সৃষ্টি কার্যটা করতে পারেন। প্রথম যে নারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় সেই নারী থেকে তাঁর দশ হাজার সন্তানের জন্ম হল। দক্ষ তাঁর সন্তানদের বলে দিলেন যে তাদেরও সৃষ্টি কার্যে লেগে পড়তে হবে। কিন্তু সৃষ্টির কার্য করার আগে তপস্যা চাই। তাই আগে তারা তপস্যা করতে চলে গেল। যেখানে তপস্যা করতে গেছে সেখান তাদের সাথে নারদের দেখা হয়ে গেল। নারদ আবার তাদের বোঝালেন যে সংসারে কিছু আছে নাকি! তার চেয়ে বরং ভগবানের নাম কর, ভগবানই সব। নারদের কথা শুনে তাদের মন গেল ঘুরে। এরা আর সংসারে না ফিরে পুরোপুরি ভগবানে মন দিয়ে দিল, সৃষ্টির দিকে আর তাকালই না।

সন্তানরা ফিরে না আসায় দক্ষ খুব মনঃক্ষুন্ন হলেন। কেননা সৃষ্টি কার্য অত সহজ কাজ নয়। দক্ষ আবার একজন নারীকে বিয়ে করলেন, সেই নারী থেকে আবার দশ হাজার সন্তানের জন্ম হল। এরাও আবার তপস্যাতে গেল, এদেরও একই ভাবে নারদ আবার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এরাও আর সংসারে ফিরল না। তখন নারদকে দক্ষ পাকড়াও করলেন আর বললেন – *অহো অসাধো সাধূনাং সাধুলিঙ্গেন নস্ত্বয়া। অসাধবকার্যর্ভকাণাং ভিক্ষোর্মার্গঃ প্রদর্শিতঃ।।৬/৫/৩৬।* নারদ তুমি এত অসাধু লোক হয়ে সাধুদের জামা কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! তোমার মত এই রকম জঘন্য অসাধুজনিত কাজ জগতে কেউ কখন করেনি। তুমি আমার এই সরলমতি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলিকে ভিক্ষু বানিয়ে সন্ন্যাস মার্গের পথ দেখিয়ে দাও, আর আমাদের সমস্ত কাজ পণ্ড করে দাও। আমরা সংসারী, সংসারে আছি আর সংসার ধর্মটাই আমাদের মূল, কিন্তু যেটা সংসারীদের কর্ম নয় সেটাই তুমি তাদের শিখিয়ে দিচ্ছ। *ঋণৈস্ত্রিভিরমুক্তানামমীমাংসিতকর্মণাম্। বিদ্যাতঃ শ্রেয়সঃ পাপ লোকয়োরুভয়ো কৃতঃ।।৬/৫/৩৭।* এই বাচ্চাগুলো এখনো ব্রহ্মচর্য থেকে ঋষিঋণ, যজ্ঞ থেকে দেবঋণ, আর পুত্র পুত্রী থেকে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়নি। দক্ষ এখানে তিনটে ঋণের কথা বলছেন – ঋষিঋণ, আমরা সবাই ঋষিদের কাছে ঋণী, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্যে দিয়ে ঋষি ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। দেবতাদের কাছে যে ঋণ আছে সেটা যজ্ঞাদিতে আহুতির মাধ্যমে মেটানো হয়। এখান থেকেই হিন্দু ধর্মে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ধারণার জন্ম হয়েছে। আর সন্তানের যখন জন্ম হয় তখন সে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মনুস্মৃতিতে পুংসবন ষোলটি সংস্কার কর্মের মধ্যে একটি অন্যতম কর্ম। সন্তানের যখন জন্ম হয়, তখন সন্তানের বাবা যেই নবজাতকের মুখ দর্শন করে নিল তখনই তার পিতৃঋণ শোধ হয়ে গেল। তাই দক্ষ বলছেন ‘সন্তান যদি না হয় তাহলে পিতৃঋণ শোধ হবে কি করে! আপনি সবটাই গোলমাল করে দিলেন। কর্মফলের যে নশ্বরতা তার বিচারই ওদের মধ্যে এখনো আসে’। মানে কাজ করে কাজের যে ফল হয়, আর সেই ফল যে চিরস্থায়ী নয় এই বোধ কর্ম না করলে কি করে আসবে! ‘কর্মের এই গোলমেলে ব্যাপার সম্বন্ধে ওদের কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি। ফল পাকলে গাছ থেকে পাড়তে হয়, ওদের ফলটাই এখন পাকে নি, ফল পাকার আগেই আপনি গাছকেই উপড়ে দিলেন। মানুষ যতক্ষণ বিষয়কে ভোগ না করে, আর ভোগ করে বিষয়ের তিক্ততার অভিজ্ঞতা যতক্ষণ অর্জন না করে ততক্ষণ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য কখনই আসে না’। বিষয়ভোগ প্রথমে খুব মিষ্টি মিষ্টি লাগে, তারপরেই আসে তিক্ত স্বাদ। মানুষ প্রথমে বিয়ে থা করে কত আনন্দ পায়, তারপর সন্তান হওয়ার পর আনন্দ আরো বৃদ্ধি পায়। তারপর কয়েক বছর পর বলে – ‘এ আমি কোথায় ফেঁসে গেলাম’। সংসারে যখন মহামায়া খুব চড় থাপ্পড় মারতে শুরু করেন তখন বলে – ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

ঠাকুর বলছেন – দুই বন্ধু এক শহরে বেড়াত এসে একজন গেছে শুঁড়ি বাড়িতে মজা করতে, আরেক বন্ধু এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল সেখানে গেছে। কিছুক্ষণ পরে যে ভাগবত কথা শুনছে সে ভাবছে আমার বন্ধু কি দিব্যি আনন্দ করছে আর এখানে বুড়ো পণ্ডিত ভ্যাকর ভ্যাকর করে ভাগবত পাঠ করছে আর আমি তা বসে বসে শুনছি। আবার যে শুঁড়ি বাড়িতে আনন্দ করছে সে ভাবছে, ইস্, আমার বন্ধু কত ভাগ্যবান সে ভাগবত পাঠ শুনে ভগবানের কথা চিন্তা করছে আর আমি এই নোংরা জায়গায় পড়ে আছি। তাই বলছেন

যতক্ষণ ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতা না হচ্ছে ততক্ষণ বৈরাগ্য আসবে না। আর তিক্ত অভিজ্ঞতার পর যে বৈরাগ্য আসে সেটাই ঠিক ঠিক বৈরাগ্য, আর এটাই পাকা বৈরাগ্য।

দক্ষ কাঁচা বৈরাগ্যের নিন্দা করে বলছেন, তুমি জগতের কিছু দেখলে না, বুঝলে না আর কম বয়সেই সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লে, তোমার এই বৈরাগ্যতো কাঁচা বৈরাগ্য। সংসারের প্রতি, বিষয় ভোগে ঠিক ঠিক তিক্ততা এলে তবে গিয়ে পাকা বৈরাগ্য হবে। এই ভাবে দক্ষ অনেক কথা বলার পর নারদকে বলছেন 'পাকা বৈরাগ্য না হলে কারুর কথা শুনে, কারুর প্রভাবে কি কখন সাধু হওয়া যায়? এভাবে কি কেউ কখন সাধু হয়েছে? তবে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুমি আমার বংশকে নাশ করতে চাইছ বলেই দু দুবার আমার সন্তানদের সন্ন্যাসী করে পাঠিয়ে দিলে। দুবার তুমি মুর্খ লোকের মত ব্যবহার করলে, সেইজন্য, হে মুর্খ! আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তুমি লোক লোকান্তরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে থাকবে, কোথাও তোমার স্থায়ী বাসস্থান হবে না, কোথাও তোমার থাকার জায়গা হবে না'।

অভিশাপের কথা শুনে নারদ খুব খুশি হয়ে বললেন 'খুব ভালো, খুব ভালো'। নারদের আচরণের উপর একটা ভাষ্যে বলা হয়েছে – সত্যিকারে সাধুপুরুষ এটাই লক্ষণ। কি লক্ষণ? যখন কেউ তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাঁর শক্তি থাকলেও তিনি কখনই কারুর অপকার করেন না বা কোন ক্ষতি করার কথা চিন্তাও করেন না। নারদকে অভিশাপ দেওয়ার পরও তিনি খুশি এবং অভিশাপ মাথা পেতে নিলেন আর এই অভিশাপকেই ভগবানের কাজে লাগালেন।

দক্ষ এখন বলছেন, আমি দু দুবার এত তপস্যা করে এত সন্তানের জন্ম দিলাম কিন্তু কিছুই তো লাভ হলো না, তাই সৃষ্টি কার্যে আমি আর কিছুই করব না। তখন আবার ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে খুব করে বুঝিয়ে বলছেন 'না না, তুমি এ রকম করো না, সৃষ্টি কার্যের সব দায়ীত্বতো তোমারই'। ব্রহ্মার অনুরোধে প্রজাপতি দক্ষ আবার তার বউএর কাছে থেকে এবার শুধু ষাটটি মেয়ের জন্ম দিলেন। এই মেয়েরা দক্ষকে খুব ভালোবাসত। এরা একটু বড় হতেই ধর্মকে দক্ষ দশটি মেয়ে, তেরোটি মেয়ে কশ্যপ ঋষিকে, সাতাশটি চন্দ্রমাকে, দুটো ভূতকে, ভূত বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছেন পরিষ্কার নয়, যাই হোক, দুটো মেয়ে অঙ্গিরাকে, এইভাবে ষাটটি মেয়েকে বিভিন্ন দেবতা, ঋষি ও অন্যান্যদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এই যে সাতাশটি মেয়েকে চন্দ্রমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল, এই সাতাশ জন হল চন্দ্রমার বিভিন্ন নক্ষত্র যেমন রোহিনী, ভরণী ইত্যাদি। এই বিয়ে হওয়ার পর ষাটটি মেয়ের থেকে কারা কারা জন্মাল তার আবার এক বিরাট তালিকা শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন। আমরা আর এর মধ্যে যাচ্ছি না।

কশ্যপ দুজন ছিলেন – তার্ক্ষ্য নামক কশ্যপ আর কশ্যপ। তার্ক্ষ্য কশ্যপের চারটি বউ – বিনতা, কদ্রু, পাতঙ্গী ও যামিনী। পাতঙ্গীর থেকে বিহঙ্গকুলের জন্ম হল, যামিনী থেকে ফড়িং এর জন্ম হল, বিনতা থেকে গরুড় ও অরুণ, গরুড় ভগবান বিষ্ণুর বাহন ছিলেন আর অরুণ সূর্যের সারথি, আর কদ্রু থেকে যত সর্প ও নাগাদির সৃষ্টি হল। কদ্রু আর বিনতা দুই বোন কিন্তু পরে এই দুই বোনের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। এক বোন কায়দা করে আরেক বোনকে নিজের দাসী বানিয়ে রেখেছিল। এদের সন্তান গরুড় আর সাপেদের মধ্যে চিরশত্রুতার জন্ম হওয়াটাও এক লম্বা কাহিনী। মজার ব্যাপার যে এরা দুই বোন আবার একই স্বামী, সেই কশ্যপ মুনি, অথচ এদের সন্তানদের মধ্যে সব সময় ঝগড়া, লড়াই, শত্রুতা।

দ্বিতীয় যে কশ্যপ মুনি ছিলেন তাঁর পত্নীদের নাম হল – অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্টা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি এই তেরো জন। তিমি থেকে জলের যত প্রাণী। সরমা থেকে ব্যাঘ্র জাতীয় হিংস্র পশু, কুকুর, নেকড়ে ইত্যাদি। সুরভি থেকে গাভী, মহিষ ইত্যাদি। তাম্রা থেকে যত শিকারী পাখি – বাজ, শকুন ইত্যাদি। ক্রোধবশা থেকে সাপ বিছে যত বিষাক্ত সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী। ইলা থেকে বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির সৃষ্টি হল। দিতি থেকে দৈত্যরা, অদিতি থেকে আদিত্যাদি দেবতারা ইত্যাদি করে এক বিরাট তালিকা দেওয়া হয়েছে।

অদিতি থেকে সব দেবতার এসেছেন, মূল দেবতারা হলেন – বিবস্বান, অর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র ও ত্রিবিক্রম। এঁরাই হলেন দ্বাদশ আদিত্য, অদিতির পুত্র বলে আদিত্য। ত্রিবিক্রম আবার বামন অবতার। বামন অবতার অদিতির গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এনারা সবাই কেউ ঋষি কেউ দেবতা। আদিত্য মানে প্রকাশমান। এরা হলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি। প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছিলেন মনু ও চার কুমার। দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টিতে দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি, গাছপালার সৃষ্টি হল।

বিশ্বরূপের কাহিনী

এরপর পরীক্ষিৎ আবার একটা প্রশ্ন করছেন। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শুকদেব আরেকটা কাহিনী নিয়ে আসছেন, যেখান আমরা বিশ্বরূপের কাহিনী পাই। বিশ্বরূপ ছিলেন এক মহাপুরুষ, তার সঙ্গে ইন্দ্রের কি ব্যাপার হয়েছিল সেই সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করছেন। পুরাণে সব সময় দেবতাদের বিশেষ করে ইন্দ্রকে হেয় করা হয়। অথচ বেদে ইন্দ্র হলেন সর্বেসর্বা। যাই হোক ইন্দ্র দেবতাদের রাজা আর দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি। দেবতাদের রাজা বলে ইন্দ্রের আবার খুব অহঙ্কার। একদিন বৃহস্পতি দেবতাদের রাজসভায় এসেছেন, কিন্তু ইন্দ্র দেবগুরুকে সম্মান জানাতে একবারও উঠে দাঁড়ালেন না। বৃহস্পতি একদিকে দেবতাদের গুরু আবার ব্রাহ্মণদের শিরোমণি। ইন্দ্রের এরূপ অসম্মানজনক আচরণে তিনি অপমানিত বোধ করে মুহূর্তের মধ্যে তিনি নিজেকে অদৃশ্য করে দিয়ে ঠিক করে নিলেন আমি আর এই দেবতাদের মধ্যে থাকবো না। যে শিষ্য গুরুকে সম্মান দেয় না তার সঙ্গে আমি কি করে থাকতে পারি! বৃহস্পতিকে এভাবে অন্তর্ধান হয়ে যেতে দেখে ইন্দ্র খুব ঘাবড়ে গেলেন। ইন্দ্র জানতেন দেবতাদের যা শক্তি সবই বৃহস্পতির সৌজন্যে। দেবতারা জোর কদমে বৃহস্পতির অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু বৃহস্পতির ছিলো প্রচণ্ড যোগবল, সেই যোগবলকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজেকে দেবতাদের থেকে অপ্রকাশিত করে দিলেন।

এদিকে অসুররা খবর পেয়ে গেছে যে বৃহস্পতি দেবতাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা যে দেবতা আর দৈত্যদের লড়াই দেখি আসলে সেই লড়াইটা মূলত বৃহস্পতি আর শুক্রাচার্যের মধ্যে। বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু আর শুক্রাচার্য দৈত্যদের গুরু। দৈত্যরা দেখছে বৃহস্পতি দেবতাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তারা দেখল দেবতাদের পরাজিত করার এই সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দৈত্যরা দেবতাদের আক্রমণ করে দিয়েছে আর দেবতাদের বেধড়ক মারতে লাগল। দেবতাদের আর বাঁচাবার কেউ নেই। দেবতারা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে কি করা যায়। আলোচনা করে দেবতারা ইন্দ্রকে বলছেন – দেখুন দেবরাজ! যা গোলমাল হওয়ার হয়ে গেছে এখন তার থেকে বেরোবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, বিশ্বরূপ বলে এক ব্রাহ্মণ আছেন তিনি খুব শক্তিশালী ব্রাহ্মণ, তাঁর খুব যোগবল আছে, তাঁর শরণে আসা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু বিশ্বরূপের একটা সমস্যা হল, তাঁর মায়ের দিকে অসুরদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল। আসলে দেবতা আর দানব সব সৎভাই। দিতি আর অদিতি দুই বোন আর এদের দুজনেরই স্বামী কশ্যপ। সেই দিক দিয়ে এই দুই বোনের ছেলেরা সব সৎভাই। দুই রকমের – বাবার দিক দিয়ে সৎভাই আর মায়ের দিক থেকে মাসতুতো ভাই, এত নিকট সম্পর্ক, কিন্তু কে ক্ষমতা নেবে এই নিয়েই নিজদের মধ্যে যাবতীয় লড়াই।

এদিকে দেবতারা মার খাচ্ছে। নিরুপায় হয়ে ইন্দ্র তখন বললেন 'ঠিক আছে চল আমরা বিশ্বরূপের কাছেই যাই'। বিশ্বরূপের কাছে গিয়ে সব বলা হয়েছে। বিশ্বরূপ বলছেন 'বৃহস্পতি অত ক্ষমতাবান, যোগশক্তি সম্পন্ন পুরুষ, আমি তাঁর কাছে অতি নগণ্য, ঠিক আছে আপনারা যখন এসেছেন আমি আপনাদের জন্য তপস্যা করব। আর শুনুন আমি আপনাদের নারায়ণ কবচ শিখিয়ে দিচ্ছি, এই কবচ আপনারা যদি পাঠ করেন তাহলে অসুররা আর আপনাদের কিছু করতে পারবে না'। ভাগবতের নারায়ণ কবচ খুব বিখ্যাত একটি মন্ত্র। বলা হয় নারায়ণ কবচ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে পাঠ করলে সব রকম আপদ বিপদ থেকে রক্ষা হয়ে যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই ধরণের কিছু মন্ত্র আছে, দেবীকবচও খুব প্রসিদ্ধ মন্ত্র। নারায়ণ কবচের মূল ভাবার্থ হচ্ছে – আমি এখন বিপদে আছি, আমার পৃষ্ঠদেশকে ইনি রক্ষা করুন, আমার বক্ষদেশকে ইনি রক্ষ করুন, আমার হাতকে ইনি রক্ষা করুন, রাত্রে ইনি রক্ষা করুন, সকালে ইনি রক্ষা করুন এইভাবে কয়েকটা মন্ত্র নিয়ে নারায়ণ

কবচ। নারায়ণ কবচ যিনি নিত্য পাঠ করেন তার আর কোন বিপদ হয় না, কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। বিশ্বরূপও দেবতাদের বলছেন আপনারা যদি এই নারায়ণ কবচ পাঠ করেন তাহলে কোন দৈত্য দানব আপনাদের আর পরাজিত করতে পারবে না। যদি মানুষ এই কবচ ধারণ করে নেয় তাহলে রাজা, ভূত, প্রেত কারুর কাছ থেকে কোন ভয় থাকবে না।

এখন বিশ্বরূপের কি হয়েছে, অসুরদের সঙ্গে তাঁর মামার দিকের একটা সম্পর্ক ছিল। এখন দেবতাদের হয়ে তিনি যজ্ঞ করছেন কিন্তু মাঝে মাঝে অসুরদের জন্যও কিছু আহুতি দিয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্র দেখছেন ইনি যজ্ঞ করছেন দেবতাদের হয়ে আর মাঝখান থেকে অসুরদের হয়েও কিছু আহুতি দিচ্ছেন। ইন্দ্র তখন নিজের রাগ সামলাতে না পেরে অস্ত্র দিয়ে বিশ্বরূপের মাথাটি দিলেন কেটে।

বিশ্বরূপ একজন যোগপরায়ণ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের মাথা কেটে দিতেই ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার পাপ ধরে নিয়েছে। ইচ্ছে করলে ইন্দ্র ঐ ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা না করে পাপ নিজের উপর নিয়ে নিলেন। ব্রহ্মহত্যার পাপ কাটাবার জন্য ইন্দ্র পদ্মের নালের মধ্যে ঢুকে এক বছর তপস্যা করেছিলেন। নহুষ এই সময় স্বর্গের রাজা হয়েছিলেন। ব্রহ্মহত্যার পুরো পাপ যদি ইন্দ্র নিয়ে নেন তাহলে তিনি কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবেন, তাই তিনি ঐ পাপকে চারটে ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। চার ভাগে বিভক্ত করে ইন্দ্র পৃথিবী, নারী, জল আর বৃক্ষকে বললেন – তোমরা সবাই প্রত্যেকে এক ভাগ করে এই ব্রহ্মহত্যার পাপ নাও। ইন্দ্রের কথাতে সবাই রাজীও হয়ে গেল। পৃথিবী বলল – আমার কোথাও যদি খাদ বা গাড্ডা হয়ে যায় সেটা যেন নিজে থেকে ভর্তি হয়ে যায়। সেইজন্য পৃথিবীর বুকে যদি কোথাও গর্ত হয়ে যায়, তাহলে দেখা যায় বৃষ্টির জলের সাথে মাটি এসে সেটা ভরাট হয়ে যায়, সেইজন্য গর্ত সব সময়ের জন্য কখন থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপে পৃথিবীর অনেক জমি অনাবাদি হয়ে গেল, ওখানে আর চাষবাস হয় না।

বৃক্ষরা বলল – আমি আপনার পাপ নিয়ে নিচ্ছি বটে কিন্তু তার বদলে আমার যদি কোন ডাল ভেঙ্গে যায় সেখানে আবার যেন ডাল গজিয়ে যায়। মানুষের যেমন হাত কেটে দিলে আর হাত গজায় না, গাছের কিন্তু গজায়। তবে গাছের ডাল যখন কেটে দেওয়া হয় তখন ওখান থেকে আঠার মত কষ বেরোয়, এটাই বৃক্ষের ব্রহ্মহত্যা পাপের ফল। সেইজন্য মনুস্মৃতিতে নিষেধ করা আছে গাছের ডাল কেটে দেওয়ার পর যে আঠা বেরোয় সেই আঠা খেতে নেই। মেয়েদেরও ঐরকম কিছু কিছু আছে। জলকে বলছে – তুমি সব সময় বাড়তেই থাকবে। কিভাবে? ঝরনার জল এসে তোমার সাথে মিশতে থাকবে। কিন্তু তাতে জলে অনেক ফেনা উৎপন্ন হবে, এটাই জলের ব্রহ্মহত্যার পাপের ফল। এইভাবে চার ভাগে ব্রহ্মহত্যার পাপকে বিভক্ত করে চারজনকে দিয়ে দেওয়া হল।

এদিকে বিশ্বরূপকে হত্যা করে দেওয়াতে তার বাবা ত্বষ্টা প্রচণ্ড রেগে গেছেন। তিনি বলছেন এবার ইন্দ্রের একটা শত্রু তৈরী করতে হবে। ত্বষ্টার তত্ত্বাবধানে অসুররা তখন একটা বিরাট যজ্ঞ করল, সেই যজ্ঞ থেকে বৃত্রাসুরের জন্ম হল। বৃত্রাসুরের জন্মই হয়েছে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য। সে এমনই ক্রুর যে, এই ভয়ঙ্কর ক্রুরতার জন্য তার নাম দেওয়া হল বৃত্রাসুর। বৃত্রাসুর এবার দেবতাদের আক্রমণ করতে শুরু করেছে। এদিকে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য যত অস্ত্র নিক্ষেপ করছে, বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সব অস্ত্রকে ধরে মোচর দিয়ে ভেঙ্গে দেয়। বৃত্রাসুরকে কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না। ইন্দ্র প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। খুব বিচলিত হয়ে ভগবানের কাছে দৌড়ে গেছে 'হে ভগবান! আমাকে বাঁচান'। ভগবান বলছেন 'তুমি অনেক গোলমাল করেছ ঠিকই, কিন্তু যেহেতু আমার স্তুতি করেছ তাই আমি তোমাকে বাঁচার পথ দেখিয়ে দেব। তোমার বাঁচার একটাই পথ, তুমি দধীচি মুনির কাছে যাও। দধীচি মুনির হাড় অতি শুদ্ধ। তাঁর কাছে গিয়ে সেই হাড় প্রার্থনা কর। আর সেই হাড় দিয়ে তুমি বজ্র তৈরী করবে। একমাত্র ঐ বজ্র দিয়েই বৃত্রাসুরকে মারা যাবে, অন্য কোন ভাবে বৃত্রাসুরকে তুমি কিছুই করতে পারবে না।

দধীচি ছিলেন বিরাট ঋষি। তাঁর কাছে অনেক মন্ত্রাদি ছিল আর বিরাট যোগশক্তিও তাঁর ছিল। দধীচির একটা খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। অশ্বিনীকুমাররা ছিলেন একটু নিম্নশ্রেণীর দেবতা। নিম্নশ্রেণী হওয়ার জন্য

যজ্ঞে আহুতি দেওয়া সোমরস পান করার অধিকার অশ্বিনীকুমারদের ছিল না। কিন্তু একবার অশ্বিনীকুমারদের ইচ্ছে হল যজ্ঞের সোমরস পান করে তারা যেন দেবাতাদের সমান সম্মান লাভ করতে পারেন। ওনারা দুজন ছিলেন দেববৈদ্য, মানে দেবতাদের ডাক্তার। বেদের যুগে হিন্দু সমাজে ডাক্তারি জীবিকাকে নিম্ন মানের জীবিকা বলে গণ্য করা হত। তা অশ্বিনীকুমাররা দধীচিকে গিয়ে তাদের মনোবাসনা জানাল, যাতে ঋষি যখন যজ্ঞ করবেন তখন তারা যেন সোমরসের ভাগ পায়। ইন্দ্র খবর পেয়ে দধীচিকে গিয়ে সাবধাণ করে বলছে 'হে দধীচি! যদি এদের সোমরস দেন, তবে আপনার গলাটা কাটা যাবে'।

অশ্বিনীকুমাররা দধীচি মুনিকে বললেন 'ঠিক আছে আমরা আপনার মাথাটা পাল্টে একটা ঘোড়ার মাথা এখনই লাগিয়ে দিচ্ছি, সোমরস পান করার পর ইন্দ্র এসে আপনার গলাটা কেটে দেবে, তারপর আমরা আবার আপনার আসল মুণ্ডুটা লাগিয়ে দেব'। শেষ পর্যন্ত তাই হল। তাই দধীচির নাম হল অশ্বশীর দধীচি। এখানে যে আসল ঘটনাটা হয়েছিল তা হল, অশ্বিনীকুমাররা দধীচির কাছে আত্মবিদ্যা পেয়েছিলেন, আর সেইখান থেকেই এনারা জীবন্মুক্ত হয়ে গেলেন।

ভগবানের কথা মত ইন্দ্র দধীচি মুনির কাছে গেছেন। দধীচি সাথে সাথেই রাজী হয়ে গেলেন 'ঠিক আছে, আমি যোগবলে আমার শরীর ত্যাগ করে দিচ্ছি, তারপর তুমি আমার হাড়গুলো নিয়ে নাও'। দধীচি শরীর ত্যাগ করার পর তাঁর শরীরের হাড়গুলো নিয়ে ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে দিয়ে বজ্র তৈরী করালেন। জগতের কল্যাণের জন্য দধীচির এই আত্মত্যাগ বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয়। এই বজ্র কখনই নিষ্ফল হবে না। বৃত্রাসুর আর ইন্দ্রের যখন শেষ লড়াই শুরু হয়েছে, তখন বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলছে 'ইন্দ্র ভগবান তোমাকে এই বজ্র বানাবার কথা বলেছিলেন, ঠিক আছে চালাও তোমার বজ্র, কিন্তু তার আগেই আমার মনকে আমি ভগবানের চরণে দিয়ে দেব। ফলে তোমার যে বজ্র সেটা আমার বিষয় বাসনাকেই নাশ করে দেবে, তাই এতে আমার কোন দুঃখই নেই, আর কোন ক্ষতিও হবে না'। এই কথা বলেই বৃত্রাসুর এক দৌড়ে গিয়ে ইন্দ্রকে কব্জা করে গিলে ফেলেছে। কিন্তু যেহেতু ইন্দ্রের নারায়ণ কবচ খুব নিষ্টা সহকারে পাঠ করা ছিল বলে মরল না। সে বৃত্রাসুরের পেট ফাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে যখন বজ্র চালাল তখন বৃত্রাসুর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। মৃত্যুর আগে বৃত্রাসুর বলছে 'আমি মরলাম কি বাঁচলাম তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আর আমার যে যোনিতেই জন্ম হোক না কেন আমার মন প্রাণ যেন সর্বদা সাক্ষাৎ ভগবানের চরণে সমর্পিত থাকে'।

অন্যান্য কাহিনীতে আছে বৃত্রাসুরের বর ছিল যে তাকে দিনে মারতে পারবে না, রাতে মারতে পারবে না, মাটির উপরে মারা যাবে না, স্থূল কিছু দিয়ে, সূক্ষ্ম কিছ দিয়ে তাকে মারা যাবে না। ভগবান তখন ইন্দ্রকে বলছেন তুমি এর সঙ্গে পারবে না, এর সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব করে নাও। ভগবানের কথাতে ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছে। এখন দুজনের মধ্যে বিরাট বন্ধুত্ব। দুজনে একদিন সমুদ্রের ধারে ঘুরতে বেরিয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ে ফেনা দেখতে পেল। ফেনা যখন দেখেছে ইন্দ্র, তখন তার মাথায় এলো আরে এই ফেনা শক্তও না তরলও না, আর ঐ সময় ছিল সন্ধ্যা, তখন দিনও না রাত্রিও না। তখন ইন্দ্র বজ্রকে আবাহন করে নিয়ে এসে সমুদ্রে ফেনা দিয়ে ব্জ্রকে ঢেকে নিয়ে ওই ফেনাটা ছুরে মেরেছে বৃত্রাসুরের উপর। তখন বৃত্রাসুর মারা গেল। এগুলো সবই পৌরাণিক আখ্যায়িকা এগুলোকে বেশী গুরুত্ব দিতে নেই। যাই হোক, বৃত্রাসুরের কাহিনী শুনে পরীক্ষিৎ খুব আশ্চর্য হয়ে বলছেন 'কি আশ্চর্যের ব্যাপার! বৃত্রাসুর একজন অসুর হয়ে মৃত্যুর সময় বলছে আমি যে যোনিতেই জন্ম নিই না কেন ভগবানে যেন আমার মন থাকে। অসুরকুলের হয়েও বৃত্রাসুরের মধ্যে ভগবান নারায়ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি কিভাবে জন্মাল?' তখন আবার একটা বিরাট লম্বা কাহিনীর সাহায্যে শুকদেব তাঁকে বোঝাচ্ছেন আসলে কি হয়। এই কাহিনীর নাম হল চিত্রকেতু।

বৃত্রাসুরের পূর্ব ইতিহাস

পুরাকালে শূরসেন দেশে সম্রাট চিত্রকেতু রাজত্ব করতেন। তাঁর অনেক মহিষী থাকা সত্ত্বেও তাদের গর্ভে সম্রাটের কোন সন্তান হচ্ছিল না বলে অত্যন্ত মনঃকষ্টে দিন কাটাতেন। একদিন রাজার কাছে দুই সাধুবাবা এসেছেন। তাঁরা রাজার মনের কষ্টের কথা জেনে রাজাকে বলছেন 'আমাদের আশীর্বাদে অতি শীঘ্রই আপনার

এক পুত্র সন্তান হবে আর সে আপনাকে খুব সুখ দেবে আবার খুব দুঃখও দেবে’। কিছুদিন পরেই রাজার অনেক রানীর মধ্যে এক রানী একটি খুব সুন্দর পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছ। রাজার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে। এদিকে রাজার বাকী রানীরা সন্তানহীন হওয়াতে হিংসার জ্বালায় সবাই মিলে বিষ খাইয়ে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছে। বিষ প্রয়োগে সন্তানের মারা যাওয়ার খবর শুনে পুত্রশোকে রানীর মাথা খারাপ হয়ে গেল আর রাজারও মাথা বিকৃত হয়ে গেল।

ঐ দুই সাধুবাবা, যাঁদের আশীর্বাদে রাজার ছেলে হয়েছিল, তাঁদের একজন ছিলেন দেবর্ষি নারদ অন্যজন ছিলেন অঙ্গিরা ঋষি, খবর পেয়ে তাঁরা এসে রাজাকে বোঝাতে লাগলেন – দ্যাখো চিত্রকেতু তুমি আসলে খুব পূণ্যবান লোক, তোমার মন কিছুতেই ঈশ্বরের দিকে পুরোপুরি যাচ্ছিল না, সেইজন্য আমরা দুজনে মিলে তোমাকে একটু কষ্ট দিলাম। সন্তান দিয়ে আবার কেড়ে নেওয়া হল, আসলে তোমার ভাগ্যে সন্তান সুখ নেই। এই যে কেড়ে নেওয়া হল এই আঘাতেই তোমার মন এবার পুরোপুরি ভগবানের দিকে চলে যাবে। সাধুদের কাছ থেকে সব শোনার পর চিত্রকেতুর মন সংসার থেকে একেবারে সরে এসেছে। তাঁর মন এখন বৈরাগ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে। চিত্রকেতুর এখন আর কোন দিকে নজর নেই, একমাত্র ভগবানের দিকেই তাঁর মন। নারদ আর অঙ্গিরা ঋষির সঙ্গে সর্বক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে করে মন আরও ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এত বড় সম্রাট, বিশাল সাম্রাজ্য, এত বৈভব ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও চিত্রকেতুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি অকপট গভীর ভক্তি দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

স্বয়ং ভগবান একদিন এসে চিত্রকেতুকে বলছেন *যন্নারাদাঙ্গিরোভ্যাং তে ব্যাহৃতং মেহনুশাসনম্। সংসিদ্ধোহসি তয়া রাজন্ বিদ্যয়া দর্শনাচ্চ মে।।৬/১৬/৫০।* দেবর্ষি নারদ ও অঙ্গিরা আমার সম্বন্ধে যে বিদ্যা তোমাকে উপদেশ করেছেন এবং এখন আমাকে দর্শন করে তুমি সম্যক প্রকারে সিদ্ধিলাভ করলে। সাক্ষাৎ ভগবান এসে চিত্রকেতুকে এই শংসাপত্র দিলেন। ভগবান তাঁকে বলছেন *অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ। শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মামোভে শাশ্বতী তনূ।।৬/১৬/৫১।* চিত্রকেতু তুমি এইটি শুধু জেনে নাও সমস্ত প্রাণীতে আমিই আছি, আমিই সকলের আত্মা, আমিই তাদের পালন কর্তা, এই যে শব্দব্রহ্ম বেদ সেটাও আমি, আর সব কিছুর পারে যে পরব্রহ্ম সেটাও আমি। ভগবান নিজে চিত্রকেতুকে এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের শিক্ষা দিচ্ছেন। যাবতীয় যা কিছু এই জগতে আছে সব আমি, এই সংসারটা আমিই, আর সব কিছুকে আমিই ধারণ করে আছি। ভগবানের কাছে এই সব সূক্ষ্ম কথা শুনে শুনে চিত্রকেতুর মন আরও গভীরে গিয়ে পুরো শান্ত রূপ ধারণ করল। সেইখান থেকে চিত্রকেতু এখন গন্ধর্বদের মত হয়ে গেলেন। এখন তিনি যেখানে খুশি অবাধে চলাফেরা করতে পারেন।

একবার চিত্রকেতু এক জায়গায় গিয়ে দেখছেন ভগবান শিব বসে আছেন, আর শিবের কোলে পার্বতী বসে আছেন। এই দৃশ্য দেখে চিত্রকেতু বলছেন ‘সবাই বলে এই শিব নাকি একজন ধর্ম শিক্ষক, আর ইনি নাকি গুরু, আর ইনি নাকি প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর তার এ কি অবস্থা হয়েছে! এত লোকের চোখের সামনে নিজের স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন! এটা কি ধরণের নির্লজ্জতাপূর্ণ স্বভাব। যারা সাধারণ পুরুষ তারাও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যা কিছু করেন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে করেন। আর ইনি এই ভাবে সকলের সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে নিজের স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন’!

শিব ও পার্বতী দুজনেই সর্বজ্ঞ, সবার মনের খবর তাঁদের জানা। চিত্রকেতুর মনের ভাব দেখে শিব শুধুমাত্র একটু হাসলেন। কিন্তু পার্বতী প্রচণ্ড রেগে গেলেন। ভগবান শিব যে একজন অদ্বিতীয় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ চিত্রকেতুর তা বোধগম্য ছিল না। শিবকে নিয়ে তখন আর্যদের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলছিল, প্রথমে তিনি ছিলেন অনার্যদের দেবতা। শিবের উপর যে গুণগুলো আরোপ করা হচ্ছিল সেগুলো তখনও সবে নতুন করে আরোপিত হচ্ছিল। এই ব্যাপারটই চিত্রকেতুর কথার মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। যাই হোক, পার্বতি তো চিত্রকেতুর উপর প্রচণ্ড রেগে গেছেন, রেগে গিয়ে তিনি চিত্রকেতুকে অভিশাপ দিচ্ছেন – তুমি নিজেকে খুব বড় জিতেন্দ্রিয় মনে করছো তাই না! ঠিক আছে তুমি এমন পাপময় যোনিতে গিয়ে জন্ম নাও যাতে এই যে তুমি নিজেকে খুব

বড় মনে করছ সেটা তোমার চূর্ণ হবে। পার্বতীর এই অভিশাপে চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হয়ে অসুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করল।

পার্বতীর অভিশাপের উত্তরে চিত্রকেতু বলছেন *প্রতিগৃহ্ণামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাম্বিকে। দেবৈর্মর্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্বদিষ্টং হি তস্য তৎ।।৬/১৭/১৭।* ‘হে মাতঃ! আপনার অভিশাপ আমি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করলাম। আপনি আমাকে কি অভিশাপ দিলেন তাতে আমার কিছুই আসে যায় না, কারণ দেবতারা প্রাণীদের যা কিছু বলে দেন এগুলো শুধু পূর্বাভাস, প্রারব্ধ অনুসারে যা হবার তারই পূর্বাভাস মাত্র দেবতারা বলে দেন। আপনি আমাকে যা অভিশাপ দিলেন এও পূর্বাভাস ছাড়া আর কিছুই নয়’। আমি যদি কারুর মঙ্গল হোক প্রার্থনা করি, তাতে যদি তার মঙ্গল হয় তখন তা আমার প্রার্থনাতে মঙ্গল হচ্ছে না, এটা পূর্বাভাস মাত্র। চিত্রকেতুও তাই বলছে – সেইজন্য মা পার্বতী আপনার অভিশাপে আমার কিছুই যায় আসে না, আমি অবশ্যই জন্ম নেব, কেননা আমার প্রারব্ধে এমন কিছু গোলমাল হয়ে আছে যার জন্য আমাকে অবশ্যই অসুর যোনিতে জন্ম নিতে হবে, আপনার কথার জন্য আমার অসুর যোনিতে জন্ম হচ্ছে না। ঝড় যখন আসে তখন হাল্কা বাতাস বইতে শুরু করে। আপনি যে অভিশাপ দিলেন এটা হল সেই হাল্কা বাতাস। চিত্রকেতু খুব সুন্দর বলছেন *গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কো ন্বনুগ্রহঃ। কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা।।৬/১৭/২০।* এই যে জগৎ, এই জগৎ হল সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিগুনাত্মিকা মায়ার স্বাভাবিক প্রবাহ মাত্র, তাই এখানে অভিশাপই বা কি, নরকই বা কি আর স্বর্গই বা কি সব নিজের প্রবাহ থেকেই চলছে। আপনার আমার কথাতে কিছু হবে না, জগৎ নিজের মত চলছে। আপনার কথাতো শুধু পূর্বাভাস, যেমন এর পরে কি হবে বলে দেওয়া। চিত্রকেতুর কথাটা কিরকম – বাবা আর ছেলে ট্রেনে করে যাচ্ছে, বাবা ছেলেকে বলছেন এরপর ব্যাণ্ডেল স্টেশন আসবে। বাবার কথাতে কি ব্যাণ্ডেল আসবে? ব্যাণ্ডেল স্টেশন নিজে থেকেই আসবে। বাবা জানেন এর পর কি আসবে তাই বলে দিলেন, এটাই পূর্বাভাস।

এত অভিশাপের পরেও দেখা গেল চিত্রকেতু নিজের বিমানে করে সেখান থেকে উড়ে চলে গেলেন। তখন পার্বতী জিজ্ঞেস করাতে শিব বলছেন ‘আসলে কি জানো পার্বতী! চিত্রকেতু সাক্ষৎ বিষ্ণুর ভক্ত। আমি ওর কোন ক্ষতি হোক চাইনা, কেননা আমিও নিজে সেই ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত। আমি ভগবান বিষ্ণুর ভজনা করি বলেই আমার যা কিছু শক্তি। তুমি অভিশাপ দিয়েছ ঠিক আছে। কিন্তু আমার যা শক্তি তারও সেই একই শক্তি, কারণ আমি যার ভজনা করি সেও তাঁরই ভজনা করে, আমরা দুজনে ভাই এর মত’। আমরা জানি মোট আঠারোটি পুরাণ। তারমধ্যে ছটি পুরাণ ভগবান বিষ্ণুর। ভগবান বিষ্ণুর পুরাণে শিবকে সাধারণ করে রাখা হবে, আর শিব পুরাণে বিষ্ণুকে সাধারণ করে রাখা হবে, এটাই স্বাভাবিক।

ঊনপঞ্চাশ মরুৎগণের জন্মের ইতিহাস

এরপর পরীক্ষিৎ আবার প্রশ্ন করছেন এই মরুৎরা হল অসুর সন্তান কিন্তু তারা ইন্দ্রের বন্ধু কি করে হয়ে গেল? শুকদেব বলছেন – বৃত্রাসুর মারা যাওয়াতে দিতির খুব দুঃখ হল। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে দিতি তার স্বামী কশ্যপকে গিয়ে বলছেন ‘দেখুন ইন্দ্র ছলনা করে বৃত্রাসুরকে বধ করেছে। বৃত্রাসুরকে বধ করে ইন্দ্র এখন খুব অহঙ্কারী হয়ে গেছে, আপনি আমাকে এমন একটি সন্তান দিন যে সব সময় অজেয় হবে আর ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে’। দিতির কথা শুনে কশ্যপের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কশ্যপ মনে মনে বলছেন – ইন্দ্র বাঁদরামো করে ঠিকই, কিন্তু ওর যা ব্যক্তিত্ব, এই রকম ব্যক্তিত্বও স্বর্গের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, ইন্দ্রকে এভাবে শেষ করে দেওয়াটা স্বর্গের পক্ষে কখনই মঙ্গলদায়ক হবে না।

কশ্যপ মনে মনে একটু চিন্তা করে নিয়ে কিছু একটা ঠিক করে নিলেন, তারপর দিতিকে বলছেন ‘ঠিক আছে আমি তোমাকে সন্তান দেব কিন্তু তোমাকে এক বছর তপস্যা করতে হবে। কি রকম তপস্যা – একটা ব্রত নেবে যাতে তুমি তোমার মন, বাণী আর ক্রিয়া দিয়ে কোন প্রাণীকে কষ্ট দেবে না, কাউকে অভিশাপ দেবে না, কাউকে মন্দ কথা বলবে না, মিথ্যে কথা বলবে না, শরীরের নখ, লোম এগুলো কাটবে না, কোন অশুভ

জিনিষ স্পর্শ করবে না, জলে ঢুকে মানে পুকুর নদীতে গিয়ে স্নান করবে না, রাগান্বিত হবে না, বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলবে না, আচমন না করে কিছু গ্রহণ করবে না, এঁঠো মুখে আর গায়ে চাদর না দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোবে না ইত্যাদি, বিরাট লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে, আরেকটা যেটা বলছেন সেটা হল, ভদ্রকালী দেবীকে দেওয়া প্রসাদ বা মাংস খাবে না, মানে শাক্ত মতে যে পূজো হবে তার প্রসাদ খাওয়া চলবে না। মনুস্মৃতি বা অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন বলা হয় কি কি করতে হবে আর কি কি করবে না, সেটাই ভাগবত ধর্মে কি কি করতে হবে আর কি কি করবে না এখানে বলা হচ্ছে। ভাগবতে যে শুধু ভক্তির কথাই আছে তা নয় এখানেও স্মৃতির কথা পাওয়া যাবে। ভাগবতে শ্রুতি, স্মৃতি, উপাচার, পুরাণ সবই আছে কিন্তু ভক্তির উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

দিতি ভাবছে ইন্দ্রকে মারা নিয়ে আমার কথা, তার জন্য আমি তপস্যা, ব্রত যা করার সব করতে রাজী আছি। যে করেই হোক ইন্দ্রকে মারবার জন্য আমি সব করব। এদিকে ইন্দ্রও এই খবর পেয়ে সে এখন ভৃত্যের কাজ নিয়ে দিতির কাছে সবর্ক্ষণ ঘুরঘুর করে যাচ্ছে। আসলে দিতি ইন্দ্রেরও মা, সৎমাই হোক আর যাই হোক। কিন্তু চাকরের ছদ্মবেশ ধারণ করে দিতির কাছাকাছি থেকে দেখছে কিভাবে সৎ মায়ের এই ব্রতে ফাঁক পাওয়া যায়। দিতি খুব নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালন করে যাচ্ছে, ইন্দ্রও কোন ফাঁক পাচ্ছে না। কিন্তু একদিন অহোরাত্র উপোস করে দিতি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আর সেদিনই ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হওয়ায় সন্ধ্যে বেলায় মুখ ধৌত না করে, আচমন না করে আর পায়ে জল না দিয়ে ঘুমোতে চলে গেল। ব্যাস্ ব্রত ভঙ্গ হয়ে গেল। যেমনি ব্রত ভঙ্গ হয়েছে, আর এই সুযোগটাই ইন্দ্র খুঁজছিল, ইন্দ্রতো কাছে কাছেই ঘুরঘুর করছে, সে সুরুৎ করে দিতির গর্ভে ঢুকে পড়েছে, গর্ভে ঢুকে গিয়ে ইন্দ্র নিজের বজ্র চালিয়ে দিয়েছে। *চকর্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কনকপ্রভম্। রুদন্তং সপ্তধৈকৈকং মা রোদিরিত তান্ পুনঃ।।৬/১৮/৬২।* বজ্র চালাতেই গর্ভের মধ্যে সোনার মত উজ্জ্বল যে ভ্রূণটা পিণ্ডাকারে ছিল সেই পিণ্ডটা সাতটা টুকরো হয়ে গেল। গর্ভের পিণ্ডটা সাতটা টুকরো হয়ে যেতেই টুকরো গুলো কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। তখন ইন্দ্র বলছে – *মা রোদিরিতি তান্ পুনঃ।* ইন্দ্রের তো ভয় আছে, বাচ্চাগুলোর কান্নায় দিতির যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহলেতো ইন্দ্রের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ইন্দ্র ঘাবড়ে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে বাচ্চগুলোকে বলছে কেঁদো না কেঁদো না – সংস্কৃতে বলছে মা রুদ, সেখান থেকে তাদের নাম হয়ে গেল মারুৎ।

সাতটা টুকরো হয়েও বাচ্চাগুলোর তখনও গলার আওয়াজের যা তেজ তাতে ইন্দ্র দেখছেন এদের এখনও এত শক্তি! ইন্দ্র তাই প্রত্যেকটি টুকরোকে আবার সাতটা করে টুকরো করে দিলেন। এইভাবে ঊনপঞ্চাশটা টুকরো হয়ে গেল। দিতি এতদিন ধরে তপস্যা করেছে, আর মাত্র কিছু দিন বাকি ছিল, সেই তপস্যার জোরে দিতির গর্ভ অমর হয়ে গিয়েছিল। গর্ভের যে সন্তানগুলো ছিল তারা সকলে ইন্দ্রকে বলতে লাগল 'হে ইন্দ্র! আমরাতো তোমার ভাই, তা সত্ত্বেও তুমি কেন আমাদের এভাবে মেরে ফেলতে চাইছ'? এদের মুখে 'ভাই' সম্বোধন শুনে ইন্দ্রের মনে হঠাৎই একটা করুণার উদ্রেক হল আর সেই করুণার বশবর্তী হয়ে ইন্দ্র বলে দিলেন 'হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বলেছ তোমরা আমার ভাই, আর আমরা সবাই এক সঙ্গেই থাকব'। এই কথা ইন্দ্র যেই বলে দিল, আর দিতির তপস্যার জোরে ঊনপঞ্চাশটা বাচ্চা তখনই জন্ম নিয়ে নিল। ঊনপঞ্চাশটা সন্তানের জন্ম হতেই মা দিতি চমকে উঠেছে আর ভাবছে – আমার একটা সন্তানের জন্ম হওয়ার কথা কিন্ত তার জায়গায় এই ঊনপঞ্চাশটা বাচ্চা কোথা থেকে এসে গেল! দিতি বুঝে নিল সব ইন্দ্রেরই কারসাজি। এদিকে ইন্দ্র এসে দিতির পায়ে পড়ে গিয়ে বলছে, ইন্দ্রেরও তো মা হয় 'মা, আমি অনেক ভুল করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আর এরা আমার ভাই, আমার সঙ্গেই এরা থাকবে'। তখন থেকে এই ঊনপঞ্চাশ বাতাস, মরুৎ নামে যারা পরিচিত, তারা সব সময় ইন্দ্রের সাথী হয়ে থাকল। এই মরুৎগণরাই হল একমাত্র যারা অসুরকুলে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এরা সবাই ইন্দ্রের সাথী। এর মূল ব্যাপার হল, ইন্দ্র হলেন মেঘের দেবতা, মেঘ আবার বাতাস ছাড়া চলতে পারবে না। তাই বাতাসের যে দেবতা আর মেঘের যে দেবতা এরা দুজন দুজনের উপরের নির্ভরশীল। ঊনপঞ্চাশ রকমের বায়ুকেই এই ভাবে একটা আখ্যায়িকার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল

সপ্তম স্কন্ধ

এরপর আমরা সপ্তম স্কন্ধে প্রবেশ করব। সপ্তম স্কন্ধ দুটো বিষয়ের জন্য বিখ্যাত। প্রথমতঃ এই স্কন্ধেই বিখ্যাত প্রহ্লাদ চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। প্রহ্লাদের কাহিনী মানেই ভক্তির বর্ণনা। দ্বিতীয় হল কয়েকটি ধর্ম, বিশেষ করে বর্ণাশ্রমের ধর্ম, যেমন গৃহস্থাশ্রমের কথা, গৃহস্থের কি রকম আচরণ করতে হয়, সন্ন্যাসীর কি ধর্ম, রাজার কি কাজ, এগুলোকে নিয়ে সপ্তম স্কন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

শুকদেব আর পরীক্ষিৎএর মধ্যে আলোচনা চলছে। পরীক্ষিৎ মাঝেই মাঝেই শুকদেবের কাছে জানার জন্য এটা ওটা জিজ্ঞেস করছেন। পরীক্ষিৎএর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শুকদেব নিজের কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই বলছেন – ব্যাসদেব যুধিষ্টিরকে এই রকম বলেছিলেন কিংবা কোন মুনি যুধিষ্ঠিরকে এই রকম বলেছিলেন। এটাই পুরাণের বৈশিষ্ট্য। তখনকার দিনে যে কাহিনীগুলো সমাজে প্রচলিত ছিল সেই কাহিনী গুলিকেই সংগ্রহ করে বলবে এই কাহিনীটা অমুক মুনি অমুক রাজাকে বলেছিলেন। যেমন যখন জয়-বিজয়কে নিয়ে কথা চলছে তখন শুকদেব সেখান থেকে কাহিনীটাকে নারদ-যুধিষ্টির সংবাদে নিয়ে চলে এলেন। এখানেও নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রহ্লাদের কাহিনী বলছেন।

প্রহ্লাদ চরিত্র *(হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুর নিন্দা, সুযজ্ঞের কাহিনী, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের জীবনের কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য, নবধা ভক্তি, ভক্তি পথে সাধনা ও সিদ্ধি, মোক্ষ সাধনের দশ রকম উপায়, ছয় ভাবে প্রভুর সেবা বা ষড়ঙ্গ সেবা)*

এর আগে হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে যখন টেনে নিয়ে চলে গেছে তখন ভগবান বরাহ অবতার হয়ে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে দিয়েছিলেন। হিরণ্যাক্ষের ভাই ছিল হিরণ্যকশিপু, অনেকে হিরণ্যকশ্যপও বলেন। হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে হিরণ্যকশিপু মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ভাইয়ের মৃত্যুজনিত শোক থেকে ভেতরে খুব ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ আছে। হিরণ্যকশিপু তার মায়ের কাছে গেছে। মাকে গিয়ে বলছে 'এই যে বিষ্ণুকে তোমরা দেখছ, এ কিনা আমার অতি পরম প্রিয় ভ্রাতাকে বধ করল! দেবতারা বিষ্ণুর পেছনে ঘুরে ঘুরে বিষ্ণুকে তারা নিজেদের বশে করে নিয়েছে। *তস্য ত্যক্তস্বভাবস্য ঘৃণের্মায়াবনৌকসঃ। ভজন্তং ভজমানস্য বালস্যেবাস্থিরাত্মনঃ।।৭/১/৭।* বিষ্ণু আগে খুব নিরপেক্ষ ও নিষ্পক্ষ আর খুব শুদ্ধাত্মা ছিল, কিন্তু ইদানিং নিজের মায়াকে আশ্রয় করে বরাহাদি পশুর রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে আর নিজের স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে গেছে। বাচ্চা যার কাছে ভালোবাসা পায় তার কাছেই বাচ্চা থাকতে চায়। এই বিষ্ণুটাও সেই রকম স্বভাবের হয়ে গেছে, তার পেছনে যে ঘুর ঘুর করছে বিষ্ণুও তার দিকেই ঢলে পড়ছে। এই বিষ্ণুকে এবার একটা খুব ভালো রকমের শিক্ষা দেওয়া দরকার। এটা আমাদের দেবতা অসুরদের লড়াই বিষ্ণুরতো উচিত নিরপেক্ষ থাকা, দেবতাদের হয়ে লড়াই করা বিষ্ণুর কোন মতেই উচিৎ কাজ হচ্ছে না। তবে বিষ্ণু যদি নিজেকে খুব ওস্তাদ ও মাতব্বর মনে করে থাকে তবে এবার দেখুক আমার খেলা। এই ত্রিশূল দিয়ে বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ করে সেই রক্তে আমার প্রিয় ভাইয়ের তর্পণ করব।

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয়, হিরণ্যকশিপু বার বার 'বিষ্ণু' শব্দটাই ব্যবহার করছেন। পুরাণে এসে হিন্দু ধর্মের এটা একটা বড় বিবর্তন। বেদের সময় বিষ্ণু নামে এক দেবতা ছিলেন, যার প্রভাব বেদে খুব একটা ছিল না। বেদের পরবর্তি কালে এই বিষ্ণু প্রায় হারিয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু পুরাণে এসে বিষ্ণুকে আবার উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। হিরণ্যকশিপুর বক্তব্যেই এই বিবর্তনটা ধরা পড়ে। কারণ অসুরই হোক আর যেই হোক ভগবানের নিন্দা কেউ করবে না। কারণ এরা সবাই জানে যে ভগবান সর্বশক্তিমান। যে বিষ্ণু বেদের সময় একজন সাধারণ দেবতা ছিলেন, পরে যিনি হারিয়ে গেলেন আবার এখানে এসে তাঁকে সবার উপরে এক উচ্চ স্থান দেওয়া হল, যা কিনা হিরণ্যকশিপুর বাক্যালাপেই ধরা পড়ছে। হিরণ্যকশিপু বলছে বিষ্ণুকে এবার আমি শিক্ষা দেব, বিষ্ণুকে আমাদের অসুরদের ক্ষমতাটা একবার জানানো দরকার।

হিরণ্যকশিপুর মুখে বিষ্ণুর বিরুদ্ধে এই ধরণের বিষোদ্গার শুনে পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে মহিলারা একটু দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছ। মেয়েদের চিন্তান্বিত দেখে হিরণ্যকশিপু সবাইকে একটা কাহিনী

শোনাচ্ছে – আগেকার দিনে সুযজ্ঞ বলে এক রাজা ছিল। কোন এক যুদ্ধে সে কিভাবে মারা যায়। মারা যাওয়ার পর তার বাড়ির লোকেরা কান্নাকাটি করছে। ঐ সময় যমরাজ ছদ্মবেশে এসে সুযজ্ঞের পরিবারের শোক সন্তপ্ত সদস্যদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। যমরাজের এই কথাগুলোই পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মে মৃত্যু সম্বন্ধে একটা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ধারণা তৈরী করে দিয়েছে।

আসলে যমরাজ জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে একটা দার্শনিক মত বলছেন। মৃত্যু এমনই একটা বস্তু যে সাধারণ কীট-পতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে অসুর, রাক্ষস, মানুষ, সব প্রাণীই মৃত্যু ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত। অন্য দিকে হিন্দু ধর্মের সন্ন্যাসীরা বলেন মৃত্যুকে আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিই না, মৃত্যু এসেছে তাতে কি হয়েছে! কিন্তু একজন বৃদ্ধ সংসারী মানুষকে মৃত্যু নিয়ে কথা বললে তাঁরা বিরক্ত বোধ করেন। অথচ বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে যে বৃদ্ধ মহারাজরা আছেন তাঁদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন 'কি মহারাজ আর কতদিন'? তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন 'গেলে বাঁচি, ঠাকুর নিচ্ছেনও না'। কারণ সন্ন্যাসীরা যে ভাবধারার মধ্যে তৈরী হয়েছেন সেখানে তাঁদের কাছে মৃত্যুর কোন গুরুত্বই নেই। আর 'আমাদের সবাইকে একদিন মরতে হবে' গৃহস্থদের মাথায় এই চিন্তাই আসে না। হিন্দু ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য হল মুনি ঋষিরা মৃত্যুকে নিয়ে শাস্ত্রে বার বার আলোচনা করেছেন যাতে মৃত্যু-ভীতিটা দূর হয়। স্বামীজী বিদেশীদের বলতেন 'মৃত্যুকে কিভাবে বরণ করতে হয় আমরা জানি'।

শাজাহান মারা যাওয়ার পর দিল্লীর সিংহাসনে বসার জন্য দারাসিকো আর ঔরঙ্গজেবের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। জয়পুর, উদয়পুরের হিন্দু রাজারা দারাসিকোর হয়ে লড়ছে। সেই সময় দু-পক্ষের মধ্যে অন্তর্ঘাত আর বিশ্বাসঘাতকতার প্রচুর নজির আছে। রাজপুত হিন্দু রাজারা যুদ্ধে গেছে আর তাদের সঙ্গী যারা মুসলমান সেনাপতিরা ছিল, তারা অবস্থা বুঝে পালিয়ে গেছে কিন্তু হিন্দু রাজপুত রাজারা পালিয়ে যাওয়া দূরের কথা, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এক চুল নড়ল না। প্রত্যেকটি রাজপুত রাজারা মাথায় একটা হলুদ কাপড় বেঁধে নিত, মানে আমি মরার জন্যই যুদ্ধে এসেছি।

একটি ঘটনা আছে, এক রাজপুত রাজা দারাসিকোর হয়ে লড়তে গেছে, যুদ্ধে যখন সব মরতে শুরু করেছে তখন সব মুসলমান সৈন্যরা পালিয়ে গেছে। এরা লড়ছে মুসলমান রাজার জন্য কিন্তু মুসলমানরাই সব পালিয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেঁচে আছে। কিন্তু যে রাজপুত রাজা ছিলেন তিনি বলছেন 'আমি মরে যাব কিন্তু যুদ্ধে পিঠ দেখাবো না'। রাজার যারা সেনাপতিরা ছিল তারা রাজাকে খুব করে বোঝাল 'হুজুর! আপনি কার জন্য মরতে যাচ্ছেন একবার ভাবুন, আপনি হিন্দু রাজপুত আর এই বিধর্মীদের জন্য কেন মরতে যাচ্ছেন? আর তার যে আসল সেনারা ছিল সবতো পালিয়ে গেছে, আপনি মাঝখান থেকে কেন মরতে যাচ্ছেন'? রাজাও কোন কথা শুনবে না, তখন তারা জোর করে ঘোড়ার লাগাম টেনে কোন রকমে যুদ্ধভূমি থেকে পালিয়ে গিয়ে রাজাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরের যে ঘটনা সেটা আরও মর্মস্পর্শী। রাজা যখন কেল্লার কাছে পৌঁছাচ্ছে তখন রাজার রানী কেল্লার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। রানী বলছে – এই রকম স্বামীকে আমি কেল্লাতে ঢুকতে দেবো না, রাজপুত যুদ্ধে হয় মরবে নয়তো যুদ্ধে জিতে ফিরবে। এ জেতেওনি মরেওনি, আমি একে ঢুকতে দিচ্ছি না। সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষে রানী বলছে 'আমি এই রকম স্বামীকে তো ঢুকতে দিতে পারবো না, আমি নিজে সতী হয়ে যাচ্ছি। এতো মরার মতই, কেননা এ মরে গেলে এমনিতেও আমি সতী হতাম'। এই বলে সে কাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে নিয়েছে। তখন বহু কষ্টে বুড়ি রানীমা বুঝিয়ে সুঝিয়ে রানীকে ঠাণ্ডা করে বলছেন – রানীমা! ভেবে দেখো পরে দারাসিকো রাজা হলে রাজার কাজে এর প্রয়োজন হবে বলেই ওর বেঁচে থাকাটা খুব দরকার। ইত্যাদি নানা কথা বলে বুঝিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। তারপর রাজাতো কোন রকমে কেল্লাতে ঢুকতে পেল। কিন্তু সারাটা জীবন তার রানী তাকে গালাগাল দিতে দিতেই কাটিয়ে দিল।

এখানে রাজা বলছে আমি আমার স্বধর্ম করব, আমি ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করতে এসেছি, আমি মরার জন্যই এসেছি। মৃত্যুকে মাথা পেতে নিয়েছে, তারপর আর কোন কথা নেই। যদি তুমি পালিয়ে যাও তাহলে তুমি স্বধর্মচ্যুত হয়ে গেলে। রাজার অবস্থা ভাবুন! সে কার হয়ে লড়াই করছে দেখছে না, একজন বিধর্মী রাজার হয়ে

সে যুদ্ধ করছে কিন্তু তাতে কি হয়েছে, আমি আমার স্বধর্ম করছি। তাকে তার সেনাপতিরা জোর করে তুলে নিয়ে গেল বটে কিন্তু বাড়িতে তার পরিবার ঢুকতে দিচ্ছে না। পরে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখছে না। এরা সবই জানে যে এরা বিধর্মী, এরা মুসলমান, আমাদের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করছে, তার হয়ে যুদ্ধ করতে গেছে সেখানেও সে নিজের স্বধর্মকে ছাড়ছে না। মোঘল আমলে রাজপুতানায় হাজারে হাজারে মহিলারা স্বেচ্ছায় সতী হয়ে যাচ্ছিল, মৃত্যু ওদের কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না। মুসলমানরা আমাদের গায়ে হাত দেবে তার থেকে আগেই নিজেকে আহুতি দিয়ে দিই। এই যে এরা এভাবে সতী হতো বা রাজারা মরবার জন্য লড়াই করত, এদের কাছে মৃত্যুটা কিছুই না। এইভাবে মৃত্যুকে তুচ্ছ করার সংস্কারটা এসেছে আমাদের এই হিন্দু শাস্ত্রগুলি থেকে।

মৃত্যুকে কিভাবে জয় করা হয়? উপনিষদে বলছে অমৃতত্ব লাভের দ্বারা। ভাগবতে মৃত্যুকে কিভাবে জয় করতে বলছে – বলছে বিচারের মাধ্যমে। কিসের বিচার? যমরাজ এখানে তাই বলছেন, মানে হিরণ্যকশিপু তার বাড়ির মেয়েদের একটা কাহিনী বলছে যে উশিনর বলে এক রাজ্য ছিল সেখানে সুযজ্ঞ বলে এক রাজা ছিল। সে মারা যাওয়ার পর রাজ পরিবারের সদস্য ও সদস্যারা কান্নাকাটি করছে। সেখান যমদূত এক বালকের ছদ্মবেশে এসে বলছেন – কি আশ্চর্য! এই যে এরা সবাই কান্নাকাটি করছে, এদের সকলেরই বয়স হয়েছে, এরা নিত্য দেখছে সব মানুষই মারা যাচ্ছে, কোন মানুষই চিরদিন বাঁচবে না তারা ভালো করেই জানে, তাও এরা এত দুঃখ করছে, কান্নাকাটি করছে সত্যিই এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার। যমরাজের বক্তব্য হল, মৃত্যুটা স্বাভাবিক। মানুষ যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয় ঠিক তেমনি জন্ম-মৃত্যুও নিত্য ব্যাপার। তারা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে আবার ফিরে যাচ্ছে কিন্তু এতে এত কান্নাকাটি করার কি আছে!

বালক বেশী যমরাজ বলছেন 'এই বয়স্কদের থেকে আমরা অনেক ভালো। আমার বাবা-মা আমাকে বাচ্চা বয়সেই ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আমার শরীরে এমন কিছু জোর নেই যে নেকড়ে বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচতে পারি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। যে ঈশ্বর আমাকে মায়ের গর্ভে রক্ষা করেছেন তিনিই এখনো আমাকে রক্ষা করছেন'। হিন্দুদের বিরুদ্ধে খুব মারাত্মক একটা আপত্তিজনক কথা বলা হয়। হিন্দু ধর্ম নাকি অদৃষ্টবাদকে বড্ড বেশী প্রশ্রয় দেয় আর অদৃষ্টবাদের প্রভাবে অলসতা আর নিষ্কর্মণ্যতা তাদের গ্রাস করে নিয়ে জীবনকে আর দুর্বিষহ করে তোলে। অদৃষ্টবাদ আধ্যাত্মিক সাধনার একটা বিশেষ অবস্থা, এর তাৎপর্য সাধারণ মানুষদের বোঝান খুব মুশকিল। যাঁরা একান্তভাবে ধর্ম পথে এগোতে থাকেন, এগোতে এগোতে তাঁরা এমন একটা উচ্চ অবস্থায় চলে যান যেখানে তাঁদের মধ্যে পুরো শরণাগতির ভাব এসে যায়। আর যাঁরা শরণাগতিতে চলে যান, তাঁদের যারা অনুগামী বা শিষ্য যাই হোক, যদিও গুরুর মত অতটা উচ্চ অবস্থাতে নাও যায় তবুও তাদের মধ্যেও এই অদৃষ্টবাদের ভাব এসে যায়। যতক্ষণ মানুষ প্রচুর কাজ কর্ম না করে থাকে, তপস্যা, সাধনা করে করে যতক্ষণ না ডানা ব্যাথা হচ্ছে, তার আগে ঈশ্বরই সব করছেন বলাটা শুধু মুখের কথাতেই থেকে যায়।

কবীরের একটা দোঁহাকে উপমার সাহায্যে ঠাকুর বলছেন – একটা জাহাজের মাস্তুলে একটা পাখি বসেছিল। জাহাজ কখন ডাঙা ছেড়ে মাঝ সমুদ্রে চলে এসেছে পাখিটা টের পায়নি। যখন টের পেল তখন পাখীটা ডাঙার খোঁজে একবার পূব দিকে গেল, দেখতে পেল কোথাও ডাঙা নেই, পশ্চিম দিকে গেল, কোন কুল কিনারা পেল না, এইভাবে একবার উত্তর দিকে গেলে, তারপর দক্ষিণ দিকে গেলে কিন্তু কোন দিকেই সে আর কোন কূল কিনারা পেলো না। তখন সে পরিশ্রান্ত হয়ে সেই মাস্তুলে গিয়েই আবার চুপ করে বসে রইল। পরে এই উপমাকে নিয়েই গান রচিত হল – 'পাখি তুই ঠিক বসে থাক ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে'। এর মধ্যে দুটো দিক আছে। একটা হল পাখি অসহায় হয়ে মাস্তুলে বসে রইল, দেখছে আমার আর কোন গতি নেই। এই জাহাজ যেখানেই যাবে আমাকেও সেখানেই যেতে হবে। ঠিক তেমনি যিনি আধ্যাত্মিক সাধক যখন অনেক সাধন, ভজন, তপস্যা করে দেখেন পরম প্রাপ্তি হচ্ছে না, তখন তিনি বলেন আমার আর কোন গতি নেই, প্রভু যা করার করবেন। দ্বিতীয় দিক হল, তার আগে তাঁকে পূব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ

দিকে যেতে হবে। যে পূব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে গিয়ে ডানা ব্যাথা করেনি তার পক্ষে আমার আর কোন গতি নেই তিনিই যা করার করবেন বলাটা চরম শঠতা।

অনেকে মনে করেন আমরা এই উপোস, সেই উপোস করে শরীর মনকে পবিত্র করব। যে একবার ঠাকুরকে আশ্রয় করেছে, একেবারে ঠিক ঠিক আশ্রয়, তার মনে কখনই অপবিত্রতা, অশুদ্ধির কল্পনাই আসবে না। কিন্তু যারা সব সময় তোতাপাখির মত বলে যাচ্ছে সব ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের কৃপা, ঠাকুরের করুণা আবার অন্য দিকে তারা কত রকম উপোস, কত রকম ব্রতও করে যাচ্ছে। এটা কি রকম? ঠাকুরের গল্পেই আছে – এক গোয়ালিনী রোজ পণ্ডিত মশাইকে নদীর ওপার থেকে এসে দুধ দিয়ে যেতো। একদিন দেরী হওয়াতে পণ্ডিত মশাই গোয়ালিনীকে জিজ্ঞেস করছেন 'আজ এতো দেরী হল কেন রে'? গোয়ালিনী বলছে 'খেয়া পার করার জন্য কোন মাঝি ছিল না, তাই অনেক দেরী হয়ে গেছে'। পণ্ডিত মশাই বলছেন 'আরে ভগবানের নাম নিলে তিনি ভব নদী পার করে দেন'। পরের দিন গোয়ালিনী খুব তাড়াতাড়ি দুধ নিয়ে এসেছে দেখে পণ্ডিত মশাই বলছেন 'আজ যে তুই অনেক ভোরেই চলে এলি, কি করে এলি'? 'কেন আপনি যে বললেন ভগবানের নাম করলে তিনি এই নদী পার করে দেন, তাই আমি তো শ্রীগোবিন্দের নাম করতে করতে নদী পার হয়ে এলাম'। পণ্ডিত মশাইতো অবাক। তিনিও পরীক্ষা করবার জন্য নদীর পারে এসেছেন। গোয়ালিনী গোবিন্দের নাম করতে করতে নদীর উপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে আর পণ্ডিত মশাইকে ডাকছে 'কি পণ্ডিত মশাই আপনি দাঁড়িয়ে কেন, আসুন'। পণ্ডিত মশাই ভগবানের নামও করছেন আর অন্য দিকে ধুতিও গোটাচ্ছেন। জলে পা দেওয়া মাত্র ভিজে গেলেন। পণ্ডিত মশাইয়ের দুটোই আছে। এক দিকে ঈশ্বর ভবনদী পার করে দেন আবার নিজেকে ধুতিটাও গোটাতে হবে জলে না ভিজে যায়।

আমাদের সবারই পণ্ডিতের মত অবস্থা। এর কারণ আমাদের সাধনা নেই, কোন কর্ম করা নেই। আগে কাজ করতে হবে। সব সময় নিরন্তর কাজ মানে সাধনা করে যেতে হবে। কাজ না করলে নৈষ্কর্মসিদ্ধি হওয়া যায় না। পুরোপুরি ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা অর্জনের জন্য আগে প্রচুর কাজ করতে হয়, খাটতে হয়। লড়াই করে করে, কাজ করতে করতে সব দেখে নিলেন যে কিছুতেই কিছু হয় না, তখন বোধদয় হবে যে কর্মের দ্বারা, সাধনার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। তখন দেখে আমার তো আর কোন গতি নেই, আমাকে এখানেই পরে থাকতে হবে, তিনি যা করার করবেন। পুরুষকারের ভাব একটুও যদি বাকি থাকে তাহলে আপনি যতই মনে করুন তিনি যা করার করবেন, ওতে হবে না। যখনই কোন সংকট আসবে তখন এই ভাবটা খড়কুটোর মত উড়ে যাবে। তখন মনে হবে একটু উপোস করলে বা তীর্থাদি করলে হয়তো সংকট থেকে মুক্ত হয়ে যাব। কোথাও একটা বোধ আছে যে আমার পুরোপুরি হয়নি। অনেক সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সাধনা করে করে একটা খুব ভালো অনুভূতির জায়গায় চলে গেছেন তাঁরাও একাদশী ব্রত করেন। তাঁরা যে এটা কোন পাপ বোধ থেকে করছেন তা নয়, কেউ অনেক দিন ধরে করে আসছেন আবার কোন সন্ন্যাসী মনে করছেন সব কিছুইতো করা হল, এটাও না হয় করলাম। এখানে ব্যাপারটা পুরোপুরি অন্য। কিন্তু আমার মনে একটা পাপ বোধ আছে, একটা অপূর্ণতা বোধ আছে সেই বোধ থেকে উপোস করছি, ব্রত করছি আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, তিনি যা করার করাবেন, এগুলোই শঠতা।

যমরাজ যে বলছেন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করছেন আমার ভয় কিসের, এই ভাবটাই অদৃষ্টবাদ। আর এর জন্যই হিন্দুদের প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। হিন্দুদের যে সেই হাজার হাজার বছর ধরে দুরবস্থা এর মূলে অদৃষ্টবাদের অপপ্রয়োগ। যে কোন সময়ের ইতিহাসের বই পড়লে দেখা যায় যখনই ভারতের কোথাও কোন ধরণের গোলমাল হয়েছে তখনই এই অদৃষ্টের উপর সব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বহু আগে থেকেই ভারত গোষ্ঠিতন্ত্র, উগ্র প্রাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতার মানসিকতার শিকার, তার উপর বহুবর্ণ, নিচু জাত, উঁচু জাত। যার ফলে সেই রামায়ণের যুগ থেকে যে লড়াই, মারামারি, যুদ্ধ চলে আসছে আজও তা বন্ধ হয়নি, শুধু তার রূপটা পাল্টেছে। লড়াই, ঝগড়া, কলহ প্রিয়রা যদি বলে সব তাঁর ইচ্ছা, এর থেকে বড় শঠতা আর কি হতে পারে! নিজের জন্য ও অপরের জন্য শারীরিক ও মানসিক ভাবে যখন প্রচুর কাজ করা হয়, কাজ করার পর

যখন নিজেকে অসহায় মনে হবে তখনই বলা যায় তিনিই রক্ষাকর্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়, এর আগে সবটাই ফাঁকিবাজি।

যমরাজ বলছেন অবিনাশী ঈশ্বর তাঁর নিজের খেলার ছলে এই জগৎ কে দাঁড় করিয়েছেন। যার যা ঠিক ঠিক প্রাপ্য তাকে তা ভগবানই দেন। কাউকে সেইজন্য দণ্ড দিচ্ছেন কাউকে দিচ্ছেন পুরস্কার। প্রাণীকে মৃত্যু বা কষ্ট দেওয়ার, কাউকে ভালো করার, কাউকে আনন্দ দেওয়ার অধিকার একমাত্র ঈশ্বরের। সমস্যা হচ্ছে এর প্রমাণ কি কেউ দিতে পেরেছেন? এখানে এসেই গোলমাল হয়ে যায়। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট দেখছেন ঈশ্বরই সব করছেন, স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। কথামৃত পড়ার পর ঠিক করলাম কাল থেকে এটাই অভ্যাস করা যাক। কিন্তু এক ঘন্টা যেতে না যেতেই ঈশ্বরের ইচ্ছা উড়ে গিয়ে নিজের ইচ্ছা গ্যাঁট হয়ে বসে যাবে। কথামৃতের তুঁহু তুঁহু পড়ে ঠিক করলাম আমার অহং বুদ্ধিটাকে নাশ করে এবার থেকে তুঁহু তুঁহু ভাব নিয়ে আসব। খুব ভালো কথা। তুঁহু তুঁহু করে যাচ্ছি, আর বলে যাচ্ছি প্রভু তুমিই সব, আমি আর কে! কিন্তু যেই বেড়ালে ধরল তখন তুঁহু তুঁহুটা উড়ে গিয়ে অহং অহং বাজতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক ঠিক যতক্ষণ বোধ না আসে যে তিনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই ততক্ষণ তুঁহু তুঁহু বাজবে না। এই বোধ আসা খুব কঠিণ। তার জন্য চাই মুণ্ডুকাটা তপস্যা। ঠাকুরের দীর্ঘকাল ব্যাপী মুণ্ডুকাটা তপস্যার ইতিহাস কি আমরা ভুলে গেছি! এই বোধ যাদের নেই অথচ মুখে সব সময় বলে তিনিই সব করছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, এরাই পরে গিয়ে বিপদে পড়ে। আগে থেকে প্রচণ্ড নিষ্ঠা সহকারে সাধনা যদি না করা থাকে এগুলোই তখন শঠতার আকার ধারণ করে।

এরপর বলছেন – ভাগ্য যদি অনুকূল হয় তাহলে রাস্তায় যদি তোমার মানিব্যাগ পড়ে যায়, দুদিন পরে এসে দেখবে তোমার মানিব্যাগ সেখানেই পড়ে আছে। আর ভাগ্য যদি তোমার প্রতিকূল হয়ে যায়, তখন ঘরের ভেতরে সিন্দুক থেকেও জিনিষ চুরি হয়ে যাবে। এগুলোই হল প্রকৃত অদৃষ্টবাদ। অদৃষ্ট বা ভাগ্যের দোহাই দেওয়ার আমাদের স্বভাবটা তৈরী করে দিয়েছে পুরাণ। উপনিষদ কখনই অদৃষ্ট, ভাগ্য এসব নিয়ে কোন আলোচনাতেই যাবে না। মহাভারতের কিছু কিছু কাহিনীতে সামান্য একটু পাওয়া গেলেও, ভাগবত অদৃষ্টের দোহাই দেওয়াটাকে একেবারে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। সাধারণ মানুষদের সামনে ভাগবতাদি পুরাণের প্রবচন বেশী হয় বলে সাধারণ মানুষরা মেনে নিল যে ভাগ্যই সব, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। ভাগ্যে থাকলে হবে, না থাকলে হবে, তাই কোন চেষ্টা না করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাটা ভারতবাসীদের জাতীয় স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

যমরাজ বাড়ির সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছেন *সুযজ্ঞো নন্বয়ং শেতে মূঢ়া যমনুশোচথ। যঃ শ্রোতা যোঽনুবক্তেহ স ন দৃশ্যেত কর্হিচিৎ।।৭/২/৪৪।* 'আচ্ছা এই যে সুযজ্ঞ নামের যে ব্যক্তিটি মারা গেছে, যার জন্য তোমরা এত কান্নাকাটি করছ, যে সুযজ্ঞের সঙ্গে তোমরা কথা বলতে, যে সুযজ্ঞ তোমাদের কথা শুনতো, সেই সুযজ্ঞ তো তোমাদের সামনেই পড়ে আছে, তার কি হয়েছে, কিছুই হয় নি, তা তোমরা কাকে নিয়ে দুঃখ করছ, এই শরীর যেমন ছিল তেমনই তো আছে'। যমরাজ ঐ বাচ্চার রূপ ধরেই বলছেন 'তোমরা ভালো করে বিচার কর, আত্মা নিজেকে যখন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন তখন তাকে জীব বলা হয়। এইভাবে যতক্ষণ সে এই জীবত্বের মধ্যে থাকবে ততক্ষণই সে কর্ম করে যাবে আর কর্মের বন্ধনে পড়ে থাকবে। সেইজন্যই জীবের এত দুঃখ আর ক্লেশ। এই জীবরূপ ধারণ করে মানুষ যা কিছু কল্পনা করে, কল্পনা থেকে যা কিছু কর্ম করে চলে এগুলো সব মিথ্যা। এই জগৎ যেটা দেখছ এটা হল কল্পনা। মানুষ স্বপ্নে যেমন নানা কল্পনা করে সেই রকম এই জগতটাও একটা কল্পনার জগৎ। মানুষের আসল স্বরূপ আত্মা আর এটাই একমাত্র সত্য, কিন্তু সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে। আত্মার যা ধর্ম নয় সেটাতে নিজেকে জড়িয়ে নিজের ধর্ম বলে মনে করে। সেইজন্য যিনি শরীর আর আত্মার তত্ত্ব জানেন, মানে কোনটা শরীরের ধর্ম আর কোনটা আত্মার ধর্ম জানেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানরা এই শরীরের জন্য কোন শোক করেন না। কিন্তু যাদের মধ্যে জ্ঞানের দৃঢ়তার অভাব তাদেরই প্রচুর শোক, দুঃখ, কষ্ট হয়'।

এইসব তত্ত্ব কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে ভাবছে এতো কোন সাধারণ বালক হতে পারে না। সবাই তখন বলছে আপনি কে, আপনি নিশ্চই কোন দেবতা বা ঋষি হবেন। তখন যমরাজ নিজের পরিচয় দিলেন। নিজের মা, ভাইয়ের বৌ ও সন্তানদের এই কাহিনী বলে হিরণ্যকশিপু তপস্যা করতে চলে গেল, শুধু এই কামনায় – *হিরণ্যকশিপূ রাজন্নজেয়মজরামরম্। আত্মানমপ্রতিদ্বন্দ্বমেকরাজং ব্যধিৎসত।।৭/৩/১।* আমি যেন অমর হয়ে যাই, আমি যেন অজেয় হয়ে যাই, জরা যেন আমাকে কখন গ্রাস না করতে পারে এবং আমি এই সংসারের একচ্ছত্র সম্রাট হব যাতে কেউ আমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

হিরণ্যকশিপু কত রকম ভাবে তপস্যা করতে লাগল তার এক বিশাল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সে হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে অনেক দিন ধরে তপস্যা করছে। নানান ধরণের কঠোর তপস্যা করে চলেছে। এতো তপস্যা করলে কোন্ দেবতা সন্তুষ্ট না হয়ে থাকবেন! ব্রহ্মাও খুব সন্তুষ্ট হয়ে হিরণ্যকশিপুর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন 'বল তুমি কি বর চাও'? তখন হিরণ্যকশিপু বলছে 'সবাই তপস্যা করে যেতে চায় বিষ্ণুলোকে, সবাই বিষ্ণুপদ কামনা করে তপস্যা করে, কিন্তু আমার এই বিষ্ণুপদ নিয়ে কোন আগ্রহ নেই, এগুলো আমার কাছে অতি তুচ্ছ'। শাস্ত্র মতে বৈষ্ণব পদ হল 'তদবিষ্ণো পরমং পদম্, সেটাই হচ্ছে পরম পদ, অবিনাশী পদ। হিরণ্যকশিপুর মধ্যে আসুরিক বুদ্ধি বিরাজ করছে, তাই পরম পদের দিকে তার নজর নেই। ব্রহ্মা বলছেন 'তুমি যা তপস্যা করেছ এই তপস্যা ঋষিরাও আগে করতে পারেননি। তুমি জল না খেয়ে এই গরমে একশ বছর তপস্যা করেছ, এই রকম তপস্যাতো কল্পনাই করা যায় না। যদি বিষ্ণুপদই না নিতে চাও তবে তুমিই বল তুমি কি চাও'? হিরণ্যকশিপুতো আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে সে তপস্যার দ্বারা কি পেতে চায়। ব্রহ্মা কিন্তু বলছেন 'দ্যাখো, এই জগতে কেউই অমরত্বের বর নিতে পারেনা, তুমি অন্য কোন বর নিয়ে নাও'। তখন এর বদলে অন্য একটা ব্যবস্থা হল। হিরণ্যকশিপু তখন বলল 'আমাকে কোন মানুষ মারতে পারবে না, কোন দৈত্য মারতে পারবে না, কোন পশু মারতে পারবে না, কোন দেবতা মারতে পারবে না। আর কেউ আমাকে দিনে মারতে পারবে না, রাত্রে মারতে পারবে না, সকালে মারতে পারবে না, সন্ধ্যায় মারতে পারবে না, অস্ত্রে মারতে পারবে না, জলে মারতে পারবে না'। ওর বুদ্ধিতে যত কুলাল সব বলল, সে বিশাল এক তালিকা কিসে কিসে মারতে পারবে না।

ব্রহ্মার বরে হিরণ্যকশিপু এখন বিরাট ক্ষমতাবান, আর ক্ষমতা পেয়েই তার নানান রকমের অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। দেবতারা সব গেল পালিয়ে। এদিকে তার প্রহ্লাদ নামে এক সন্তানের জন্ম হল। প্রহ্লাদের যখন পাঁচ বছরের কম তখন সে যে খেলাধূলো করতো সেখানে সে তার বন্ধুদের নিয়ে ভগবানের ধ্যান ধ্যান খেলা করত। স্বামীজীর জীবনেও এই জিনিষ দেখা গিয়েছিল, তিনিও বাচ্চা বয়স থেকে ধ্যান ধ্যান খেলতেন। প্রহ্লাদও তাই করত। আর ধ্যানের খেলা করতে গিয়ে প্রহ্লাদের বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে যেত, কোন হুঁশ থাকত না। প্রহ্লাদের সেই সময়কার অবস্থার বর্ণনা করে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন *আসীনঃ পর্যটন্নশ্নন্ শয়ানঃ প্রপিবন্ ব্রুবন্। নানুসন্ধত্ত এতানি গোবিন্দপরিরম্ভিতঃ।।৭/৪/৩৮।* প্রহ্লাদের সব সময় মনে হত ভগবান বিষ্ণু যেন তাকে কোলে নিয়ে বুকের মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছেন। যার ফলে প্রহ্লাদের শোওয়া-বসা, খাওয়া-জলপান, হাঁটা-চলা বা কথা বলার সময়তেও কোন বোধই থাকত না। সব সময় তার একটাই বোধ। ভগবান নারায়ণ আমাকে কোলে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে আছেন। তাই জাগতিক সুখ-দুঃখের কোন বোধই প্রহ্লাদের থাকত না।

ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হলে ভক্তের কি কি হয়, তাঁরা কি রকমের আচরণ করেন, প্রহ্লাদকে উপলক্ষ করে তার খুব সুন্দর একটা বড় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন প্রহ্লাদের মন এমন ঈশ্বরে ডুবে থাকে যে কখনো কখনো মনে হয় এই বুঝি ভগবান আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন, এই মনে করে তাঁর হৃদয় দুঃখে এতই কাতর হয়ে যেত যে উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করে দিতেন। আবার কখন কখন অন্তরে ভগবানের নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করে আনন্দে এত পুলকিত হন যে হা হা হা করে হাসতে থাকেন। কথামৃতে ঠাকুর এই ধরণের ভক্তির প্রচুর বর্ণনা করেছেন – এই হাসে, এই কাঁদে, এই নাচে, এই গায়। ঈশ্বরীয় প্রেমে মানুষ কতটা উন্মত্ত

হতে পারে তার এই বর্ণনা কিন্তু ভাগবত থেকেই এসেছে। এগুলোই ভক্তের বাহ্যিক লক্ষণ, তাঁরা কি রকমের আচরণ করেন সেগুলোকে পুরাণকাররা খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছেন। আর সেটাই ভাগবতে বিস্তৃত করে তুলে দেওয়া হয়েছে। বলছেন কখন চিৎকার করছেন, কখন নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন, কখন ভগবানের অনুকরণ করছেন। মীরাবাঈ বা অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে এই ধরণের আচরণ দেখা যেত, ভাগবতে তারই বিরাট বর্ণনা চলছে। প্রহ্লাদের কি রকম অবস্থা ছিল সেটাকে বোঝাতেই ভক্তদের এই বিভিন্ন আচরণের কথা বলা হয়েছে।

প্রহ্লাদ ছিলেন খুব বড় উচ্চকোটির সাধক, আর এই ধরণের উচ্চ আধ্যাত্মিক আধারের সন্তানকে পাওয়া যে কোন বাবা মার পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে প্রহ্লাদের বাবা হিরণ্যকশিপু ছিল আসুরিক মনোভাবাপন্ন। তাই প্রহ্লাদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাবের এই বাহ্যিক আচরণগুলো হিরণ্যকশিপু কিছু মাত্র বুঝতে পারল না। যাই হোক, এরপর প্রহ্লাদকে ষণ্ড আর অমর্ক নামে দৈত্যকুলের দুজন শিক্ষকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রহ্লাদ প্রথম থেকেই প্রচণ্ড মেধাবীবান ছাত্র ছিল, যা কিছু শিক্ষকরা প্রহ্লাদকে শেখাতেন, সে রাজনীতি, বা যুদ্ধনীতি বা ধর্মশাস্ত্র যাই শিক্ষা দিতেন একবার বলা মাত্র তার মাথাতে বসে যেত, পরে শিক্ষকরা য কিছু জিজ্ঞেস করর প্রহ্লাদ চটপট তার উত্তর দিয়ে দিত।

অনেক দিন শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা লাভের পর একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডেকে এনে কোলে বসিয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে 'বাবা প্রহ্লাদ! এতদিনে তুমি যা কিছু শিখেছ তার মধ্যে তোমার কোন্ বিষয়ের আলোচনা বেশী পছন্দ'? এই জায়গা থেকে প্রহ্লাদের আসল কাহিনী শুরু হয়। প্রহ্লাদ বলছেন *তৎসাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ। হিত্বাঽঽত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত।।৭/৫/৫।* প্রহ্লাদ তার পিতৃদেবকে বলছেন 'আমার মনে হয়, এই জগতের প্রাণীরা আমি আর আমার এই মিথ্যাবোধকে আশ্রয় করে প্রচুর যন্ত্রণা আর কষ্ট পায়, আর যে কোন প্রাণীর যে অধঃপতন হয় তার মূল কারণ এটাই – আমি আর আমার বোধ। সেইজন্য আমার নিজের মনে হয় মানুষ যদি তৃণাচ্ছাদিত অন্ধকূপের সমান এই সংসার ত্যাগ করে নির্জন জঙ্গলে চলে যায় আর সেখানে গিয়ে যদি ভগবান শ্রীহরির শরণ নেয় যাতে আমি আর আমার এই বোধটাকে ত্যাগ করতে পারে তাহলে এতেই তাদের সবার সার্বিক কল্যাণ সাধন হবে।

যাই হোক, হিরণ্যকশিপু ছেলের কথা শুনে ভাবছে – এ নিতান্ত বাচ্চা ছেলে, বাচ্চা ছেলের মতই কথা বলছে। এমনও হতে পারে প্রহ্লাদ যে পাঠশালায় লেখাপড়া শিখছে সেখানে হয়ত কিছু বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ কৌশল করে শিক্ষক সেজে ঢুকে গেছে, তারাই হয়ত বাচ্চার মাথায় এই বিপরীত বুদ্ধিগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে। এদিকে রাজার সন্দেহের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের কাছেও যখন খবর গেছে তখন তারা প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করছে 'এই বুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে প্রহ্লাদ? আমরাতো তোমাকে এসব কিছু শেখাইনি'। শিক্ষকদের দৃঢ় ধারণা যে রাজা সন্দেহ করছে তারাই প্রহ্লাদকে এসব বাক্য শিখিয়েছে।

প্রহ্লাদ তখন উল্টে নিজের শিক্ষকদেরই উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। প্রহ্লাদ তাঁর শিক্ষকদের বলছেন *স্বঃ পরশ্চেত্যসদ্‌গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ। বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ।।৭/৭/১১।* জাগতিক মোহে যাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত আর যারা ভগবানের পথ থেকে সরে এসেছে তাদেরই মধ্যে শুধু আমি আর আমার এই ভেদ বুদ্ধির উদয় হয়, আর তাই তাদের এত কষ্ট ভোগ করতে হয়। আমি আর আমার বুদ্ধি পশুদের বুদ্ধি। আমি সেই মায়াধীশ ভগবানকে প্রণাম জানাই'। এর অর্থ হল – একটা গরু আর তার সামনে ঘাস আছে। গরু এখন কি দেখবে? আমি আর আমার ঘাস, ঘাস আর নিজেকে গরু সব সময় আলাদাই দেখবে। উত্তরাখণ্ডে এক মহাত্মা ছিলেন তিনি এই ভাগবতাদির প্রবচন দিতেন। একদিন এক সাধু এসে তাঁকে বলছেন 'মহাত্মাজী! আমি অনেক বিচার করে দেখলাম যে দ্বৈতবাদীই সত্য'। মহাত্মাজী শুনে বলছেন 'তা এতে তুমি কি এমন তীর মারলে! দ্বৈতবাদ যে সত্য সেতো একটা গরুও জানে। সে জানে আমি আর ঘাস আলাদা, তা তুমি এমন কি বড় কিছু করে দিলে! হ্যাঁ তুমি যদি বুঝে নিতে অদ্বৈত একটি বাদ তাহলে বুঝতাম

তুমি কিছু একটা করে নিলে, দ্বৈততো স্বাভাবিক। আমি আছি আর এই বই আছে, আমি আর বই আলাদা, এতো আমার বুদ্ধিই বলে দিচ্ছে, সাধনা না করেই দ্বৈতবাদ বোঝা যাচ্ছে। আর দ্বৈতবাদই সত্য বোঝার জন্য তুমি এমন কি বিরাট তীর মেরে নিলে'। প্রহ্লাদও ঠিক এই কথাই বলছেন, পশুও জানে সে আলাদা আর তার খাদ্য আলাদা। কারণ তার বুদ্ধি এখনো বিকশিত হয়নি, আমি আর আমার এই ভেদ বুদ্ধিটাই হল পশু বুদ্ধি।

প্রহ্লাদ বলছেন – যাঁরা বড় বড় বেদজ্ঞ, বড় বড় পণ্ডিত তাঁরাও পরমাত্মার বিষয়ে জানতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যান। আপনারা আমার শিক্ষক হয়ে জানতে চাইছেন আমার বুদ্ধিকে কে ভ্রষ্ট করেছে? তাহলে আপনারা জেনে নিন, যিনি সেই পরমাত্মা, যিনি আমার হৃদয়ে বাস করেন তিনিই আমার বুদ্ধিকে বিপরীত করে রেখেছে। মানে, আমাকে এই কথাগুলো কেউ শেখায়নি, এগুলো আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এসেছে। অর্থাৎ তিনি নিজেই আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমার এই শিক্ষার জন্য অন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। *যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া।।৭/৫/১৪।* যেমন চুম্বক লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি চক্রধারী ভগবান নিজের ইচ্ছা শক্তি দিয়ে আমার মনটাকে সংসার থেকে উৎপাটিত করে তাঁর দিকে টেনে নিচ্ছেন। প্রহ্লাদ বলতে চাইছেন, ঈশ্বর নিজেই তাঁকে টেনে নিচ্ছেন, এর জন্য অন্য কাউকে দোষ দেওয়ার দরকার নেই।

ভাগবতে এর আগে ধ্রুব চরিত্রের বর্ণনা এসেছিল। এখানে পাচ্ছি প্রহ্লাদ চরিত্র। দুজনেই শিশু, কিন্তু দুজনের চরিত্রে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথম যে পার্থক্যটা নজরে আসে তাহল ধ্রুবের মধ্যে 'আমি আর আমার' এই ভেদ বোধটা ছিল, প্রহ্লাদ কিন্তু প্রথম থেকেই ভেদবুদ্ধি রহিত ছিল। আরেকটি প্রধান পার্থক্য হল ধ্রুবকে চেষ্টা করে খেটে খুটে, সাধনা ও তপস্যার দ্বারা ভক্তি লাভ করতে হয়েছিল, কিন্তু প্রহ্লাদের ভক্তি স্বতঃ, আপনা থেকেই প্রহ্লাদের মধ্যে ভক্তি এসেছিল, ভক্তি লাভের জন্য তাঁকে সাধনা করতে হয়নি। ভক্তি দুই রকমের। একটা হল চেষ্টার দ্বারা, তা সকামই হোক বা নিষ্কামই হোক, সাধনার দ্বারা পাওয়া। আরেকটি স্বতঃ, স্বাভাবিক, প্রহ্লাদের ক্ষেত্রে এটাই হয়েছিল spontaneous । প্রহ্লাদ বলছেন – আমি নিজেও জানিনা, কিন্তু বুঝতে পারছি তিনিই আমাকে টেনে নিচ্ছেন। প্রহ্লাদের দিক থেকে কোন চেষ্টা নেই, কিন্তু ভগবান তাঁকে টেনে নিচ্ছেন। এরপর এর উপর যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। প্রহ্লাদের হয়তো আগের আগের জন্মে অনেক সাধনা করা ছিল, আমরা এখানে এগুলোকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। সব সময় চোখের সামনে যা দেখছি সেটার উপরেই আমরা জোর দেব। এখানে ভক্তি লাভ দুজনেই করেছেন একজন করছেন through self effort আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা আরেকজনের স্বতঃ spontaneously। যাদের ভক্তি হয় তাদের দুই ধরণেরই হয় – চেষ্টা করেও হয় আর চেষ্টা না করেও হয়। এখন প্রহ্লাদ ভগবানকে ভুলে থাকতে চাইলেও পারবেন না। ঠাকুর এই ব্যাপারে খুব সুন্দর একটা উপমা দিয়েছেন। কিছু গাছে ফুল হওয়ার আগেই ফল আসে। আর বাকী সব গাছে ফুল আগে ফল পরে। ধ্রুবের আগে ফুল তারপর ফল আর প্রহ্লাদের ফল আগে ফুল পরে, সাধনা পরে করছেন। এখানে অনেক রকমের উপমা আছে – একটা পাতাল ফোঁড়া শিব আরেকটা বসানো শিব।

এইভাবে কিছু দিন যাবার পর হিরণ্যকশিপু আবার প্রহ্লাদকে ডেকে পাঠিয়েছে। প্রহ্লাদ আসার পর হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞেস করছে 'আচ্ছা বাবা, তুমিতো অনেক পড়াশুনো করলে, মাস্টার মশাইদের কাছ থেকে যা শিখেছ তার থেকে দুচারটে ভালো কথা আমাকেও শোনাও'। প্রহ্লাদও তখন খুশী হয়ে বাবাকে বলছেন – *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।৭/৫/২৩।* এই শ্লোকে প্রহ্লাদ ভক্তিমার্গের খুব প্রচলিত নবধা ভক্তির কথা বলছেন। ভক্তি কত ভাবে অর্জন করা যায় – *শ্রবণং*, ভগবানের নাম শ্রবণ করা, ভগবানের লীলাকথা বা শাস্ত্র পাঠ শোনা, *কীর্তনম্* - ভগবানের নামগুণগান করা, *বিষ্ণোঃ স্মরণম্* – বিষ্ণুর কথা ও রূপের চিন্তা করা, *পাদসেবনম্* - ভগবানের চরণকমলের সেবা করা, *অর্চনম্* - ভগবানের পূজা অর্চনা করা, *বন্দনম্* - ভগবানের বন্দনা করা, *দাস্যম্* – আমি ভগবানের দাস, তাঁর ভৃত্য, *সখ্যম্* – আমি তাঁর বন্ধু, আর *আত্মনিবেদনম্* - আমি আমার আমিত্বকে তাঁর কাছে বিসর্জন দিলাম। ভক্তিশাস্ত্রে

এই নয় প্রকারে ভগবানের প্রতি ভক্তির অনুশীলনের কথা বলা হয়। প্রহ্লাদ বলছেন, যখন ভগবানের প্রতি সমর্পণের ভাব নিয়ে এই নয় প্রকার ভক্তির ঠিক ঠিক অনুশীলন করা যায় তখনই তাকে আমি যথার্থ শিক্ষা বলে মনে করি।

প্রহ্লাদের মুখে ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির কথা শুনেই ক্রোধে হিরণ্যকশিপুর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। রাগে জ্বলতে জ্বলতে বলছেন যে বিষ্ণু প্রহ্লাদের কাকাকে হত্যা করেছে সেই অধম বিষ্ণুরই কিনা সে চরণ বন্দনা করছে! আমার তো মনে হয় আমার ভাইয়ের হত্যাকারী বিষ্ণুই প্রহ্লাদ হয়ে জন্ম নিয়েছে। তাই এই প্রহ্লাদ এখন হত্যারই যোগ্য। *পরোঽপ্যপত্যং হিতকৃদ্যথৌষধং স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ। ছিন্দ্যাত্তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং শেষং সুখং জীবতি যদ্বিবর্জনাৎ।।৭/৫/৩৭।* পর হয়েও যে ওষুধের মত উপকারী হয় তবে তাকে আত্মজই বলে মনে করতে হয়, কিন্তু আত্মজ যদি পিতার ক্ষতি করে তবে সে ব্যাধির মতই শত্রু। নিজের শরীরের কোন অঙ্গে যদি রোগগ্রস্ত হয়ে যায় তখন সেই অঙ্গকে কেটে বাদ দিতে হয়, বাদ না দিলে পুরো শরীরটাই ব্যধিগ্রস্ত হয়ে যাবে, সুস্থ শরীর নিয়ে সে আর বেঁচে থাকতে পারবে না। আমার বংশে কোথা থেকে এসে আমারই এক পরম শত্রু জন্ম নিয়েছে। স্বজনের বেশে নিশ্চয় কোন শত্রুই আমার পুত্র রূপে এই বংশে জন্ম নিয়েছে।

হিরণ্যকশিপু বলছে, *সর্বরুপায়ৈর্হন্তব্যঃ সম্ভোজশয়নাসনৈঃ। সুহৃল্লিঙ্গধরঃ শত্রুর্মুনের্দুষ্টমিবেন্দ্রিয়ম্।। ৭/৫/৩৮।* যোগীর কোন একটি ইন্দ্রিয় যদি ভোগলোলুপ হয়, তাহলে সেই যোগীর আধ্যাত্মিক মৃত্যু অবধারিত। আমাদের দশটি ইন্দ্রিয়, আর এগারতম ইন্দ্রিয় হল মন বা বুদ্ধি। এই এগারোটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোন একটা ইন্দ্রিয় যদি তার নিজের বিষয়ের ভোগে আসক্ত হয় তাহলে ওই একটা ইন্দ্রিয়ই বাকি দশটি ইন্দ্রিয়কে একাই শেষ করে দেবে। একের উপর যদি দুটো ইন্দ্রিয় ভোগাসক্ত হয় তাহলে তো তার আর কোন ভাবেই রক্ষে নেই। কোন সন্ন্যাসীর যদি এই ইচ্ছে হয় যে আমি একটা ভালো বই লিখব, মানে বুদ্ধির খেলা খেলতে চাইছে, তাহলে বুঝে নিতে হবে সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক জীবন এই জন্মের মত ইতি হয়ে গেল। আজকাল কত রকমের subject বেরিয়েছে, Vedanta in Management, Science and Vedanta, Vedanta in Public Administration এই ধরণের কত নতুন নতুন বিষয়ের উপর কত বই, কত প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, কত সেমিনার হয়েই চলেছে, আর সবাই সবাইকে টেক্কা দিয়ে চলছে। এগুলো কিছুই নয়, শুধু বুদ্ধির খেলা মাত্র, দুদিন পর এই বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ই তাকে কোথায় টেনে নিয়ে ফেলবে বুঝতেই দেবে না। কোন সন্ন্যাসীর যদি গান শোনার খুব ইচ্ছা থাকে, তাহলে সেই সন্ন্যাসীকে চিৎ করে ফেলে দিতে এই শ্রবণেন্দ্রিয় একাই যথেষ্ট। হিরণ্যকশিপু তাই বলছে, যোগীদের যেমন একটি ভোগলোলুপ ইন্দ্রিয় শেষ করে দেয়, এই ছেলেও আমার বংশকে শেষ করে দেবে, তাই একে আগেই শেষ করে দিতে হবে।

তারপরের কাহিনী সকলেরই জানা। প্রহ্লাদকে কখন তুষারাবৃত পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কখন আগুনের লেলিহান শিখাতে, কখন উত্তাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে, কখন ভয়ংকর তুফানের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে, কখন মাটির অতল গহ্বরে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিচ্ছে, কখন আবার তাঁকে বিষাক্ত সর্পের মধ্যে, কখন ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুর খাঁচার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাঁকে মেরে ফেলাতো দূরে থাকুক, তার গায়ে কোন আঁচড়ই লাগছে না। প্রহ্লাদকে যখন বিভিন্ন ভাবে বধ করবার চেষ্টা চলছে সেই সময় প্রহ্লাদের মন ভগবানের সঙ্গে পুরোপুরি লীন হয়ে থাকছে। সমস্ত শক্তির আধার সেই পরব্রহ্ম, প্রহ্লাদ সেই পরব্রহ্মের সঙ্গে তখন একাত্ম হয়ে থাকার জন্য কোন কিছুতেই তার কিছু হচ্ছিল না।

কি রকম? যেমন যখন পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রহ্লাদকে নীচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যে পরব্রহ্ম হলেন সমস্ত শক্তির আধার, তখন তিনি সেই পরব্রহ্মের গুরুভার (heaviness) তত্ত্বের সঙ্গে নিজের মন, বুদ্ধি, চিত্তকে একাত্ম করে দিচ্ছেন, তার ফলে পাহাড়ের উপর থেকে পাহাড়কে ফেলে দেওয়ার পর প্রহ্লাদের কিছুই হচ্ছে না, বরঞ্চ যেখানে এসে পড়ছে সেখানকার পাথরই গুড়ো গুড়ো হয়ে ধুলিকণার মত হয়ে যাচ্ছে। প্রহ্লাদকে যখন সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে তখন সে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে সমুদ্রের জলে ভেসে থাকছে। যখন বিষাক্ত

সর্পের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে তখন প্রহ্লাদ সমস্ত ভূতের সঙ্গে নিজেকে এক করে নিচ্ছেন, সাপের বিষে তো আর সাপ মরবে না। এগুলো হল যোগশক্তি। যোগীরা সাধনার দ্বারা এই যোগশক্তি অর্জন করে বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নেন। মনকে যদি পরব্রহ্মের লীন করে দেন তখন কোন শক্তিই যোগীকে কিছু করতে পারবে না।

এত কিছু করার পরেও হিরণ্যকশিপু দেখল প্রহ্লাদের কিছুই হলো না। প্রহ্লাদের মধ্যে এই অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখে হিরণ্যকশিপু বিস্মিত হয়ে একটু যেম দমে গেল। নিজের অক্ষমতা দেখে ভেতরে ভেতরে নিজেও প্রমাদ গুণতে শুরু করে দিয়েছে। দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধের সময় দেখা যায় একটা দেশ আরেকটা দেশকে কিছুতেই শায়েস্তা করতে পারছে না, তখন বেশী শক্তিশালী দেশ দুর্বল দেশের সাথে একটা দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা করে যুদ্ধটা মিটিয়ে নেয়। মানে আমিই সুপিরিয়র থাকব কিন্তু একটা চুক্তি করে নিলাম। প্রহ্লাদকেও যখন হিরণ্যকশিপু কিছু করতে পারলো না, তখন দৈত্যকুলের মহারথীরা প্রহ্লাদকে বলছে – আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, তুমি এভাবে আর ভগবান বিষ্ণুর নাম মুখেও আনবে না।

প্রহ্লাদ ছাড়া পেয়ে গেছে। ছাড়া পেয়ে সে আবার গুরুর আশ্রমে ফিরে গেছে। শিক্ষকরা এবার প্রহ্লাদকে শুধু ধর্ম, অর্থ ও কামের শিক্ষাই দিয়ে যেতে লাগল। একদিন আচার্য কোন কাজে বাইরে যাওয়ায় অন্যান্য সহপাঠিরা প্রহ্লাদকে নিরিবিলি কাছে পাওয়ার অবকাশ পেয়ে গেল। সহপাঠিরা সবাই নিতান্তই বালক, তাদের বুদ্ধি তখনও মলিন হয়নি। খেলায় মত্ত না হয়ে তারা প্রহ্লাদের চারপাশে বসে মিত্রের প্রতি মিত্রের ভালোবাসার দৃষ্টিতে নিষ্পলক নেত্রে প্রহ্লাদের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রহ্লাদের হৃদয়ও তাদের প্রতি করুণা আর মৈত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সহপাঠিদের উদ্দেশ্যে প্রহ্লাদ তখন বলছেন – *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ। দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।।৭/৬/১।* দ্যাখো ভাই! এই জগতে মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ। মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হল পরমাত্মাকে লাভ করা। কিন্তু কবে কখন এই জীবন যে শেষ হয়ে যাবে আমাদের কারুরই জানা নেই। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিৎ কবে আমি যৌবন থেকে বার্ধক্যে প্রবেশ করব তার অপেক্ষা না করে শৈশব থেকেই ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য সাধন-ভজন আরম্ভ করে দেওয়া। কারণ কিছুদিন পরে যৌবন আসবে, যৌবনে মন অন্য দিকে চলে যাবে, যৌবন চলে গিয়ে বৃদ্ধাবস্থা আসবে, বৃদ্ধাবস্থায় শরীর জরাজীর্ণ হয়ে যাবে, তখন আর সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা, উচ্চ চিন্তন এগুলো কিছুই করা সম্ভব হবে না। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য তাই যা করার শৈশবেই করে নিতে হয়। বৃদ্ধ বয়সের জন্য এগুলো ফেলে রাখলে কিছুই হবে না।

প্রহ্লাদ বলছেন *সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্। সর্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্যথা দুঃখমযত্নতঃ।।৭/৬/৩।* শোন ভাই! প্রাণী যে যোনীতেই জন্ম নিক না কেন, প্রারব্ধ অনুসারে তার ইন্দ্রিয়জনিত সুখভোগের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য হয় না। কপালে যদি দুঃখভোগ থাকে শত চেষ্টাতেও সেই দুঃখকে নিবারণ করা যায় না। অর্থাৎ প্রহ্লাদ বলতে চাইছেন এই যে আমাদের নীতি শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র পড়ান হচ্ছে এগুলো আমাদের কোন কাজেই আসবে না, এগুলো বেকার। কারণ আমাদের প্রারব্ধে যা আসবার তা আসবেই। আমাদের মনে রাখতে হবে প্রহ্লাদের এই কথাগুলো শুধু তাদেরই জন্য যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ, যারা আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন নয় তাদের জন্য বলা হচ্ছে না। মধুসুদন সরস্বতী এক জায়গায় বলছেন যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদের যা কিছু দরকার হয় ভগবান তাঁদের কাছে সেগুলো ঠিক পৌঁছে দেন। আর যারা সাধারণ লোক তাদেরও ভগবানই দেন তবে তাদেরকে কাজ করিয়ে, খাটিয়ে নিয়ে তারপরে দেন। যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে আছেন তাঁদের প্রয়োজনীয় সব এসে যায়, আর না এলেও তাঁরা উদ্বিগ্ন হন না বা তোয়াক্কা করেন না। বাকীদেরও ভগবানই দেন কিন্তু তাদের দিয়ে আগে খাটিয়ে নেন, তারপর দেন।

এখানে প্রহ্লাদ মজার একটা কথা বলছেন – *পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্ধং চাজিতাত্মনঃ। নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেহন্ধং প্রাপিতস্তমঃ।।৭/৬/৬।* মানুষের আয়ু মাত্র একশ বছর। যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়কে

বশীভূত করতে পারেনি সে জীবনের অর্ধেক সময় তমোগুণের বশীভূত হয়ে নিষ্ক্রিয় ভাবে নিদ্রিত অবস্থায় অজ্ঞানাচ্ছন্নতায় নিষ্ফল জীবন অতিবাহিত করে। এখানে মজার ব্যাপার হল এর আগের আগের কাহিনীতে যত প্রধান চরিত্র আমরা পেয়েছি তাঁদের কারুরই এক কোটি বছরের নীচে আয়ু ছিল না। কিন্তু এখানে হঠাৎ মাঝখানে মানুষের আয়ু একশ বছর হয়ে গেল। কেন হঠাৎ মানুষের একশ বছর আয়ু করে দিলেন? আসলে হিন্দু ধর্মে বেদকে কেউ উল্লঙ্ঘন করতে পারবে না। বেদে বার বার বলা হয়েছে মানুষের আয়ু একশ বছর। আখ্যায়িকা তৈরী করতে গিয়ে কাউকে দশ লক্ষ বছর, কাউকে এক কোটি বছর আয়ু খুব সহজেই দিয়ে দেওয়া যায়। তাঁরাও ভালো করেই জানেন এগুলো আখ্যায়িকা। কিন্তু যখন অনুশীলনের ব্যাপার আসছে, যখন সাধন-ভজনের ব্যাপার আসছে তখন দুম্ করে বাস্তবে নেমে এসে বলছেন – মানুষের আয়ু মাত্র একশ বছর, তার মধ্যে অর্ধেক সময় ঘুমেই কেটে যায়, জীবনের বাকি পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রথম কুড়ি বছর খেলায় মত্ত থেকে কেটে যাচ্ছে, তারপর এটা সেটা করে হিসেব করে দেখা যায় মুষ্টিমাত্র কয়েকটি দিন অবশিষ্ট পড়ে থাকে, আর তার মধ্যেও কত কামনা, বাসনা জড়িয়ে আছে। সেইজন্য প্রহ্লাদ বলছেন, সব ছেড়ে একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করাই দুর্লভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

যারা নিজেদের ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সংযত করতে পারে না তাদের কি কি ধরণের সমস্যা হতে পারে? যেমন যে নিজের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, সে স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে থাকার সুখ ভোগের সুযোগ খুঁজতে ব্যস্ত, স্ত্রীর মিষ্টি মিষ্টি কথায় আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যে নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের স্নেহ ভালোবাসার বন্ধনে পড়ে আছে, সে তাদের দৈনন্দিন সমস্ত কর্মের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। নিজের এবং অপরের ছোট ছোট শিশুর তোতলা তোতলা, আধো আধো বুলিতে মুগ্ধ হয়ে থাকে। মাছ নদীর স্রোতে ভেসে যেতে যেতে যখন বিশালাক্ষীর 'দ' এর মধ্যে পড়ে যায়, তখন ওখানকার জলের মিষ্টি আওয়াজটা মাছেদের খুব আনন্দ দেয়। মাছেরা আর ঐ জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না, জেলেরাও জানে কোথায় মাছেরা থাকতে ভালোবাসে। তারাও ঠিক সেখানে পৌঁছে গিয়ে মাছগুলো জালে বদ্ধ করে নেয়। সংসারে নিজের শিশু সন্তান, নাতি-নাতনীর আধো আধো বুলি শুনে মা-বাবা ও বাড়ির সবার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সবাই সন্তানের মায়া জালে বদ্ধ হয়ে সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন – গঙ্গায় স্নান করতে এসে গল্প করছে, কিছুক্ষণ পরে বলছে 'যাই নাতির চাঁদ মুখটা একবার দেখে আসিগে'।

প্রহ্লাদ তার সহপাঠীদের বলছেন *ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ কর্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ। ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যং বহু মন্যমানঃ কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ।।৭/৬/১৩।* ইন্দ্রিয় সুখভোগকে সর্বস্ব মনে করে যারা মন, বুদ্ধি, প্রাণকে ভোগ-বাসনার তৃপ্তির জন্য লুটিয়ে দিয়েছে, তাদের ভোগের তৃপ্তি হওয়া তো দূরে থাক উপরন্তু উত্তরোত্তর ভোগ-বাসনা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। যার ফলে তাকে কর্মের পর কর্ম করেই যেতে হচ্ছে, রেশমের গুটি পোকার মত নিজের লালায় নিজেই জড়িয়ে একেবারে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এদের পক্ষে এই জাল ছিঁড়ে গুটি থেকে বেরিয়ে ঈশ্বরের দিকে মন দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই শ্লোকের মূল বক্তব্য হল নিজের ইন্দ্রিয় সুখ, অর্থাৎ ভালো খাওয়া-দাওয়া, ভালো সাজ-পোশাকের বাহার করা, খোশ গল্পগুজব করা, টিভি দেখা এগুলোই যাদের কাছে সর্বস্ব, তাদের এই সব বাসনার পুর্তির জন্য কর্মের পর কর্ম করেই যেতে হয়। রেশমের গুটি পোকা যেমন নিজের লালা দিয়ে সুতো বানিয়েই চলে আর শেষে ঐ গুটিতে বদ্ধ হয়ে আর বেরোতে পারেনা, ঠিক সেই রকম এরাও এদের কর্মের মধ্যে ফাঁসতেই থাকে। শেষে বাঁচার আর কোন পথ পায়না। ভাগবতে আমরা এই ধরণের অনেক উপমা পাই, যে উপমাগুলো পরে ঠাকুরও অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছেন।

তারপর বলছেন – *বিদ্বানপীত্থং দনুজা কুটুম্বং পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ। যঃ স্বীয়পারক্যবিভিন্নভাবস্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ।।৭/৬/১৬।* হে আমার প্রিয় বন্ধুরা! যারা পণ্ডিত অথচ আত্মীয়, পরিবার, পরিজনের ভরণ-পোষণেই যারা সর্বদা ব্যস্ত, যার ফলে তারা ভগবানের ভজনার কোন সুযোগ বা সময়ই পায় না, তাই এরা পণ্ডিত হলেও এদের অন্তরটা ভগবদ্‌ভাবহীন, এরা হচ্ছে নিস্ফলা। অজ্ঞানীরা

পরিণামে যে তমঃ প্রধান নরকে যায় এদের গতিও সেইখানেই। মোদ্দা কথা তুমি যেই হও ঈশ্বরের ভজনা যদি না কর তোমার এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন বৃথাই হবে। *যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিদ্ বা দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ। বিমোচিতুং কামদৃশ্যং বিহারক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ।।৭/৬/১৭।* সুন্দরী নারীরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হোক এই আশা করে পুরুষরা নিজেদের ক্রীড়ামৃগের মত ব্যবহার্য বস্তু করে তোলে। পুরুষগুলো একদিকে নিজের স্ত্রীর খেলনার সামগ্রী আর এদিকে নিজের সন্তানাদের স্নেহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে আষ্টেপৃষ্টে শৃঙ্খলিত করে ফেলে। এই ধরণের যারা, সে ধনী হোক, কিংবা গরীব হোক অথবা পণ্ডিত হোক, এদের মুক্তির কোন পথ নেই। এইসব বলে বলে শেষে প্রহ্লাদ তার বন্ধুদের বলছেন – সেই ঈশ্বর হচ্ছেন অন্তর্যামী, আর তাঁকে যদি একবার লাভ করতে পার তাহলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এগুলো কোন কিছুই আর চাইতে হবে না, তখন আপনা আপনি অনায়াসেই সব কিছু এসে যাবে। এই যে তোমাদের আমি আমার পবিত্র অনুভূতির কথা শুনিয়ে তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞান সঞ্চারিত করলাম, এই প্রজ্ঞাযুক্ত জ্ঞানই হল ভাগবত ধর্ম। ভগবানের একান্ত অনুগত সেবক দেবর্ষি নারদের শ্রীমুখ থেকে আমি সর্বপ্রথম এই অমূল্য পরম পবিত্র জ্ঞানের কথা শ্রবণ করেছিলাম। তোমরা সবাই এস, এসে এই ভাগবত ধর্মে অবগাহন করে সবাই চিরদিনের মত শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাও।

এখানে ভাগবতে যে 'ভাগবত ধর্ম' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, পরে পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন যে 'ভাগবত ধর্ম' হিন্দু ধর্মে একটা বিশেষ ধর্ম রূপে স্থান করে নিয়েছে, যেখানে বলা হয় সংসারের সব কিছু ছেড়ে একমাত্র ঈশ্বরে ভক্তি কর। ভাগবত ধর্মে একমাত্র ভক্তির উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। এই ভক্তিতে আবার বলা হয় শুধু ভগবান বিষ্ণুকে ভক্তি কর আর বাকী সব কিছু ছেড়ে দাও। প্রহ্লাদও বলছেন – হে বন্ধুগণ! তাই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এই ভাগবত ধর্মকে গ্রহণ কর, এই ভাগবত ধর্মের কথা আমি প্রথম দেবর্ষি নারদের কাছে শুনেছিলাম, সেইজন্য তোমরা মনে করো না যে আমি নিজে থেকে তোমাদের কোন মনগড়া কথা বলছি, এটা ঋষিবাক্য।

প্রহ্লাদের কথা শোনার পর তাঁর সহপাঠীরা বলছে 'হে প্রহ্লাদ! তোমার কথায় আমাদের কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কারণ আমরা ছোটবেলা থেকেই ষণ্ড আর অমর্ককেই আমাদের শিক্ষক বলে জানি, এই দুজন আচার্য ছাড়া তো আর কেউ আমাদের এসে শিক্ষা দিয়েছেন বলে তো মনে পড়ছে না। কিন্তু তুমি হঠাৎ যে বলছ দেবর্ষি নারদের কাছে শিখেছ! তুমি এখনও বালক এবং জন্ম থেকেই রাজপ্রাসাদে নিজের মায়ের কাছেই আছ। আর এযাবৎ যা শিক্ষা পেয়েছি তাতো আমরা একসাথেই পেয়ে এসেছি। তাই নারদের সাথে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়াটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে'। তখন প্রহ্লাদ বলছেন 'আমার বাবা যখন তপস্যা করতে গিয়েছিলেন সেই সময় দেবতারা আমাদের দৈত্যকুলকে আক্রমণ করেছিল, তখন আমি আমার মা কয়াধুর গর্ভে ছিলাম। আর দেবতারা বলল 'দৈত্যের স্ত্রীর গর্ভে যে আছে সে সাপের বাচ্চা, একেও মেরে ফেলতে হবে'। তখন দেবর্ষি নারদ দেবতাদের বাধা দিয়ে বললেন – না! একে আপনার মারতে পারেন না, কয়াধুর গর্ভে যে হিরণ্যকশিপুর সন্তান আছে সে ঈশ্বরের পরম ভক্ত, ঈশ্বরের পরমপ্রেমী সেবক, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিষ্পাপ মহাপুরুষ বর্তমান, তাঁকে মেরে ফেলার ক্ষমতা আপনাদের নেই'।

তারপর দেবর্ষি নারদ আমার মাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গিয়ে খুব যত্ন করে রাখলেন। আর তখন থেকে আমি মায়ের গর্ভ থেকে নারদের মুখে ভগবান বিষ্ণুর বিভিন্ন নামগুণগান শুনে যাচ্ছিলাম। আমার মাও শুনেছেন আর আমিও শুনেছি। কিন্তু আমার যখন জন্ম হয়ে গেলে, ধীরে ধীরে আমার মা দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত সব ঈশ্বরীয় বাণী ও উপদেশের কথা ভুলে গেলেন, আমার স্মৃতি যেমন ছিল তেমনই থেকে গেছে। প্রহ্লাদ যে কথা বলছেন, বাস্তবে তাই হয়। শাস্ত্রের কথা অনেকেই শোনে কিন্তু সবাই মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না, যারা মনে রাখে তাদের অনেকেই আবার ধারণাও করতে পারে না। প্রহ্লাদের মা যতদিন আশ্রমে ছিল ততদিন শুনে গেছে কিন্তু তারপর রাজপ্রাসাদে এসে মন থেকে সব হারিয়ে গেছে। প্রহ্লাদও মায়ের ব্যাপারে বলছেন –

স্ত্রীলোক হওয়ার জন্য আমার মায়ের দেবর্ষি নারদের উপদেশগুলো মনে নেই, কিন্তু দেবর্ষি নারদের কৃপায় আমি তা বিস্মৃত হইনি।

বন্ধুদের সংশয় দূর করে প্রহ্লাদ আবার ভাগবত ধর্মের কথা বলে যাচ্ছেন। *জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ। ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্তিনা।।৭/৭/১৮।* প্রহ্লাদ এখানে বস্তুর ষড়বিকারের কথা বলছেন। এই জগতে যা কিছু আছে সবারই ছয় রকমের বিকার হয়। যেমন বৃক্ষে ফল ধরে, ধরার পর কিছু দিন বৃক্ষেই থাকে, ফলটা বাড়তে থাকে, এক সময় পরিপক্ক হয়, তারপর ক্ষয় হতে থাকে আর শেষ গাছ থেকে পতিত হয়ে বিনষ্ট হয়। ঠিক তেমনি যে জন্ম নেবে তার অস্তিত্বের অনুভব হবে, বাড়তে থাকবে, একটা পরিণাম হবে, তারপর আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকবে এবং শেষে একদিন মৃত্যু এসে সব কিছুকে নাশ করে দেবে। এই সংসারে যারই জন্ম হবে তারই এই ছটি বিকার হবে। কিন্তু আত্মার সাথে এর কোন সংযোগ বা সম্বন্ধ নেই। এরপর ভাগবতে প্রহ্লাদের মুখ দিয়ে আত্মার দ্বাদশটি লক্ষণের কথা বলছেন – *আত্মা নিত্যোহব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোহসঙ্গ্যনাবৃতঃ।।৭/৭/১৯।* আত্মা যিনি তিনি এই সব কিছুর বাইরে, তিনি অবিনাশী, তিনি নিত্য, শুদ্ধ, তিনিই শুধু আছেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, নির্বিকার, স্বয়ং প্রকাশ, সব কিছুর হেতু, ব্যাপক, নির্লিপ্ত ও আবরণরহিত। সেইজন্য সবারই একমাত্র তাঁরই ভজনা করা উচিৎ।

মানুষ একটার পর একটা কর্ম করেই চলেছে, এই কর্মের কারণেই সে কর্ম বন্ধনে পড়ে যায়। কিন্তু সমস্ত কর্মের পশ্চাতে রয়েছে বুদ্ধি, এই বুদ্ধি তাকে চালিত করছে বলে সে কর্ম করছে। সেইজন্য প্রথমে কর্মের যে বীজ, বীজ মানে চিন্তা ভাবনা, এই চিন্তা ভাবনাকে কাটতে হবে, চিন্তা ভাবনাকে যতক্ষণ না কাটা হয় ততক্ষণ কর্মের বীজ থেকে যাবে, কর্মের বীজ থাকলেই একটার পর একটা কর্মও হতে থাকবে। এই বুদ্ধিবৃত্তিকে আটকাবার হাজার রকমের উপায় আছে, মানে জ্ঞান, ভক্তি, যোগের যে কথা বলা হয়, বলছেন এই রকম হাজার রকমের পথ আছে। কিন্তু সব থেকে উৎকৃষ্ট পথের কথা ভগবান গীতায় নিজেই বলে দিয়েছেন – সব কিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে দেওয়া, গুরুকে শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করা, মহাত্মাদের অর্থাৎ সাধুসঙ্গ করা, ভগবানের আরাধনা করা, তাঁর কথাবার্তা শোনা, তাঁর গুণ ও লীলার কীর্তন করা, তাঁর চরণের ধ্যান করা, মন্দিরে তাঁর মূর্তির দর্শন পূজন করা ইত্যাদি। এই সব উপায়ে সাধনা করলে ভগবানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভগবানে প্রতি এই প্রেমাভক্তি যখন জাগ্রত হবে তখন, যে বুদ্ধিবৃত্তির কথা বলা হল, এই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবাহ থেমে গিয়ে মন শান্ত আকার ধারণ করবে। বুদ্ধিবৃত্তির প্রবাহ যখন থেমে যায় তখন কর্মবীজেরও নাশ হতে শুরু হয়। কর্মবীজ যখন নাশ হয়ে দগ্ধবীজ হয় তখন কর্মেরও নাশ হয়ে যায়। কর্ম নাশ হলেই পরম শান্তি।

এখানে আমাদের একটা জিনিষ ভালো করে বুঝতে হবে। ভক্তির দুটো দিক। ভক্তি-সাধনা ভক্তির একটা দিক, আরেকটি দিক হল ভক্তি-সাধনার লক্ষ্যও ভক্তি লাভ করা। সাধনা আর সিদ্ধি দুটোই ভক্তি। ভক্তি একটা পথ আবার এই পথের লক্ষ্য হল ভক্তি। কর্মযোগে বলছে অনাসক্ত ভাবে নিষ্কাম কর্ম করলে কর্ম আমাকে আত্মজ্ঞানে নিয়ে যাবে। যখন বিবেক বিচার, নিত্য-অনিত্যের বিচার করা হয় তখন তা সাধককে আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। যখন আমি যোগ সাধনা করছি তখন তার লক্ষ্য কৈবল্য লাভ বা নির্বিকল্প সমাধি। এর মানে সাধনা একটা সিদ্ধি আরেকটা। যখন ভক্তির কথা হয় তখন ভক্তির শেষ কথা ঈশ্বরে পাকা ভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, ভক্তি দিয়ে শুরু আর ভক্তিতেই শেষ। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ তিনটে যোগের লক্ষ্য ও সাধনা আলাদা। কিন্তু ভক্তিযোগে যেটাই পথ সেটাই লক্ষ্য, এটাই ভক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রহ্লাদ বলছেন তোমরা মনে রেখো ভগবানকে প্রসন্ন করার অনেক পথ আছে, ব্রাহ্মণদের দান করা, দেবতা বা ঋষি হয়ে যাওয়া, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, তপস্যা করা, যজ্ঞ করা, শারীরিক বা মানসিক শুচিতা রক্ষা করা অথবা বড় বড় ব্রত-অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়। ভগবান ঠিক ঠিক প্রসন্ন হন নিষ্কাম প্রেম এবং নিষ্কাম ভক্তিতে। *ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং করুত দানবাঃ। আত্মৌপম্যেন সর্বত্র*

সর্বভূতাত্মনীশ্বরে।।৭/৭/৫৩। সেইজন্য হে বন্ধুরা! সমস্ত প্রাণীদের আপন জ্ঞান করে সর্বত্র বিরাজমান, সর্বাত্মা, সর্বশক্তিমান ভগবানকে ভক্তি কর। ভগবানকে ভক্তি করে দৈত্য, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, রাখাল বালক, গোয়ালা, পশু, পাখি এবং অনেক পাপীতাপীও ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়েছে। সেইজন্য ভগবানে কি করে ভক্তি হয় সেইদিকে মন দাও। শেষে প্রহ্লাদ বলছেন *এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থ পরঃ স্মৃতঃ। একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্।।৭/৭/৫৫।* এই জগতে মানুষের সব থেকে বড় স্বার্থ হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি অর্জন করা। এই ভক্তি এসেছে কিনা তার লক্ষণ হল সর্বদা, সর্বত্র, সকল বস্তুতে ঈশ্বর দর্শন।

সহপাঠীরা প্রহ্লাদের কাছে সুন্দর সুন্দর কথা শোনার পর তাদের আর আচার্যদের দেওয়া শিক্ষায় মন বসছে না। প্রহ্লাদের আচার্যরা দেখছেন প্রহ্লাদকে পথে আনা তো দূরের কথা উল্টে বাকী যত দৈত্যবালক আছে সবাকার মাথাটাই সে ঘুরিয়ে দিয়েছ, সব পড়ুয়াদের মন ও বুদ্ধি একমাত্র ভগবানে স্থির হয়ে গেছে। শেষে তড়িঘড়ি করে তারা প্রহ্লাদকে ধরে হিরণ্যকশিপুর কাছে হাজির করিয়ে সব ঘটনা নিবেদন করে বলছে 'আমরা আর পারছি না, আপনি নিজে এবার একে সামলান'।

সব শোনার পর ক্রোধে হিরণ্যকশিপুর শরীর থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। ঠিক করে নিয়েছে, এবার আমি নিজের হাতেই আমার পুত্রকে হত্যা করব। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে প্রহ্লাদকে বলছে 'তুমি যে এত বিষ্ণু বিষ্ণু করছ, তোমার বিষ্ণুর যদি এতটুকু সাহস থাকে তাহলে সে আমার সামনে আসছে না কেন, কোথায় তোমার বিষ্ণু'। প্রহ্লাদ বলছে 'ভগবান বিষ্ণুতো সর্বত্র'। হিরণ্যকশিপু একটা থাম দেখিয়ে বলছে 'তোমার বিষ্ণু কি এই থামের মধ্যেও আছে'? প্রহ্লাদ বলছে 'হ্যাঁ বাবা! এই থামের মধ্যেও তিনি আছেন'। প্রহ্লাদের কথা শুনে তিনি রেগে গিয়ে থামের উপর তরোয়াল চালিয়ে দিলেন। থামের গায়ে তরোয়ালের আঘাত পড়তেই থামের ভিতর থেকে সমস্ত জগৎ বিদীর্ণকারী এক ভয়ঙ্কর শব্দ হতে শুরু করল। ঐ বিকট ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনেই হিরণ্যকশিপু প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। বলছেন কোন ধাতু দ্রব্য দিয়ে পাথরের উপর যদি আঘাত করা হয় তখন তার একটা বিশেষ ধরণের আওয়াজ হয় কিন্তু এই আওয়াজ তো সেই রকম নয়। যত সভাসদ ও সেনাপতিরা সেখানে উপস্থিত ছিল তারাও ঐ ধরণের কোন আওয়াজ করেনি, তাহলে এই আওয়াজটা কে করল বা কোথা থেকেই বা এই শব্দের উৎপত্তি?

তারপর সবাই দেখছে ঐ স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে আসছে এক অদ্ভুত প্রাণী – *স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্* - বলছেন ঐ সভার মধ্যে স্তম্ভ থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি না মানুষ না মৃগ। এখানে মৃগ বলতে বোঝাচ্ছে সিংহ। সংস্কৃতে এই এক সমস্যা মৃগ বলতে হরিণকেও বোঝায় আবার মৃগকে শিকার করে যে তার মাংস ভক্ষণ করে তাকেও বোঝায়। সিংহ আর মানুষের সংমিশ্রণে এই অদ্ভুত প্রাণীর যে বিকট রূপ হয়েছে, ভাগবতে তার বিরাট বর্ণনা করা হয়েছে। ওপরের দিকটা সিংহের মত আর নীচের দিকটা মানুষের মত। ইনিই সেই নৃসিংহ অবতার।

নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপুকে তুলে নিয়ে তাঁর কোলে দুই উরুর উপর শুইয়ে দিলেন আর সিংহের সামনের পায়ের নখ দিয়ে হিরণ্যকশিপুর বুকের পাঁজরকে বিদির্ণ করে দিলেন। হিরণ্যকশিপু কিছুই করতে পারল না, কোন প্রতিরোধ করার ক্ষমতাই পেলো না। সভায় তখন এত দৈত্যবীরেরা ছিল কিন্তু কারুর ক্ষমতা বা সাহসে কুলাল না যে নৃসিংহ অবতারের সামনে দাঁড়াবে, সবাই নির্বাক দর্শক হয়ে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে হতবম্ব। মুহূর্তের মধ্যে সব দৈত্যরা ওখান থেকে পালিয়ে গেল।

স্বয়ং ভগবান এখন তাঁর নিজের ক্রোধ বৃত্তিকে অবলম্বন করেছেন, এই সময় তাঁকে কে শান্ত করবে? কার এমন বুকের পাটা যে ভগবানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। ভগবান এখন নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছেন, সমস্ত প্রাণী সেখানে সমবেত হয়ে করজোড়ে ভগবানের ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য নানা রকমের স্তুতি করে চলেছেন। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, যত রকমের প্রাণী আছে সবাই মিলে ভগবানের স্তুতি করেই চলেছেন, কিন্তু ভগবান কিছুতেই নিজের এই ক্রোধ বৃত্তিকে প্রশমিত করে শান্ত মুর্তি ধারণ করছেন না। তখন

লক্ষ্মীদেবীকে অনুরোধ করে সেখানে নিয়ে আসা হল। লক্ষ্মীদেবী এসে নৃসিংহের ঐ ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভগবানের ধারে কাছেই গেলেন না, তিনিও পালিয়ে গেলেন।

সবাই তখন নিরুপায় হয়ে প্রহ্লাদের শরণাপন্ন হয়েছে। তুমিই পারো ভগবানকে শান্ত করতে, কেননা তোমার জন্যই ভগবান এই রূপ ধারণ করেছেন। প্রহ্লাদ তখন হাত জোড় করে স্তুতি করতে শুরু করলেন। সে বিরাট লম্বা স্তুতি। বলছেন 'হে প্রভু আপনিই একমাত্র সাধুদের আশ্রয়। যা কিছু জগতে আছে তা আপনিই হয়েছেন। জগতে যা কিছু আছে তাকে সৃষ্টি করার যে প্রেরণা সেটাও আপনিই হয়েছেন। মানে জগতে যা কিছু – ক্রিয়া শক্তি, কারণ শক্তি, ইচ্ছা শক্তি, যা কিছু হতে পারে সবটাই আপনি। প্রহ্লাদ বিরাট লম্বা স্তুতি করে ভগবানকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছেন, আর খুবই সুন্দর স্তুতি। সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন – যত মানুষ এখানে আমার আশেপাশে আছে এরা সব অসহায়, এরা সবাই নিজেদের স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মোহে আবদ্ধ হয়ে আছে, এদের এই মোহান্ধকারে ফেলে রেখে আমি নিজের মুক্তি চাইনা। সেইজন্য আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে সবাইকে আমি সাহায্য করতে পারি। সংসারে থেকে মানুষ নানা রকমের সুখ পাওয়ার চেষ্টা করে, সে যে ধরণেরই সুখ হোক না কেন, কিন্তু যখন তার শরীরে চুলকানি হয় তখন একটু চুলকে নেয়। যখন চুলকায় তখন খুব আরামদায়ক মনে হয়, কিন্তু পরে যে কি অসহ্য জ্বলন শুরু হবে সেটা আগে তারা টের পায়না, চুলকোবার পর টের পায়। কিন্তু যাঁরা সৎ পুরুষ তাঁদের যখন চুলকানি হয় তখন তাঁরা সেটা সহ্য করে নেন তাই তাঁকে আর জ্বলনের কষ্টটা পেতে হয়না। জগতের সাধারণ মানুষের সারা গায়ে চুলকানি ছেয়ে আছে, অনবরত চুলকেই যাচ্ছে। সেইজন্য সংযমের সাধন না করা পর্যন্ত এই জ্বালা থেকে তাদের নিস্তার নেই।

তারপর মোক্ষ সাধন কি ভাবে হবে তার সম্বন্ধে বলছেন *মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্মব্যাখ্যারহো– জপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ। প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্।। ৭/৯/৪৬।* মৌন, ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্রশ্রবণ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, স্বধর্ম পালন, যুক্তি দ্বারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা, নির্জনে একান্ত বাস, জপ ও সমাধি – হে পুরুষোত্তম! মোক্ষের এই দশ প্রকার সাধন জগতে প্রসিদ্ধ, এই সব কিছু দিয়ে মানুষ মোক্ষ সাধন করতে পারে। কিন্তু অসংযমীদের কাছে এগুলো জীবিকা নির্বাহের অনুষ্ঠানমাত্র। বকধার্মিকদের স্বরূপ মানুষ যতদিন না বুঝতে পারে ততদিন তারা জীবিকাসাধন করে থাকে আর তা জানাজানি হওয়া মাত্রই তাদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। *তৎ তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্। সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত।।৭/৯/৫০।* হে প্রভু আপনাকে ছয় রকম পদ্ধতির দ্বারা সেবা করা যায় – (১) আপনাকে নমস্কার বা প্রণাম করা, (২) আপনার স্তুতি করা, (৩) কর্ম পূজা – আপনার জন্য কাজ করা, সেবা কর্ম বা এর অর্থ সমস্ত কর্মের সমর্পণ, (৪) আপনার সেবাপূজা করা, (৫) চরণস্তুতি – মানে ভগবানের ধ্যান করা এবং (৬) শ্রবণম্, অর্থাৎ আপনার দিব্যলীলা শ্রবণ করা। ভাগবতে এই ছয়টিকে বলা হচ্ছে 'ষড়ঙ্গ সেবা', ভগবানকে সেবার করার ছয় প্রকার পদ্ধতি। এই বিষয় গুলোকে আধার করেই পরবর্তি কালে ভক্তি মার্গ বিস্তার লাভ করেছে।

সপ্তম স্কন্ধের মূল কাহিনী প্রহ্লাদ-চরিত্র। প্রহ্লাদের কাহিনী ছাড়াও এই স্কন্ধেই আসবে কিছু ধর্মের কথা – যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম, স্ত্রীধর্ম ইত্যাদি। মহাভারত, বিশেষ করে মনুস্মৃতির অনেকটা জুড়ে বিভিন্ন বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রসঙ্গ করা হয়েছে। ভাগবতেও আমরা অনেক বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা পাই। আসলে এর উদ্দেশ্য হল, ধর্মের একই বিষয়কে বারবার শুনিয়ে শুনিয়ে আমাদের মনের মধ্যে একটা দৃঢ় সংস্কার তৈরী করা। ভারতীয় শাস্ত্র গুলিতে কি আছে, শাস্ত্র কি বলতে চাইছে এগুলো আমাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন এটাই আজকের দিনে ভালো করে বোঝা দরকার। আমরা যতই বলি জাতফাত মানিনা, কিন্তু যাদের পূর্বপুরুষ কেউ রাজা বা জমিদার ছিল তারা খুব গর্ব করেই বলে আমরা জমিদার বংশের লোক। যারা ব্রাহ্মণ তারাও বলে আমরা অমুক ব্রাহ্মণ কুলের। গর্ব একটা থাকে। ঠিক তেমনি আমরা যখন আমাদের ঐতিহ্যকে ঠিক ঠিক জানব, আমাদের পূর্ব পুরুষরা বেদ, রামায়ণ, মহাভারত রচনা করেছিলেন, তখন আমাদের ব্যাক্তিত্বে স্বাভাবিক ভাবেই একটা

শক্তির জাগরণ হবে। আগেকার দিনে রাজার কোন বাচ্চা ছেলেকে যদি মিলিটারির কমাণ্ডর করে পাঠিয়ে দেওয়া হত তখন তাকে সবাই মানতো। বড় বড় যোদ্ধারাও ওর কাছে মাথা নত করে থাকবে। সেও সব সময় সজাগ যে আমি রাজবংশের। ঠিক তেমনি আমরা যখন জেনে যাব যে আমি রাজবংশের লোক, কিসের রাজবংশ? এই শাস্ত্র যারা রচনা করেছিলেন তাঁদের বংশধর, তখন আমাদের ব্যাক্তিত্ব সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। আমাদের চিন্তা ভাবনা পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্র, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে জানার জন্য এত গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভারতের জাতীয় আদর্শ

আমরা এখন ভাগবতের কথা থেকে সরে গিয়ে একেবারে অন্য একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি। হিন্দু ধর্মের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল একমাত্র হিন্দু ধর্মেই জীবনমুক্তির কথা বলা হয়। আমি পরমাত্মা কিংবা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন এই জ্ঞান যখন কারুর হয়ে যায় তখনই তাঁর মুক্তি হয়ে গেল, এরপর তাঁকে আর কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, এটাই হল জীবনমুক্তি, জীবন থাকতে থাকতেই মুক্তি পাওয়া। এই জ্ঞান লাভের পর পৃথিবীতে তিনি যত দিন বেঁচে থাকবেন তত দিন তাঁকে কোন কিছুই আর বন্ধনে ফেলতে পারবে না। জীবনমুক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের বেঁচে থাকার একটাই উদ্দেশ্য থেকে যায় – মানুষের মঙ্গল বা কল্যাণ করা। জীবনমুক্তিই হিন্দু ধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা করে দেয়। একমাত্র হিন্দু ধর্মেই জীবনমুক্তি আছে, অন্য কোন ধর্মে নেই। স্বামীজী সেইজন্য বারবার বলতেন হিন্দু ধর্মকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করতে হবে, তা নাহলে জীবনমুক্তির এই ভাব পৃথিবী থেকে মুছে যাবে।

বিশ্বে একমাত্র সেই জাতি বা সেই দেশই ঠিক ঠিক বড় হয়েছে যারা মনে করে আমরা সমগ্র বিশ্বের সমগ্র জাতির মধ্যে একটা বিশেষ জাতি। এই বিশ্বাস ছাড়া কোন জাতি কখনই দাঁড়াতে পারবে না। শুধু দেশ বা জাতিই নয়, যতক্ষণ না আমি ব্যক্তিগত ভাবে নিজেকে না ভাবতে পারছি আমি সেই বিশেষ লোক, ততক্ষণ আমার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে না। ইজ্রায়ালীরা মনে করে আমরা হলাম chosen people of God। ইজ্রায়াল একটা ছোট্ট দেশ, কলকাতা শহরের মত একটা ছোট্ট দেশ। এই ছোট্ট দেশটিকে নয়টি মুসলিম দেশ ঘিরে রেখেছে যারা সব সময় এই দেশটিকে পিষে দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। ইজ্রায়ালীদের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস – আমরা হলাম ঈশ্বরের বিশেষ লোক। অন্য দিকে মুসলমানরাও মনে করে আমরা আল্লার বিশেষ লোক। সেইজন্য তারা নিজেদের আল্লার এত আপনলোক মনে করে যে আমি আমার এই প্রিয় শরীরকেই আল্লার নামে দিয়ে দেব। তাই আল্লার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, যারা আল্লাকে মানে না, মানববোমা হয়ে তাদের শেষ করে দিতে পারলে তারা নিজেদের গর্বিত মনে করে। মৃত্যু-ভয়কেও তারা পার করে গেছে। যে কোন মানুষের পক্ষে মৃত্যু-ভয়কে পার করা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। সে নিজের স্ত্রীকে, সন্তানকেও বধ করতে কুণ্ঠিত হবে না, যদি সে দেখে তারা কোরানের ডান দিক বাম দিক কিছু করেছে। আমেরিকানরা মনে করে তারা হল বিশ্বের সব থেকে সভ্য দেশ। সারা বিশ্বে গণতন্ত্র, বাক্ স্বাধীনতা, মানবিক অধিকার ইত্যাদি আমরাই এনেছি। তারা মনে করে পুরো বিশ্বের তারাই আলোর দিশারি। ঠিক তেমনি বৃটিশরা মনে করে আমরা হলাম বিশ্বের সব থেকে সংস্কৃতমনস্ক জাতি। এখন ইজ্রায়ালীরা, মুসলমানরা বা আমেরিকনরা ঠিক বলছে কিনা সেই বিচারে আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু ওদের নিজেদের ব্যাপারে এগুলোই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এরপর এক অপরের বিরুদ্ধে যখন কোন লড়াই করে তখন তারা মরে যাবে কিন্তু নিজেদের বিশ্বাস থেকে সরবে না। আমি মরে যেতে পারি, তার জন্য আমার কোন চিন্তা নেই – এই ভাবটা তখনই কোন জাতির মধ্যে আসবে যখন তারা মনে করবে আমরা হলা বিশ্বের এক বিশেষ জাতি, তখনই তার মধ্যে স্বজাতির প্রতি প্রীতি ভালোবাসার জন্ম দেয়, এই প্রীতি ও ভালোবাসাই তার জাতিকে যে কোন ভাবে রক্ষা করার প্রেরণা জোগাবে।

অন্য দিকে জার্মানরা যদিও বলতে শুরু করল আমরা হলাম আর্য, কিন্তু ঠিক মত নিজেদের জাতীয় ভাবটাকে ধরতে পারেনি বলে জার্মান বিশ্বযুদ্ধে মার খেয়ে গেল। রাশিয়া এত শক্তিশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব কোন জাতীয় আদর্শ সামনে না থাকায় আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে যখন ঝামেলা সৃষ্টি হল,

তখন রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কিন্তু আমেরিকা যা ছিল তাই রয়ে গেল, একটা আঁচড়ও দিতে পারলো না। যতক্ষণ কোন জাতি বা দেশ বা কোন মানুষের মধ্যে এই বোধ না আসে যে, আমি হলাম ঈশ্বরের বিশেষ লোক, ঈশ্বর আমাকে বেছে নিয়েছেন এই বিশেষ কাজের জন্য, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি বা দেশ বা মানুষের মধ্যে আত্মবল আসবে না। আমেরিকানরা অবশ্য ঈশ্বরের কথা মুখে আনে না, কিন্তু অন্য দিকে মনে করে আমরা হলাম বিশ্বের সব থেকে সভ্য জাতি। আমেরিকানরা যে বিশ্বের বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার কারণ হল তারা মনে করে আমি আমরা হলাম বিশিষ্ট লোক, আমরা হলাম বিশিষ্ট জাতি আর ঈশ্বর আমাকে এই কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন।

এবার যদি কোন ভারতবাসীকে জিজ্ঞেস করা হয় ভাই ভারতবাসী হিসাবে তোমার কি কোন অহঙ্কার আছে? ভারতীয় হিসাবে তোমার জাতীয় আদর্শ কি? কোন ভারতবাসীর কাছে এর কোন সদুত্তর নেই। কারণ সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে কোন কালেই এই ধরণের কোন অহঙ্কার ছিল না, আর ভারতের দুরবস্থার একমাত্র কারণও এটাই। কিন্তু ভারতে একমাত্র অহঙ্কার ছিল ব্রাহ্মণদের। যেমন তেমন অহঙ্কার নয়, প্রচণ্ড অহঙ্কার – আমরা হলাম ব্রহ্মজ্ঞানী। আচার্য শঙ্করও বলছেন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করলে বর্ণপ্রথা রক্ষা পায়, বর্ণপ্রথা ঠিক থাকলেই ধর্ম রক্ষা হয়। ধর্ম থাকলে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সও স্বাভাবিক ভাবেই হবে। তাই পুরো বিশ্বের মঙ্গল হবে যদি ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা হয়। কারণ ব্রাহ্মণদের হাতে রয়েছে বর্ণাশ্রম ধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্মের হাতে রয়েছে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স। ব্রাহ্মণদের তাই এত অহঙ্কার ছিল যে, কোন রকমে তারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে সহ্য করে নেবে, খুব হলে একটু গঙ্গাস্নান করে নিত। কিন্তু এর বাইরে যারা আছে তাদের ম্লেচ্ছ মনে করে কাছেই আসতে দিত না। ম্লেচ্ছর সঙ্গে যদি কথাও বলে ফেলে তাও গঙ্গাস্নান করে নেবে, এতই তাদের ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার ছিল। দু হাজার বছর ধরে ভারতে একের পর এক বাইরে থেকে বিভিন্ন জাতিরা এসে আক্রমণ করেছে, মুসলমানরা এসে অত্যাচার করেছে, ইংরেজরা এসে অত্যাচার করেছে কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের এই অহঙ্কার ছিল বলে ভারতের সনাতন আদর্শ এতটুকু বেসামাল হয়ে যায়নি। এত হাজার বছর ধরে একমাত্র ব্রাহ্মণরা ভারতকে রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব চলে যাওয়ার পর ভারতের আজ এই দুরবস্থা, যে যেখান দিয়ে পারছে ভারতকে মেরে যাচ্ছে। ভারতকে আজ বলা হয় World capital of suicide, প্রত্যেক ছয় মিনিটে ভারতে একজন করে আত্মহত্যা করে। তার কারণ, ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার চলে গেছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম যেটা ভারতের প্রাণ ছিল সেটাও আজ মুছে গেছে।

ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে স্বামীজী যত কথা বলেছেন তার একমাত্র মূল সন্দেশ হল ভারতবাসী হিসাবে তুমি নিজেকে গর্বিত মনে কর যে তুমি ঈশ্বরের একজন বিশেষ ব্যক্তি। কলম্বো থেকে আলমোড়া স্বামীজী যত ভাষণ দিয়েছেন, যে ভাষণ গুলো ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থে সঙ্কলিত করা হয়েছে, তাঁর সমস্ত ভাষণের একটাই মূল বক্তব্য আমি হলাম ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি। যদিও ঠিক এই ভাবে স্বামীজী বলেননি, কিন্তু তিনি বলছেন – যে আত্মা মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে তাকে শেষে ভারতে এসে জন্ম নিতে হবে। তুমি যে ধর্মেরই হও না কেন, তুমি ৪,৩২,০০০x২x৩৬০x১০০ দিন পর্যন্ত স্বর্গে ঘুরঘুর করতে পার, কিন্তু যখন তোমার মুক্তির সময় হবে তখন তোমাকে ভারতে এসে জন্ম নিতে হবে। মুক্তি তোমার হবে একমাত্র ভারতেই। এটা স্বামীজীর কথা, আমার আপনার কথা নয়। ব্রাহ্মণরা এই কথাই চিরদিন বলে গেছে, অথচ স্বামীজী ব্রাহ্মণও ছিলেন না।

শুধু তাই না, ব্রাহ্মণরা বিদেশীদের বলতো তোমরা হলে ম্লেচ্ছ, আমাদের শাস্ত্রের কথা শোনার অধিকারই তোমাদের নেই। আমরা এর আগে মদন মোহন মালব্যের কথা বলেছিলাম। বৃটেনের হোম সেক্রেটারি একবার মদন মোহন মালব্যকে বললেন, আমি যদি ব্রাহ্মণ হতে চাই আমাকে ব্রাহ্মণ করবেন? তিনি শুনে বললেন 'ব্রাহ্মণ! না না কোন প্রশ্নই ওঠে না আপনাকে ব্রাহ্মণ করার। আপনার যদি খুবই ইচ্ছা থাকে ব্রাহ্মণ হওয়ার, তাহলে আগে মনে এই বাসনাটাকে খুব তীব্র করুন। তারপর আপনার এই শরীরের মৃত্যুর পর ভারতে এসে শূদ্র হয়ে জন্মাবেন। তারপর সেখানে কয়েক জন্ম ধরে খুব সেবা করুন, তারপর বৈশ্য হয়ে, ক্ষত্রিয় হয়ে, আর আপনার সংস্কার যদি খুব ভালো হয় তাহলে কয়েক জন্ম পরে আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাবার

সুযোগ পাবেন'। মদন মোহন মালব্য কোন ব্যঙ্গ বা হাসিঠাট্টার ছলে এই কথা বলছেন না। মদন মোহন মালব্য তিনি নিজে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন আর তিনি জানেন বৃটেনের এই হোম মিনিস্টার থেকে ভারতের জন্য অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে, মালব্যও তাঁকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন।

এই ছিল ব্রাহ্মণদের অহঙ্কার। স্বামীজী ভারতবাসীদের বারবার বলছেন তোমার মধ্যে এই অহঙ্কারকে জাগ্রত কর। স্বামীজী বলছেন তোমরা গর্বের সঙ্গে বল আমি ভারতবাসী। কিন্তু আমরা এখন নিজেদের ভারতবাসী বলে গর্বিত বোধ করার বদলে লজ্জিত বোধ করি। ইস্রায়েল, মুসলমান, আমেরিকা সবাই বলছে 'আমরা হলাম' অমুক। কিন্তু একজন ভারতীয় 'আমরা হলাম' বলতে পারছে না, বলছে 'আমরা ছিলাম'। এই জায়গায় এসে ভারতবাসীকে আত্মগ্লানি গ্রাস করে নিয়েছে। স্বামীজী কিন্তু তাঁর ভাষণে কোথাও 'আমরা ছিলাম' বলছেন না, সব জায়গাতে 'আমরা হলাম' বলে যাচ্ছেন – আমরা হলাম ভগবানের বিশেষ দূত। কিসের জন্য? ব্রহ্মবিদ্যার জন্য। ভারতের সবাই ব্রাহ্মণ, ভারতভূমি হল বিশেষ ভূমি, ভারতই হল প্রকৃত আর্যভূমি। কারণ এই ভূমিতেই বিরাজ করছে ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কারুর কাছে নেই। স্বামীজী সেইজন্য বারবার ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বলছেন – তুমি আধ্যাত্মিকার ক্ষেত্রে নিজেকে বিকাশ কর, আধ্যাত্মিকতাই তোমার জাতীয় আদর্শ আর আধ্যাত্মিকতাই তোমার সম্মান নিয়ে আসবে।

আজ থেকে হাজার বছর আগে এনাদের প্রথা ছিল, আমি যখন ব্রহ্মবিদ্যার দিকে যাবো তখন আমার একটা জিনিষই থাকবে, সেই জিনিষটা হল অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের জন্য আমি রাজাকে মানবো না, ধনীকে মানবো না, কাউকেই মানবো না। তুমি রাজা আমাকে খেতে দেবে না, আমি খাবো না। তুমি ধনী আমাকে পড়তে দেবে না, আমি পড়বো না। আমার বিয়ে হবে না, হবে না তো হবে না। কিন্তু থাকবো আমি এভাবেই, কারণ আমার কাছে আছে একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা। আর সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণরা এভাবেই জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। আচার্য শঙ্করও বলছে, ব্রহ্মবিদ্যাতে যিনি প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সেই ব্রাহ্মণ। বাকি সবাইকে বলে দিলেন, তোমরা এবার ব্রাহ্মণদের রক্ষা কর। তোমার হাতে ক্ষমতা আছে, তুমি ক্ষত্রিয় হয়ে তাদের রক্ষা কর। তোমার হাতে অর্থ আছে, তুমি বৈশ্য হয়ে তাদের রক্ষা কর, ওরা যেন না খেয়ে মারা যায়। শূদ্রদের বললেন তোমরা এই ব্রাহ্মণদের সেবা কর। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বলে আমিও ব্রহ্মবিদ্যার দিকে যাবো, তাহলে সেও ব্রাহ্মণ। পরের দিকে যদিও ওনারা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ঠিক করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা ছিল এটাই, তুমি আগে ঠিক করে নাও কি করতে চাও। তুমি যদি ব্রহ্মবিদ্যাতে থাকতে চাও তাহলে তুমি বিশেষ, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা মানেই বাকি সব কিছু ত্যাগ করার জন্য তোমাকে তৈরী থাকতে হবে – তোমার বিয়ে হবে না, তোমার অর্থ হবে না, তোমার ভালো খাওয়া-দাওয়া জুটবে না, ভালো জামা-কাপড় জুটবে না। ব্রাহ্মণরা চিরদিন এভাবেই থেকে এসেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা মানেই তাঁর প্রচণ্ড অহঙ্কার, আমি বিশেষ। স্বামীজী বলছেন, হিন্দু ধর্মকে যে করেই হোক রক্ষা করতে হবে, কারণ একমাত্র হিন্দু ধর্মের কাছেই জীবনমুক্তির দর্শনটা আছে। জীবনমুক্তি মানেই ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা কোন জাতির কাছে নেই, কোন ধর্মের কাছে নেই, কোন দেশে নেই, একমাত্র হিন্দুদের কাছেই আছে।

কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা কোন মুখের বিদ্যা নয়। যেমন যুদ্ধবিদ্যা কখন মুখে হয় না। মিসাইল নিয়ে আমি যতই ডিজাইন করি না কেন, যতক্ষণ না মিসাইলকে চালিয়ে সাফল্য পাওয়া হচ্ছে ততক্ষণ ওর কোন মূল্যই নেই। বৈশ্যদেরও ঠিক তাই, যতই তারা এই পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা করুক না কেন, টাকা যদি না থাকে এসব পরিকল্পনার কোন দামই নেই। শূদ্রদের ক্ষেত্রেও তাই, যত বড় বড় মেশিন থাকুক না কেন, যত ডিজানই থাকুক না কেন ওতে কোন কাজ হবে না, মেশিনকে কাজে লাগিয়ে জিনিষ তৈরী করে তাকে মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত করতে হবে। ব্রহ্মবিদ্যাও ঠিক তাই। আচার্য শঙ্কর বলছেন ব্রহ্মবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন তিনি চলাফেরা করবেন তখন স্বয়ং ব্রহ্ম সেই ব্রাহ্মণ রূপে হাঁটছেন, সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ সেই ব্রাহ্মণ রূপে কথা বলছেন। তাই আমার গর্ব হল আমি হলাম সেই বিশেষ জাতির বংশধর যে জাতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যার রহস্যটা আছে। ব্রহ্মবিদ্যার নামই রহস্য বিদ্যা। এই রহস্য বিদ্যাতে যাঁরা পুরোপুরি নামবেন তাঁরাই ব্রাহ্মণ,

আর যাঁরা নামতে পারবেন না তাঁদের কাজ হল এই ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা। মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় ওঠে মাত্র দুজন, কিন্তু তাদের মালপত্র বহন ও অন্যান্য জিনিষ যোগান দেওয়ার জন্য অনেকেই থাকে। এখানেও ঠিক তাই মুষ্টিমেয় কজন ব্রহ্মবিদ্যার জন্য নামবেন, আর সমাজের বাকি সবার কাজ হল তাঁদের সব কিছু যোগান দেওয়া। স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলীর বক্তব্য শুধু ব্রহ্মবিদ্যাকে কেন্দ্র করে আর ভারতের আদর্শ হল ব্রহ্মবিদ্যাকে সামনে নিয়ে আসা। ভারতবাসী হিসাবে আমাদের একটাই গর্ব, আমরা হলাম সেই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে কয়েকজন, যাঁদের ভগবান নিজে বেছে নিয়েছেন এই ব্রহ্মবিদ্যাকে ধারণা করার জন্য। বিশ্বে একমাত্র আমাদের কাছেই এই ব্রহ্মবিদ্যা আছে। আর ব্রাহ্মণদের অহঙ্কার অন্যান্য দেশের মত অহঙ্কার ছিল না। এনাদের অহঙ্কার একটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্রাহ্মণরা বলতেন – ভাই আমি জাতি হিসাবে বিশেষ, এই আমার পথ, এই আমার সীমানা, এর মধ্যে তুমি আমাকে জ্বালাতে এসো না, আমাকে আমার মত থাকতে দাও। যদি আস তাহলে আমাকে অনেক রকম প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তুমি তোমার মত থাকো, তুমি গরু খাও, মদ খাও, যত খুশী বিয়ে কর কিন্তু আমাকে বিরক্ত করতে এসো না। কিন্তু অন্যান্য দেশের অহঙ্কারে তারা বলছে, তুমি যদি আমার কথা না শোন তাহলে তোমার গলা কেটে দেব। কিন্তু ব্রাহ্মণরা কখনই এই ভাবে কথা বলবেন না, এসব ব্রাহ্মণদের আদর্শের বাইরে। তাঁরা বলবেন, তুমিও এই সৃষ্টির একজন সদস্য, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ যেমন সৃষ্টিতে আছে সেই রকম তুমিও এই সৃষ্টিতে আছ। তোমার কোন চিন্তা নেই, চেষ্টা করলে আস্ত আস্তে তুমিও উপরে উঠবে। কিন্তু যতক্ষণ উপরে না উঠে আসছ ততক্ষণ আমাকে বিরক্ত করতে এসো না। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় যে বলছেন not tolerance but acceptance এটাই একমাত্র ব্রাহ্মণদের ধর্মের মধ্যেই ছিল। আমি তোমাকে সহ্য করছি বলেই যে তোমাকে মেনে নিচ্ছি তা নয়, আমি তোমাকে ঈশ্বরেরই একটি রূপ মনে করে গ্রহণ করছি। আগেকার দিনে মেয়ে যখন বিয়ের পর শ্বশুড় বাড়ি যেত তখন শ্বশুড় বাড়ি থেকে বলা হত – তুমি আমাদের এই বাড়ির মেয়ে, এই বাড়ির সব কিছুই তোমার, তোমাকে আমরা গ্রহণ করলাম। এখন পুরো ব্যাপারটা উল্টে গেছে – এখন একজন অপরজনকে বলছে আমি তোমাকে সহ্য করছি তুমিও আমাকে সহ্য কর। হিন্দু ধর্মে সহ্য করার কোন ধারণাই ছিল না, তাদের কাছে একটাই ছিল, আমি তোমাকে গ্রহণ করছি। তবে গ্রহণ করার কতকগুলি বিধি আছে।

ভারত আজ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সবার সব কিছুতে স্বাধীনতা এসে গেছে। যে কেউ যে কোন কিছু অধ্যয়ন করতে পারে, যে কোন মানুষ যে কোন সাধনা করতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যাতেও সবার সমান অধিকার, কিন্তু তার জন্য আগে তোমাকে অবশ্যই কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। কেউ কেউ এই জীবনেই ঈশ্বরের স্বরূপকে জানতে পারেন আবার কেউ মৃত্যুর পরে জানতে পারবেন – ঈশ্বরের স্বরূপ জানার এই দুটো পদ্ধতি। যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যাতে আছেন তাঁরা স্বর্গের সুখকে অতি তুচ্ছ বলে মনে করেন। ব্রহ্মবিদ্যাতে সব থেকে উচ্চ অবস্থা হল জীবনমুক্তি। জীবনমুক্তি মানে, যিনি তাঁরা জীবদ্দশায় ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের কার্যকে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন। দ্বিতীয় হল মৃত্যুর সময় তাঁর ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে যায়। তৃতীয় হল ক্রমমুক্তি, এনারা সাধনা করে করে জন্মের পর জন্ম এগোতে এগোতে একটা জন্মে গিয়ে মুক্ত হয়ে যান। চতুর্থ শ্রেণীকে বলা হয় স্বর্গপ্রাপ্তি আর পঞ্চম যারা তারা সবাই মৃত্যুধর্মা। মৃত্যুর সময় শ্রীমা বা ঠাকুর এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, এই ধরণের চিন্তাকে ব্রহ্মবিদ্যায় যাঁরা আছেন তাঁরা অত্যন্ত হেয় দৃষ্টিতে দেখেন। এনাদের ভাবই হল *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।* এই জীবদ্দশাতেই, আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই আমার মুক্তি চাই। এটাই জীবনমুক্তির আদর্শ, এটাই ব্রহ্মবিদ্যা, এটাই হিন্দু তথা ভারতবাসীর জাতীয় গর্ব। ভারতের সমাজ ব্যবস্থার পুরোটাই এই ব্রহ্মবিদ্যার উপর আধার করে নির্মিত।

পরা বিদ্যা, যে বিদ্যা মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আর অপরা বিদ্যা, যে বিদ্যা অর্জনের দ্বারা জাগতিক অভ্যুদয় হয়, এই দুটো বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত। একজন চর্মকার যখন জুতো সেলাই করছে তখন সেও জানে যে আমি এই কাজের মাধ্যমে মুক্তির দিকে এগোচ্ছি। এটাই ভারতের সনাতন আদর্শ, শুধু আদর্শ নয় এটাই বাস্তব। কোন ব্যক্তি যদি হঠাৎ খবর পায় তার ঠাকুর্দা ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা রেখে গেছেন, আর

সে এর সমস্ত টাকার উত্তরাধিকারী। তখন তার খুব গর্ব হয়, আমি এত টাকার মালিক! আর কেউ যদি বলে আমার ঠাকুর্দা জমিদার ছিলেন, তাঁর অমুক ছিল, তিনি অমুক ছিলেন। তাতে কি দাম আছে! তোমার ঠাকুর্দা ছিলেন তো ছিলেন তাতে তোমার কি! গর্ব হয় তখন যখন জানব আমি এর মালিক। আমি সেই সমাজের লোক, যে সমাজের হাতের মুঠোয় ব্রহ্মবিদ্যা। যাঁরা এই রহস্য বিদ্যাকে আয়ত্ত করেছেন তাঁদের সেবা করে, তাঁদের সঙ্গ করে যতটা পারা যায় ততটা তাঁদের কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করে আমিও নিজের জীবনকে ধন্য করতে পারি, আমিও এই ব্রহ্মবিদ্যার মালিক হতে পারি। এই হল ব্রহ্মবিদ্যার ভাব।

ব্রহ্মবিদ্যার এই ভাব পাওয়ার জন্য যে ধ্যান ধারণার কথা বলা হয়েছে সেগুলোই আমাদের শাস্ত্র। ভাগবত-পুরাণও ব্রহ্মবিদ্যা। আমাদের পূর্বজরা শুধু যে বিদ্যা শিখেছেন, লিখেছেন তা নয়, আমি আপনি সবাই এই ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, আমরাও এই বিদ্যা অর্জন করার যোগ্য। সেইজন্য স্বামীজী বারবার বলছেন তোমার নিজের ঐতিহ্যকে আগে জানো। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে না জানলে এই ভাব আমাদের মধ্যে কোন দিন জাগ্রত হবে না। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রে শুধু এই ব্রহ্মবিদ্যার কথাই বলা হয়েছে, আমাদের ঋষিরা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন, ব্রহ্মবিদ্যার রহস্যকে উন্মোচন করেছেন, আর ভাবীকালের মানুষরাও যাতে এই ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে সেইজন্য এই সব শাস্ত্রে তাঁদের উপলব্ধিকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমাদের এই ঐতিহ্যকে না জানলে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কারটা আসবে না, জাতি হিসাবে গর্ব করার প্রেরণাটাই হবে না। ভারতের এই দুরবস্থা থেকে বেরোবার একটাই পথ তা হল, আমাদের ঐতিহ্যকে ভালো করে জানা, আর ভারতবাসী হিসাবে নিজেকে গর্বিত বোধ করা।

নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদ *(ধর্ম ও অধর্মের ব্যাখ্যা, ধর্মের তিরিশটি অনুশাসন, স্বাভাবিক বৃত্তির আশ্রয়, ভোগ নিবৃত্তির উপায়, গৃহস্থের মোক্ষধর্ম পালন)*

যাই হোক, আমরা আবার ভাগবতের মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। যদিও মহাভারতে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু ভাগবতে এগুলোর কোন পুনরাবৃত্তি হচ্ছে না, কেননা মহাভারতে যেভাবে এগুলোকে দেখানো হয়েছে এখানে আবার অন্যভাবে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। তাছাড়া এগুলো বারবার শোনা ভালো। এখানেও যুধিষ্ঠির আর নারদের মধ্যে সংলাপ চলছে। যুধিষ্ঠির নারদকে বলছেন 'আপনি আমাকে একটু ধর্মের ব্যাপারে বলুন'। নারদ এখানে ধর্মের কথা বলতে গিয়ে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। এর তাৎপর্য্য হচ্ছে ধর্মের মূল স্বরূপ। এখানে ধর্ম বলতে বোঝাচ্ছে rightful action, অনেক সময় আমাদের মনে সংশয় হয় এই কাজটা আমি করব কি করব না, এই কাজটা কি ধর্মমূলক নাকি অধর্মমূলক। নারদ বলছেন – *ধর্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো হরিঃ। স্মৃতং চ তদ্বিদাং রাজন্যেন চাত্মা প্রসীদতি।।৭/১১/৭।* যার মূলে ১) ভগবানের মুখ থেকে যে শাস্ত্র বেরিয়েছে, ২) ভগবানকে যে মহর্ষিরা জানেন তাঁরা যে স্মৃতি শাস্ত্র দিয়ে গেছেন এবং ৩) যে কর্ম করলে আত্মগ্লানি না হয়ে আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি হয় সেই কর্মই ধর্মের মূল। শ্লোকের সহজ অনুবাদ করলে ঠিক এই অর্থ দাঁড়ায়। এখানে শাস্ত্র বিরোধীর অর্থ হচ্ছে – কোন কর্ম যেন শাস্ত্র বিরোধী না হয় অর্থাৎ শাস্ত্র যে কর্ম করতে নিষেধ করেছে সেই কর্ম না করা। দ্বিতীয়ত, স্মৃতি বিরোধী কোন কর্ম করা যাবে না। এখানে কিন্তু ভারতীয় সংবিধানকে স্মৃতির মধ্যে গণ্য করা হচ্ছে না। তাহলে কোন্ স্মৃতির কথা বলছেন? সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যে কথাগুলো বলে গেছেন। কিন্তু যদি এমন কোন কাজ করছি যে কাজের কথা শাস্ত্রে বা স্মৃতিতে উল্লেখ করা নেই, যেমন এই মাইক্রোফোন আমি ব্যবহার করব কি করব না। এখন মাইক্রোফোন ব্যবহার করার কথা বেদে উল্লেখ করা হয়নি, স্মৃতিতেও নেই, এখন শিক্ষক হিসেবে আমার মাইক্রোফোন ব্যবহার করা উচিত হবে কি হবে না? এখন এটা আমরা কিভাবে ঠিক করব? এখানে আমাদের তৃতীয় শর্তটা নিয়ে আসতে হবে। মাইক্রোফোন ব্যবহার করে আমার আত্মগ্লানি হচ্ছে কিনা। ঠাকুর এক জায়গায় পাপ-পূণ্যের কথা বলতে গিয়ে বলছেন – যে কাজ করলে মন খুঁতখুঁত করে সেই কাজটাই পাপ কাজ। নিজের অন্তরাত্মা আছেন তিনি বলে দেন এটা ঠিক কি বেঠিক।

তাহলে কোন কাজ ধর্ম সম্মত? যে কাজ বেদ সম্মত, যেহেতু বেদ ভগবানের মুখের কথা, স্মৃতি সম্মত ও অন্তরাত্মা সম্মত। এই তিনটে যদি সম্মত না হয় তাহলে ঐ কাজ করা যাবে না। সারা জগত বলে দিতে পারে এটা করো না আর এটা কর, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই তিনটের মধ্যে কোথাও যদি দ্বন্দ্ব হয় তাহলে সাবধাণ, ঐ কাজ করবে না। যদি বেদ সম্মত হয় তাহলে অন্তরাত্মা কখনই আটকাবে না। স্মৃতি সম্মত হয় তখনও অন্তরাত্মা বাধা দেবে না। আর অন্তরাত্মা তখনই আসবে যখন এই দুটোতে যে কাজের কথা উল্লেখ নেই বা হয়তো শাস্ত্রে বা স্মৃতিতে কি বলা আছে আমার পরিষ্কার ধারণা নেই। সেইজন্য বিখ্যাত একটি উক্তি আছে – the voice of conscience, তোমার অন্তরাত্মা কি বলছে। অনেক সময় মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন মানুষ বন্ধুদের সাহায্য নেয়। এখন বেদ, স্মৃতি আর অন্তরাত্মা এই তিনটেকে ভিত্তি করে যুধিষ্ঠির আর নারদের মধ্যে আলোচনা চলেছে।

তখন নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন শাস্ত্রে ধর্মের তিরিশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। *সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ। অহিংসা ব্রহ্মচর্যং চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবম্।। সন্তোষঃ সমদৃক সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ। নৃণাং বিপর্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্।। অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ। তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব।। শ্রবণং কীর্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ। সেবেজ্যাবননির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্।। নৃণাময়ং পরো ধর্মঃ সর্বেষাং সমুদাহৃতঃ। ত্রিংশল্লক্ষণবান্‌রাজন্‌সর্বাত্মা যেন তুষ্যতি।।৭/১১/৮-১২।* নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, (১) সত্য, (২) দয়া, (৩) তপস্যা, (৪) শৌচ, (৫) তিতিক্ষা, (৬) উচিত-অনুচিতগের বিচার, (৭) মনের সংযম, (৮) ইন্দ্রিয়ের সংযম, (৯) অহিংসা, (১০) ব্রহ্মচর্য, (১১) ত্যাগ, (১২) স্বাধ্যায়, (১৩) সরলতা, (১৪) সন্তোষ, (১৫) সমদর্শী মহৎ ব্যক্তির সেবা, (১৬) সংসারের ভোগবাসনা থেকে ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হওয়া, (১৭) অভিমানযুক্ত কর্ম বিপরীত হয়ে থাকে – এই বিচার করা, (১৮) মৌনতা, (১৯) আত্মচিন্তন, (২০) প্রাণীজাতির মধ্যে অন্নাদির বিভাজন, (২১) সবার মধ্যে আমার ইষ্টদেবই বিরাজ করছেন এই ভাব রাখা, (২২) সাধুর পরম আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা প্রভৃতির শ্রবণ, (২৩) কীর্তন, (২৪) স্মরণ, (২৫) তাঁর সেবা, (২৬) পূজা এবং (২৭) প্রণতি, (২৮) ভগবানে আত্মোৎসর্গ, (২৯) সখ্য এবং (৩০) আত্মসমর্পণ এই তিরিশ রকম পরম ধর্মময় আচরণ করলে সর্বাত্মা ভগবান প্রসন্ন হন। হে রাজন্! এই তিরিশটি আচরণই মানুষের পরম ধর্ম। যোগশাস্ত্রেও সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছে আমাদের কি করতে হবে আর কি করা যাবে না। যারাই ধর্মাচরণ করবে, যারাই মনে করবে লোকেরা আমাকে ধার্মিক বলে জানুক তাদেরকে অবশ্যই এই তিরিশটি অনুশাসনকে অনুসরণ করতে হবে।

ব্রাহ্মণরা কি কি কাজ করবে, ক্ষত্রিয়রা কিভাবে জীবন ধারণ করবে বলার পর বলছেন – *বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ। হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ।।৭/১১/৩২।* এই শ্লোকে মানুষের স্বাভাবিক কর্মের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিক কর্ম মানে, মানুষের ধর্ম আর তার স্বভাব ও চরিত্রে সঙ্গে যে কর্মটা খাপ খাচ্ছে, সেই কর্মটাই অনাসক্ত ভাবে করা উচিৎ। এর খুব সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কোন এক মহারাজ আছেন যিনি মঠ মিশনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের কাজ করছেন। কোন সময় বই বিক্রি করছেন, কখন ছাপাখানায় কাজ করছেন, কখন ডিসপেন্সারি চালাচ্ছেন, আবার কখন তাকে মন্দিরে পূজাদি করতে হচ্ছে। এখন তিনি সব কটা কাজই নিষ্ঠা নিয়ে করছেন। কিন্তু তাঁর হয়তো শিক্ষকতায় স্বাভাবিক একটা গুণ আছে। এখানে বলছেন তোমার এই যে স্বাভাবিক গুণের কর্মটা যদি অনাসক্ত ভাবে কর তাহলে সেখান থেকে তুমি আস্তে আস্তে কর্মের পারে চলে গিয়ে গুণাতীত হয়ে যাবে। নিজের স্বাভাবিক কর্ম থেকে বেরিয়ে আসাটা যত না সহজ, অন্য কর্ম থেকে বেরোন অনেক শক্ত। এখন যদি আমাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়ীত্ব পালন করতে বলা হয় তখন এই কর্মটা আমার আর স্বাভাবিক কর্ম থাকবে না। কয়েক দিন পরে প্রধানমন্ত্রীর যা ক্ষমতা সেটাকে আর হজম করতে পারবো না। কিন্তু আমাকে যদি শাস্ত্র অধ্যাপনার দায়ীত্ব পালন করতে বলা হয় তখন ঐ কাজে আমার কোন আর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না, কেননা এটা আমার স্বাভাবিক কর্ম। যেটা স্বাভাবিক জিনিষ সেটাতে কখন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না। কিন্তু আমাদের সমস্যা হল যে কাজটা আমাদের

স্বাভাবিক নয়, আমার স্বভাবে যে কর্ম খাপ খায়না সেটাই আমরা ধরতে যাই, আমাদের যে কর্মগুলো স্বাভাবিক সে কর্মগুলো থেকে আমরা পালিয়ে বেড়াই।

এখানে ভাগবত আমাদের একটা অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছে, যেটা হিন্দু শাস্ত্রে আর কোথাও পাওয়া যায় না। বলছেন *উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্যতামিয়াৎ। ন কল্পতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজং চ নশ্যতি।। এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া। বিরজ্যেত যথা রাজন্নাগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ।।৭/১১/৩৩-৩৪।* একই জমিতে যদি বারবার চাষ করা হয় তাতে ক্ষেতের উর্বরা শক্তি হ্রাস পেয়ে যায়। ঠিক তেমনি কোন মানুষ কোন একটা জিনিষ যদি খুব বেশি দিন ধরে করতে থাকে তখন একটা সময় সেই জিনিষটা থেকে তার বিরক্তি আসে। এমন কি কোন বিষয় ভোগে যদি প্রশ্রয় দিয়ে খুব বেশি মাত্রায় ভোগ করতে থাকে, তাহলেও একটা সময়ের পর থেকে সেই ভোগ থেকে তার মনটা উঠে আসে। মানুষ যখন পুরোদমে স্বকর্ম করতে থাকে, তার একটা সময়ে সেই কর্ম থেকে মনটা উঠে যায়, এইভাবে মন একবার কর্ম ও ভোগ থেকে সরে এলে ক্রমশ সে মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু যযাতির কাহিনী এর ঠিক উল্টো তত্ত্ব নিয়ে আসছে। যেমন আগুনে ঘি ঢাললে আগুন আরো জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি ভোগ বাসনাতে ইন্ধন দিলে ভোগ বাসনা আরো বেড়ে যায়। যযাতি যত ভোগের প্রশ্রয় দিচ্ছিল ততই তার ভোগ বাসনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু ভাগবত এখানে ঠিক উল্টো কথা বলছে – বলছে আগুনে ঘি ঢাললে আগুন আরো জ্বলে উঠবে ঠিকই কিন্তু ঘিয়ের পুরো পাত্রটাই যদি আগুনে ঢেলে দাও তাহলে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে আগুনটা নিভে যাবে।

এখন কোনটাকে আমরা ঠিক বললে মানবো? ভাগবত এখানে বলছেন তুমি তোমার স্বধর্মে মনকে নিবদ্ধ করে নিরন্তর ভাবে কাজ করে যাও, একটা সময় আসবে যখন তুমি বলবে যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। তারপরেই বলছেন স্বধর্ম করতে করতে যদি তুমি ভোগ করতে চাও সেটাও পুরো মাত্রায় ভোগ করে নাও – *এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া* – এখানে আর কর্মের কথা বলছেন না, কামের কথা, ভোগের কথা বলছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঠাকুরও এই একই কথা বলছেন, তিনি বলছেন ভোগান্ত না হলে কিছু হবে না বাপু, ভোগান্ত না হলে ঈশ্বরের দিকে মন যাবে না।

এই দুটো তত্ত্বের মধ্যে কোনটা ঠিক? একজন সন্ন্যাসী সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তা সত্ত্বেও সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আশ্রমেই একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের কিছু কিছু জিনিষে ভোগের অনুমতি দেওয়া আছে, সেটুকুও তাড়াতাড়ি শেষ করে সব মিটিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসীকে এগিয়ে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় যেটা হতে পারে, যতবার তুমি ঐটুকু ভোগের দিকে যাবে ততই তোমার মন ঐদিকেই যেতে চাইবে। এখন সন্ন্যাসী কোনটাকে নেবে? দুটোর মধ্যে একটাই তো ঠিক হবে। স্বামীজী এর সঠিক সমাধান দিয়ে গেছেন। তিনি বলছেন – ছোটখাটো বাসনা গুলোকে আগে মিটিয়ে নিতে হয়, কিন্তু বড় বড় যে বাসনাগুলো আছে সেগুলিকে প্রশ্রয় দিতে নেই, কেননা এই বড় বড় বাসনাগুলোর খুব তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলার শক্তিটা প্রচণ্ড। ঠাকুর যেমন বলছেন – ভবনাথ পান, মাছ ত্যাগ করেছে তো তাতে কি আর হল, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই আসল ত্যাগ। এর মানে কি? তোমার পান মাছ খেতে ইচ্ছে করছে তো খেয়ে নাও না বাপু, এগুলো ছোটখাটো বাসনা, খেয়ে মিটিয়ে দাও। কিন্তু এই ছোটখাটো বাসনা গুলি ত্যাগ করে তুমি অন্য বড় বড় বাসনাকে ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছো তাতে কিন্তু তোমার বন্ধন আরো দৃঢ় হচ্ছে। ভাগবত এখানে পরিষ্কার করে বলছে না যে কি ধরণের কামনা বাসনাকে তুমি প্রশ্রয় দিয়ে মিটিয়ে দেবে। আমরা এখানে মহাভারতের শ্লোক আর ভাগবতের এই শ্লোকের একটা তুলনামূলক আলোচনা করলাম। মহাভারতে যযাতি বলছেন – যদি কামনা বাসনাতে মন যায়, যদি ভোগের উপসেবন করা হয় তাহলে তা কখনই বাসনার আগুনকে নির্বাপিত করবে না, বরং আগুন বেড়েই চলবে। ভাগবত বলছে – বাসনার আগুন যাবে যদি তুমি ভোগ বাসনাতে খুব বেশি মাত্রায় প্রশ্রয় দিতে থাক। অনেক দিন ধরে কোন জিনিষ ভোগ করতে করতে একটা সময় ওই জিনিষের প্রতি তোমার বিরক্তির ভাব চলে আসবে।

দুটো তখনই ঠিক আছে, যখন সাধক ছোট খাটো বাসনাগুলিকে মিটিয়ে দিয়ে সাধনার পথে পুরো একাগ্রতা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে, কিন্তু যেগুলো অত্যন্ত ক্ষতিকারক সেগুলিকে কখনই যেন প্রশ্রয় না দেয়। আবার অন্য রকমও আছে। আমেরিকায় এক অল্প বয়সী যুবক হিন্দু পরম্পরার নিয়মে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এক আশ্রমে থাকতেন। খুব ভালো সাধু ছিলেন। আশ্রমের মহন্তও খুব স্নেহ করে তাঁকে সামলে রাখতেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল তিনি আশ্রম ছেড়ে চলে গেছেন। বেশ কিছুদিন পরে তিনি আবার একদিন আশ্রমে এসেছেন, কিন্তু এবার তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী। তাঁকে দেখে ঐ আশ্রমের মহন্ত চোখের জল ফেলে বলছেন 'ছিঃ ছিঃ! তুমি এই সাধারণ একটা জিনিষের জন্য সন্ন্যাসের পথ ছেড়ে দিলে! তুমি যদি একবার আমাকে বলতে তোমার এই দিকে একটু দুর্বলতা আছে, আমি তাহলে তোমাকে এদিক সেদিক কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে তোমার এই দুর্বলতাটা মিটিয় দিতাম, তাহলে এই জিনিষটা থেকে তোমার মন উঠে আসত। আর এতটুকুর জন্য তোমার পুরো জীবনটাকে সর্বনাশ করে দিলে'। মহন্তের এই বক্তব্যকে এখন আমরা কিভাবে বিচার করব?

যখনই মনে হবে আমার একটি সন্তান হোক, ভবিষ্যতে সে আমাকে দেখবে, আমার পিতৃকর্ম করবে, তখনি একটা গভীর সঙ্কটের আবর্ত তৈরী হয়ে গেল, আর সে ওই সঙ্কটের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসাটা অত্যন্ত দুরূহ। কামিনী আসল সমস্যা নয়, কামিনী নাচাবে, আর সেখান থেকে বিরক্তি এসে যাওয়ার সম্ভবনাও আছে, কিন্তু সন্তান-সন্ততি থেকে মানুষ কখনই বিরক্ত হয় না। যারা সন্তানদের কাছে অনেক আঘাত পেয়েছে, তাদেরও একটা আশা থাকে যে সন্তান পরে পাল্টে যেতে পারে। তাই বলছে কামিনী থেকে খুব একটা কঠিণ সমস্যা হয় না, সেখান থেকে বিরক্তি জন্মাতে বেশি সময় নেয় না, কিন্তু নিজের সন্তানদের প্রতি মায়া মমতা, যতই তাদের কাছ থেকে আঘাত পাক, কখনই নষ্ট হয় না। সেইজন্যে শাস্ত্রে পুত্রৈষেণার কথা বলছে, সন্তান পাবার ইচ্ছা যদি হয় তাহলেই বুঝে নিন তার বিপদ এসে গেল। কিন্তু যদি কেবল নারীর জন্য বাসনা থাকে সেটা সন্তান কামনার মত খুব একটা মারাত্মক সমস্যা তৈরী করতে পারবে না।

এখানে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে ছোট খাটো বাসনা যেটা আছে মিটিয়ে নাও, কিন্তু শাস্ত্র যেটা বারণ করেছে, পুত্রৈষেণা, বিত্তৈষেণা আর লোকৈষাণা এগুলোতে পা রাখতে নেই। কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে যেখানে ভোগের চরমে চলে যায়, মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়, যযাতির বাস্তবে সেটাই হল। যযাতি এতো ভোগ করল যে তাঁকেও শেষে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

তবে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, এত যে কথা বলা হচ্ছে এগুলো শুধু তাদেরই জন্য যারা পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাইছে, যে ব্যাক্তি এই জীবনে ঈশ্বর বই আর কাউকে জানতে বুঝতে চায় না, যে জীবন্মুক্ত হতে চাইছে, তাদের জন্যই এই কথা বলা হচ্ছে, সর্বসাধারণের জন্য কখনই বলা হচ্ছে না। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে মুক্তির দিকে এগোতে চাইছেন তাঁদের জন্যই বলা হচ্ছে – তোমার ছোটখাটো বাসনাগুলো মিটিয়ে দিয়ে ভোগ থেকে আগে বেরিয়ে এসো। কিন্তু এখানেও একটা সীমারেখা টানতে হবে। টাকা-পয়সা উপার্জন করতে কেউ নিষেধ করছে না, কিন্তু যেটাই করবে সেটা যেন ধর্ম সম্মত হয় আর সব কাজ যেন ধর্মভাবে করা হয়। কেউ যদি কোটিপতি হতে চায় তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতাটাও অর্জন করতে হবে। স্বামীজী বলছেন – যদি জানি কারুর গলা কেটে দিলে আমি আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারব, আর আত্মজ্ঞান লাভই যদি আমার জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহলে আমি তাই করব।

বলছেন অনাসক্ত না হলে হবে না। কিন্তু কি করে অনাসক্ত হবে? ভেতরে ভোগ বাসনার আগুন জ্বললে অনাসক্ত সুদূর পরাহত। আগুনকে আগে নেভাতে হবে। এর আগে আমরা চিত্রকেতু রাজার কাহিনীতে দেখেছিলাম, সন্তান হচ্ছে না বলে চিত্রকেতুর কত দুঃখ। দেবর্ষি নারদ ও অঙ্গিরা ঋষির আশীর্বাদে তার ছেলে হল, সে তখন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারপর ছেলেটা মরেও গেল। প্রথমে খুব কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পরে রাজা সব কিছু ছেড়েছুড়ে ঈশ্বর লাভের জন্য বেরিয়ে গেল। শাস্ত্র কতকগুলো নিয়ম করে দিয়েছে, কিন্তু একই নিয়ম আবার সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এরপরে সন্ন্যাসীর কি ধর্ম, বাণপ্রস্থী কি করবে সেই নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যেটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করার দরকার আছে। বলছেন গৃহস্থরা কিভাবে মোক্ষধর্ম পালন করবে। মূল কথা একটিই তত্ত্ব, তা হল অদ্বৈত তত্ত্ব, কিন্তু আমাদের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি প্রবল তাই বহু দেখছি। এক ঈশ্বরই আছেন কিন্তু তিনি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। তাই প্রত্যেকের সাধনা এই বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করা। গৃহস্থরা বহুর মধ্যে সেই এককে দেখার সাধনা কিভাবে করবে? *ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাহত্মনঃ। বর্তয়ন্স্বানুভূত্যেহ ত্রীন্ স্বপ্নান্ধুনুতে মুনিঃ।।৭/১৫/৬২।* অদ্বৈতের তিন রকম রূপ – প্রথম হল ভাবাদ্বৈত, দ্বিতীয় ক্রিয়াদ্বৈত আর তৃতীয় দ্রব্যাদ্বৈত। বিচারশীল পুরুষরা স্বানুভূতিতে আত্মার এই তিন প্রকার অদ্বৈত-রূপকে অনুভব করেন। ভাবাদ্বৈত মানে – এই যেমন আমাদের গায়ে জামা আছে, এটা কি দিয়ে তৈরী? সুতো দিয়ে তৈরি। সুতো আবার তৈরী হয়েছে তুলো থেকে। লক্ষ লক্ষ সুতো দিয়ে এই জামা তৈরী হয়েছে। আর জামাও যা সুতোও তাই, সুতোও যা তুলোও তাই। জামা কার্য সুতো কারণ, কিন্তু কার্য ও কারণ এক। এই একতার বিচারকে বলে ভাবাদ্বৈত। বিচার করে যখন বুঝে নেওয়া হল কার্য আর কারণ এক তখন সেটাই হয়ে গেল ভাবাদ্বৈত। মন, বাণী ও কায় দিয়ে যা কিছু কর্ম সম্পন্ন হচ্ছে সবই সেই পরমব্রহ্মের উপরেই হচ্ছে, কেননা পরমব্রহ্ম ছাড়াতো কিছু নেই। সুতরাং যা কিছু হবে তাঁর উপরেই হবে। ক্রিয়ার সঙ্গে যে আমিটা আছে সেটা সেই পরমব্রহ্মের আমির সাথে যুক্ত করে দেওয়াটা হচ্ছে ক্রিয়াদ্বৈত – মানে সমস্ত কর্মের ফল সমর্পণ করে দেওয়াটাই ক্রিয়াদ্বৈত। ক্রিয়াদ্বৈতে আমি বোধটা চলে গেল। যখন কার্য কারণের কথা বলা হল তখন যে আমি চলে গেল সেটা কার্য কারণের আমি। এখানে চলে গেল ক্রিয়ার আমি। তৃতীয় দ্রব্যাদ্বৈত – স্ত্রী, পুত্র, মা, বাবা, ভাই, বোন বা সমস্ত যে প্রাণী আছে, তাদের যে স্বার্থ বা তাদের যে ভোগ সেটা এক ভাবা। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, হাজার মুখে আমি খাচ্ছি। যে কোন লোক যখন খাচ্ছে তখন আমিই খাচ্ছি, কেননা একমাত্র তিনিইতো আছেন। যখন আপন আর পর এই ভেদ বোধ থাকে না তখন এটাই হয়ে যাচ্ছে দ্রব্যাদ্বৈত।

এবার সহজ ভাবে যদি বলি, একজন সন্ন্যাসী আশ্রমে সামান্য ভিক্ষান্নে ঝোল ভাত খাচ্ছেন, একজন গৃহস্থ বাড়িতে মাংস বিরিয়ানী খাচ্ছেন। কিন্তু এতে সন্ন্যাসীর কোন চিন্তার কারণ নেই। কারণ সন্ন্যাসী জানেন, বিচার করে বুঝেছেন ঝোল ভাত যা বিরিয়ানি আর মাংসও তাই। ঝোল ভাতে কি আছে? শাক সব্জি। মাংস কোথা থেকে আসছে? ছাগল থেকে। ছাগল কি খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে? এই শাক, পাতা খেয়েই তার শরীরে মাংস হয়েছে। তাহলে ঝোল ভাতও যা মাংসও তাই, এই বিচারটা হয়ে গেল ভাবাদ্বৈত। দ্বিতীয় সন্ন্যাসী যা খাচ্ছেন সেটা শ্রীরামকৃষ্ণকে অর্পণ করে গ্রহণ করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণেরই জিনিষ শ্রীরামকৃষ্ণকেই অর্পণ করা হচ্ছে – এটা হয়ে গেল ক্রিয়াদ্বৈত। আর, সন্ন্যাসীর হয়তো ইচ্ছে ছিলে বিরিয়ানী খাওয়া, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, এদিকে গৃহস্থ পেলেন ও খেলেন, এতে সন্ন্যাসী নিজেকে সুখী মনে করছেন, কেননা সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ তো এক, দুজনের মধ্যে সেই পরমাত্মাই সব কিছু গ্রহণ করছেন। তাই গৃহস্থ যদি মাংস খান তাহলে সন্ন্যাসীরও খাওয়া হবে। এটাই দ্রব্যাদ্বৈত। গৃহস্থ এই তিনটি জিনিষ অভ্যাস করবে, আর এতেই সে মোক্ষ লাভ করবে। একজন গৃহস্থ এই তিনটেকে অনুশীলন করবে আর এরপর সে অর্থ আয় করতে চায় করুক, ভোগ করতে চায় করুক, কিন্তু শাস্ত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন যেন কখন না হয়ে যায়। যেটাই করবে সেটা যেন শাস্ত্র সম্মত ভাবে করে।

অষ্টম স্কন্ধ

এরপর আসছে অষ্টম স্কন্ধ। অষ্টম স্কন্ধে বিভিন্ন মণ্বন্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একই কল্পে পর পর কয়েকজন করে মনু পাল্টাতে থাকেন, সেই সব মনুদের সম্বন্ধে এখানে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তার সাথে কয়েকজন অবতারের কথাও আছে। আমাদের সবারই একটা ধারণা যে, পরীক্ষিৎ যে সময় ছিলেন, অর্থাৎ মহাভারত থেকে এখন পর্যন্ত সপ্তম মণ্বন্তর চলছে। কল্প, মন্বন্তর এই জিনিষ গুলো আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু এগুলো সবই ঋষিরা নিজেদের চিন্তা ভাবনা থেকে বলে গেছেন। ঋষিরা কখনই কোন

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন উদ্ভট কথা বলবেন না। আর এই কথাগুলো যে ভাগবতেই বলা হয়েছে তা নয়, প্রত্যেকটি পুরাণ একই কথা বলছে, আর অন্যান্য যত শাস্ত্র আছে সেখানেও এই একই কথা পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবিরা বলবেন এগুলো সব আজগুবী গালগপ্প। কিন্তু ঋষিরা তাঁদের দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এমন কিছু একটা দেখে নিশ্চিত হয়েছিলেন যেটা তাঁরা ভাবী কালের প্রজন্মের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর বেশি আমাদের আর জানার কোন উপায় নেই। এটাই হলো ভারতের আধ্যত্মিকতার ঐতিহ্য, এই আধ্যাত্মিকতার ধারাটা কিভাবে আমাদের কাছে এই অবস্থায় এসেছে সেটাই আমরা জানার চেষ্টা করে যাচ্ছি। মণ্বন্তর নিয়ে এনাদের চিন্তা ভাবনা কতটা ঠিক কতটা ভুল আমাদের জানার উপায় নেই, কিন্তু আমরা সবাই জানি যে এখন সপ্তম মণ্বন্তর চলছে।

বিভিন্ন মনুর বর্ণনা এবং গজেন্দ্র উপাখ্যান

পরীক্ষিতের মনেও স্বাভাবিক ভাবে এই প্রশ্ন জেগেছে। আমরা যে কল্পে আছি এই কল্পে ইতিমধ্যে ছজন মনু হয়ে গেছেন। ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে এসেছি প্রত্যেক সৃষ্টিতে একজন করে মনু আছেন, একজন ইন্দ্র আছেন আর আছেন সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিরা। কিন্তু একজন মনু বা ইন্দ্রই বরাবরের জন্য থাকেন না, প্রত্যেকটি মণ্বন্তরে মনু, ইন্দ্র পাল্টে যায়, আবার সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিদের মধ্যেও প্রত্যেক মন্বন্তরে একই ঋষি থাকেন না। এর মানে, আপনি যাই হয়ে যান না কেন, আপনার স্থান ও কাল খুবই সীমিত। ইন্দ্রকে তো মাঝ পথেই অনেক বার সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিরা এক মণ্বন্তরে মধ্যে আর পাল্টে যান না, কিন্ত বাকীদের কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

শুকদেব বলছেন – প্রথম যিনি মনু ছিলেন তাঁর নাম স্বয়ম্ভু মনু। সচরাচর এই স্বয়ম্ভু মনুকেই মনু বলা হয়। প্রথম মণ্বন্তরে স্বয়ম্ভু যখন মনু হলেন সেই প্রথম মণ্বন্তরে কপিল মুনি জন্ম নিয়েছিলেন। কপিল মুনি কিন্তু আমাদের এই সপ্তম মণ্বন্তরের ঋষি নন, তিনি প্রথম মণ্বন্তরের ঋষি ছিলেন। দ্বিতীয় মনু যিনি হয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল স্বারোচিষ। ভগবান এই মণ্বন্তরে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁর নাম ছিল বিভু। যদিও এই নামের অবতার সম্বন্ধে আমাদের পরম্পরাতে খুব একটা প্রচলিত ধারণা নেই, তবে হিন্দু শাস্ত্রে অসংখ্য অবতারে কথা বলা হয়। যাঁরই মধ্যে একটা কোন বিরাট অনন্য আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ দেখতে পেতেন তাঁকেই তাঁরা অবতার বানিয়ে দিতেন। তৃতীয় মনুর নাম ছিল উত্তম, এই মণ্বন্তরে সত্যসেন নামে ভগবান অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সত্যসেনেরও কোন বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাইনা, এখানে শুধু বলা আছে তিনি দেবতা ও অসুরদের প্রয়োজন মত সংহারাদি করেছিলেন। চতুর্থ মণ্বন্তরের মনুর নাম ছিল তামস। এই চতুর্থ মণ্বন্তরে এক ঋষি ছিলেন যাঁর নাম হল হরিমেধা। হরিমেধার এক সন্তান রূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এই অবতারের নাম হচ্ছে হরি। আর ঐ অবতারে ভগবান গজেন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন, গজেন্দ্র এক পৌরাণিক হাতি।

গজেন্দ্রর কথা শুনে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করছেন 'আরে এটা কি অদ্ভূত ব্যাপার! গজেন্দ্রতো হাতি, ভগবান হাতিকে কেন ত্রাণ করতে গেলেন আর কিভাবেই বা ত্রাণ করেছিলেন?' শুকদেব তখন গজেন্দ্রের কাহিনী বলছেন। গজেন্দ্র এক বিরাট হাতি ছিল। সে একবার তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে নদীর জলে স্নান করতে নেমেছে। সেই সময় তাকে এক কুমির ধরে নিয়েছে। হাতি আর কুমিরে অনেক দিন ধরে টানাটানি চলতে লাগল। অনেক দিন পর গজেন্দ্র যখন দেখছে যে আমি আর পারছি না, আমার শরীর ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে, কুমির আমাকে আস্তে আস্তে টেনে গ্রাস করে ফেলছে। তখন সে ভগবানের স্তুতি করতে আরম্ভ করল। তখন ভগবান এই হরি রূপে সেখানে গরূড়ের পিঠে আরূঢ় হয়ে এলেন, তারপর তাঁর চক্র দিয়ে কুমিরটাকে কেটে দিলেন। প্রথমে হাতি আর কুমিরকে এক সাথে জমির উপরে টেনে নিয়ে এলেন, ডাঙায় নিয়ে এসে ভগবান কুমিরের গলাটা কেটে দিলেন। এই কাহিনীর নাম গজেন্দ্র মুক্তি। লোকমুখে প্রচলিত যে এই ঘটনাটা বিহারের পাটনার কাছে শোণপুরে হয়েছিল, সেইজন্য এখনও সেখানে এক মাস ধরে মেলা হয়। এই কাহিনীতে

সেখানকার জঙ্গলের খুব সুন্দর কাব্যিক বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণের এই সব বর্ণনা থেকে তখনকার দিনের বৃক্ষাদি এবং বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখিদের বিবরণ জানা যায়।

পৌরাণিক কাহিনীতে যখনই কোন কিছুর বর্ণনা করবে তখন তাকে বিরাট করে দেখাবে আর কোন চরিত্রই এক কোটি বছরের নীচে বাঁচত না। কিন্তু প্রহ্লাদ চরিত্রে প্রহ্লাদ তাঁর বন্ধুদের বলছেন মানুষের আয়ু একশ বছর। সেখানে যদি বলে দিত মানুষের আয়ু এক কোটি বছর তখন বন্ধুরা বলত ঠিক আছে দশ লক্ষ বছর ভোগ করে নিই, তারপর দেখা যাবে। সেইজন্য সেখানে সত্যি কথা বলতে হল। যখন ভোগের ব্যাপার আসবে কিংবা কারুর অত্যাচারের কথা আসবে তখন লক্ষ লক্ষ কোটি বছর চালাবে। কিন্তু যখন ঠিক ঠিক ভাব নিয়ে আসতে হবে তখন মানুষের জীবন একশ বছরে নিয়ে আসবে। এখানে যেহেতু হাতি আর কুমির মূল চরিত্র তাই তাদের বর্ণনা বিরাট করে না দেখালে কাহিনী জমবে না। যাঁরা ভাগবত কথা পাঠ করেন, তাঁরাও এই জিনিষগুলিকে আরও রসালো করে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করেন। তারা কি কি খাওয়া দাওয়া করত তার বর্ণনা, বা বিষ্ণুলোকের সুন্দর মনোরম বর্ণনা যখন করবে তখন সেটাকে বাচনশৈলী দিয়ে খুব আকর্ষণীয় করে তুলবেন, কেননা সাধারণ মানুষ এগুলোই শুনতে চায়। ভাগবতের তত্ত্ব কথাগুলো বেশী আলোচনা করলে সাধারণ মানুষ কোন ধারণা না করতে পেরে বিরক্ত হয়ে ভাগবত কথার আসরে যাওয়াই বন্ধ করে দেবে। শ্রোতাদের ধরে রাখার জন্য এই ধরণের কাহিনীর নাটকীয় বাচনশৈলীতে পরিবেশনেরও দরকার আছে।

এখানে শুধু যে হাতির বর্ণনা করা হচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে হাতি কিভাবে স্নান করে, কিভাবে হাতি জল খায় সব নিখুঁত ভাবে বলছেন। হাতি কিভাবে জল খায় আমাদের অনেকরই জানা নেই। হাতি শুঁড় দিয়ে প্রথমে জলকে টেনে নেয়, শুঁড়টা যতটা পাইপের মত সেটাকে পুরো জল নিয়ে ভরে দেয়। তারপর শুঁড়টাকে মুখ দিয়ে সোজা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সরাসরি পেটের মধ্যে জলটাকে ঢেলে দেয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল হাতি যদি দরকার মনে করে শুঁড়কে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে পেট থেকে জলটাকে টেনে বাইরেও ফেলে দিতে পারে। হঠযোগীরা যে পেটের মধ্যে নল ঢুকিয়ে ধৌতি করেন ওটা মনে হয় হাতিকে দেখেই শিখেছেন। হাতির বাচ্চারা প্রথমে ওই ভাবে জল খেতে পারেনা, তখন মা নিজে জল টেনে বাচ্চার মুখে শুঁড়টাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাচ্চাকে জল খাওয়ায়। তখনকার কবিরা শুধু যে কবিতাই লিখে গেছেন তা নয়, তাঁরা প্রত্যেকটা জিনিষকে খুব যত্ন সহকারে সুন্দর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। আজকাল আমরা কত কিছু পড়াশুনো করেছি কিন্তু আমরাও এত বিশদ ভাবে পশু পাখিদের কথা জানিনা। কবিরা সব লক্ষ্য করে কবিতার মাধ্যমে একটা বিজ্ঞানকে তুলে ধরেছেন। এটাই তখনকার কবিদের বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই ভাবে গজেন্দ্র জলে নেমে যখন স্নানাদি করছিল সেই সময় কুমির এসে তার পা কামড়ে ধরেছে। কুমির গজেন্দ্রকে জোর টানতে শুরু করেছে, গজেন্দ্র কুমিরের থেকে মুক্তি পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। গজেন্দ্র তখন বলছে *ন মামিমে জ্ঞাতয় আতুরং গজাঃ কুতঃ করিণ্যঃ প্রভবন্তি মোচিতুম্। গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরাবৃতোহপ্যহং চ তং যামি পরং পরায়ণম্।।৮/২/৩২।* এই যে গ্রাহ, এখানে কুমিরকে গ্রাহ বলা হচ্ছে, গ্রহ থেকে গ্রাহ, গ্রহ হচ্ছে বন্ধন – *গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুঃ* – এটা হচ্ছে বিধাতার পাশ। বিধাতার পাশ এই কুমির রূপে এসেছে। গজেন্দ্র ভাবছে – এই পাশ, মানে আমার মৃত্যু রূপে বিধাতার এই পাশ এসেছে। আমার মত শক্তিশালী হাতি এই পাশ থেকে মুক্ত হতে পারছে না, তা আমার সাথে যে হস্তিনীরা রয়েছে তারা আমাকে এই পাশ থেকে মুক্ত হতে কি করে আর সাহায্য করতে পারবে! কেননা তাদের শক্তি আমার থেকে অনেক কম। এখন আর আমার কোন উপায় নেই, একমাত্র উপায় এখন ভগবান, তাই আমি এখন ভগবানেরই শরণাপন্ন হলাম। কালই হল সব, সাপের মত কাল সব কিছুকে গ্রাস করবার জন্য ধাবিত হচ্ছে। কালের ভয়ে ভীত হয়ে যে ভগবানের শরণ নেয় ভগবান তাকে অবশ্যই রক্ষা করেন। সেই প্রভুই সকলের আশ্রয়স্থল, তিনিই শরণদাতা, আমি তাঁরই আশ্রয় নিলাম।

যাঁরা বেদান্ত সাধক তাঁরা বলেন, সুখ, দুঃখ যাই আমার উপরে আসুক না কেন আমি সহ্য করে নেব। তাঁদের জন্য এটাই একমাত্র পথ, তাঁরা কোন ধরণের চেষ্টা করবেন না। যাঁরা সন্ন্যাসী, শুধু সন্ন্যাসীই নয়,

সন্ন্যাসের একটা বিশেষ অবস্থায় কোন কিছুর জন্য চেষ্টা না করাটাই তাঁদের সাধনা। বাকী যাঁরা আছেন, তাঁদের যতটুকু দরকার সেটার জন্য তাদের সব রকম ভাবে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তা না করে ঠাকুর যা করার করবেন, ঠাকুরের ইচ্ছে হলে হবে, না হলে হবে না বলে চুপ করে বসে থাকাটা মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ। ঠাকুরের যা ইচ্ছে হয় আমি তাই করব, তার মানে এই নয় যে আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব। কিন্তু যাঁরা ঠিক করে নিয়েছেন সুখ আসুক কি দুঃখ আসুক, শোক আসুক কি হর্ষ আসুক এগুলো আমার কাছে কোন আলাদা কিছু নয়, এটাই তাঁদের সাধনা, কিন্তু তাঁকেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সিদ্ধপুরুষদের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো প্রযোজ্য হবে না, সিদ্ধপুরুষের কথা আলাদা। সিদ্ধপুরুষের নীচে যাঁরা আছেন, তাঁদের যতটুকু দরকার সেটুকু পাওয়ার চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে। এই চেষ্টাটা যদি না চালিয়ে ঠাকুরের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে কিন্তু তারা মারাত্মক বিপদে পড়ে যাবে, এমন এমন জাগতিক সঙ্কট আসবে যার থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন।

স্বামীজীর মত মহাপুরুষ যাঁরা আছেন, তাঁদের যেন মা কালী আদেশ দিয়ে সব করান। ঠাকুরও স্বামীজীকে আদেশ দিচ্ছেন তোকে এটা করতে হবে, না করলে তোকে ঘাড়ে ধরে করিয়ে নেবে। কিন্তু স্বামীজী যখন সিদ্ধির অবস্থায় আসেননি তার আগে তিনি সব ধরণের চেষ্টা করেছেন। অদৃষ্টবাদ, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, এটা আমাদের দর্শন নয়। যিনি ঠিক করে নিলেন আজ থেকে এটাই আমার সাধনা, কি সাধনা? ঝড় আসুক, বৃষ্টি আসুক, রোদ আসুক আমি সব কিছুকে নির্দ্বিধায় সহ্য করব। তখন তার ব্যাপার আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু তার বাইরে যে কজন আছে তাদের পুরোদমে চেষ্টা করে যেতে হবে। আর একটা কথা হল – সেই চেষ্টার মধ্যে যেন রাগ, দ্বেষ আর লোভ না থাকে। গীতাতে যে ভগবান অর্জুনকে '*তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*' বলছেন, কেন বলছেন সহ্য করতে? কারণ দ্বন্দ্ব থাকবেই, আর দ্বন্দ্ব থাকলেই সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ এগুলো আসবেই। তোমার সামর্থ থাকলে গরমে তুমি বাড়িতে এসি মেশিন লাগাতে পারো, কিন্তু যার সামর্থ নেই তাকে গরম সহ্য করতে হবে। আবার যে বাড়িতে এসি মেশিন লাগিয়েছে বিদ্যুৎ সরবারাহ বিঘ্নিত হলে এসি মেশিন চলবে না, তখন গরম সহ্য করতে হবে, এখানে কোন উপায় নেই, তাই এগুলোকে নিয়ে হা-হুতাশ করতে যেও না। এর আরেকটি হল যার এটাই সাধনা, শীত-গ্রীষ্ম যাই আসুক, সুখ-দুঃখ যাই আসুক আমি সহ্য করে যাব। এদের কথা আলাদা। এটাই তাঁর সাধনা। সাধনা রূপে যদি নেওয়া হয় তখন আর কোন কথা থাকে না। গজেন্দ্র যদি বলত আমি মরেও সেই ভগবানের কাছেই যাব, তাহলে আর কুমিরের কামড় থেকে ছাড়াবার জন্য চেষ্টা কেন করব, কিন্তু তাতো হয়নি, গজেন্দ্র শেষ দম পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছে। সব চেষ্টা করেও যখন দেখছে আর বাঁচা যাবে না, তখন সে বলল 'হে প্রভু, আমি তোমার শরণাপন্ন, তুমি আমাকে রক্ষা কর'।

গজেন্দ্র মনে প্রাণে বুঝে নিয়েছে ভগবান ছাড়া আর আমার কোন বাঁচার পথ নেই, এখন সে তাই ভগবানের স্তুতি করতে শুরু করেছে। সেই সময় গজেন্দ্রের মনে হঠাৎ করে তার পূর্ব জন্মের একটা স্তুতির কথা মনে পড়ে গেল। মহাভারতে যদিও কিছুটা পাওয়া যায় কিন্তু ভাগবতে পূর্ব জন্মের খেলাটা বড্ড বেশি চোখে পড়বে। যাই হোক গজেন্দ্র তার পূর্ব জন্মে এই স্তোত্রের অভ্যাস করত। *ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্। পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি।।৮/৩/২।* যিনি জগতের মূল কারণ এবং সকলের হৃদয়ে পুরুষরূপে বিরাজ করছেন, যিনি সমস্ত জগতের একমাত্র প্রভু, যাঁর জন্য এই সংসারে চেতনার বিস্তার হয় সেই ভগবানকে নমস্কার এবং ভক্তিযুক্ত চিত্তে একান্ত ভাবে আমি তাঁর ধ্যান করি। চেতনার বিস্তার হয় – এই জিনিষটাকে একটু অনুধাবন করা দরকার। যখন সৃষ্টি হয় তখন যে জড় পদার্থ তৈরী হয়, তার মধ্যে চৈতন্য ঘুমিয়ে থাকে (sleeping consciousness), বৃক্ষের মধ্যে চৈতন্য স্থির থাকে standing consciousness, পশুপাখির মধ্যে চৈতন্য চলতে পারে walking consciousness আর মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক জাগ্রত চৈতন্য awaking consciousness। এইভাবে চৈতন্যকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। এই চৈতন্য যে ধীরে ধীরে বিকাশের মধ্য দিয়ে বিস্তার হচ্ছে, এই বিস্তারও ভগবানের জন্যই হচ্ছে। চৈতন্যের এই ভাবে বিস্তার হওয়াটাই যেন তাঁর শক্তির বিস্তার। বেদান্তের দিক থেকে বিচার করতে গেলে শক্তির বিস্তার বলা

যাবে না। বেদান্ত চৈতন্যের এই বিকাশকে বলবে আত্মার উপরে যে অনেক আবরণ পড়ে গিয়েছিল, সেই আত্মার উপর থেকে একটার পর একটা আবরণ সরে যাচ্ছে। পুরাণের দর্শন অনেক পরের দিকের, তাই এর মজা হল যখন তত্ত্বের সূক্ষ্ম দিকগুলি আসবে তখন এরা কখন বেদান্তের দিকে চলে যাবে, কখন তন্ত্রের দিকে চলে যাবে, কখন শৈব মতে চলে যাবে, যখন যেভাবে সুবিধা হবে তখন সেই ভাবে মিলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। হিন্দু দর্শনে তিনজন মহান সমণ্বয়কারী এসেছিলেন। প্রথমজন হলেন ব্যাসদেব, আমাদের যত রকমের দর্শন ও তার সাধনা ছিলে সব কটিকে ব্যাসদেব এক জায়গায় নিয়ে এসে একটা সমণ্বয় করে দিলেন। দ্বিতীয় হলেন আচার্য শঙ্কর, তিনিও যত রকমের দর্শন ছিল যা এতকাল ধরে মানুষ অনুশীলন করে এসেছে, একটা জায়গায় একত্রিত করে দিয়ে বললেন সবার একই বক্তব্য। তৃতীয় শ্রীরামকৃষ্ণ – তিনি সমস্ত ধর্মকে, যত ধর্ম ছিল, সব কটি ধর্ম পথে সাধনা করে সব ধর্মকে এক করে দিলেন। সব ধর্ম, সব তত্ত্ব সে এক কথাই বলছে – এই দিক থেকে দেখলে এক রকম দেখাবে, আর অন্য দিক থেকে দেখলে আরেক রকম দেখাবে, এই যা প্রভেদ। আধ্যাত্মিক পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা এই তিনজন মহান সমন্বয়কারী পাই কিন্তু শাস্ত্রের দিক থেকে পুরাণ হল শ্রেষ্ঠ সমণ্বয়কারী শাস্ত্র।

তারপর গজেন্দ্র বলছে আমি সেই ভগবানকে প্রণাম করি। আর এই যে জগৎ-সংসার আর তার সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে তার সবটা তাঁতেই অবস্থিত, সংস্কৃতে আরো সুন্দর ভাবে বলছেন *যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্। যোহস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্।।৮/৩/৩।* এই সংসার তাঁতেই অবস্থিত, তাঁর সত্তাতেই এই সংসার দেখা যাচ্ছে, তিনি আছেন বলেই এই সংসারকে ভাসমান দেখা যাচ্ছে, তিনি না থাকলে এই সংসার প্রতীতিই হত না। এই পুরো জগৎ জুড়ে তিনিই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সব শেষে বলছেন '*য ইদং*' তিনিই সব কিছু হয়েছেন, কিরকম – এক গ্লাশ জল নিয়ে আর তাতে যদি দুটো বরফের কিউব দেওয়া হয়, তখন আমরা বলব এই বরফটা জলেই আছে, এই জল আছে বলে বরফটা দেখা যাচ্ছে, জলটায় বরফে ব্যাপ্ত রয়েছে, আর শেষে জলটাই বরফ। তিনি আর তাঁর যে সৃষ্টি এই দুইএর মধ্যে জল আর বরফের মত সম্পর্ক।

এইভাবে অনেক স্তব করতে করতে একটি শ্লোকে আমরা গীতার একটা মত পাই যেখানে বলছেন – *গুণারণিচ্ছন্নচিদূষ্মপায় তৎ ক্ষোভবিস্ফূর্জিতমানসায়। নৈষ্কর্ম্যভাবেন বিবর্জিতাগম স্বয়ংপ্রকাশায় নমস্করোমি।।৮/৩/১৬।* যাঁরা বিবেকী পুরুষ তাঁরা কর্মসন্ন্যাস আর কর্ম সমর্পণ দ্বারা যখন নিজের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করে নেন তখন তাঁরা যে কৈবল্য মুক্তি লাভ করেন সেই মুক্তি দেবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। এখানে এসে ভাগবত উপনিষদের মত থেকে একটু সরে গেল। উপনিষদে সেই স্বয়ং প্রকাশাত্মা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে আছেন। অজ্ঞানের আবরণ সরে গেল আপনি আবার নিজের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে গেলেন। কিন্তু এখানে বলছে যার কর্মসন্ন্যাস আর কর্ম সমর্পণ করে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে গেছে এখন তার যে কৈবল্য মুক্তি, তার যে পূর্ণ মুক্তি সেটা ভগবান নিজে দেন। কেন দেন? ভগবান হচ্ছেন নিত্য মুক্ত, যিনি নিত্য মুক্ত তিনিই মুক্তি দিতে পারেন। জেলে অনেক কয়েদী আছে, তাদের সবারই হাত পা বাঁধা, তারা অপর কয়েদীকে কি করে মুক্ত করবে! মুক্ত আপনাকে তিনি করতে পারবেন যিনি নিজে মুক্ত। গজেন্দ্র বলছে সেই নিত্য মুক্ত প্রভুকে আমি প্রণাম করি। প্রভু সবাইকে মুক্তি দেন না। তবে তিনি কাকে মুক্তি দেন? যিনি কর্মসন্ন্যাস করেছেন আর কর্ম সমর্পণ করেছেন। কর্মসন্ন্যাস মানে, তার আর কোন কাজ করার স্পৃহাটাই নেই। বাড়িতে যেদিন প্রিয় কেউ মারা যায় সেদিন কারুর কোন কাজ করার ইচ্ছে হয় না। কিন্তু এটাকে কর্মসন্ন্যাস বলা যাবে না। প্রিয়জন বিয়োগের শোকটা চলে গেলে আবার কোন প্রিয় লোক জুটে গিয়ে আবার কর্মের মধ্যে নেমে যাবে।

তারপর বলছে, যজ্ঞের কাঠের মধ্যে অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, ঠিক তেমনি যিনি তাঁর গুণ আর জ্ঞানকে মায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছেন, আর ঐ গুণগুলোর মধ্যে যখন একটু ক্ষোভ হয়, মানে একটু যখন নড়ে ওঠে তখন সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। যেমন জল, জলের মধ্য থেকে জলের উষ্ণতা নিয়ে নিলে জলটা হিম হয়ে গেল। নর্থ পোলে সবাই বরফ দিয়ে ঘর তৈরী করে, যাকে ইগলু বলে। রাজস্থানের কোন লোককে

যদি বলা হয় জানো আইসল্যাণ্ডে জলের ঘর দেখলাম, তারা তো অবাক হয়ে ভাববে জলের ঘর আবার কি করে হবে! আসলেতো জলেরই ঘর, জলটাই বরফের আকার ধারণ করেছে। জলের উপরে জলের ঘর বললে লোকে পাগল বলবে, কিন্তু আইসল্যাণ্ডে তো তাই। এটাই ঈশ্বরীয় লীলা। তাঁরই গুণে যখন ক্ষোভ হয় তখন এই সৃষ্টিটা হয়। এই সৃষ্টিটা কোথায় আধারিত? সেই ভগবানেরই উপরে। তিনি নিজেই এই সৃষ্টিটা হয়েছেন, তাঁর মধ্যেই সৃষ্টিটা, সৃষ্টিতে তিনিই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, সৃষ্টির বাইরেও তিনি।

গজেন্দ্র কৃত ভগবানের এই স্তুতির মধ্যে দিয়ে ভগবানের তত্ত্বটা বেরিয়ে আসছে। সেই স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা থেকেই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর সব প্রকট হচ্ছে। ভগবান ছাড়া যদি কিছু না হয় তাহলে সবই তো তিনিই, তাঁর থেকেই সব হয়েছে। এই তত্ত্বটা আইসল্যাণ্ডে বরফের উপরে বরফের বাড়ি, বরফের রাস্থা এই উপমা দিয়ে বুঝলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বরফের উপর সব কাজ কর্ম চলছে, বরফ কোথা থেকে এসেছে? সেই জল থেকেই এসেছে। তিনিই আবার এই সৃষ্টির মধ্যে বার বার আসেন, সেই তিনি দেবতাও না, অসুরও না, মানুষও না, পশুপাখি নয়, স্ত্রী নয়, পুরুষ না, নপুংসক না ইত্যাদি। তিনি গুণ নয়, কর্ম নয়, কার্য নয়, কারণ নয়, এই সব বলে বলে সব কিছু যখন নিষেধ হয়ে যায়, তারপরে যা থাকে সেটাই তিনি। এটাই হচ্ছে বেদান্তের নেতি নেতি বিচার।

গজেন্দ্র যে স্তুতি করছেন, এই স্তুতি সাক্ষাৎ ভগবানের স্তুতি, এখানে কোন দেবতার স্তুতি করা হয়নি। যখন কোন অসুর বা দেবতারা তপস্যা করে তখন তাদের তপস্যায় দেখা যায় অমুক দেবতা বা ব্রহ্মা খুশী হয়ে বর দিতে হাজির হয়ে যান। কিন্তু এখানে যেহেতু শুধুমাত্র গুণ নির্বিশেষে ভগবানেরই আরাধনা করা হয়েছে তাই ভগবান নিজেই গরুড়ের পিঠে চেপে আবির্ভূত হলেন। ভগবান এসে গজেন্দ্র আর কুমির দুটোকেই এক সাথে ধরে জল থেকে তুলে ডাঙার উপরে নিয়ে এলেন। দেখছেন কুমিরের শক্ত চোয়ালের কামড়ে গজেন্দ্র ছটফট করছে তখন তিনি চক্র দিয়ে কুমিরের গলাটা কেটে দিলেন। কুমিরের গলাটা কেটে দিতেই কুমির একটা গন্ধর্ব হয়ে উড়ে চলে গেল। এই কুমির আগের জন্মে যখন গন্ধর্ব ছিল তখন তার নাম ছিল হুহু। আগেকার দিনে এইসব হাহা, হুহু নাম ছিল। একজন ঋষিরও নাম ছিল হুহু। এই কুমিরও হয়তো কোন অভিশপ্ত ঋষি ছিল। স্বয়ং ভগবান তাঁর চক্র দিয়ে গলাটা কেটে দিতেই তার অজ্ঞান বন্ধনটা কেটে যাওয়াতে সে মুক্ত হয়ে গেল। স্বয়ং ভগবানের হাতে মারা গেছে বলে সে ভগবানের সারূপ্য, মানে পীতাম্বরধারী চতুর্ভুজ রূপ পেয়ে গেল। কুমির যোনিতে এতদিন সে কষ্ট করেছে, আর ভগবান নিজে এসে তাকে বধ করেছেন, আর মরার সময় সে ভগবানের দিব্যোজ্জ্বল রূপ দর্শন করার জন্য সে ভগবানের রূপটা পেয়ে গেল।

কুমিরের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পর গজেন্দ্রের পূর্বজন্মের অনেক কিছু প্রকাশ হতে লাগল। গজেন্দ্র আগের জন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে এক রাজা ছিল। কোন এক সময় তার মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হলে সে সব কিছুর মায়া মমতা ত্যাগ করে এক জঙ্গলে নদীর ধারে ধ্যান ধারণায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। কোন এক সময়ে ওই পথ দিয়ে অগস্ত্য ঋষি যাচ্ছিলেন। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে দেখেই বুঝতে পারেন আসলে এই তপস্বী একজন রাজা। অগস্ত্য মুনি দেখছেন রাজা হয়ে কোন রাজকার্য্য না করে এখানে বসে তপস্যা করছে আর আমি এখান দিয়ে যাচ্ছি আমার কোন অতিথি সৎকারও করছে না। তুমি গৃহস্থ উপরন্তু রাজা, তোমার কাজ অতিথি সেবা করা, বর্ণধর্ম পালন করা, কিন্তু কোন ধর্ম পালন না করে তপস্যা করে যাচ্ছে! অগস্ত্য খুব রেগে গেছেন। রেগে গিয়ে তিনি বলছেন 'এর তো দেখছি হাতির মত বুদ্ধি, যাও হাতি যোনিতে গিয়ে জন্ম গ্রহণ কর'। বাইবেলে Twenty Talents এর বিখ্যাত গল্প আছে। দুই চাকর ছিল একজন খুব কর্মঠ, আরেকজন খুব ফাঁকিবাজ। একবার মালিক দুজনকেই কুড়িটা করে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বলছেন এক বছর পরে আমি এই স্বর্ণমুদ্রা ফেরৎ নেব। এক বছর পর মালিক এসেছে। প্রথম জন বলছে 'হুজুর আপনার এই টাকাটা নিয়ে একটা কাজে লাগিয়েছিলাম, এখন সেটা কুড়ি থেকে তিরিশ হয়ে গেছে। মানে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মুনাফা হয়েছে'। মালিক শুনে খুব খুশি হয়ে বলছেন 'তুমি নিজে খেটেছ, তাই তুমি পুরোটাই রেখে দাও'। তারপর দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলছে 'হুজুর আপনার টাকা কিনা, তাই টাকাটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তাই খুব সামলে

সুমলে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দিয়েছি’। মালিক বলছেন ‘আসলে তুমি একটা অলস, কুঁড়ে, নিষ্কর্মা। তোমার এই কুঁড়েমির জন্য কিছু করতে পারোনি, এক্ষুণি ফেরত দাও ঐ টাকা’। এই বলে কুড়িটা স্বর্ণমুদ্রা ফেরত নিয়ে নিলেন। যিশু এই গল্পটা বলে বলছেন – যখন যাকে যেটা দেওয়া হয়েছে সে যদি ওটা কাজে না লাগায় তাহলে তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হয়। যে কাজে লাগায় তাকে পুরোটাই দিয়ে দেওয়া হয়।

ভাগবতে সন্ন্যাস ধর্মের খুব একটা প্রশংসা নেই। গৃহস্থ ধর্মের কর্তব্যগুলোর দিকে ভাগবত বেশি জোর দিয়েছে। অতিথি সেবা করা, সাধুসেবা করা, দান করা, স্বধর্ম পালন করা এগুলোর উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। অগস্ত্য ঋষির অভিশাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন হাতি হয়ে গেল। এই হাতি হওয়ার পর যখন ভগবানের স্তুতি ও আরাধনার ফলস্বরূপ ভগবানের দর্শন লাভ করল তখন তার পূর্ণ মুক্তি হয়ে গেল। গজেন্দ্রকে ভগবান বলছেন *যে মাং স্তুবন্ত্যনেনাঙ্গ প্রতিবুধ্য নিশাত্যয়ে। তেষাং প্রাণাত্যয়ে চাহং দদামি বিমলাং মতিম্।।৮/৪/২৫।* হে প্রিয় গজেন্দ্র! যে ব্রাহ্মমুহুর্তে জাগরিত হয়ে তোমার কৃত স্তুতি দ্বারা আমার বন্দনা করবে তাকে মৃত্যুর সময় আমি নির্মল বুদ্ধি দিয়ে দেব। সূর্যোদয়ের এক ঘন্টা আগের সময়কে ব্রাহ্মমুহুর্ত বলে, এই ব্রাহ্মমুহুর্তেই সমস্ত দেবালয়, মন্দিরে বিগ্রহের মঙ্গলারতি করা হয়, ভগবান বলছেন ব্রাহ্মমুহুর্তে উঠে তুমি যে স্তুতি করলে এটাকে যে নিয়মিত পাঠ করবে তাকে আমি মৃত্যুর সময় নির্মল বুদ্ধি দিয়ে দেব, অর্থাৎ তার মৃত্যু ভয় থাকবে না। এই হল চতুর্থ মনু।

সমুদ্র মন্থনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য

পঞ্চম মনুর নাম রৈবত। ষষ্ঠ মনু ছিলেন চাক্ষুস। ষষ্ঠ মণ্বন্তরে অজিত নামে ভগবান অংশাবতার রূপ গ্রহণ করেছিলেন। পরে এই ষষ্ঠ মনুতেই অংশ অবতার থেকে ভগবান কূর্ম রূপ ধারণ করেছিলেন। কুর্মের কথা শুনে পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞেস করছেন ‘ভগবান কেন কচ্ছপ রূপ ধারণ করেছিলেন, এর কাহিনীটা আমাকে একটু বলুন’। এখানেই আসে বিখ্যাত সমুদ্র মন্থনের কাহিনী।

বলিরাজ যখন সব দিক দিয়ে খুব ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তখন অসুরদের থেকে দেবতাদের উপর প্রায়শই আক্রমণ হত। বলিরাজার সঙ্গে দেবতারা কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না। দেবতারা তখন সবাই মিলে ব্রহ্মা, মহেশের কাছে নিজেদের দুঃখ-কষ্টের কথা নিবেদন করবার জন্য গেছেন। ব্রহ্মা ও মহেশ বলে দিলেন, বলিরাজকে ঠাণ্ডা করা আমাদের দ্বারা হবে না, তোমরা ভগবানের কাছে যাও। ভগবান নারায়ণের কাছে দেবতারা গিয়ে তাঁদের উপর অসুরদের নির্যাতনের প্রতিকারের আর্জি জানিয়েছেন। ভগবান নারায়ণ তখন দেবতাদের বলছেন *যাত দানবদৈতেয়ৈস্তাবৎ সন্ধির্বিধীয়তাম্। কালেনানুগৃহীতৈস্তৈর্যাবদ্ বো ভব আত্মনঃ।।৮/৬/১৯।* ‘হে ব্রহ্মা, মহেশ ও দেবতাগণ! অসুরদের উপর এখন কালের কৃপা চলছে। যতদিন না তোমাদের ভাগ্যের অভ্যুদয় আর উন্নতির অনুকূল সময় না আসে ততদিন তোমরা অসুরদের সঙ্গে চুপচাপ সন্ধি করে নাও’। এই ধরণের কৌশল রাজনীতিতে হামেশাই অবলম্বন করা হয়। মাও সে তুঙের রেডবুকে গরিলা যুদ্ধের কথা আছে। গরিলা যুদ্ধে বলছে শত্রুপক্ষ তোমাকে আক্রমণ করে দিয়েছে আর তখন যদি দ্যাখো এই মুহুর্তে শত্রুর সাথে লড়াই করার মত ক্ষমতা তোমার নেই, তুমি তখন সব ছেড়ে আগে পালাও। আগেকার দিনে যখন যুদ্ধ হত তখন রাজারা যুদ্ধে সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিত। কিন্তু মাওবাদীরা তা নয়। মাওবাদীদের নীতি হল আগে পালাও, শেষ পর্যন্ত মাওবাদীদের ধরতে না পেরে পুলিশের অকথ্য অত্যাচার গ্রামের নিরীহ লোকগুলোকে সহ্য করতে হয়।

ভগবান দেবতাদের বলছেন, তোমাদের সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে, তোমরা এখন সন্ধি করে শান্তিতে থাক। *অহিমূষকবদ্ দেবা হ্যর্থস্য পদবীং গতৈঃ। অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ ক্রিয়তামবিলম্বিতম্।।৮/৬/২০।* আর বড় কাজ যখন করতে হয় তখন শত্রুর সাথে একটু বন্ধুত্ব রেখে চলতে হয়। কি রকম সেই বন্ধুত্বটা? বলছেন ‘*অহি মুষকবৎ*’। ‘*অহি মুষকবৎ*’ মানে সাপ আর ইঁদুরের মত। এটি খুব প্রাচীন প্রচলিত কাহিনী। সাপুড়েদের সাথে অনেক রকমের টুকরি থাকে, যার মধ্যে সাপকে বন্দী করে রাখা হয়। একবার একটা টুকরির মধ্যে একটা ছোট ইঁদুর ঢুকে পড়েছে। সাপের মুখে পড়ে গিয়ে ইঁদুরতো ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। তখন

সাপটা ইঁদুরকে বলছে ‘তুমি ভয়-টয় ছাড়ো, এসো আমরা দুজনে বন্ধুত্ব করে নিই, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমাকে আমি খাবো না, তার বিনিময়ে এই টুকরিটাকে তোমার দাঁত দিয়ে ছেঁদা করে দাও। ছেঁদা হয়ে গেলে আমরা দুজনেই পালিয়ে যাব’। ইঁদুরটা দাঁত দিয়ে ছেঁদা করে দিল, যেমনি ছেঁদা হয়ে গেল তক্ষুণি সাপ ইঁদুরটাকে খেয়ে নিয়ে ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সাপের পেটও ভরল আর মুক্তিও পেল। এই গল্প কে বলছেন? সাক্ষাৎ ভগবান। কাকে বলছেন? দেবতাদের বলছেন। ভগবান বিষ্ণু এই ধরণের বুদ্ধি দিচ্ছেন ইন্দ্রকে। অথচ দেবতা আর অসুররা ভাই ভাই। দুজনের পিতা এক, দুজনের মা সম্পর্কে দুই সহোদরা। সেই দেবতাদের ভগবান পরামর্শ দিচ্ছেন সাপের মত কৌশল অবলম্বন করতে। আগে অসুরদের দিয়ে ইঁদুরের মত ছেঁদা করে নাও। তারপর অসুরদের গিলে নিয়ে সেই ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে যাও। এছাড়া তোমাদের গতি নেই।

এটাই রাজনীতি। আমাদের দেশে যে মুসলমানরা এতদিন রাজত্ব করে গেছে তার কারণ আমাদের দেশের রাজারা বিশেষ করে রাজপুত রাজারা মহা বোকা ছিল। তারা রাজনীতির কিছুই জানত না। নিজেরা মরত, বাড়ির লোকগুলিকেও মারার বন্দোবস্ত করে দিত। আর ভাই ভাইয়ের ঝগড়া কখনই মেটাবে না। মুসলমানের দাসত্ব করবে তবু ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার মিমাংসা করবে না। স্বামীজী বলছেন প্রত্যেক দেশের একটা বিশেষ রোগ থাকে, ভারতের রোগ নিজেদের পরিবারের মধ্যে, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে হিংসার ভাব। এই নিয়ে কিছুদিন আগে সুইট্জারল্যাণ্ডের একজন নামকরা শিল্পপতি একটা প্রবন্ধে বলছেন – নতুন কোন বিরাট ভালো আইডিয়া যদি আপনার কোন শত্রুপক্ষের কাছে থাকে, যে আইডিয়ার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা সারা বিশ্বে আলোড়ন এনে দিতে পারে, সেই আইডিয়াটাকে যদি বরবাদ করতে হয় তাহলে দুজন প্রতিভাশালী ভারতীয়কে কায়দা করে ওই আইডিয়াকে কার্যে রূপান্তর করতে লাগিয়ে দিন, দেখবেন ঐ আইডিয়ার ঐখানেই মৃত্যু হয়ে যাবে। বলছেন - দুজন এমন তর্ক বিচার যুক্তি দিতে থাকবে যে শেষে হাতাহাতি হয়ে পুরো প্রকল্পটার ইতি হয়ে যাবে। তিনি বলছেন, তার সারা কাজ তিনি ভারতীয়দের দ্বারাই করান। কিন্তু দুজন বুদ্ধিমান ভারতীয়কে যদি রেখে দেওয়া তাহলে আর দেখতে হবে না। কোন পরিকল্পনাই সাফল্যের মুখ আর দেখবে না। শুধু তাই না, রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসেই আছে, স্বামীজী বিদেশে গিয়ে এত কিছু করলেন, অথচ দেশে ফিরে আসবার আগেই তার নিজের লোকেরাই লিফ্লেট ছাপিয়ে বলে দিলেন, নরেন অতি বাজে লোক, ওর কথাতে একদম বিশ্বাস করবেন না। এই রোগটা যে শুধু বাঙ্গালীদের মধ্যেই আছে তা নয়, সারা ভারতের জাতীয় রোগ হল স্বজাতির প্রতি হিংসা ভাব।

ভগবান তো দেবতাদের বুদ্ধি দিয়ে দিলেন – এখন ফাক্কা রোখ করে রাগারাগি করতে যেও না, শান্তি ভাব বজায় রেখে কিছু দিন চালাও। আর ইতিমধ্যে যত রকমের ওষধি গাছপালা আছে এগুলো সব সমুদ্রে ফেলতে থাক। তারপর সমুদ্রকে মন্থন কর। মন্থন করলে সমুদ্র থেকে অমৃত বেরোবে, অমৃত বেরোলে তখন সেটা তোমরা নিয়ে নেবে। তা তোমাদের দ্বারা এগুলো অত সহজে হবে না, আমি তোমাদের সাহায্য করব। ঠাকুর আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা গেছেন এক জায়গায় নিমন্ত্রণে। সেখানে তাঁদের খেতে দিয়েছে এক নোংরা জায়গায়। রাখাল রেগে গিয়ে বলছে ‘চলুনতো মশাই দক্ষিণশ্বরে ফিরে যাই’! ঠাকুর বলছেন ‘পয়সা নেই, ফাক্কা রোখ, আর এখন দক্ষিণেশ্বরে গেলে কে খেতে দেবে’?

ভগবান বিষ্ণুর কথা মত দেবতারা সেখান থেকে বলি রাজার কাছে গেলো। বলিতো দেবতাদের দেখে অবাক। যাই হোক দেবতারা সন্ধি করে অসুরদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিল। শান্তি ফিরে এল। কিছুদিন পর দেবতারা অসুরদের বলল চলো ভাই আমরা সমুদ্র মন্থন করব। অসুররা রাজি হয়ে গেল। এখন সমুদ্র মন্থন কি করে হবে? সমুদ্র মন্থন করতে মন্দর পর্বতকে প্রয়োজন। দেবতা অসুর সবাই মিলে চলল মন্দর পর্বতকে নিয়ে আসতে। বহু কষ্টে মন্দার পর্বতকে ভালোই নিয়ে আসছিল, কিন্তু কিছু দূর এসে পর্বত গেল পড়ে। এদের সেই তাগদ নেই যে এই পাহাড়কে আবার তুলে নিয়ে আসে। তখন ভগবান গরুড়ের পিঠে করে এসে খেলার ছলে পুরো পাহাড়টা হাতের তালুতে তুলে নিলেন। পাহাড়কে সমুদ্রের মধ্যে রাখা হল। পাতাল লোক থেকে বাসুকিকে নিয়ে তাকে দড়ি করা হল। দেবতারা সাপের মুখের দিকটা ধরেছে, এটাও ভগবান দেবতাদের বলে

দিয়েছিলেন। অসুরদের সাপের লেজের দিক ধরতে দেওয়াতে তাদের আত্মসম্মানে লেগেছে। অসুররা বলছে সাপের লেজ অশুভ অঙ্গ, আমরা কেন লেজ ধরতে যাব, আমরা মুখের দিকটা ধরব। দেবতারাও এটাই চাইছিল। তারা বলল ঠিক আছে তাই নাও। আসলে ভগবান জেনেবুঝেই একটা কায়দা করে রেখেছিলেন, কেননা বাসুকির মুখ থেকে সব সময় বিষ নির্গত হতে থাকে।

এবার পুরো দমে মন্থন শুরু হয়ে গেছে। বাসুকিকে দড়ি করে পেঁচিয়ে মন্দর পর্বতকে ঘোরানো শুরু হল। একটু ঘোরাতেই পাহাড়ের ঘোরার গতি প্রচণ্ড বেড়ে গেল, আর তাতেই পুরো পাহাড়টা সমুদ্রের নীচের দিকে বসে যেতে শুরু করেছে। পাহাড় যদি নীচে বসে যায় তাহলে আর মন্থন হবে কি করে। তখন ভগবান বিষ্ণু কচ্ছপ হয়ে পাহাড়ের তলায় নিজেকে স্থাপন করলেন, তার মানে পুরো পাহাড়টাকে নিজের পিঠের উপর ধারণ করলেন। সে বিরাট আকারের কচ্ছপ। বলছেন যখন পুরো মন্থন শেষ হয়ে গেছে তখন কচ্ছপের মনে হল কেউ যেন তার পিঠটা চুলকে দিয়েছে। ভগবানের কী অসীম ক্ষমতা, মানুষ যাতে ভগবানের ক্ষমতা ধারণা করতে পারে তারই জন্য এইভাবে কাহিনীগুলি বলা হয়।

আসলে এখানে ভগবানের লীলা কাহিনীকে রূপক করে ভগবানের তত্ত্বটা বলে দেওয়া হয়েছে। ভগবান এখানে চারটে রূপ এক সঙ্গে ধারণ করে তাঁর ঐশী শক্তির মহিমাকে প্রকাশ করেছেন। অসুরদের মধ্যে আসুরিক বল ও শক্তি রূপে, দেবতাদের মধ্যে তিনি দৈবীশক্তি রূপে, বাসুকির মধ্যে নিদ্রা রূপে, যাতে তার ক্লান্তি না আসে আর সমুদ্রের মধ্যে কচ্ছপ হয়ে আধার রূপে নিজের মহিমাকে প্রকাশ করে অমৃতত্বকে জগতের মাঝে নিয়ে এলেন। ভগবান ইচ্ছে করলে অনেক জায়গায় অনেক রূপে থাকতে পারেন। শুধু তাই না, তিনি শরীর ধারণ করে কচ্ছপ রূপে আছেন আবার অন্য দিকে তিনি দেবতাদের দিকে তাদের হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন, উনিতো জানতেন যে দেবতাদের মধ্যে শারীরিক বল নেই, দুধ আর মধু পান করে কত আর জোর হবে! অসুররা গরুর মাংস থেকে শুরু করে সব ধরণের মাংস খেয়ে গায়ের জোর বাড়িয়ে নিয়েছে।

এখানে খুব একটা সুন্দর শ্লোকের মাধ্যমে বলছেন *উপর্যগেন্দ্রং গিরিরাড়িবান্য আক্রম্য অস্তেন সহস্রবাহুঃ। তস্থৌ দিবি ব্রহ্মভবেন্দ্রমুখৈরভিষ্টুবদ্ভি সুমনোহভিবৃষ্টঃ।।৮/৭/১২।* ঘোরার ফলে মন্দর পর্বত প্রথমে বসে যাওয়াতে ভগবান সমুদ্রের তলায় কচ্ছপ হয়ে পর্বতকে ধারণ করলেন। কিন্তু তারপর মন্দর পর্বত ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আসছে দেখে ভগবান সহস্রবাহু দিয়ে পর্বতের উপরিভাগকে চেপে ধরে রেখছেন, চেপে না রাখলে ঘোরার শক্তি আসবে না। আসলে পাহাড়তো কতকগুলি পাথরের সমাবেশ, একটু নাড়া দিলেই পাথর আলগা হয়ে ধসে যাব। তাই ভগবান তাঁর সহস্রবাহু দিয়ে দৃঢ় করে পাহাড়ের উপরিভাগকে ধরে রাখলেন। ভগবানের এই অভূতপূর্ব কাণ্ড দেখে আকাশ থেকে তখন ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করলেন।

মন্থন শুরু হয়ে গেল। প্রথম বেরিয়ে এলো হলাহল, বা কালকূট। কালকূট বেরিয়ে আসতেই সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কারণ এই বিষের এমন ক্ষমতা যে জগতের সমস্ত কিছুকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পারে। বিষ্ণু সবাইকে তখন বলছেন 'এই বিষকে গ্রহণ করতে পারেন একমাত্র ভগবান শিব, তোমরা সবাই শিবের কাছে যাও'। মন্থন কার্য বন্ধ করে সবাই ছুটলো শিবের কাছে। শিবকে প্রণাম এবং খুব সুন্দর স্তুতি করে সবাই বলছেন 'হে প্রভু, আপনি যদি এই বিষ ধারণ না করেন তবে এই সৃষ্টি আর থাকবে না, সব শেষ হয়ে যাবে'। শিব তখন পার্বতীকে বলছেন, 'পার্বতী দেখ, যে কোন কারণেই হোক এই মহাকালকূট বেরিয়ে এসেছে আর এই কালকূটের দরুণ সমস্ত প্রজাকুল, সমস্ত প্রাণী জগতের কি কষ্টই না উপস্থিত হয়েছে, এরা কোন ভাবেই এই বিষের জ্বালা সহ্য করতে পারছে না। *আসাং প্রাণপরীপ্সূনাং বিধেয়মভয়ং হি মে। এতাবান্হি প্রভোরর্থো যদ্ দীনপরিপালনম্।।৮/৭/৩৮।* এখন আমার কর্তব্য হচ্ছে এদেরকে নির্ভয় দেওয়া, এই কষ্টদায়ক জ্বালা থেকে সমস্ত প্রাণীকুলকে রক্ষ করা আমার কর্তব্য। *এতাবান্হি প্রভোরর্থো যদ্ দীনপরিপালনম্* প্রভু যারা, যাঁদের ভগবান ক্ষমতা দিয়েছেন, তাঁরা ভগবানের সেই ক্ষমতা দিয়ে দীন দুখী যারা তাদেরকে পালন

করবেন। এই সেবা ভাবই ভারতের আদর্শ। আমাদের মধ্যে যেটুকু ক্ষমতাই থাকুক না কেন, সেটা ঈশ্বরেরই শক্তি, সেই শক্তি দিয়ে অপরের সেবা করে ভগবানের সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করাটাই ধর্ম। ভগবান যাদের অনেক টাকা পয়সা দিয়েছেন, তাদের ধর্ম হল গরীব-দুখী, আর্ত, পীড়িতদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা। যাকে ভগবান বিদ্যা বুদ্ধি দিয়েছেন সেই বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে কিছু মুর্খকে বিদ্যা দান করাতেই বিদ্যার প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয়। ভগবান আমাদের যা কিছু অতিরিক্ত শক্তি বা ক্ষমতা দিয়েছেন তার কারণ এই একটাই – অপরের সেবা করবার জন্য, সকলের মঙ্গলার্থে ভগবানের শক্তিকে কাজে লাগানোই মানুষের প্রকৃত ধর্ম।

ভগবান শিব বলছেন *প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ। বদ্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেষ্বাত্মমায়য়া।।৮/৭/৩৯।* যারা ঠিক ঠিক সৎ পুরুষ তাঁরা অপর প্রাণীর কল্যাণের জন্য নিজের প্রাণটুকুও ত্যাগ করে দিতে প্রস্তুত থাকেন। কেননা যাকে বাঁচাতে যাচ্ছেন সেতো একটা ক্ষুদ্র জীব, তার মন এখন দেহের উপর, প্রাণের উপর পড়ে আছে, আর যিনি সৎ পুরুষ তিনি তো সেই দেহ, মন, প্রাণের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসেছন, সেইজন্য তাঁদের দেহ মন প্রাণকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করে দেওয়াটাই মহৎ ধর্ম। রিক্সাওয়ালাকে বা ট্যক্সিওয়ালাকে দু পাঁচ টাকা বেশি দিয়ে দিলে কি আর হবে, আমার আপনার কাছে দু পাঁচ টাকার হয়তো কোন মূল্য নেই কিন্তু তার কাছে ওই দু-পাঁচ টাকাই অনেক। সেইজন্য আমাদের ভাবতে হবে কাকে আমি কোন্ জিনিষ দেব? তাকেই দেওয়া উচিৎ, যার কাছে ঐ জিনিষটার মূল্য আছে। একজন সন্ন্যাসীকে আমি পাঁচ টাকা প্রণামী দিলাম। তাতে সন্ন্যাসীর কি হবে? কিছুই হবে না, কেননা সন্ন্যাসীর কাছে এই টাকার কোন মূল্য নেই, আমার একটু পূণ্য হল এই যা। কিন্তু একজন রিক্সাওয়ালাকে যদি পাঁচ টাকা বেশী দিয়ে দিই তাহলে দুটোই হল, তারও কাজে লাগল আর আমার পূণ্যও হল। ভগবান শিব এখানে এই কথাই পার্বতীকে বোঝাতে চাইছেন।

এইসব বলে শিব ঐ কালকূট পান করে নিজের কণ্ঠের মধ্যে ধারণ করে নিলেন। তাঁর গলায় ঐ পুরো বিষটা আশ্রয় নেওয়ার জন্য ভগবানের কণ্ঠের রঙ নীল হয়ে গেল। ভগবান শিবের তাই নাম হয়ে গেল নীলকণ্ঠ। তখন শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন *তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ। পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ।।৮/৭/৪৪।* পরোপকারী মানুষ যখন অপরের দুঃখ নিবারণ করার জন্য তার দুঃখটাকে নিজের মধ্যে টেনে নেন, প্রকৃত পক্ষে তখন সেটা তাঁর কাছে দুঃখও নয়, কষ্টও নয়। তাহলে সেটা কি? ঐ যে হতদরিদ্র, ক্ষুধা ব্যধিতে জর্জরিত লোকগুলির হৃদয়ে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ বাস করছেন, এদের দুঃখ লাঘব করাটাই সেই অখিলাত্মা নারায়ণের আরাধনা। আপনি রাস্থা দিয়ে যেতে যেতে দেখছেন একটা গরীব লোক রাস্থায় শীতে কষ্ট পাচ্ছে, দেখে আপনার করুণা হল। আপনি আপনার গায়ের চাদরটা ওর গায়ে চাপিয়ে দিলেন। বাড়ি যাওয়ার পথটুকু আপনি হয়তো ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবেন। বাড়িতে এসে আপনি অন্য একটা চাদর গায়ে দিয়ে নিলেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হবে ঐ গরীব লোকটার কষ্ট দেখে আপনি ওর কষ্টটা নিয়ে আপনি কষ্ট পেলেন। কিন্তু ভাগবত বলছেন – না তা কেন হবে! এটা কোন কষ্টের ব্যাপার নয়, সেই ভগবান যিনি ঐ দুখী মানুষের মধ্যে বসে আছেন, এটাই তাঁর পূজা। ঠিক ঠিক যাঁরা সেবা করেন তাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই করেন। মঠ মিশন থেকে যখন সাধু ও ভক্তরা ত্রাণের কার্যে যান তখন তাঁরা কি লোকেদের ভিক্ষা দিতে যান? কখনই এই মনোভাব নিয়ে যান না, তাঁরা ভগবানের পূজা করার মনোভাব নিয়েই ত্রাণ কার্যে যান। এখন যদি আপনি পূজা ভাব নাও আনতে পারেন, শুধু দান করতে চাইছেন, তবে তাই করুন, কিছু না করার থেকেও এটা ভালো। ঠিক ঠিক আরাধনা তখনই হবে যখন আপনি দেখবেন যে তার মধ্যে যে সর্বভূতান্তরাত্মা ভগবান নারায়ণ আছেন আমি তাঁরই পূজা করছি।

এবারে যখন ভগবান শিব বিষপান করতে শুরু করেছেন তখন বিষের দুই এক ফোঁটা মাটিতে পড়ে গেছে। মাটিতে যখন পড়ে গেল, তখন যত সাপ বিছের মত বিষাক্ত প্রাণী ছিল তারা সেই বিষটা গ্রহণ করে নিল, আর তারপর থেকেই এরা খুব বিষাক্ত হয়ে গেল। আগে এইসব প্রাণীরা নাকি বিষাক্ত ছিল না।

পরীক্ষিতের যে তক্ষক সাপের দংশনে মৃত্যু হবে সেই সাপের আগে কোন বিষ ছিল না। সমুদ্র মন্থন হওয়ার পর থেকেই এদের বিষ এসেছে।

সমুদ্র মন্থনে প্রথমেই কালকূট বেরিয়ে আসার পেছনে সাধকের সাধনার প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতার এক গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। এর তাৎপর্য আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে বুঝতে পারব না। বাল্মীকি রামায়ণেও এই সমুদ্র মন্থনের কথা আছে। ধ্যানের মাধ্যমে মন যতক্ষণ অন্তর্মুখী না হয় ততক্ষণ সমুদ্র মন্থনের তাৎপর্য বোঝা খুব মুশকিল। মানুষ যখন ঠিক ঠিক প্রথম জপ-ধ্যানের অনুশীলন শুরু করে তখন আমাদের ভেতরেও ঠিক এই সমুদ্র-মন্থন থেকে কালকূট বেরিয়ে আসার মত ব্যাপার ঘটে। অবশ্য জপ ধ্যান বলতে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে সকাল বিকেল একশো আট বার কি হাজার জপ করার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। জপ ধ্যান অনেক উচ্চস্তরের ব্যাপার। আধ্যাত্মিকতার মূল লড়াইটা শুরু হয় যখন মানুষ সত্যিকারের ধ্যান করতে আরম্ভ করে। রাজযোগে পতঞ্জলী এর খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, যখন সাধক ধ্যান করতে শুরু করে তখন মনে হাজার রকমের বৃত্তি উঠতে থাকে, সাধক যখন এই বৃত্তিগুলিকে সরিয়ে উল্টো বৃত্তির প্রবাহ দিতে যাবে তখন আসল লড়াইটা আরম্ভ হয়। এটাই মনের গহন সমুদ্রের মন্থন।

মন হল সমুদ্র, সেই সমুদ্র মন্থনে ইষ্ট যিনি তিনিই হলেন মন্দর পর্বত, বাসুকি রূপ ইষ্টমন্ত্র ইষ্টকে ঘিরে রেখেছে, যার একদিকে আছে নিত্য-অনিত্য রূপ বিচার বৃত্তি অন্য দিকে আছে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার রূপ বৃত্তি সমূহ। সাধনার প্রথমের দিকে কিছুই হবে না। কিন্তু যখন ঠিক ঠিক মন্থন শুরু হবে, তখন প্রথমেই অবশ্যম্ভাবি ভাবে কালকূট নামক ভয়ঙ্কর বিষ বেরিয়ে আসবে। আধ্যাত্মিক পথের যে কোন সাধকের যখন সত্যিকারের সাধনা শুরু হয়, প্রথমেই তার ভেতরের বিষ, মানে মনের আবর্জনাগুলো বেরোতে শুরু করবে। জপ-ধ্যান করার সময় যার ভেতর থেকে মনের এই আবর্জনা যতক্ষণ না বেরিয়ে আসছে, বুঝতে হবে তার আধ্যাত্মিক সাধনা আদপেই শুরু হয়নি। যখন আবর্জনা বেরোতে থাকবে সাধক প্রথমে হতবাক হয়ে ভাববে আমার ভেতরে এত নোংরা চিন্তা, এত লোভ, এত ঘৃণা, এত হিংসা আছে! আমিতো আগে জানতাম না। সারা জীবনে যত হিংসা ভাব ছিল, সাত দিন ঠিক ঠিক জপ-ধ্যান করার পর যত হিংসা ভাব বেরোবে তার থেকে বেশি মনে হবে। যে জিনিষগুলো আমরা কল্পনা করতে পারি না, এমন এমন সব নোংরামি আমাদের মধ্যে জমে আছে, ঐ সময় যেন সব ঠেলে বেরিয়ে আসতে শুরু করে দেবে।

আধ্যাত্মিক সাধনার রাজ্যে এটাই হলাহল। শুধু উপমাই নয়, এটাই বাস্তব। এই কালকূটকে যে গুরুর কৃপায় হজম করে নিতে পারল, সেইই সাধনার পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম, তা নাহলে ওখানেই এই জীবনের মত সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে। এই কারণে দেখা যায়, যারাই জপ ধ্যান করে বেশির ভাগই বেশি দূর এগোতে পারে না, আর না হয় মহা খিটখিটে হয়ে যায়। মন্ত্র নিয়ে সাধনা শুরু করার পর ভেতরের সব বিষ বেরিয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়লে আর এগোবে কি করে, কারণ বিষ হজম করার ক্ষমতা নেই। এই কালকূটকে যদি সে গুরুর কৃপায় পার করে নিল তারপর তার একটার পর একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আসতে শুরু করে দেয়। কি ধরণের শক্তি? এই যেমন এখানে বলছেন উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, ঐরাবত হাতি, এই রকম নানা জিনিষ। সবার শেষে বেরিয়ে আসবে অমৃত। অমৃত মানে অমৃতত্ব, ঈশ্বর প্রাপ্তি। তার আগে যা বেরোবে এগুলো সব সিদ্ধাই। সিদ্ধাই মানে জাগতিক ও মহাজাগতিক কিছু অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা। সিদ্ধাইয়ের ক্ষমতার চমৎকারিত্বে আকৃষ্ট হয়ে যদি এর মধ্যে ফেঁসে যায় তাহলে আবার তার সাধনা এখানেই ইতি হয়ে গেল। প্রথমে বেরোবে আবর্জনা, তারপরে বেরোবে ভালো জিনিষ। আবর্জনাকে যদি পার করে দাও তাহলে বেঁচে গেলে, যদি ফেঁসে যাও তাহলে ওখানেই শেষ। আবার ভালো জিনিষের তৃপ্তিতে যদি মোহ এসে যায় তাহলেও সাধনা ওখানেই থেমে যাব আর সাধকও এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ফেঁসে গেল। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ঐ শেষটার জন্য। এটাই আধ্যাত্মিক সাধনার সমুদ্রে সমুদ্র মন্থন। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রমপর্যায়কে সাধারণ ভাবে বোঝানোর জন্য সমুদ্র মন্থনের এই আখ্যায়িকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সমুদ্র মন্থনের এ ছাড়া আর অন্য কোন তাৎপর্য নেই।

হলাহলের পর যখন উচ্চৈঃশ্রবা বেরোল তখন বলি রাজা বলল এই ঘোড়া আমি নেব। ভগবান আগেই দেবতাদের বলে দিয়েছিলেন 'দ্যাখো, অসুররা যা চাইবে দিয়ে দেবে, ওখানে কোন আপত্তি করতে যেও না'। তারপর যখন ঐরাবত বেরিয়েছে তখন ইন্দ্র বলল এই হাতি আমার কাছে রাখব। তারপর বেরোল কৌস্তভ, কৌস্তভ যখন বেরোল তখন নারায়ণ বললেন এই কৌস্তভ আমি নেব। এইভাবে কল্পবৃক্ষ বেরোল, কল্পবৃক্ষের পর অপ্সরারা বেরোল। তারপর সবার শেষে সমুদ্র মন্থন থেকে বেরিয়ে এলেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মানে সব কিছুর সৌন্দর্য, জগতের শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী। এই স্তরে যখন সাধক পৌঁছান, তখন এটাই সাধকের সব থেকে উচ্চতম অবস্থা, তখন মনে হয় আমি যেন পুরো জগতের স্বামী হয়ে গেলাম।

যাই হোক লক্ষ্মী বেরিয়ে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। লক্ষ্মী যখন বেরিয়েছেন তাঁকে কেউই গ্রহণ করতে পারলেন না। লক্ষ্মীও চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন যে আমি কাকে গ্রহণ করতে পারি, কে আমার উপযুক্ত। এখানে খুব সুন্দর শ্লোক আছে। বলছেন *নূনং তপো যস্য ন মন্যুনির্জয়ো জ্ঞানং ক্বচিৎ তচ্চ ন সঙ্গবর্জিতম্। কশ্চিন্মহাংস্তস্য ন কামনির্জয়ঃ স ঈশ্বরঃ কিং পরতোব্যপাশ্রয়ঃ।।৮/৮/২০।* অনেকে আছেন যাঁরা তপস্বী, ঋষি, মুনি কিন্তু এনারা এখনো নিজেদের ক্রোধকে জয় করতে পারেননি। লক্ষ্মীদেবী ভাবছেন তুমি সন্ন্যাসী, তুমি সাধক তোমার এখন ক্রোধের উপর জয় হয়নি তোমাকে বরণ করে আমি কি করব! কেউ কেউ আছেন যাঁদের মধ্যে প্রচুর জ্ঞান আছে কিন্তু এখনো অনাসক্ত হতে পারেননি। কেউ কেউ আছেন যাঁদের খুব প্রভাব আছে, প্রচুর কীর্তি আছে কিন্তু তাঁরা এখনও তাদের কামকে জয় করতে পারেননি। একটা প্রচল কথাই আছে যে বাঁশ যত বড় তার ফোঁকর তত বড়। যার যত বেশি নাম ডাক, আওয়াজ তার তত ঐদিকে বেশি গোলমাল। এটা যে আজকের কথা তা নয়, আমরা পুরাণেই এই কথা পাচ্ছি। অনেক তপস্যা করে যাচ্ছে কিন্তু ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধের বৃত্তি রয়েছে, জ্ঞানী, বিশাল জ্ঞান নিয়ে বসে আছে, কিন্তু আসক্তি আছে। তার অনেক নাম ডাক আছে, প্রভাব আছে কিন্তু ভেতরে অনেক কাম-বাসনা আছে। কারুর হয়তো প্রচুর ঐশ্বর্য আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরের আশ্রয় বা সাহায্য নিতে হচ্ছে। এই সব বলার পর বলছেন অনেকে খুব ধর্মাচরণ করে কিন্তু প্রাণীদের প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা নেই, কারুর প্রতি সহানুভূতির ভাব নেই। যত কটা খারাপ গুণের কথা বলা হল, এটা ভাবা উচিৎ হবে না যে এই দুর্গুণ গুলো শুধু গৃহী ভক্তদের মধ্যেই আছে, এর সব কয়টা দুর্গুণ অনেক গেরুয়াধারী সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অল্প বিস্তর পাওয়া যাবে। লক্ষ্মী সেইজন্য সবার থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

তারপর লক্ষ্মীদেবী বলছেন – কেউ কেউ আছেন যাদের খুব ত্যাগ আছে, কিন্তু শুধু ত্যাগ থাকলেই তো মুক্তি হয় না। এবারে অন্যদের সম্বন্ধে বলছেন – কারুর মধ্যে খুব শক্তি আছে, বিরাট শক্তিমান, কিন্তু তারা কালের অধীন, মানে সময় হলে তাদের এই শক্তিরও নাশ হয়ে যাবে। কিছু কিছু সত্যিকারের মহাত্মা আছেন যাঁদের মধ্যে সব গুণই আছে, ত্যাগী, অনাসক্ত, কামনা-বাসনা শূন্য, অক্রোধী, অহিংস, বিষয়াসক্তিশূন্য, কিন্তু তাঁরা সব সময় সমাধিতে লীন হয়ে আছেন। সমাধিলীন পুরুষকে নিয়ে আমি কি করব! আসলে বলতে চাইছেন যতক্ষণ তোমার সমাধি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার এই গোলমাল গুলো যাবে না। এত কিছু বলার পর লক্ষ্মীদেবী দেখছেন যে সবারই মধ্যে কিছু গুণ যেমন আছে, তার সাথে আবার অনেক দোষও আছে, সম্পূর্ণ রূপে দোষবিবর্জিত কোন পুরুষকেই তাঁর নজরে পাচ্ছেন না। সবার শেষে লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টি পড়েছে বিষ্ণুর প্রতি, লক্ষ্মী দেবী দেখছেন ইনিই একমাত্র পুরুষ যাঁর মধ্যে কোন গুণের অভাব নেই আর কোন দোষও দেখা যাচ্ছে না। বিষ্ণুর একমাত্র বৈশিষ্ট্য যেটা আর কারোর মধ্যে নেই, তা হল, তাঁর কোন দিকেই দৃষ্টি নেই, এমন কি লক্ষ্মীর দিকেও তাঁর কোন দৃষ্টি নেই। লক্ষ্মী তাঁর অনুগত হয়ে গেলেন।

তারপরে বারুণী বের হল। শেষে ধণ্বন্তরী অমৃত নিয়ে সমুদ্র থেকে উঠে এলো। যেই অমৃত উঠে এলো, সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যরা অমৃত পাত্র হস্তগত করে ফেলেছে, দেবতারা কোন সুযোগই পেলো না। অমৃত নিয়ে নেওয়ার পর অসুরদের নিজেদের মধ্যেই অন্তর্কলহ থেকে মারামারি শুরু হয়ে গেল। যারা শক্তিশালী তারাই ঐ অমৃতকে পান করবে বলে ছাড়ছে না। আর যারা দুর্বল তারা তখন আইনের দোহাই দিতে আরম্ভ করল – এ

ভারী অন্যায়, দেবতারাও তো আমাদের সঙ্গে একসাথে কাজ করেছেন, তাঁদেরকেও এই অমৃতের ভাগ দেওয়া উচিত। এ জিনিষ সব জায়গায় হয়। যাদের ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে তারা আইন বানায় আর যারা দুর্বল তারা সেই আইন পালন করে। দৈত্যদের মধ্যে যারা দুর্বল ছিল তাদের জন্যই দেবতারা বাঁচল, যারা শক্তিশালী দৈত্যরা ছিল তারাতো তখনই ঢক্ ঢক্ করে অমৃত পান করে দেবতাদের খেলা শেষ করে দিতে পারত।

যাই হোক, দৈত্যদের হাতে অমৃত চলে যাওয়ায় দেবতারা বাচ্চাদের মত 'আমাদের কি হবে' ভেবে প্রায় কান্নাকাটির অবস্থায় চলে গেছে। ভগবান বিষ্ণু তখন দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে বলছেন – কোন চিন্তা নেই, আমি এক্ষুণি এর বিহিত করছি। তখন ভগবান বিষ্ণু এক মোহিনী নারীর রূপ ধারণ করলেন। মোহিনী রূপ এমনিতেই তাবড় তাবড় পুরুষদের মাথা ঘুরিয়ে কুপোকাৎ করে দেয়, তার ওপর স্বয়ং ভগবান এই মোহিনী রূপ ধারণ করে দৈত্যদের মধ্যে হাজির হয়েছেন। ভগবানের মোহিনী রূপ দেখে দৈত্যদের সমস্ত বল বীর্য সব তখনই অবশ হয়ে গেল। অসুররা মেয়েটিকে বলছে – দেখুন আমরা সবাই এক জাতি, ভাই ভাই, আপনি আমাদের যা বলবেন আমরা তাই করব। দৈত্যদের কথা শুনে মোহিনী রূপী নারী তাদের সাথে নাটক করে নানা কথা বলে বলে তাদের মন বুদ্ধিকে আরো বশীভূত করে দিয়েছে। দৈত্যরা মোহিনীর রমণীয় বাক্য আর লাস্যময়ী আচরণে সম্পূর্ণ সম্মোহিত হয়ে গেছে।

সবাই যাতে অমৃত পান করতে পারে তাই মোহিনী রূপী নারী দেবতা আর দৈত্যদের সবাইকে দুটো লাইন করে বসতে বললেন। দৈত্যরা মোহিনী নারীকে কথা দিয়েছে সে যা বলবে দৈত্যরা তাই পালন করবে, এখন কিছু করার নেই, সবাই চুপচাপ লাইনে বসে গেল। মোহিনী নারী অমৃত বন্টন করতে শুরু করলেন। কিন্তু দেখা গেল সেই মোহিনী নারী শুধু দেবতাদেরই অমৃত দিয়ে যাচ্ছেন। দৈত্যদের লাইনে যারা বসে ছিল তারা শুধু হাঁ করে দেখতে থাকল। কিন্তু রাহু আর কেতু ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে। ওরা দুজন চুপচাপ কায়দা করে দেবতাদের লাইনে ঢুকে গেছে। অন্য দিকে অসুররা মোহিনীর রূপে এখনো এত সম্মোহিত হয়ে আছে যে তারা কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারছে না। রাহু আর কেতুকে ঐ মোহিনী রূপ সম্মোহন করতে পারেনি বলে তারা দিব্যি দেবতাদের সারিতে ঢুকে গেল। অসুরদের দুজন দেবতাদের রূপ ধারণ করে দেবতাদের সারিতে ঢুকে অমৃত পান করতে এসেছে ব্যাপারটা সূর্য আর চন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যাইনি, তারা ধরে ফেলেছে। সূর্য আর চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছে। কোন কোন গ্রন্থে আছে ইন্দ্র খবর পেতেই সঙ্গে সঙ্গে বজ্র দিয়ে রাহু আর কেতুর গলাটা কেটে দিয়েছিলেন। আবার কিছু কিছু জায়গায় আছে ভগবান একদিকে কচ্ছপ রূপ ধারণ করে মন্দার পাহাড়কে ধারণ করে আছেন, আবার আরেক দিকে তিনি মোহিনী নারীর রূপ নিয়ে অসুরদের সম্মোহিত করে রেখেছেন আবার তিনিই এখন নিজের বিষ্ণুরূপ ধারণ করে চক্র দিয়ে রাহু আর কেতুর গলাটা কেটে দিলেন। কিন্তু যেহেতু রাহু আর কেতু যেটুকু অমৃত পান করেছিল সেটা তাদের গলা পর্যন্ত নেমেছিল তাই ওদের মুণ্ডুটা অমর হয়ে রইল আর ধড়টা নষ্ট হয়ে গেল। সেইজন্য রাহু আর কেতুর যত রাগ সূর্য আর চন্দ্রের উপর গিয়ে পড়ল কারণ এরা দুজনে মিলে তাদের ধরিয়ে দিয়েছিল। আর তাই রাহু আর কেতু সূর্য আর চন্দ্রকে মাঝে মাঝেই আক্রমণ করে। সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণের সময় বলে রাহু আর কেতু এসে সূর্য আর চন্দ্রকে গ্রাস করতে থাকে।

শুকদেব এইবার পরীক্ষিৎকে বলছেন *এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকালহেত্বর্থকর্মমতয়োঽপি ফলে বিকল্পাঃ। তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাহপুর্যৎ পাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণান্ন দৈত্যঃ।।৮/৯/২৮।* 'হে রাজন্! দেখুন দেবতারা আর অসুররা একই সময়ে, একই জায়গায়, একই সঙ্গে, একই প্রয়োজনে, একটি বস্তু পাওয়ার জন্যে, এক ভাবনা, এক চিন্তা, সমান পরিশ্রম ও এক বুদ্ধি দিয়ে একই কর্ম করল কিন্তু ফল লাভের ক্ষেত্রে প্রভেদ হয়ে গেল, দুজনের দুই রকম ফল লাভ হল'। আমি আপনি মিলে একই জায়গায় একই কর্ম করলাম কিন্তু ফল আপনার আর আমার ক্ষেত্রে অন্য রকম হয়ে গেল। এর ব্যাখ্যা আমরা কিভাবে করব? শুকদেবের ব্যাখ্যা হল 'এর কারণ হল, দেবতারা ভগবানের চরণের আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু অসুররা ঈশ্বর বিমুখ হওয়ার জন্য পরিশ্রম করেও অমৃত পান করতে পারলো না'।

যে কোন কাজে সাফল্য পাওয়ার জন্য কতকগুলো জিনিষের দরকার। তারমধ্যে একটা আছে কর্মের বন্ধন, শাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে বলা হয় অপূর্বতা – মানে পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মসংস্কার। আমি হয়তো খুব নিষ্ঠা নিয়ে কর্ম করে যাচ্ছি, সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু তাও কর্মের আশানুরূপ ফল আসছে না, এর কারণ অপূর্বতা, পূর্ব পূর্ব জন্মের যে আমার কর্মসংস্কার রয়েছে সেই কর্মসংস্কার এই জন্মে আমার কর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ঈশ্বরের ভজনা করলে, জপ-ধ্যান করলে ওই সঞ্চিত সংস্কার গুলো কেটে যায়। যেমন কেউ হয়তো বাড়িতে কোন যজ্ঞ করতে চাইছে বা ছেলের উপনয়ন দিতে চাইছে। সব কিছু নিখুঁত ভাবে আয়োজন করা হয়েছে। দেখা গেল অনুষ্ঠানের দিন এমন কিছু একটা অঘটন ঘটে গেল, হয়তো ছেলের খুব শরীর খারাপ হয়ে গেল, কিংবা ঐ দিন এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হল যে সমস্ত অনুষ্ঠানটা ভেস্তে যাবার উপক্রম হল। এই বিঘ্ন তো কারোর দোষে হয়নি, আগের আগের কোন কর্ম এই শুভ কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এখন যেদিন অনুষ্ঠান করবার জন্য দিন ক্ষণ ঠিক করে নেওয়া হল সেদিন থেকে সে যদি খুব করে ভগবানের ভজনা করতে থাকে তাহলে ঐ পূর্ব কর্ম কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। ঐ কর্মটা নষ্ট হয়ে যাবে না, যে ধাক্কাটা দেওয়ার কথা সেটা কিছু দিন পরে দেবে। সেইজন্যই শুকদেব বলছেন তুমি যে কর্মটা করতে যাচ্ছ, সেই কর্মের সাফল্য তুমি তখনই পাবে যদি আগে থেকে অকপট ভাবে তোমার ঈশ্বরের ভজনা করা থাকে।

শুকদেব মূল কাহিনীর উপসংহার টেনে বলছেন *যদ্ যুজ্যতেঽসুবসুকর্মমনোবচোভির্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ। তৈরেব সদ্ ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ সর্বস্য তদ্ ভবতি মূলনিষেচনং যৎ।। ৮/৯/২৯।* মানুষ নিজের প্রাণ, নিজের সম্পত্তি, নিজের কর্ম, নিজের মন, নিজের বাণী এগুলি দিয়ে নিজের শরীরের জন্য আর নিজের পুত্রাদি ও পরিজনদের জন্য অনেক রকম প্রচেষ্টা করে চলে। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টার ব্যর্থ হওয়ার একটাই কারণ, তাদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে ভেদ বুদ্ধি লাগানো আছে। আমি আলাদা আর ওরা আলাদা এই ভেদ বুদ্ধি থাকার জন্য তাদের কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় না। কিন্তু সব কাজ যদি একমাত্র ভগবানের জন্য করা হয়, অর্থাৎ প্রাণ, ধন, মন, বাণী দিয়ে যদি শুধু ভগবানের কাজই করা হয় আর অভেদ বুদ্ধি দিয়ে যদি করা হয়, অভেদ বুদ্ধি মানে আমি ভগবানের সঙ্গে এক। তখন কি হয়? নিজের বলে যা কিছু আছে মনে করছি, অর্থাৎ নিজের শরীর, নিজের মন, নিজের ধন, নিজের প্রাণ দিয়ে যা কাজ করব সবটাই সফল হয়ে যাবে। মূল কথা হচ্ছে তুমি যে কাজই কর না কেন, ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ আশ্রিত হয়ে আর একমাত্র ভগবানের কাজ মনে করে যদি কর তাহলেই তোমার সমস্ত কর্ম সফল হবে।

যাই হোক ভগবান বিষ্ণু মোহিনী নারীর রূপ ধারণ করে খুব কৌশলে অমৃতের ভাগ বাটোয়ার করে দিয়ে তো তিনি চলে গেলেন। কিন্তু অসুররা অত সহজে ছাড়বে কেন! আমরা এত খাটলাম আর মাঝখান থেকে আমরাই অমৃত থেকে বঞ্চিত হবো! অসুররা কিছুতেই ছাড়বে না। শুরু হয়ে গেল দেবাসুরের সংগ্রাম। এখন আর দেবতাদের কে বাঁচাবে, ভগবান তো সব করে দিয়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেছেন। অসুরেরা দেবতাদের খুব মারতে লাগল, যেহেতু দেবতারা অমৃত পান করেছিল বলে বেঁচে যেত। যাই হোক শেষ পর্যন্ত অসুররাই পরাজিত হল। বলি ছিল অসুরদের নেতা আর ইন্দ্র দেবতাদের নেতা। ইন্দ্র আর বলির মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি লেগেই থাকত। এর মাঝখানে ভাগবত অন্য একটা কাহিনী নিয়ে আসছে। এই কাহিনীর পর বলি আর বামনাবতারের কাহিনী আসবে।

মহাদেবকে ভগবান বিষ্ণুর মোহিনীরূপ দর্শন

এদিকে মহাদেব কালকূট পান করে বেহুঁশ হয়ে গেছেন। তাঁর হুঁশ আসার কিছুদিন পর তিনি বিষ্ণুর দরবারে বৈকুণ্ঠলোকে এসেছেন। ভগবান বিষ্ণুকে শিব বলছেন ‘হে ভগবান বিষ্ণু! আপনি নিজের গুণ আর মায়াকে আশ্রয় করে অনেক রকমের অবতারত্ব গ্রহণ করেন। আমি শুনলাম কিছুদিন আগে সমুদ্র মন্থনের সময় আপনি নাকি এক মোহিনীরূপ ধারণ করেছিলেন, আর সেই রূপ দিয়ে সারা জগৎকে নাকি নাচিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় আমি কালকূট পান করে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম বলে আপনার ওই জগৎ ভোলানো মোহিনীরূপ দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। আপনার ঐ মোহিনীরূপকে একবার দেখার আমার খুব ইচ্ছা,

আপনি দয়া করে আপনার ওই মোহিনী রূপটা একবার দেখিয়ে আমার এই অভিলাষটা পূর্ণ করে দিন। তাছাড়া ওই মোহিনী রূপ আমারও তো দেখার কথা, কিন্তু আপনারই কাজে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম'। শিবের কথা শুনে বিষ্ণু স্মিত হাস্যে বলছেন 'হে শংকর! দেখুন, দেবতা আর অসুরদের যৌথ প্রচেষ্টায় সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উদ্ধার হওয়ার পর দৈত্যদের মনটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে একটা নতুন ধরণের কৌতুহল সৃষ্টি করতে হয়েছিল। শুধু মেয়ে হলে হবে না, একটা কৌতুহল সৃষ্টি করা দরকার'। মানুষ কখন পুরনো জিনিষের পেছনে ছুটবে না, নতুন যদি কিছু হয়, যেটা সবার মনে একটা কৌতুহল সৃষ্টি করতে পারবে, সেটার পেছনেই মানুষ দৌড়াবে। বিষ্ণু শিবকে তাই বলছেন 'আমাকে এমন একটা জিনিষ তৈরী করতে হয়েছিল যেটার দিকে দৈত্যদের মনটা সহজে আকৃষ্ট হয়ে যায়। আপনি ঐ রূপটা যখন দেখতে চাইছেন, আমি আপনাকে দেখাব। কিন্তু যারা কামী পুরুষ একমাত্র তাদের জন্যই এই মোহিনীরূপ। যাদের মধ্যে কামনা-বাসনা আছে এই রূপ তাদের কাম ভাবকে আরো উত্তেজিত করে দেবে। কিন্তু আপনি হলেন কামজয়ী পুরুষ, আপনি স্বয়ং কামদেবকেই ভস্ম করে দিয়েছেন, আপনার জন্য এই রূপ নয়'। কিন্তু শিব মোহিনীরূপ দেখতে চাইছেন। শিব আর বিষ্ণুর মধ্যে কথাবার্তা চলছে, তারই মধ্যে শিব যতক্ষণে বুঝবেন কি হচ্ছে নিমেষের মধ্যে শিব দেখছেন তিনি বিষ্ণুলোকে দাঁড়িয়ে আছেন, কথা চলছে, আর সতীর সঙ্গে একটা বাগানে এসে গেছেন। এর মধ্যেই শিব হারিয়ে গেলেন। মাত্র একটা বাক্য দ্বারা এখানে নিয়ে চলে এসেছেন, এর বেশি কিছু হয়নি।

তারপর বাগানের বর্ণনা। ভাগবতের বর্ণনা খুব সুন্দর। সেই সুন্দর বাগানে একটি নারী। তারপরেই একের পর এক দৃশ্যের সেই দুর্ধর্ষ বর্ণনা। মেয়েটি নানান ভঙ্গিতে নৃত্য করছে, নানা রকমের কাণ্ড করে চলেছে। তাকে দেখে শিবের মাথা গেছে ঘুরে। শিব তাকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন, আর সেই মোহিনী নারী কায়দা করে সরে সরে যাচ্ছে। কোথাও স্থির হয়ে থাকছে না। মেয়েটি যেমন যেমন দৌড়াচ্ছে, শিবও তেমন তেমন তার পেছনে ছুটে চলেছেন, সে এক যাচ্ছেতাই অবস্থা। এই ভাবে অনেক ছুটোছুটি করার পরেই শিবের হঠাৎ টনক নড়ে গেল – এ আমি কি করছি!

শিবের যখন হুঁশ এলো তখন প্রথম তাঁর মনে হল – আরে ভগবান নিজের মায়া দিয়ে আমাকে খুব বোকা বানিয়ে দিলেন! এই ভেবেই তিনি নিজের স্বরূপে ফিরে এলেন, শুকদেব এখানে খুব সুন্দর বলছেন – *জড়ীকৃত নৃপশ্রেষ্ঠ সন্যবর্তত কশ্মলাৎ(৮/১২/৩৫)* - যেটা থেকে দুঃখের জন্ম, ভগবানের সেই মায়া থেকে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আলাদা করে নিলেন। এর তাৎপর্য হল, আমরা যখন কৌতুহল বা লোভবশাৎ কোন কিছুতে আসক্ত হই, তারপর যখন কোন কারণে বুঝে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হই, তখন আর সেই ঘটনাকে নিয়ে কোন অনুতাপ করতে নেই। দুঃখের মূলকে বুঝে নিয়ে তখনই মুহুর্তের মধ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসাটাই যোগীর আসল শক্তির পরিচয়। শিব ঠিক তাই করলেন, যেই টনক নড়ে গেলে তিনি ঠাক্ করে ঐ মোহিনীরূপের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেরিয়ে চলে এলেন। ভগবান যখন দেখলেন শিব আমার মোহিনী রূপকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তখন ভগবান আবার বিষ্ণুর রূপ ধারণ করে নিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য পরে শিবের কোন রকমের লজ্জা বা দুঃখ বা কোন অনুতাপ হয়নি।

তখন ভগবান বলছেন *দিষ্ট্যা ত্বং বিবুধশ্রেষ্ঠ নিষ্টামাত্মানা স্থিতঃ। যন্মে স্ত্রীরূপয়া স্বৈরং মোহিতোহপ্যঙ্গ মায়য়া।।৮/১২/৩৮।* হে দেবশিরোমণি! আমি ভগবান, আমার যে এই মায়াশ্রিতা নারী রূপ আপনাকে যে বিমোহিত করেছে এটা আশ্চর্যের নয়, কিন্তু মোহিত হয়েও যে আবার নিজের প্রকৃত অবস্থা লাভ করে স্বরূপে অবস্থান করে স্থির চিত্ত হয়েছেন, এ অতি আনন্দের বিষয়। আমার এই মায়া অপার, সামান্যতম অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা এই মায়ার মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে। আমার এই মায়া বড় বড় ওস্তাদ পুরুষ যারা আছেন তাদেরকেও মোহিত করে ফাঁদে ফেলে দেবে। তবে আপনাকে এই মায়া কোনদিন মোহিত করতে পারবে না। আপনি যে আমার মায়া থেকে একবার বেরিয়ে আসতে পেরেছেন তাই ভবিষ্যতেও আমার মায়া আপনাকে কখন স্পর্শ করতে পারবে না'। এই সব বলে শুকদেব বলছেন যারা কপট ও দুষ্ট পুরুষ তারা কখন

ভগবানের চরণকমলের দর্শন করতে পারবে না। শুধুমাত্র ভক্তিভাব দিয়ে তাঁর চরণকমল লাভ করা যায়। সেই ভগবান নিজের মায়াকে আশ্রয় করে সমস্ত দৈত্যকুলকে বিমোহিত করে দিলেন, তাতেই তাদের সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেল। অথচ দেবতারা তাঁর চরণাশ্রিত হয়েছিলেন বলে অমৃত পান করে নিলেন। দেবতাদের আর কি কথা, যে কোন প্রাণী যদি তাঁর চরণের শরণ নিয়ে নেয়, তিনি তার সব বাসনা পূর্ণ করে দেন। সেই প্রভুর চরণকমলে আমার প্রণাম।

আগামী সাত মন্বন্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

এই হল সমুদ্র মন্থনের কাহিনী যেটা ষষ্ঠ মণ্বন্তরে হয়েছিল। এরপর বলছেন এখন যে মণ্বন্তর চলছে অর্থাৎ এই সপ্তম মণ্বন্তরের মনুর নাম বৈবস্বত মনু, বিবস্বান থেকে বৈবস্বত। এই মনুর অধীনে প্রধান দেবতারা হলেন আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎগণ, অশ্বিনীকুমার আর ভৃগু। আর ইন্দ্র যিনি তাঁর নাম পুরন্দর। পুরন্দরের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে অর্থ হয় যিনি কেল্লাকে জয় করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকে বলেন, আর্যরা যখন ভারতে আসা শুরু করেছিল তখন তারা মহেঞ্জদারো হরপ্পার কেল্লাগুলো জয় করেছিল বলে তাদের রাজার নাম পুরন্দর। কিন্তু পরের দিকে এই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন যাঁরা সপ্তর্ষিরা আছেন তাঁদের নাম কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নী ও ভরদ্বাজ। বামন অবতারের আবির্ভাব এই মণ্বন্তরে হয়েছিল, অর্থাৎ কপিল অবতারের আগে। প্রথম থেকে যে যে অবতারের কথা বলা হয়েছে এগুলো যেন বিবর্তনের ধারা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে দেখানো হচ্ছে, যেমন প্রথম হয়েছিলেন মৎস্যাবতার, তারপর কূর্ম অবতার, নৃসিংহ অবতার তারপর এই মণ্বন্তরে এলেন বামন অবতার। এরপরে পরের মণ্বন্তরে অর্থাৎ অষ্টম, নবম মণ্বন্তরে কিরকম কিরকম হবে তারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

মনুর কাজ হল দেশ আর কাল এই দুটোকে বিভাজন করে প্রজাপালন আর ধর্মপালনকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা। বিভিন্ন যজ্ঞ এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞের কোনটা কার কাছে যাবে, কোনটা ইন্দ্রের কাছে যাবে, কোনটা অন্যান্য দেবতাদের কাছে যাবে সব মনুই ঠিক করে দেন। তিনিই হচ্ছেন প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। সবার উপরে আছেন ভগবান বিষ্ণু, তার নীচে হলেন ব্রহ্মা আর ব্রহ্মার ঠিক নীচে মনু। মনু প্রকৃতপক্ষে আসল Regent। কিন্তু তাঁরও উপরে আছে বেদ, কারণ বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে। বেদের নীতিগুলি আবার সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে এসেছে। এই পৃথিবীতে বৃষ্টি ঠিক মত হচ্ছে কিনা তার দেখভাল মনু করেন। ঠিক মত বৃষ্টি যদি না হয় তা হলে তিনি কোথায় কার গাফিলতি হয়েছে অনুসন্ধান করতে নেমে যাবেন। অনুসন্ধান করতে করতে যেখানে তিনি গাফিলতির সন্ধান পাবেন সেখানে একটা দণ্ডের বিধান দিয়ে সবাইকে আবার সব সোজা রাস্থায় নিয়ে আসবেন।

যিনি ভগবান, তিনি যুগে যুগে সনকাদি সিদ্ধ রূপ ধারণ করে জগতে জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে যান। যাজ্ঞ্যবল্কাদি ঋষি হয়ে কর্মের উপদেশ দেন। দত্তাত্রেয়াদি যোগেশ্বর রূপে তিনি যোগের উপদেশ দেন। মরীচি আদি প্রজাপতি রূপে তিনি সৃষ্টির বিস্তার করেন। আর সম্রাট রূপে তিনি দুষ্টের দমন করেন। শীতোষ্ণাদি বিভিন্ন গুণ ধারণ করে কালরূপ হয়ে তিনি সকলকে সংহারের দিকে নিয়ে যান। শীতলতা, উষ্ণতা, তাপ প্রবাহ এগুলো সব ভগবানেরই বিভিন্ন রূপ, কালরূপ, এই রূপে তিনি আমাদের সংহারের দিকে নিয়ে যান। মানে তিনিই সৃষ্টি করছেন, তিনিই জ্ঞান, কর্ম, যোগের উপদেশ দিচ্ছেন, আবার তিনিই সংহার করছেন, সবই তাঁর।

বামন অবতার ও মৎস্যাবতারের কাহিনী

এদিকে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে খুব মারামারি কাটাকাটি হয়েই চলেছে। এরই মধ্যে বলি ইন্দ্রকে একবার খুব বিশ্রী ভাবে পিটিয়ে দিয়েছে। বলির খুব তপস্যা করা ছিল বলে ইন্দ্রের থেকে তার বেশি ক্ষমতা ছিল। ইন্দ্রকে বলির হাতে খুব মার খেতে দেখে দেবতাদের মাতা অদিতির মনে খুব কষ্ট হল। অদিতি তাঁর স্বামী কশ্যপকে গিয়ে বললেন 'হে স্বামী! আমার সন্তানরা কোন অন্যায় করেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও অসুরদের হাতে খুব নির্যাতিত হচ্ছে, বলুন এর কি বিহিত করা যায়। আর তা যদি না করা যায় তাহলে আমাকে এমন এক সন্তান দিন যাতে সে এর প্রতিশোধ নিতে পারে'। কশ্যপ বেচারা তাঁর বউদের নিয়ে প্রায়ই খুব ঝামেলায়

পড়তেন। কশ্যপ ঋষি অদিতিকে বললেন 'ঠিক আছে, তুমি পয়োব্রত পালন কর'। পয়ো মানে দুধ, পয়োব্রত দুধেরই একটা ব্রত। পায়েস রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করে দ্বাদশ অক্ষর 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্রে সব কিছুর পূজো করবে। পায়েস ব্রাহ্মণদের খাওয়াবে আর নিজেও খাবে, পায়েস ছাড়া আর কিছু খাওয়া যাবে না। সারাদিনে অনেক নিয়ম-কানুন পালন করবে, যেমন মাটিতে শয়ন করা, তিন বেলা স্নান করা, মিথ্যে কথা না বলা, পাপীদের সঙ্গে কথা না বলা, তাদের কথা আলোচনা না করা' ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ম-কানুনের কথা বলে দিলেন। আসল কথা হল সাধনা, সাধনা ব্যতিরেকে কোন কিছুই হয় না। এই ভাবে বারো দিন পয়োব্রত পালন করতে বললেন, এই ব্রত বারো দিনই করতে হয়। বললেন 'তুমি বারো দিন ধরে এই পয়োব্রত পালন করলে তোমার গর্ভ থেকে এক উত্তম সন্তানের জন্ম হবে'।

স্বামী কশ্যপের উপদেশ মত অদিতি অতি সংযত চিত্তে বারো দিন ব্যাপি এই পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। তারপর তিনি মন বুদ্ধিকে একাগ্র করে পুরুষোত্তম ভগবানের ধ্যান করতে লাগলেন। ভগবান বাসুদেব তাঁর শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী রূপে অদিতির সামনে আবির্ভূত হলেন। তারপর অদিত গদগদ হয়ে ধীরে ধীরে ভগবানের স্তুতি করলেন। ভগবানের স্তব করলে অদিতিকে ভগবান আশ্বস্ত করে বললেন 'আমি তোমার অবস্থা সব অবগত আছি, তুমি যে সাধনা করেছ তাতে তোমার সব অভিলাষ পূর্ণ হবে'। এই বলে ভগবান সেই মুহূর্তে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। কিছু দিন পর যিনি জন্ম-মৃত্যুরহিত সেই ভগবান শ্রীহরি দেবমাতা অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হলেন। প্রথমেই অদিতি তাঁর গর্ভ থেকে স্বয়ং ভগবানকে জন্ম নিতে দেখলেন, যেমন কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ভগবানের রূপ ধারণ করে জন্ম নিতে দেখেছিলেন, কংসের কারাগারে দেবকী যেমন ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করেছিলেন, ঠিক সেই রকমই অদিতিও পরমপুরুষ ভগবানকে নিজের গর্ভ থেকে আবির্ভূত হতে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। কিন্তু কিছু পরেই কশ্যপ ও অদিতির চোখের সামনেই সেই শরীর বামন ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করলেন।

শুকদেব এখানে ব্রাহ্মণ বেশের বর্ণনা করছেন – তাঁর হাতে ছাতা, দণ্ড এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু, তাঁর কটিদেশে মুঞ্জমেখলা, কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত, মৃগচর্মের উত্তরীয় এবং মাথায় জটা। এই বেশ ধারণ করে তিনি সেইখানে গেলেন, যেখানে বলি শুক্রাচার্যের সঙ্গে এক বিরাট যজ্ঞ করছেন। যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ এসেছেন, এখন তাঁকে দক্ষিণা দিতে হবে। শুক্রাচার্য কিন্তু বুঝতে পেরে গেছেন এই ব্রাহ্মণ বেশধারী এখানে এই সময় এসেছেন, কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে এর মধ্যে। শুক্রাচার্য বলিকে সাবধান করছেন এই ব্রাহ্মণকে দান গ্রহণের সুযোগ না নিতে। কিন্তু বলি বলছে 'না, আমি দান দেবই'। এই বলে সে শুক্রাচার্যের বাক্যকে অগ্রাহ্য করে ব্রাহ্মণকে বলছেন 'তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব, বল তুমি কি চাও'। ব্রাহ্মণ বলছেন 'আমি কিছুই সেরকম চাইনা, আমি শুধু তিন পাদ ভূমি চাই'। বলি বলছে 'আরে তুমিতো আরো অনেক কিছু চাইতে পারো, মাত্র তিন পাদ ভূমি নিয়ে কি আর করবে'। ব্রাহ্মণ বলছেন 'না, আমি তিন পাদ ভূমি ছাড়া আর কিছুই চাইনা'। শুক্রাচার্য তখনও বলছেন 'দ্যাখো বলি, তুমি এরকম করতে যেও না'। এর মধ্যেই বলি 'তুমি কেবল তিন পাদ ভূমি কেন চাইছ, তুমিতো এই পৃথিবীকে চাইতে পারতে, এই চাইতে পারতে, সেই চাইতে পারতে' ইত্যাদি বলেই যাচ্ছে।

বলি রাজাকে ভগবান তখন বলছেন 'প্রারব্ধ থেকে মানুষ যা পেয়ে যায় তাতেই যে মানুষ সুখী থাকে সেই মানুষই ইহজীবনে সুখ ও শান্তি পায়। কিন্তু যার ইন্দ্রিয় বশে নেই সে যদি তিনটে লোকও পেয়ে যায় তবুও তার জীবনে কখন শান্তি আসে না। তাই সামান্য এটুকু পেলেই আমার হয়ে যাবে, এর বেশী কিছু লাগবে না। যে ব্রাহ্মণ, নিজে থেকে যা এসে যায় তাতেই সে যদি সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তার তেজ বৃদ্ধি হয়'। যোগশাস্ত্রের ভাষায় এটাই অপরিগ্রহ, কারুর কাছ থেকে কোন ধরণের উপহার না নেওয়া। যে যা দিতে চাইছে তা গ্রহণ করে নিলে তেজ নাশ হয়ে যায়। যদি না নেওয়া হয় তাতে তেজ বৃদ্ধি হয়। যেটা নিজে থেকে এসে যাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ভগবান বলছেন 'যে অসন্তোষী, সব সময় এটা চাই সেটা চাই বলে, যার চাহিদার কোন অন্ত নেই, তার তেজ নষ্ট হয়ে যায়'।

শুক্রাচার্য বুঝতে পেরেছেন স্বয়ং ভগবান বামন অবতার হয়ে লীলাচ্ছলে বলিরাজের সমস্ত কিছু গ্রাস করে নিতে এসেছেন। তিনি বলিকে এইভাবে দান না করতে বার বার নিষেধ করে অনেক কথা বলছেন। সেখানে শুক্রাচার্য বলিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উপদেশ দিচ্ছেন, যে উপদেশ সংসারীদের পালন করা অবশ্যই কর্তব্য *ধর্মায় যশসেহর্থায় কামায় স্বজনায় চ। পঞ্চধা বিভজন্বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে।।৮/১৯/৩৭।* এই সংসারে যে মানুষ তার উপার্জিত সম্পদকে পাঁচটা ভাগে বিভাজন করে কিছু অর্থ যশের জন্য, কিছু অর্থ ধর্মের জন্য, কিছুটা অর্থ বৃদ্ধির জন্য, কিছু নিজের ভোগের জন্য আর কিছু অর্থ আত্মীয়স্বজনের জন্য দান করে সেই মানুষই ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ শান্তি পায়। শাস্ত্র বলে দিচ্ছে, আপনি মাসে যত রোজগার করছেন তার এক পঞ্চমাংশ আপনাকে ব্যাঙ্কে বা শেয়ার মার্কেটে লাগাতে, যাতে টাকাটা বাড়ে। এইভাবে যদি না কর তাহলে তুমি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে। শাস্ত্র নিষেধ করছে, তোমার সামর্থের বাইরে কখনই দান করবে না।

শুক্রাচার্য যখন আবার নিষেধ করছেন তখন বলি বলছে 'হে গুরুদেব! আমি হলাম প্রহ্লাদের পৌত্র, আমি দান দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর আমার ভয়ে যদি ভগবান এই বামন রূপে ব্রহ্মচারী হয়ে এইভাবে এসে থাকেন তাহলে তো আমার কপাল খুলে গেল। যে ভগবান যুদ্ধভূমিতে আমাকে বধ করতে পারবেন না, সেই ভগবানকে আমার ভয়ে বেঁটে বামন হয়ে আসতে হয়েছে! এঁকে আমি অবশ্যই খুশি করব, কিন্তু তার আগেইতো সে আমার কাছে হেরে গেছে। হেরে গেছে বলেই তো তাঁকে এই বিচিত্র বেশ ধারণ করতে হয়েছে'। শুক্রাচার্য তখন খুব রেগে গেছেন, বলিকে বলছেন 'তোমাকে আমি বারংবার নিষেদ করছি এই বামনকে কিছু দেবার জন্য পণ করো না, কিন্তু তখন থেকে তুমি গুরুবাক্য লঙ্ঘন করে চলেছ, এখনও বলছি তুমি এই বামনকে দান করা থেকে বিরত হও। কিন্তু শুক্রাচার্যের কথায় কর্ণপাত না করে হাতে কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে পণ করে বলছে 'ঠিক আছে, হে ব্রাহ্মণ! আমি দিলাম তোমাকে তিন পাদ ভূমি'।

যেমনি বলি কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলে দিল – আমি দিলাম, তুমি নাও, বল কোথায় তুমি তিন পাদ ভূমি নেবে, তারপরেই বামন অবতার বিরাটের রূপ ধারণ করতে লাগলেন, তাঁর শরীর ক্রমশ বিরাট আকার ধারণ করতে শুরু করে দিল। পৃথিবী, আকাশ, দিক্, স্বর্গ, পাতাল, পশু, পাখি, মানুষ, দেবতা সব কিছু তাঁর এই বিরাট শরীরের মধ্যে অবস্থিত। তাঁর চরণতলে রসাতল, তাঁর চরণে পৃথিবী, কত বড় আকার হতে পারে যে তাঁর চরণে এই পৃথিবী, পায়ের পেশীতে যত পাহাড়াদি, হাঁটুতে যত পাখি, জঙ্ঘাতে মরুৎগণ ইত্যাদি, মূল কথা যাবতীয় যা কিছু আছে সব তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে তাঁর যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, এখানেও ঠিক সেই একই দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানেও সেই বিশ্বরূপদর্শন। পুরাণে বিভিন্ন জায়গায় এই বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা আসে। ভগবানের এই বিরাটের বর্ণনা বেদ থেকেই এসেছে, বেদেও এই একই বর্ণনা করা হয়েছে।

তিন পাদ ভূমি দিতে বলি অঙ্গীকার বদ্ধ। এখন বামন অবতারের একটি পা সত্যলোক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যেটা সব থেকে উচ্চতম লোক। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে যত ঋষিরা আছেন, ভগবানের চরণ থেকে যে জ্যোতির্ময় আলোর বিকিরণ হচ্ছে, সেই আলোতে তাঁরা সবাই হারিয়ে গেছেন। তখন সব ঋষিরা ভগবানকে কৃতার্থ হয়ে সাদর ভাবে অভ্যর্থনা করছেন। কারণ ভগবানের চরণকমল তো কখন সত্যলোকে পড়ে না। এই উপলক্ষে এখন সত্যলোকে ভগবানের চরণ পড়েছে। তারপর বলছেন – বেদ, উপবেদ, নিয় – নিয় মানে স্মৃতি আদি, তর্ক – মানে ন্যায় শাস্ত্র, ইতিহাস, বেদাঙ্গ, পুরাণ, সংহিতা এরা সব ব্রহ্মলোকে সচল মুর্তিমান হয়ে বাস করেন। আমাদের কাছে বেদ, ইতিহাস, পুরাণ গ্রন্থ রূপে বিরাজ করে, কিন্তু ব্রহ্মলোকে এঁরা সবাই মূর্ত রূপে বিরাজ করেন। অধ্যাত্ম রামায়ণেও নৈর্ব্যক্তিক জিনিষকে মূর্ত রূপ করে দেওয়ার কিছু বর্ণনা পাই। যখন কোন বিদ্যা বা অস্ত্র দেওয়া হয়, বা কোন অস্ত্রকে যখন আবাহন করা হয় তখন তারা স্বর্গ থেকে রূপ ধারণ করে অস্ত্রধারীর সামনে করজোড়ে হাজির হয়ে যেতেন। প্রত্যেকটি জিনিষের একটা বাহ্যিক রূপ আছে। আমাদের ঋষিরা যেটা কল্পনা করতেন, প্রত্যকে মানুষের যে আত্মা আছেন, তিনি যেমন যেমন যে কোন একটা রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন, ঠিক তেমনি এই বেদ, ইতিহাসাদি যত শাস্ত্র আছে তাদেরও একটা রূপ আছে, কিন্তু ঐ

রূপটা পৃথিবীলোকে আমরা দেখতে পাইনা, একমাত্র ব্রহ্মালোকেই দেখা যাবে। যখন কোন কাজের জন্য অবতরণ করেন তখন বেদ, পুরাণেরা এভাবেই থাকেন।

প্রথম পায়ে তিনি সত্যলোক থেকে স্বর্গলোক পর্যন্ত মেপে নিয়েছেন। দ্বিতীয় পায়ে সমস্ত পাতাল লোক মেপে নিয়ে ভগবান বলিকে বলছেন 'বলি! আমি তৃতীয় পা কোথায় রাখব বল'? তৃতীয় পা কোথায় দেবে যেই ভগবান বলেছেন, বলি তখন তার নিজের মাথাটা এগিয়ে দিয়েছেন। অসুররা বুঝে গেছে তাদের সাথে দেবতারা একটা কৌশল খেলেছে। অসুররা সবাই মিলে দেবতাদের আক্রমণ করে দিল। আক্রমণ করে এখন আর কি করবে! ভগবানের সামনে অসুররা আর কিইবা করতে পারবে। বলি সমস্ত অসুরদের নিষেধ করে বললেন 'এখন আর এসব করতে যেও না, আমাদের এখন খারাপ সময় এসে গেছে'। ভগবান এদিকে বলিকে আদেশ দিলেন 'এখন থেকে তোমার বাসস্থান হবে রসাতল, তুমি রসাতলে চলে যাও'।

ভগবান বলিকে বলছেন 'তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমাকে তিন পাদ ভূমি দান করবে, কিন্তু তুমি তিন পাদ জমি দিতে পারলে না, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রক্ষা করতে পারোনি। সেইজন্য তোমাকে এখন নরকে যেতে হবে। আসলে তোমার বিরাট অহঙ্কার হয়েছিল, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তুমি মনে করতে যে যা চাইবে তুমি তাকে তা দিয়ে দেবে। এই অহঙ্কারের পরিণামে তোমার আজ এই দুরবস্থা'। বলির স্ত্রী বিন্ধ্যা ভগবানের হাতে পায়ে ধরে অনেক ক্ষমা চাইল। বিন্ধ্যার প্রার্থনাতে ভগবান একটু নরম হয়ে বলছেন 'ঠিক আছে, বলিকে আমি রসাতলে পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ওখানে সে অনেক ভোগ করতে পারবে। আর ওখানে বলিকে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না, আমি তাকে রক্ষা করব। ঐ লোকে যখনই চাইবে তুমি আমার দর্শন পাবে। দানব আর অসুরদের সঙ্গে থাকার জন্য তোমার যে আসুরিক ভাব আসবে, আমি তোমার সঙ্গে থাকার জন্য সেই আসুরিক ভাব চাপা থাকবে। যদিও তুমি রসাতলে থাকবে কিন্তু তুমি চাইলেই সব সময় আমার দর্শন পাবে'।

এরপরে আসছে মৎস্যাবতারের কাহিনী। হয়গ্রীব বলে এক অসুর ছিল। বেদ, যা থেকে সৃষ্টি চলে, সেই বেদকে বেঁধে নিয়ে হয়গ্রীব রসাতলে চলে গেছে। ভগবান তখন একটা ছোট্ট মাছ হয়ে এসেছেন। মনু স্নান করতে গিয়ে সেই ছোট মাছটিকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে নিয়ে ছোট একটা ঘটির মধ্যে রেখে দিয়েছেন। পরের দিন সকালে উঠে দেখেন মাছটা বড় হয়ে গেছে, ঘটির মধ্যে আর রাখা যাচ্ছে না। তাকে পুকুরে রেখে এলেন। পরের দিন সেই মাছ এত বড় হয়ে গেল যে পুকুরেও রাখা যাচ্ছে না। মনু তখন তাকে নদীতে রেখে এলেন। পরের দিন নদীতেও রাখা যাচ্ছে না, এত বড় হয়ে গেছে। শেষে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলেন। সমুদ্রে যখন রাখতে গেছেন তখন সেই মাছ মনুকে বলছে 'দ্যাখো, প্রলয় আসছে, যখন প্রলয় আসবে আমি তোমার কাছে চলে আসব। তার আগে তুমি একটা নৌকা প্রস্তুত করে রাখবে। আর তাতে সব কিছুর জোড়া রাখবে। যখন প্রলয় হবে তখন সমুদ্রের মাঝখানে নৌকার মধ্যে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। প্রলয়ের পর তোমার দ্বারা আমি এইসব জোড় থেকে আবার সৃষ্টির রচনা করবো'। এই ভাবে মৎস্যাবতার রূপে তিনি সৃষ্টিকে রক্ষা করেছিলেন। এই কাহিনীর সাথে খ্রীশ্চান ধর্মে যে নোয়াজারের কাহিনী আছে তার অনেক মিল পাওয়া যায়। নোয়জার কাহিনীর প্লাবন খ্রীশ্চান ধর্মে একটা বড় ভূমিকা নেয়। কিন্তু আমাদের মৎস্যাবতারের যে প্লাবনের কথা বলা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ পৌরাণিক আখ্যায়িকা। খ্রীশ্চানদের কাছে এটা আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি আর ভারতীয় ধর্মে শুধু একটা কাহিনী মাত্র। এর সঙ্গে হিন্দু ধর্মের দর্শনের কোন সম্পর্ক নেই। মনুও মৎস্যাবতারের যে অনেক স্তব করেছেন, এই ধরণের স্তব প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এই হল মোটামুটি অষ্টম স্কন্ধের সারাংশ।

নবম স্কন্ধ

এর আগে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। এই পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে প্রথমে আসছে সর্গ। সর্গ হল সৃষ্টির কথা – পুরাণে সৃষ্টির বর্ণনা থাকবেই। তারপর আসছে প্রতিসর্গ – প্রতিসর্গ মানে secondary creation, প্রথম সৃষ্টি ভগবান বিষ্ণু নিজেই করছেন। কিন্তু তারপরের সৃষ্টির কার্য ব্রহ্মাই সামলান। সৃষ্টি যখন হল তখন এক সময় এই সৃষ্টির প্রলয়ও হবে, সৃষ্টি হবে আবার প্রলয়ও হবে। যেখানে সৃষ্টি আর প্রলয় এই দুটোকেই আলোচনা করবে সেটাই প্রতিসর্গ। তৃতীয় ও চতুর্থ লক্ষণ বংশ আর বংশানুচরিত। এই যে নানা রকমের সৃষ্টি হয়েছে, মনু, মনু থেকে বিভিন্ন প্রজা – এদের যে পরিচয় পরে দেওয়া হয় যেমন সুর্যবংশ, চন্দ্রবংশ, ইত্যাদি এগুলোই বংশ। যেমন যেমন বংশ এগোতে থাকবে, বিস্তার হয়ে শাখা প্রশাখাতে ছড়িয়ে যাবে আর এর যে ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হবে তাকে বলে বংশানুচরিত। পঞ্চম লক্ষণ মণ্বন্তর, বিভিন্ন মনুর কথা।

প্রত্যেক ভারতীয়র উচিৎ পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে জানা

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে হলে শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপার গুলো জানলেই হবে না। স্বামীজী তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহেকে একদিন ভারতীয়দের মানসিকতার সমালোচনা করে বলছেন – আগেকার দিনের লোকেরা নিজেদের চৌদ্দ পুরুষের নাম জানতেন, এখনকার লোকেরা সাত পুরুষের নামও জানেনা। তখন প্রিয়নাথ বলছেন ‘ওগুলো জেনে কি হবে’? বন্ধুর কথাতে স্বামীজী খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন ‘তুমি এই সামান্য জিনিষটা বুঝতে পারলে না! মানুষ যখন তার পূর্বপুরুষদের পরিচয় জানে তখন তার মাথায় থাকে – আমি এই কুলের বংশধর! মানসিক দুর্বলতার জন্য যখন খারাপ কিছু করার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে উদয় হয় তখন নিজের বংশ পরিচয় জানা থাকলে সেই খারাপ কাজ করা থেকে তখন সে পিছিয়ে আসবে, সে ভাববে আমি এই বংশের হয়ে এই নোংরা কাজ কি করে করব’! এখন যদি মহাত্মা গান্ধীর বংশের কেউ খারাপ কাজ করে, তাহলে লোকে তাকে বলবে ‘আপনি মহাত্মা গান্ধীর বংশের লোক হয়ে এই ধরণের খারাপ কাজ কি করে করছেন!’ নিজের বংশ পরিচয় জানা থাকলে কোন খারাপ কাজের চিন্তা মাথায় এলেও সেটা কার্যে পরিণত করতে পারবে না। আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরাট ঐতিহ্য জানা থাকলে আমাদের ভালো কাজে এগিয়ে যেতে শক্তি যোগায়, আমাদের ব্যাক্তিত্বে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দেয়। নিজেকে আরো সমৃদ্ধ, আরো উন্নত করার ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য আমাদের মস্ত বড় এক অবলম্বন। আর যদি কারোর পশ্চাতে কোন ঐতিহ্য না থাকে তাহলে আর কি হবে! অসহায়, অবলম্বনহীন হয়ে ভেসে বেড়াবে। আমেরিকান সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় সেখানে তারা পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে কোন গুরুত্বই দেয় না। কিছু দিন আগে আমেরিকার বিশ্বখ্যাত একজন পপসিংগার মারা গেছেন। আমেরিকার কাগজে লেখা বেরিয়েছে – আমেরিকায় স্বাধীনতার প্রতি এত মমত্ব আর কোথাও নেই, এখানে একজন নিগ্রো পুরুষ আগামীকাল শ্বেতাঙ্গ নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারবে। একজন লেখাটা পড়ে বলছে – ওখানে আরেকটা কথা জুড়ে দিলে পারত – An black American Christian man can become a white Muslim woman। কারণ সেই পপসিংগারের কোনটারই ঠিক নেই, তার গায়ের রঙের ঠিক নেই আর তার না আছে জাতের ঠিক, না আছে ধর্মের ঠিক, না আছে লিঙ্গের ঠিক। এই হচ্ছে আমেরিকা। এখন মরে যাওয়ার পর খ্রীশ্চানদের দেবতারাও আসবেন আবার মুসলমানদের দেবতারাও আসবেন, এদের মধ্যে হবে টানাটানি। এরপর সে ছেলেদের নরকে যাবে, না মেয়েদের নরকে যাবে এই নিয়েও আরেক প্রস্ত টানা হ্যাঁচড়া চলবে, মাঝখান থেকে ছিটকে গিয়ে কোন্ যোনিতে যাবে কেউ জানে না। মৃত্যুর পর তার নাকি পাঁচশ মিলিয়ন ডলার দেনা আছে। এক মিলিয়ন ডলার মানে ভারতের টাকার হিসাবে দশ লক্ষ টাকা। এর মৃত্যুর জন্য এখন সারা বিশ্ব কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। যাদের টাকা মেরেছে এখন তাদের কি অবস্থা হবে ভগবানই জানেন। আর এরাই হচ্ছে আমাদের আদর্শ, এরাই হাজার হাজার যুবক যুবতীর ইষ্ট, বাড়িতে এই ধরণের ‘মহান মানুষের’ ছবিই টাঙানো থাকে। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য এদের পেছনে নেই বলে এই অবস্থা। এই ধরণের লোকের মৃত্যুতে আমার আপনার যদি চোখের জল না পড়ে তাহলে আমরা হলাম একটা গেঁয়োভূত, অসংস্কৃতি সম্পন্ন দ্বিপদী প্রাণী।

পুরাণের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই বংশ আর বংশানুচরিত। প্রথম সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টিতে হয়েছে তার ইতিহাসকে পুরাণ সামনে নিয়ে এসেছে। এই ইতিহাস যখন আমরা পাঠ করবো তখন আমাদের বংশের বিরাট ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে যেতে হবে। তাই পুরাণ আমাদের সবার জন্য শক্তিবর্ধক, বলবর্ধক। পুরাণেই একটা কাহিনী আছে, যদিও এটাকে আমরা আলোচনায় আনব না, রন্তিদেব নামে এক রাজা ছিলেন। সব দান টান করে তাঁর এমন অবস্থা হল যে সামান্য একটু খাবার অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও আরেকজন এসে চেয়ে নিয়ে নিল। শেষে শুধু একটু জল ছিল। এক চণ্ডাল এসে তাঁকে বলল – আমি খুব তৃষ্ণার্ত, আপনি একটু জল খেতে দিন। তিনি শেষ জলটুকুও তাকে দিয়ে দিলেন। আর কিছু নেই। এদিকে প্রচণ্ড গরম, খাওয়া দাওয়া নেই, তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কি আর করবে! তাঁর মাথা ঘুরছে। এই করে তিনি সেখানেই মারা গেলেন। এটাই ভারতের সনাতন আদর্শ, ভারতের আদর্শ ত্যাগের আদর্শ। স্বামীজী বলছেন – হে ভারতবাসী ভুলিও না তোমার আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। কেন বলছেন স্বামীজী? কেননা ভারতের আদর্শ ত্যাগের আদর্শ, ত্যাগের মধ্যে দিয়েই ভারত সেই সময় শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছেছিল। এ যুগের সিনেমা, নাটকে বলে – এখন আর নারীদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী নয়। এটা কি খুব গর্বের কথা! নাকি আমাদের অধঃপতনের ইঙ্গিতবাহক বার্তা।

ভালো করে যদি আমরা নিজেদের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো এখন আমাদের দ্বারা জ্ঞানের অনুশীলন হয় না, ভক্তি করতে গেলে সেই ভক্তির ভাব আসে না, শাস্ত্র পড়তে গেলে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে, এরপর আধ্যাত্মিক চর্চার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এর কারণ যদি অনুসন্ধান করা হয় তাহলে দেখা যাবে আমাদের মনের সাথে বানরের মনের কোন প্রভেদ নেই। আমরা এখানে একটু খাবলাচ্ছি, পর মুহুর্তেই অন্য জায়গায় গিয়ে আরেকটা জিনিষের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ছি। সেইজন্য কোন কার্যেই আমরা সাফল্য পাই না। আমাদের চরিত্রে দৃঢ়তার প্রচণ্ড অভাব। ভারতে একদিকে যেমন উচ্চ উচ্চ আদর্শ আছে অন্য দিকে আবার রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, খেলাধূলা, কলা সর্ব ক্ষেত্রে এত ধাপ্পাবাজী, লোক ঠকানোর কারবার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কেন? আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানসিক বলের বড় বেশি অভাব। এই বংশানুচরিত যদি পাঠ করা হয় তখন চরিত্রের মধ্যে একটা বল আসবে। ক্ষত্রিয় রাজপুতরা যুদ্ধে মরে যাবে কিন্তু কখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। রাজপুতদের মধ্যে এই শক্তি কোথা থেকে এসেছে? আমাদের ঐতিহ্য থেকেই এই শক্তি এসেছে। আমরাও যখন আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের ব্যাপারে সজাগ হয়ে যাব তখন ঐ শক্তিটা আমাদের মধ্যেও জাগরুক হয়ে যাবে।

সপ্তম মনু বৈবস্বতের ইতিহাস

নবম স্কন্ধে আমরা কিছু কিছু বংশের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা আগেই জেনেছি চৌদ্দটি মণ্বন্তর আছে। এখন সপ্তম মণ্বন্তর চলছে, এর পরে আরো সাতটা মণ্বন্তর আসবে। এই সপ্তম মনু যিনি হয়েছেন, মনু হওয়ার আগে তিনি দ্রাবিড় দেশের এক রাজর্ষি ছিলেন, তখন তাঁর নাম ছিল সত্যব্রত। সত্যব্রত মৃত্যুর পর বৈবস্বত মনু হয়ে জন্ম নিয়েছেন। বৈবস্বত মানে বিবস্বানের পুত্র, সূর্যের আরেক নাম বিবস্বান। সূর্যের সন্তান হওয়ার জন্য এই বংশকে বলা হয় সূর্যবংশীয়। পুরাণ যখনই সুযোগ পাবে তখনই বলতে শুরু করবে সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে। এখানেও একই জিনিষের পুনারবৃত্তি চলছে। ভগবান বিষ্ণুই একমাত্র ছিলেন। সেই ভগবান বিষ্ণুর নাভি থেকে পদ্ম বেরোল। সেই পদ্মতে ব্রহ্মা বসে আছেন। ব্রহ্মা যখন চিন্তা করতে শুরু করলেন আমি কেন এসেছি, তখন তিনি ধ্যান করতে শুরু করলেন। ব্রহ্মার মন থেকে প্রথম বেরিয়েছে চারজন কুমার – সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। এই চার কুমার ব্রহ্মার সত্ত্বগুণ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন বলে তাঁদের সৃষ্টির দিকে মন ছিল না। চার কুমারের পর ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন ঋষিদের। সেই ঋষিদের মধ্যে একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন, তাঁর নাম মরীচি। মরীচির পর ব্রহ্মার যে সন্তান হলেন তাঁর নাম হল কশ্যপ। এনারাও সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, কিন্তু ঐ চার কুমারের মত সত্ত্বগুণে সম্পন্ন ছিলেন না। এই ঋষিরা সৃষ্টির কাজে মন দিতে সক্ষম ছিলেন। কশ্যপের বিয়ে হল দক্ষ কন্যা অদিতির সাথে। সেখান থেকে জন্ম হল সূর্যের –বিবস্বান। বিবস্বানের যে

সন্তান হল তার নাম ছিল শ্রাদ্ধদেব। বৈবস্বত মনুর কোন সন্তান ছিল না। এগুলো সবই পৌরাণিক কাহিনী। পড়লে বোঝা যায় কিভাবে কিভাবে এই কাহিনী গুলো এগিয়ে গেছে। পরবর্তি কালে কবি সাহিত্যিকরা অনেকেই এই কাহিনীগুলোকে আধার করে অনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। হিন্দীর খুব নাম করা কাব্যগ্রন্থ কামায়নী এই পৌরাণিক কাহিনীকেই আধার করে রচিত।

ইলা ও সুদ্যুম্নের কাহিনী

প্রথমের দিকে মনু ছিলেন সন্তানহীন। সন্তান লাভের জন্য মনু একটা যজ্ঞ করতে চাইলেন। এই যজ্ঞের নাম মিত্রা-বরুণ যজ্ঞ, শুধু দুধ খেয়ে থাকতে হয়। যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণরাও এসে গেলেন। এই সব কারণেই পুরাণের কাহিনীকে অনেকে গালগপ্পো বলে উড়িয়ে দিতে চায়। এখনও সৃষ্টিই হয়নি, কোথাও কেউ নেই, মনুকে বলা হয়েছে সৃষ্টি করতে। কিন্তু সেখানে যজ্ঞ করার জন্য ব্রাহ্মণরা এসে গেলেন। যাই হোক মনুর স্ত্রীর নাম ছিল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ছিলেন সবারই জননী। শ্রদ্ধা একদিন চুপি চুপি যে ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ করছিল তাদের কানে ফিস ফিস করে বলে দিল 'দেখুন, আপনারা যজ্ঞ করছেন পুত্র সন্তানের জন্য কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা যে আমার একটি কন্যা সন্তান হোক'। তখন ব্রাহ্মণরা বলল 'ঠিক আছে, আপনি যেমনটি চাইছেন তেমনটিই হবে'। ব্রাহ্মণরা মনে মনে কন্যা সন্তানের কল্পনা করে আহুতি দিয়ে গেছেন। যখন সন্তান হল তখন পুত্র হওয়ার জায়গায় হয়েছে এক কন্যা। কন্যার নাম রাখা হয়েছে ইলা। মনু, শ্রদ্ধা আর ইলা এই তিনটি নাম হিন্দু পুরাণে খুব বিখ্যাত নাম।

কন্যা সন্তান দেখে মনু খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। আমি যজ্ঞ করালাম পুত্রের জন্য, কিন্তু কন্যা কি করে হল? তখন ঋত্বিক ব্রাহ্মণরা বলে দিলেন 'কেন, আপনার সাধ্বী স্ত্রী আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে ওনার কন্যা সন্তান দরকার'। ঋত্বিকদের কথা শুনে মনুর খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। বশিষ্ট সেখানে মনুকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন 'তোমার চিন্তার কিছু নেই, আমি তোমার ছেলের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি'। বশিষ্ট ছিলেন বিরাট তপস্বী। তিনি মনুকে এমন আশীর্বাদ দিলেন যে, আশীবার্দের জোরেই মেয়ে ইলা হয়ে গেল পুরুষ। তখন তার আবার নাম হয়ে গেল সুদ্যুম্ন। সৃষ্টিতে যে প্রথম সন্তান জন্ম নিল তারই লিঙ্গ পরিবর্তন করে দেওয়া হল। ছিল মেয়ে ইলা সেখান থেকে হয়ে গেল ছেলে সুদ্যুম্ন। মেয়ে থেকে ছেলে হওয়া, ছেলে থেকে মেয়ে হওয়া আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। লিঙ্গ পরিবর্তন আমাদের পরম্পরাতে প্রথম দিন থেকেই চলে আসছে।

রাজকুমার সুদ্যুম্ন এখন বড় হয়েছে। একদিন সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শিকারের জন্য জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। যেতে যেতে সে যে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেছে সেই বনভূমি নাকি আবার শিবলোকের আওতার মধ্যে, এখানে শিবের সব নিয়ম চলে। জঙ্গলটা বিশেষ এক কারণে খুব অভিশপ্ত ছিল। একবার এই জঙ্গলে ভগবান শিব পার্বতীকে নিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। শিব-পার্বতীর ঐ একান্ত সময়ে সেখানে কিছু ঋষিরা এসে পড়েন। ঋষিদের দেখে পার্বতী তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে তাঁর কাপড়-চোপড় সরে যেতে খুব লজ্জায় পড়ে যান। তাতে শিব খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন 'এরপর থেকে যে এই জঙ্গলে প্রবেশ করবে সঙ্গে সঙ্গে সে পুরুষ থেকে নারী হয়ে যাবে'। সেই থেকে এই জঙ্গল অভিশপ্ত হয়ে আছে। সুদ্যুম্ন এখানে অজান্তে জঙ্গলে ঢুকে পড়তেই ওর ঘোড়া হয়ে গেল ঘোড়ী, নিজে আবার মেয়ে হয়ে গেল, আর সঙ্গে যত সৈন্যরা ছিল সবাই নারীতে রূপান্তরিতে হয়ে গেল। এগুলো আমাদের কাছে নতুন কিছু না। আমাদের ঋষি মুনিরা নারী পুরুষ এগুলোকে কোন গুরুত্বই দিতেন না, এঁদের কাছে পুরুষ নারীর কোন ভেদ ছিল না। নারী পুরুষের ভেদ বলতে আসলে কিছুই নয় এগুলো সব মিথ্যার একটা আবরণ, নারী-পুরুষ ভেদের পেছনে যে অভিন্ন সত্তা রয়েছে সেটাই সত্য, তাঁর দিকে মন দাও। ভেতরে জীব আছেন তাঁর ইন্দ্রিয় গুলোই প্রধান, ইন্দ্রিয়ের কাছে আবার পুরুষ নারীর কোন ব্যাপার থাকে না। যাই হোক, ইলা নামে যে কন্যা রূপে জন্মে ছিল, সেখান থেকে সে হয়ে গেল ছেলে, নাম হল সুদ্যুম্ন, আবার এই অভিশপ্ত জঙ্গলে এসে আবার হয়ে গেল মেয়ে ইলা। লজ্জার জন্য সে আর নিজের রাজ্যে ফিরেও আসতে চাইছে না। ইতিমধ্যে ইলার অসাধারণ রূপলাবণ্য দেখে বুধের

মাথা গেছে ঘুরে। ইলারও বুধকে পছন্দ হয়ে গেছে। ইলার সাথে বুধের বিয়ে হয়ে গেল। বুধ আবার চন্দ্রের পুত্র। বুধ কি করে চন্দ্রের পুত্র হয়েছিল তার আবার একটা বিরাট কাহিনী আছে।

সুদ্যুম্নের এখন হয়ে গেল মহাসমস্যা, সে এখন কোন্ পরিচয়কে ধরে রাখবে! ছেলে যদি না হয় এই সাম্রাজ্য কে চালাবে! কিন্তু মেয়ে হওয়াতে তার বেশ ভালোও লাগছে। কারণ বুধের থেকে তার সন্তানাদি হয়ে গেছে। তখন বশিষ্টদেব এর একটা সমাধান করে দিলেন 'তুমি এক মাস পুরুষ থাকবে আর এক মাস মেয়ে থাকবে'। ব্যাপারটা আরও মজার হয়ে গেল। যাই হোক এভাবেই সুদ্যুম্ন দু-কুল সামলাতে লাগল। বুধ আর ইলা থেকে পরে পুরূরবা নামে এক পুত্র জন্মায়। পুরূরবা খুব নামকরা পৌরাণিক চরিত্র এবং অনেক হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে পুরূরবার বেশ বড় ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। এই পুরূরবার সাথেই স্বর্গের অপ্সরা ঊর্বশীর বিবাহ হয়, এও এক লম্বা কাহিনী। যাই হোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সুদ্যুম্ন তার ছেলে পুরূরবাকে সাম্রাজ্য হস্তান্তর করে বাণপ্রস্থ নিয়ে তপস্যার জন্য বনে প্রস্থান করল। সুদ্যুম্ন ও ইলা থেকে দুটো বংশের ধারা বেরিয়ে এল। সুদ্যুম্ন রূপে তাঁর যত সন্তানাদি হল তারা হয়ে গেল সূর্যবংশ আর ইলা হয়ে বুধের সাথে থেকে যে সন্তানাদি হল তাদের বংশের নাম চন্দ্রবংশ। সূর্যবংশের খুব নামকরা ব্যক্তিত্ব হলেন শ্রীরামচন্দ্র, রাজা হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি। চন্দ্রবংশের খুব নামকরা বংশ হল যদু বংশ, যে বংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন।

মহর্ষি চ্যবন ও সুকন্যার কাহিনী

এর পরেই মহর্ষি চ্যবন আর সুকন্যাকে নিয়ে এক জমাট কাহিনী আসে। মহাভারতেও এই কাহিনী আছে। চ্যবন ঋষি একবার বহুদিন ধরে খুব কঠোর তপস্যা করছিলেন। এমন তপস্যা করছিলেন যে তিনি উঁইয়ের ঢিপিতে চাপা পড়ে যান। সুকন্যা ছিল রাজকুমারি। একদিন খেলা করতে করতে সুকন্যা এই উঁইয়ের ঢিপি দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে দেখে ঢিপের ভেতর থেকে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। সুকন্যা ভেবেছে কোন হরিণ হয়তো এর মধ্যে ঢুকে আছে। সে তখন চুলের কাঁটা নিয়ে ঐখান দিয়ে ফুটিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে দেখে ঐ ফুটো দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। আসলে ওটা ছিল চ্যবনের চোখ, যার জন্য চ্যবন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুকন্যাকে ঋষির অভিসম্পাত থেকে বাঁচাবার জন্য রাজাকে চ্যবনের সাথে সুকন্যার বিবাহ দিতে রাজী হয়ে গেলেন।

চ্যবন সুকন্যাকে নিয়ে যেখানে থাকতেন সেখানে একদিন দেবতাদের ডাক্তার অশ্বিনীকুমারদ্বয় এসে উপস্থিত হয়েছেন। অশ্বিনী কুমাররা ছিলেন দুই যমজ ভাই, দুজনে এক সঙ্গেই থাকতেন। হিন্দু সমাজে ডাক্তারি পেশাকে খুব নিচু পেশা বলে গণ্য করা হত। এই কারণে যজ্ঞে যে সোমরসাদির আহুতি দেওয়া হত, সেটা পান করার অধিকার অশ্বিনীকুমারদের ছিল না। এরা চ্যবনকে ধরে এই সোমরস পান করার ব্যবস্থা করতে চাইল। অন্য দিকে সুকন্যাকে দেখে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সুকন্যাকে পাওয়ার একটা সুপ্ত বাসনার জন্ম নিয়েছে। তারপর দুই অশ্বিনীকুমার আর চ্যবন তিনজনে পুকুরে স্নান করতে নেমেছে। যখন জল থেকে উঠে এল তখন তিনজনকেই এক রকম দেখতে হয়ে গেছে। সুকন্যাকে এখন বলা হল তুমি এখন ঠিক কর কে তোমার স্বামী। সুকন্যা, তার স্বামী যতই বৃদ্ধ হোক সে ছিল তার পতি দেবতা, খুব ভালোও বাসতেন আবার শ্রদ্ধাও করতেন। তখন সুকন্যা মনে মনে ঠিক করে নিলেন যে আমি যদি পতিব্রতা ধর্মে ঠিক থাকি তাহলে আমি যেন আমার স্বামীকে চিনতে পারি। তারপর তো সে চিনতে পারল আর তার পরিণামও খুব ভালো হয়ে গেল। বৃদ্ধ চ্যবন ঋষি পূর্ণ যৌবন ফিরে পেলেন। চ্যবন ঋষিও কৃতজ্ঞতা বশতঃ অশ্বিনীকুমারদের যজ্ঞের সোমরস পান করার অধিকারের ব্যবস্থা করে দিলেন। তার আবার এক লম্বা কাহিনী।

মান্ধাতা রাজার কাহিনী

তারপরে আছে মান্ধাতার কাহিনী। মান্ধাতা মানে অনেক যুগ আগেকার কথা। যুবনাশ্ব বলে এক রাজা ছিলেন। তাঁরও কোন সন্তান ছিল না। ঋষিরা ঐ রকম যজ্ঞ করে একটা ঘটিতে জল রেখে দিয়েছেন। ঐ জল ছিল মন্ত্রসিদ্ধ জল। একদিন এক গভীর রাত্রিতে যুবনাশ্বের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙতেই তার খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। কোথাও কাউকে না পেয়ে যুবনাশ্ব ঐ ঘটির জল পান করে নেন। সকালে ঋষিরা উঠে দেখছেন

ঘটিতে জল নেই। তাঁরা অনুসন্ধান করছেন ঘটির জল কোথা গেল। রাজা বলছে ‘রাত্রে খুব তৃষ্ণার্ত হওয়াতে আমি ঐ জল পান করে নিয়েছি’। ঋষিরা বলছেন ‘সর্বনাশ করেছেন, এই জল যে পান করবে তার গর্ভধারণ হয়ে যাবে আর তার থেকে এক সন্তান জন্ম নেবে, এখন কি হবে!’ রাজা পুরুষ হয়ে এখন গর্ভ ধারণ করে নিয়েছে। এই সব কাহিনী কেন লেখা হয়েছে আর কতটা সত্য আমরা কেউ বলতে পারবো না। যারা ডাক্তার তারা হয়তো বলতে পারবেন এসব কাহিনীর কতখানি বাস্তবতা আছে। কিন্তু এনারা এমন ভাবে কাহিনীকে সামনে নিয়ে আসবেন মনে হবে যেন কত স্বাভাবিক ব্যাপার।

এখন প্রসবের সময় হয়েছে। বাচ্চাটা বেরোবে কোথা দিয়ে, তার গর্ভধারীতো পুরুষ মানুষ। বাচ্চাটা তখন রাজার পেট চিড়ে বেরিয়ে এসেছে। তাতে সন্তানের বাবা গেল মরে। জন্মেই বাচ্চা কাঁদতে শুরু করেছে, কেননা তারতো খাওয়া চাই। এখন এই বাচ্চাকে খাওয়াবে কে। তখন ইন্দ্র বললেন ‘মাং ধাতা’, মানে আমিই একে খাওয়াব। সেই থেকে শিশুর নাম হয়ে গেল মান্ধাতা। বিচিত্র তাঁর জন্ম। মান্ধাতা পরে এত প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন যে বলা হয় তিনিই প্রথম রাজা যিনি সবার চাইতে প্রসিদ্ধ ও সফলতম রাজা হতে পেরেছিলেন। সেই থেকে যখন কেউ বলবে কতদিনের প্রাচীন? বলবে মান্ধাতা আমলের। মানে অনেক প্রাচীন।

সৌভরি ঋষির উপাখ্যান

এরপর আসছে সৌভরি ঋষির উপাখ্যান। সৌভরি ঋষির অনেক বয়স হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে একদিন অনেক ধ্যান ভজন করার পর এক জলাশয়ে স্নান করতে গিয়ে জলের মধ্যে দুটো স্ত্রী আর পুরুষ মাছকে খেলা করতে দেখতে পেলেন। মাছের ঐ খেলা দেখা সৌভরির মনে সংসার ভোগের বাসনা জেগে উঠল। সৌভরি বিরাট বড় ঋষি ছিলেন, সবাই তাঁকে জানত। ভোগের বাসনা জেগেছে, তাই তিনি সেই দেশের রাজার কাছে গেলেন। সেই রাজার আবার পঞ্চাশটি রাজকন্যা ছিল। ঋষি গিয়ে রাজাকে বললেন ‘আপনার একটি রাজকন্যাকে আমাকে দিয়ে দিন। আমি তাকে আমার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে চাই’। রাজা খুব ভয় পেয়ে গেছে। কারণ ইনি একে খুব বড় ঋষি, যদি না বলে দিই তাহলে কি অভিশাপ দিয়ে দেবে কোন ঠিক নেই। আর নিজের মেয়েকে কি করে এই বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবে। রাজা তখন বললেন ‘ঠিক আছে, ওদের স্বয়ম্বর হবে, আপনিও আসবেন, ওদের কারুর যদি পছন্দ হয় তখন বিয়ে করে নেবেন’। ঋষি ব্যাপারটা বুঝে গেছেন যে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমাকে কোন মেয়ে তার স্বামী রূপে পছন্দ করবে না বলে রাজা এই কায়দা করেছে। সৌরভি ঋষি নিজেকে অপমানিত মনে করে ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি বিশেষ এক তপস্যায় এমন জোর দিলেন যে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর চেহারাটা দেবতাদের মত হয়ে গেছে। ওই দিব্যকান্ত সুপুরুষ চেহারা নিয়ে তিনি আবার রাজার কাছে এসেছেন রাজার একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য। তারপর ওনাকে রাজকন্যাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ঋষির ওই কান্তিময় রূপ দেখে পঞ্চাশটি বোনের মধ্যে এবার রীতিমত চুলোচুলি লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে। ঋষির অমন দেবতা সুলভ সুপুরুষ আর কান্তিময় চেহারা দেখে তাঁকে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য বোনেদের মধ্যে রীতিমত রেষারেষি লেগে গেছে। ঋষি তখন রাজকন্যাদের বলছেন ‘তোমাদের আর মারামারি চুলোচুলি করে কাজ নেই, আমি তোমাদের সবাইকেই অর্থাৎ পঞ্চাশ জনকেই বিয়ে করে নিচ্ছি’।

পঞ্চাশটি সুন্দরী রাজকন্যা বোনকে বিয়ে করে যা হয়, ঋষির মনটা এই পুরো পঞ্চাশটা বউয়ের ওপরেই পড়ে রইল। ইনি আবার ঋক্ বেদের আচার্য ছিলেন আর খুব বড় তপস্বী ছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পরে হঠাৎ কি ভাবে তার মনে পড়ে গেল যে আমি এত বড় ঋষি, এত তপস্যা করেছি, যত রকমের ব্রত আছে, সবই পালন করেছিলাম। আমার যে ব্রহ্মতেজ তাকে আমি অনেক সামলে রেখেছিলাম, ক্ষণিকের জন্যও সেই তেজকে আমি অপক্ষয় হতে দিইনি। আর কয়েক পলকের জন্য দুটো মাছের খেলা দেখে আমার এই দুরবস্থা হয়ে গেল! আর তাতে আমার ব্রহ্মতেজ চলে গেল, সব তপস্যা নষ্ট হয়ে গেল, ছিঃ।

তখন তিনি বলছেন – *সঙ্গং ত্যজ্যেত মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষুঃ সর্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্ বহিরিন্দ্রিয়াণি। একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে যুঞ্জীত তদ্‌ব্রতি সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ।।৯/৭/৫১।* যে পুরুষের মধ্যে মুক্তি লাভের ইচ্ছে জেগেছে সেই পুরুষের কক্ষণ ভোগী প্রাণীদের ক্ষণিক মুহূর্তের জন্যও সঙ্গ করতে নেই। এই কারণে সন্ন্যাসীদের ভক্তদের সঙ্গে মাখামাখি করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়। যদি কোন সন্ন্যাসী কখন গৃহীভক্তের সঙ্গ করে তার বিপর্যয় হবেই হবে, আজ হোক কি কাল হোক, শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ফল পেকে গেছে খসবেই। যাদের উপরে ঠাকুরের অতি বিশেষ কৃপা আছে একমাত্র তারাই বাঁচতে পারে। সন্ন্যাসীদের বোঝা উচিৎ প্রত্যেক গৃহীভক্তই কম বেশী ভোগী। তাই মুমুক্ষদের প্রতি ভাগবতের সাবধাণ বাণী, তুমি যদি মুক্তি পেতে চাও, এই জীবনে মোক্ষ লাভ করতে চাও, তাহলে ভোগীদের সাথে কোন ধরণের সঙ্গ করা চলবে না, সে যত বড়ই গৃহীভক্ত হোক না কেন, করেছ কি সৌভরি ঋষির মত ফেঁসে গেলে। ভোগ আর ভোগীর সম্পর্কে আসা মানেই বিপর্যয় ঘনিয়ে আসা। সংসারী আর সন্ন্যাসী, দুজনের দুটো রাস্থাই আলাদা। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – ভক্তিমতি নারীও যদি হয় তার পাশে বসে কথা বলবে না, নারীর মুর্তিও দর্শন করতে নেই সন্ন্যাসীর। সৌভরির জীবনে তাই হল যার জন্যে সে বসে বসে চোখের জল ফেলছে আর বলছে – আমার এই ব্রহ্মতেজ, আমার এই তপস্যা সব কি হয়ে গেল!

তারপর সৌভরি বলছেন – যদি আদপে সঙ্গ করার লিপ্সা হয়, তাহলে যাঁরা ভগবানের একান্ত সেবক তাঁদের সঙ্গ করবে। একটা কথা আছে – Happiness Index। কোন্ মানুষ সবথেকে সুখী। আমেরিকানরা এর উপরে গবেষণা করে যা বার করেছে আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই তা জানে। ওরা বলছে যার যত পরিচিতি আছে, বন্ধু বান্ধব আছে সে তত সুখী। Happiness Index – মানে, আপনার সুখ কতটা সেটা কিভাবে মাপা যেতে পারে? মানুষের বন্ধু বান্ধব আর পরিচিতি দিয়ে। সত্যিকারের বন্ধু হতে হবে, মাইকেল জ্যাকসনের মত নয়, তার কোটি কোটি অনুরাগী ছিল কিন্তু বন্ধু বলে কেউ ছিল না, সবাই ওকে শুষে নেওয়ার জন্য বসে থাকত। সত্যিকারের বন্ধু বলতে যার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়, দুঃখে বিপদে একজন আরেকে জনের জন্য দৌড়ে যাবে, এটাই সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। যত এই ধরণের বন্ধু থাকবে তত সে সুখী, এটাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মৌলিক নিয়ম। মানুষ টাকা, সম্পত্তি, খাওয়া-দাওয়া পেয়ে কখনই সুখী হতে পারে না। সুখী তখনই হয়, যার কাছে সে নিজেকে মেলে দিতে পারবে এই রকম লোকের সংখ্যা যদি অনেক থাকে। স্কুলে বাচ্চা বয়সে শিশুরা খুব আনন্দে থাকে, কেননা সবাই তার বন্ধু। যেমন যেমন বড় হতে থাকে তার বন্ধু বান্ধবের গণ্ডিটাও ছোট হতে শুরু করে।

মানুষকে সব থেকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার একটাই উপায় – কারুর সঙ্গে থাকতে না দেওয়া। দ্বীপান্তর করা, জেলের কুঠুরির মধ্যে কয়েদীকে বন্দী করে রাখা হয় শুধু এই কঠোর শাস্তির দেওয়ার জন্য। কোন মানুষ যদি কারুর সঙ্গে কথা না বলতে পারে, কিছু দিন পরে সেই মানুষ অবশ্যই পাগল হয়ে যাবে। আপনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, আপনি ঋষি হয়ে গেছেন, কিন্তু আপনারও মনে ইচ্ছে হবে একটু কারুর সাথে সঙ্গ করি, দু চারটে কথা বলি। তখন কি করবেন? যদি করতে যান তাহলে সৌভরির মত মরবেন। তাই বলছেন, যদি ঐ রকম ইচ্ছে হয় তাহলে খোঁজ নাও কোথাও মহাত্মা, ভালো সাধু-পুরুষ আছেন কিনা, যদি সেই রকম সাধু মহাত্মাকে পাও তাহলে তাঁর সঙ্গ কর। কিন্তু ভোগী বা সংসারীদের ধারে কাছে যদি গেছ তাহলে বুঝে নাও তুমি কিন্তু বিপদের ফাঁদে পা ফেলে দিলে।

সৌভরি ঋষি বলছেন, আমি আগে একা একা তপস্যা করছিলাম, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য মাছের সঙ্গ করে এক থেকে পঞ্চাশ হয়ে গেলাম। আর ঐ পঞ্চাশের মাধ্যমে আমি আজকে পাঁচ হাজার হয়ে গেছি। সৌভরি এই ভাবে বিচার করছেন। তিনি এত দিন তপস্যা করেছেন, তপস্যাতো বৃথা হয়ে যাবে না। এইভাবে বিচার করতে করতে তাঁর মধ্যে আবার বৈরাগ্যের উদয় হল, বৈরাগ্যের উদয় হতেই তিনি সব ছেড়েছুড়ে আবার তপস্যায় চলে গেলেন। তাঁর পঞ্চাশ জন বউরাও কোন আপত্তি করল না – আপনি যখন চাইছেন আমরা আপনাকে বাধা

দেবো না, আর আমরাই বা এখানে কি করব। বউরাও সবাই সন্ন্যাস নিয়ে স্বামীর সাথে তপস্যায় চলে গেল। পরে তাদের সবারই উত্তম গতি হয়েছিল।

ত্রিশঙ্কুর কাহিনী

মান্ধাতার এক সন্তান ছিল, তার নাম ছিল অম্বরীশ। অম্বরীশ থেকে কয়েক প্রজন্ম পেরিয়ে আমরা সত্যব্রতকে পাই। এই সত্যব্রত পরে ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। সত্যব্রত ছিলেন রাজা কিন্তু নিজের পিতা ও গুরুর অভিশাপে তার শরীরটা তিন জায়গা থেকে বেঁকে গিয়েছিল, আর তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সত্যব্রতের মনে খুব ইচ্ছে হয়েছিল যে তিনি সশরীরে স্বর্গে যাবেন। তিনি যাঁর কাছেই এই ব্যাপারে সাহায্য চাইতে যান সবাই তাঁর অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করে ভাগিয়ে দিতেন। সব শেষে তিনি বিশ্বামিত্র ঋষির কাছে গেলেন। বিশ্বামিত্র শুনে বললেন – ঠিক আছে আমি তোমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাব। সত্যব্রত চণ্ডাল ছিল, এখন তিনি বিশ্বামিত্রকে গুরুরূপে বরণ করে নিলেন। বিশ্বামিত্র এমন তপস্যার জোর দিলেন যে, সেই তপস্যার প্রভাব সত্যব্রতকে সশরীরে স্বর্গলোকে নিয়ে হাজির করিয়ে দিলেন। স্বর্গের অধিবাসীদের কারুরই কোন স্থূল শরীর থাকে না। তখন স্বর্গবাসীরা মর্ত্যলোকের দেহধারী সত্যব্রতকে দেখে অবাক হয়ে গেছে – আরে! এই জীবাত্মাটা আবার দেহ ধারণ করে এখানে কি করে চলে এসেছে! পরে সবাই জানতে পারলো বিশ্বামিত্রের তপস্যার জোরে সত্যব্রত সশরীরে স্বর্গলোকে চলে এসছে।

ইন্দ্র তখন পদাঘাতে সত্যব্রতকে স্বর্গ থেকে ফেলে দিয়েছেন। ইন্দ্র সত্যব্রতকে স্বর্গ থেকে ফেলে দিতেই তিনি বিশ্বামিত্রের নামে খুব চেঁচাতে শুরু করেছে – প্রভু বাঁচান বাঁচান। তখন বিশ্বামিত্র এদিক থেকে সত্যব্রতকে বলছে 'সত্যব্রত তুমি ওখানেই থেমে থাকো'। সত্যব্রত তারপর আর ওখান থেকে পড়ছে না, আবার ঐদিক থেকে ইন্দ্র তাকে ওপরে যেতে দেবে না। এখন কি হবে? বিশ্বামিত্র দেখছেন ইন্দ্র সত্যব্রতকে স্বর্গে উঠতেই দিচ্ছেন না। তখন বিশ্বামিত্র বলছেন 'ঠিক আছে, ইন্দ্র স্বর্গে তোমাকে জায়গা না দিতে চায় না দিক, আমি আমার তপস্যার জোরে তোমার জন্য একটা নতুন স্বর্গই বানিয়ে দেবো'। বিশ্বামিত্রের তেজ আর তপস্যার শক্তির কথা দেবতাদের অজানা ছিলো না। দেবতারা তখন দৌড়ে এসে বিশ্বামিত্রের হাতে পায়ে ধরে বলছে 'হে মুনিবর, আপনি এই কাজ করতে যাবেন না, সৃষ্টির ব্যাপারে নাক গলাতে যাবেন না, বিধাতার নির্দিষ্ট নিয়মানুসারেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়, বিধাতার এই নিয়মকে আপনি উল্লঙ্ঘণ করবেন না'। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ঋষিরা প্রকৃতির কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারেন কিনা? কেন পারবে না। প্রচুর ঘটনা আছে যেখানে ঋষিরা সৃষ্টির কাজে মাথা গলিয়েছিলেন। অগ্যস্ত মুনি পুরো সমুদ্রকে পান করে নিয়েছিলেন। যার ফলে সমুদ্র শুকিয়ে গেল। কিন্তু সাধারণত ওনারা প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ করতে চান না। সৃষ্টির যে বিধান আছে সেটাকে তাঁরা কখনই অতিক্রম করেন না। কারণ সৃষ্টির সাথে যুক্ত আছে কর্মের বিধান।

তাই সত্যব্রতের আকাশের একটা তারা হয়ে ওখানে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেঁসেই আছে। স্বর্গেও যেতে পারল না, পৃথিবীতেও আসতে পারল না, আর মরল না বলে তার আর পুনর্জন্মও নেই। সেইজন্য কাউকে যখন নিন্দা করা হয় তখন বলে ত্রিশঙ্কু। বলে, সন্ন্যাসীরা যারা মুক্তি পাবে না, তারা সব ঐ ত্রিশঙ্কু হয়ে যায়। কেননা, একদিকে সন্ন্যাসী, মানে তার আর গৃহস্থ হওয়ার ইচ্ছেও নেই, আবার অন্য দিকে মুক্তিও হলো না, এখন যাবেটা কোথায়। সবাই তখন ঐ ত্রিশঙ্কুর কাছেই যাবে। তাই যারা বিয়েথা করে না তাদেরকে গালাগাল দিয়ে বলে ত্রিশঙ্কু। সে বিয়ে করে সংসারীও হলো না আবার সন্ন্যাসীও হলো না। আমাদের হিন্দু ধর্মে কখনই অবিবাহিত জীবনকে অনুমতি দেয়না। দুই একজন ছিলেন পিতামহ ভীষ্মের মত, কিন্তু হিন্দু ধর্মে গার্হস্থ জীবনে অবিবাহিত থাকাকে একেবারেই বরদাস্ত করা হয় না।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

সূর্যবংশের সন্তান হলেন সগর। সগরের কাহিনী আমাদের সবারই কিছু না কিছু জানা আছে। সগর রাজা বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। ইন্দ্র দেখছেন এই যজ্ঞ যদি সগর করে নেয় তাহলে সগর রাজা ইন্দ্রত্ব পদ পেয়ে যাবে, ইন্দ্র তখন তাঁর ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াটাকে কায়দা করে গঙ্গাসাগরে

কপিল মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখল। সগরের আবার ষাট হাজার সন্তান ছিল। এই ষাট হাজার ছেলে সমস্ত জায়গা খুঁজে খুঁজে কোথাও না পেয়ে পাতাল লোকে কপিল মুনির আশ্রমে এসে দেখে যজ্ঞের ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে। সগরের ছেলেরা কপিল মুনিকে গিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল 'ব্যাটা! চুরি করে এসে আবার চোখ বুজে এখানে ধ্যান করছে'। ষাট হাজার রাজপুত্রদের চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কিতে কপিল মুনির ধ্যানটা গেল ভেঙ্গে। ধ্যান ভাঙ্গতেই তিনি প্রচণ্ড রাগে বিস্ফারিত নেত্রে যেমনি সগরের ষাট হাজার পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন তক্ষুনি ষাট হাজার ছেলে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে গেল। সাগরের সব কটি ছেলেই মরে গেল। কিন্তু পরে সগর রাজাকে বলা হয়েছিল যে তোমার বংশেরই একজন বংশধর তোমার ষাট হাজার পুত্রকে উদ্ধার করবে।

তারপর সাগরের বংশে ভগীরথের জন্ম হল। ভগীরথ তপস্যা করে গঙ্গাকে মর্তে যখন নিয়ে এলেন তখন গঙ্গাকে কপিল মুনির আশ্রমের পাশ দিয়ে প্রবাহিত করে বঙ্গোপসাগরে মিশিয়ে দিলেন। আর সগরের ষাট হাজার সন্তানরাও জীবিত হয়ে গেল। এর অনেক আগে অগস্ত্য মুনি সমুদ্রকে পান করে নিয়েছিলেন বলে সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছিল। এখন গঙ্গা এসে সমুদ্রকে আবার জলে পরিপূর্ণ করে দিল।

নিমি রাজার কাহিনী

ভগীরথের কয়েক প্রজন্ম পরে এলেন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র হলেন সূর্যবংশের। ভাগবতে শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনীটা বলার পর সূর্যবংশের বিবরণটার ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে। এরপরে সূর্যবংশ মোটামুটি একটা স্থিতিশীলতায় পৌঁছে গিয়েছিল। এই সূর্যবংশে এক রাজা ছিলেন যার নাম নিমি। নিমির একবার ইচ্ছে হল একটা যজ্ঞ করবেন। তাঁর গুরু ছিলেন বশিষ্ট মুনি। বশিষ্ট মুনিকে যখন যজ্ঞ করবার জন্য অনুরোধ করা হল, তখন বশিষ্ট মুনি বললেন 'কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে, আমি এখন ইন্দ্রের একটা যজ্ঞ করাতে যাচ্ছি। ওখান থেকে ফিরে আসার পর যজ্ঞ করা যাবে'। এদিকে নিমির মনে হলে মানুষের জীবনতো ক্ষণভঙ্গুর, কবে মরে যাব ঠিক নেই, ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে বশিষ্টের ফিরতে অনেক বছর লেগে যাবে। এই ভেবে উনি নিজেই বশিষ্ঠ মুনির অনুপস্থিতিতে যজ্ঞ করতে শুরু করে দিয়েছেন।

এদিকে তো নিমি যজ্ঞ করতে শুরু করে দিয়েছেন। যজ্ঞ চলছে। যজ্ঞ শেষ হতে যাচ্ছে, তখন বশিষ্টদেব ফিরে এসে দেখছেন আমাকে ছাড়াই এরা যজ্ঞ করে নিয়েছে। বশিষ্টদেব নিমির কাণ্ড দেখে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে নিমিকে অভিশাপ দিয়ে বললেন 'এক্ষুণি তোমার যেন মৃত্যু হয়ে যায়, আমি তোমার রাজগুরু, আমার অনুমতি ছাড়া আর আমাকে বাদ দিয়ে তুমি এই যজ্ঞ করেছ!' রাজগুরুর কথা শুনে নিমি বলছেন 'আপনি অকারণে আর অন্যায় ভাবে আমাকে অভিশাপ দিলেন। আমি এই যজ্ঞ উপযুক্ত ভেবেই করেছিলাম, আর আমিও আপনাকে পাল্টা অভিশাপ দিচ্ছি, আপনি এক্ষুণি মরে যান'। বশিষ্ট মরে গেলেন। চেলার অভিশাপে গুরু আর গুরুর অভিশাপে চেলা দুজনেই মরে গেলেন।

ইতিমধ্যে যেসব ব্রাহ্মণরা যজ্ঞাদি করেছিলেন তাঁরা এখন তাঁদের দক্ষিণা প্রাপ্তির ব্যাপারে আশঙ্কা করতে শুরু করেছেন, কারণ যজমানইতো মরে গেছে, দক্ষিণা কে দেবে! সব ব্রাহ্মণরা মিলে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করল। দেবতাদের বলা হল নিমির কোন দোষ ছিল না। দেবতাদের ব্রাহ্মণ ঋত্বিকরা অনুরোধ করে বললেন *রাজ্ঞো জীবতু দেহোহয়ং প্রসন্নাঃ প্রভবো যদি। তথেত্যুক্তে নিমিঃ প্রাহ মা ভূন্মে দেহবন্ধনম্।।৯/১৩/৮।* 'হে দেবগণ! আপনারা যদি প্রসন্ন হন তবে এই নিমি রাজার দেহ আবার জীবিত হয়ে উঠুক। দেবতারা 'তথাস্তু' বলতেই নিমি রাজার মনে হল তিনি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। নিমি জেগে উঠে বলছে '*মা ভূন্মে দেহবন্ধনম্* – এই দেহটা একটা বন্ধন, আমি বন্ধন চাই না'। নিমির এই কথার মধ্যে একটা গভীর তাৎপর্য আছে।

শ্রীশ্রীমায়েরও একবার এই ধরণের একটা অবস্থা হয়েছিল। সেই সময় মায়ের শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল। তিনি শুয়ে আছেন। হঠাৎ তাঁর মনটা দেহ থেকে বাইরে চলে এল। তিনি শরীর থেকে বেরিয়ে দেখতে পাচ্ছেন তাঁর জরাজীর্ণ শরীরটা পুরনো বস্ত্রের মত বিছানায় পড়ে আছে। শ্রীমায়ের তখন ইচ্ছেই হচ্ছিল না যে আবার ঐ

শরীরটার মধ্যে প্রবেশ করেন। আমাদের অবস্থা ভিখারীর মত, একটাই জামা গায়ে আর সেই জামাটাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছি না। তাই আমাদের একবারও মনে হয় না আমি এই দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, এই দেহের আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানে নিমি রাজার ঠিক তাই মনে হচ্ছে। খুব গরীব কোন কাঙালী হঠাৎ করে প্রচুর টাকা পয়সা পেয়ে বড়লোক হয়ে গেছে। এখন সে ইচ্ছে করলে রাজার মত থাকতে পারবে, আবার ইচ্ছে করলে আগের গরীব কাঙালীর মত জীবন-যাপন করতে পারে। যখন মনে হবে এই শরীরে কি আর আছে, যত সব আবর্জনা মাত্র, তখন বুঝতে হবে তিনি আধ্যাত্মিকতার এক উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন। যাঁরা সন্ন্যাসী, যারা মুক্তির পথে যান, শরীরের ব্যাপারে তাঁদের এই বোধটা সত্যিকারের হয়, যখন মনে হবে এই শরীর, এই বন্ধু বান্ধব, এই জগৎ বিরক্তিকর, আমি এই সংসারের কিছুই চাইনা। আমি আপনি এই জগতে কেন এখনও পড়ে রয়েছি? কারণ এই জগতের কিছু কিছু জিনিষের প্রতি আমাদের এখন প্রবল আকর্ষণ আছে, কিছু ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আসক্তি আছে। এমন কিছু কিছু সুপ্ত ভালো লাগার জিনিষ আমাদের মনের গহ্বরে পড়ে আছে যেটা আমরা জানতেও পারি না। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন এই জগতের কোন কিছুর প্রতি আর কোন টান থাকবে না, সব কিছুতেই বিরক্তির ভাব এসে যাবে, তখন কোন কিছুই তাঁর মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বুড়ো বয়সে মানুষ যখন দুঃখ-কষ্ট পেতে থাকে তখন বলতে থাকে আমি আর কিছু চাই না, কবে ভগবান আমাকে নেবেন। যাদের এখনো আসক্তি আছে তাদের এই বিরক্তির ভাব আসবে না। ভগবান কিন্তু সব সময়, প্রতি মুহূর্তে আমাদের দুঃখ-কষ্ট আঘাত দিয়ে বলতে চাইছেন – বাবা, তুমি ওসব ছেড়ে বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এসে মুক্তির পথ অবলম্বন কর। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনা, বুঝলেও বেরিয়ে আসতে চাই না।

তখন নিমি বলছে *যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ। ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ।।৯/১৩/৯।* যাঁরা বিচারশীল, বিবেকবান, বুদ্ধিসম্পন্ন মণীষী তাঁরা তাঁদের মন প্রাণ চিত্ত সব সময় ভগবান শ্রীহরির চরণে নিবদ্ধ করে দেন। এই শরীরের আজ হোক কাল হোক পতন হবেই, আমার শরীরের যখন একবার পতন হয়ে গেছে আমি আর এই দেহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই না। তখন দেবতারা বলছেন 'নিমি এত বড় পূণ্যবান রাজা, জগতের মঙ্গালার্থে নিমির মত ভালো রাজার অত্যন্ত প্রয়োজন, আর আমরা তো নিমিকে বাঁচিয়ে দিয়েছি সে তো আর মৃত্যুলোকে যেতে পারবে না। তাহলে কি হবে'? তখন সবাই মিলে ঠিক করল জগতে যত প্রাণী আছে, সমস্ত প্রাণীর চোখের পাতার মধ্যে নিমিকে বসিয়ে দাও। এখন নিমি সমস্ত প্রাণীর চোখের পাতার মধ্যে অশরীরি রূপে অমর হয়ে থাকবেন। সেই থেকে চোখের পাতা ফেলতে যে সময়টুকু লাগে সেই সময়ের ব্যপ্তিকে বলা হয় নিমেষ। নিমি এখনও সূক্ষ্ম শরীরে এই ভাবে সমস্ত প্রাণীর চোখের পাতায় বাস করেন আর সব সময় ঈশ্বর চিন্তন করে যাচ্ছেন।

এখন রাজার কোন শরীর নেই, তাহলে রাজ্য চলবে কি করে! এর আগে আমরা দেখেছিলাম এক রাজা মারা যাওয়াতে তার শরীরকে মন্থন করা হয়েছিল। এখানেও রাজার মৃত শরীরকে মন্থন করা হল। মন্থন করতেই সেই মৃত শরীর থেকে উৎপন্ন হল এক কুমারের। অসাধারণ ভাবে জন্ম হওয়াতে ওই কুমারের নাম হল জনক। বিদেহ থেকে উৎপন্ন হওয়ার দরুণ তার আরেকটি নাম রাখা হল বৈদেহ। আর মন্থনের দ্বারা তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম দেওয়া হল মিথিল। যেখানে তিনি রাজত্ব করতে লাগলেন সেই রাজ্যের নাম হয়ে গেল মিথিলা। মিথিলার যিনি রাজা তিনি হলেন বিদেহ, পরে জনক নামেই সুপরিচিত হন। তারপরে এমন নিয়ম হয়ে গেল যে, মিথিলার যিনি রাজা হবেন তারই নাম হবে জনক। আবার মিথিলার রাজার উপর এক আশীর্বাদ ছিল, যিনি এই বংশে রাজা হবেন তিনিই আত্মজ্ঞানী হবেন। মিথিলার যিনিই রাজা হন তাঁকে রাজা জনক নামেই সম্বোধন করা হয়। রাজা জনকের সাথে শুকদেবের একটা বড় যোগসূত্রও আমরা পাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে রাজা জনকের রাজদরবারে অনেক ঋষিদের সাথে আত্মতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। শুকদেবের সাথে যে জনককে আমরা পাই, আর বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে জনকের কথা বলা হয়েছে তাঁরা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে একই ব্যক্তি কিনা এখন বলা মুশকিল।

চন্দ্রমা ও দেবগুরু বৃহস্পতির বিবাদ

এই হল মোটামুটি সূর্যবংশের কাহিনী। এরপর আসছে চন্দ্রবংশ। মরীচির মত অত্রিও ব্রহ্মার আরেক পুত্র ছিল। অত্রি মুনি যখন তপস্যা করছিলেন তখন তাঁর চোখ থেকে চন্দ্রমার জন্ম হল। ঋষির চোখ থেকে যেহেতু জন্ম হয়েছে সেইহেতু চন্দ্রমাও এক ঋষিপুত্র। নাতি চন্দ্রমার উপর ব্রহ্মার একটা অপত্য স্নেহ ছিল। ব্রহ্মা তাই নাতিকে কৃপা করে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ওষধি ও নক্ষত্রদের অধিপতি করে দিলেন। অন্য দিকে চন্দ্রমা আবার মানুষের মনের অধিষ্ঠাত্রি দেবতা। যার জন্য বলা হয় চন্দ্রমা দুর্বল থাকলে নানা রকমের মাথার গণ্ডগোল হয়। মজার ব্যাপার মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের ইংরাজীতে বলা হয় লুনাটিক পেশেন্ট, লুনাটিক শব্দটা এসেছে লুনার থেকে, লুনার মানে চন্দ্র।

ব্রহ্মার কৃপাতে চন্দ্রমার হাতে এখন অনেক ক্ষমতা এসে গেছে, সমস্ত ব্রাহ্মণদের নিয়ন্তা, যত গাছ-গাছাড়ি, ওষধি, সমস্ত নক্ষত্রের, এমনকি সবার মন, এতগুলো জিনিষের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা চন্দ্রমার হাতে। তার সাথে প্রচণ্ড রূপবান হওয়াতে সব মিলিয়ে চন্দ্রমার অহঙ্কারটাও স্বাভাবিক ভাবে সেই তুলনায় খুব বেড়ে গেছে। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি আর অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য। বৃহস্পতির স্ত্রীর নাম তারা, পরে তাঁদের কচ নামে এক সন্তান হয়। তারা দেখতে ছিল খুব রূপসী। তারার রূপ যৌবন লাবণ্যের আকর্ষণে চন্দ্রমা তারার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। নিজের রূপ আর ক্ষমতার অহঙ্কারে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সে একদিন তারাকে অপহরণ করে পালিয়ে যায়। অপহরণ করার এই রোগটা আজকের নয়, আমাদের পরম্পরাতে এটা আগে থাকতেই হয়ে আসছে। এখানে আবার যাকে তাকে অপহরণ করা হয়নি! দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি, তাঁর বউকে নিয়ে পালিয়েছে! কে কিডন্যাপ করল? চন্দ্রমা, সে নিজেও একজন দেবতা, আবার ঋষিপুত্র। ব্রহ্মার নাতি চন্দ্রমা দেবতাদের গুরুদেবের বউকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

এই নিয়ে স্বর্গে বিরাট হৈচৈ পড়ে গেছে। দেবগুরু বৃহস্পতি বলছেন 'আমি দেবতাদের গুরু আর দেবতারাই আমার স্ত্রীকে চুরি করে পালাল! আমি তোমাদের ছেড়ে চললাম বাপু, আমাকে আর তোমাদের গুরুগিরি করার দরকার নেই'। এই খবর গিয়ে আবার পৌঁছে গেল শুক্রাচার্যের কানে। তিনি দেখলেন এই সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে অসুরদের গিয়ে বললেন 'দেবতাদের গুরু স্বর্গ ছেড়ে চলে গেছেন এক্ষুণি দেবতাদের আক্রমণ কর'। অসুররা দেবতাদের আক্রমণ করে দিয়েছে, আর দেবতারা অতর্কিত আক্রমণে প্রচণ্ড মার খেতে লাগল। দেবতারা দেখছেন কোন পথ নেই, শিগ্‌গিরি গিয়ে বৃহস্পতিকে ফেরত নিয়ে আসতে হবে। দেবগুরুকে গিয়ে বলছে বাঁচান। বৃহস্পতি বলছে 'আমার বউকে কিডন্যাপ করেছ, আবার আমাকেই কিনা বলছ বাঁচাতে! আমি তোমাদের জন্য কোন কিছুই করতে পারবো না'। তখন সবাই চন্দ্রমাকে গিয়ে ধরেছে, তুমি তাড়াতাড়ি তারাকে ফেরত দাও, তা নইলে আমরা সবাই মারা যাব। চন্দ্রমা তারাকে ফেরত দিতে এসে সবাই দেখছে ইতিমধ্যে তারা গর্ভবতী হয়ে গেছে। তখন আবার এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হল, গর্ভের সন্তান বৃহস্পতির না চন্দ্রমার। এইভাবে চলতে চলতে সন্তানের জন্ম হয়ে গেছে। সন্তানকে দেখতে এত সুন্দর হয়েছে যে এই নিয়ে আবার বৃহস্পতির আর চন্দ্রমার মধ্যে লেগে গেল কাজিয়া। বৃহস্পতি বলতে চাইছে এই সন্তান আমার থেকেই হয়েছে। চন্দ্রমা মনে করছে না এই সন্তান যখন এত সুন্দর দেখতে হয়েছে তবে নিশ্চয় আমার থেকেই হয়েছে। শেষে তারাকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে এ কার সন্তান। চন্দ্রমার দিকে তাকিয়ে তারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল এই সন্তান চন্দ্রমার। যেই বলে দিয়েছে চন্দ্রমার সন্তান তখন আবার বিরাট এক প্রস্থ ঝামেলা। সবাই বলে স্বর্গে কত সুখ! পৃথিবীলোক থেকে স্বর্গের অশান্তি কোন অংশে কম নেই, এ ওর বউ নিয়ে পালাচ্ছে, কে কার সন্তান সেই নিয়ে ঝামেলা আর তার উপর আছে অসুরদের সাথে মারামারি কাটাকাটি।

পুরুরবা-উর্বশীর কাহিনী

এই সন্তান আমার থেকেই হয়েছে বলে চন্দ্রমার খুব গর্ব। চন্দ্রমা সন্তানের নাম রাখলো বুধ। এর আগে আমরা দেখেছিলাম সূর্যবংশের সুদ্যুম্ন যখন অজান্তায় অভিশপ্ত জঙ্গলে প্রবেশ করে নারী হয়ে ইলা হয়ে গেছে

তখন বুধের ইলাকে দেখে এত পছন্দ হয়েছে যে সে তাকে বিয়ে করে নিল। এবার বুধ আর ইলার থেকে যে সন্তান হল তার নাম পুরুরবা।

একবার পুরুরবার সঙ্গে কিভাবে ঊর্বশীর দেখা হয়ে যায়। দেখা হতেই দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেলে। এদিকে পুরুরবা মানব দেহধারী অন্য দিকে ঊর্বশী স্বর্গের দিব্যদেহধারিণী। অনেক বৈপরিত্য সত্ত্বেও ঊর্বশী এখন পুরুরবার সঙ্গে থাকতে শুরু করে দিয়েছে। স্বর্গ থেকে ঊর্বশী চলে যাওয়াতে সেখানে আবার আরেক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ঊর্বশীকে ফেরত আসতে হবে, স্বর্গের অধিবাসী হয়ে কতদিন স্বর্গের বাইরে থাকবে! সে এক বিরাট লম্বা কাহিনী। ঊর্বশীকে স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য দেবতারা কায়দা করে ঊর্বশীকে দুটো ভেড়া দিয়ে বলল এই দুটো ভেড়াকে রাজমহলে তুমি সামলে রাখ, আর পুরুরবাকে প্রতিজ্ঞা করে বলে দাও পুরুরবাকে যেন তুমি কখন বস্ত্রহীন অবস্থায় না দেখে ফেল, যদি দেখে ফেল তাহলে সেই মুহূর্তে তুমি পুরুরবাকে ত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে যাবে। পুরুরবা আর ঊর্বশীর সংসার বেশ ভালোই চলতে লাগল। কিন্তু কিছু দিন পরে দেবতারা একদিন চুপি চুপি ঐ ভেড়ার বাচ্চা দুটোকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। ভেড়া দুটো যখন ভ্যা ভ্যা করে চেঁচাচ্ছে। ঊর্বশী তখন পুরুরবাকে বলছে আমার ভেড়ার বাচ্চাগুলোকে তুমি বাঁচাও। সে তখন তাড়াতাড়ি কোন রকমে একটা অস্ত্র নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। সেই সময় চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণ চারিদিক আলোকিত করে রেখেছে। আর ঐ আলোতে ঊর্বশী পুরুরবাকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখে ফেলেছে। ঊর্বশী তখন বলছে – আমি চললাম। কেননা শর্ত ছিল তোমাকে যেন আমি কখন বস্ত্রহীন অবস্থায় না দেখি। দেবতারা কৌশল করে ঊর্বশীকে ওখান থেকে স্বর্গের ফেরত নিয়ে এল।

এদিকে ঊর্বশীকে হারিয়ে পুরুরবা হয়ে গেছে পাগল। ঊর্বশীকে ছাড়া সে থাকবে না। এরপর বিশাল নাটকীয় ঘটনা আর কাহিনীর পর কাহিনী চলছে। মূল কথা হল, পুরুরবা তখন মনের কষ্টে একটা জঙ্গলে চলে গেল, সেখানে একটা গাছের ডালকে নামিয়ে অগ্নি মন্থন শুরু করল। যাতে পুরুরবা আর ঊর্বশীর থেকে একটা সন্তান হয়। ঊর্বশী সেখানে নেই, কিন্তু যজ্ঞের সাহায্যে সন্তান প্রাপ্তিকে সম্ভব করতে চাইছেন। পুরুরবা এইভাবে যত বার মন্থন করছে ততবারই সেই মন্থন থেকে অনেক কিছু জন্ম নিতে থাকল। এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক আসে আর এই শ্লোকে যে তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে এই তত্ত্ব আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে ঘুরে ঘুরে অনেক জায়গায় আসবে। *এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ।।৯/১৪/৪৮।* ত্রেতাযুগের আগে সত্য যুগে প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল, প্রণব মানে ওঁ। যত বেদ, শাস্ত্র সব এই প্রণবে অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর একমাত্র দেবতা ছিলেন নারায়ণ। অগ্নি একটাই ছিল, আর বর্ণ ছিল একটা, তার নাম ছিল হংস। এখন যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারটে বর্ণ, তখন এই হংস একটাই বর্ণ ছিল। প্রথমের দিকে সব কিছুই একটি একটি করে ছিল। বেদ একটি – ওঁ, দেবতা একজন – নারায়ণ, অগ্নি একটি আর বর্ণও একটি। যখন পুরুরবার কারণে ত্রেতা যুগ শুরু হল তখন বেদ তিনটে হয়ে গেল, অগ্নি তিনটে হয়ে গেল যাদের নাম – আহ্বনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি। বর্ণও তিনটি হয়ে গেল – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। তখন শূদ্রকে সেইভাবে বর্ণের মধ্যে গণ্য করা হয়নি, পরে বিশেষ করে মহাভারতের সময়ে শূদ্রকে বর্ণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পুরুরবা থেকে শুরু হল চন্দ্রবংশ। এর পরে পুরূরবা থেকে এই বংশে এলেন জমদগ্নী, পরশুরাম। পরশুরাম ছিলেন বিরাট তপস্বী আর সেই কারণে প্রচুর শক্তিও ছিল তাঁর। পরশুরামের দুটো খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। সহস্রবাহু অর্জুন বলে একজন খুব ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। একবার জমদগ্নীর আশ্রম থেকে মুনিকে না জানিয়ে আশ্রমের একটা কামধেনু গরুকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিলেন। খবর পেয়ে পরশুরাম সহস্রবাহু অর্জুনকে এক দীর্ঘ যুদ্ধে নিহত করে সেই কামধেনুটিকে উদ্ধার করে আনলেন। জামদগ্নি মুনি যখন শুনলেন তাঁর পুত্র রাজাকে বধ করেছে তখন তিনি পরশুরামকে বলছেন — সার্বভৌম রাজার বধ ব্রাহ্মণ বধের থেকেও গুরুতর পাপ, এই পাপ স্খালন করার জন্য তোমাকে ভগবানকে স্মরণ করতে করতে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে এক বৎসর যাবৎ তীর্থ পর্যটনাদি করতে হবে। এরপর একের পর এক প্রচুর কাহিনী — পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন, বিশ্বামিত্র সহ বিভিন্ন রাজাদের বংশাবলীর বিবরণ, রাজা যযাতির কাহিনী, দুষ্মন্তের কাহিনী, ভরতের কাহিনী ইত্যাদি নিয়ে এই নবম স্কন্ধ।

মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক আর সমস্ত পুরাণ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ শ্লোক হয়ে যায়। ভাগবত পুরাণের প্রথম খণ্ডে প্রায় বারো হাজারের কিছু বেশি শ্লোক আছে, এই রকম চল্লিশটা মোটা মোটা খণ্ড হলে তবে গিয়ে সমগ্র পুরাণকে সন্নিবেশিত করা যাবে। এরপর আবার আঠারোটা উপ-পুরাণ আছে। হিন্দু ধর্মের যা কিছু শক্তি এই পুরাণ আর উপপুরাণই হল তার উৎস। পুরাণের যে কোন কাহিনীই অন্য পুরাণেও কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। পুরাণ দিয়েই বোঝা যায় হিন্দু ধর্মের বিশালত্বটা কতখানি। মোটামুটি সব পুরাণ একই কথা বলছে। কিন্তু দেবতাদের কিছু কিছু স্তুতি পাল্টে যাবে, কাহিনীও কোথাও কোথাও পাল্টে যাবে, কিন্তু বংশ আর বংশানুচরিতের বর্ণনা কোথাও পাল্টাবে না। আমরা এবার দশম স্কন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

দশম স্কন্ধ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রাক্‌কালীন বর্ণনা

দশম স্কন্ধই ভাগবতের সব থেকে উল্লেখনীয় স্কন্ধ। এই স্কন্ধ প্রধানত শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব আর তাঁর লীলাকে আধার করেই এগিয়েছে। বংশ আর বংশানুচরিত বিশেষ করে সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শোনার পর পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলছেন 'হে ভগবন্! আপনি সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশের কথা বললেন, তার সাথে যযাতির থেকে সৃষ্ট যদু বংশের ইতিহাসও আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত ভাবে শুনলাম। পরিবর্তি কালে এই যদুবংশে স্বয়ং ভগবান নিজ অংশ রূপে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র চরিত্রকথা আমাদের শোনান। হে শুকদেব, আপনি যে এত কথা বললেন সব শোনার পর এখন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কথা শুনতে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে'। ভাগবতের প্রারম্ভিক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মহাভারত রচনার করার পরেও ব্যাসদেব মানসিক তৃপ্তি ও শান্তি পাননি। তাঁর মনের মধ্যে সব সময় একটা অবসাদ ও অতৃপ্তির ভাব যেন নাড়া দিত। ব্যাসদেবের মানসিক অতৃপ্তি ও অশান্তির অবস্থা নারদ জানতে পেরে ব্যাসদেবকে বলেছিলেন 'দ্যাখো বাবা, তুমি এক মহান কালজয়ী বিশাল সাহিত্য রচনা করেছ ঠিকই, কিন্তু তাতে তুমি ভগবানের কথা সেই অর্থে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করোনি। মহাভারতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যুদ্ধ, নীতিকথা খুবই আছে কিন্তু ঈশ্বরের কথা সেভাবে কিছুই নেই। সেইজন্য তোমাকে বলছি, তুমি ভগবানের কথা কিছু লেখ'। যদিও এর আগের স্কন্ধগুলিতে কিছু কিছু ভগবানের স্বরূপের কথা এবং বিভিন্ন অবতারে ভগবানের লীলাকথার বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু দশম স্কন্ধে পুরোপুরি শুধু ভগবানের লীলাকথারই বর্ণনা করা হয়েছে।

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলছেন 'আমার এই শরীর, যে শরীরে আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই শরীরকে যিনি অশ্বত্থামা দ্বারা নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং কৌরব আর পাণ্ডব এই দুটো বংশেরই যিনি সহায় ছিলেন, তাঁর কথা আপনি আমাকে বলুন'। পরীক্ষিৎএর মূল বক্তব্য হল শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র ভগবান, যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, জগতের মঙ্গলার্থে যিনি অবতার রূপে নেমে এসেছেন, সেই তিনি আমার উপর বিশেষ কৃপা করেছেন। ব্যাপারটা দুই রকমের হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার রূপে এসেছেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তার একটা মাহাত্ম্য আছে, আবার সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ কারুর উপর বিশেষ কৃপা করেছেন, তার ক্ষেত্রে সেটা হয়ে গেল দ্বিগুণ, একেই তিনি ভগবান আবার তিনি তাঁকে বিশেষ কৃপা করেছেন। তাই পরীক্ষিৎ বলছেন যে আমি তাঁর ব্যাপারে বিশেষ রূপে আগ্রহ, আপনি তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারতি ভাবে বলুন।

এখানে ভাগবতে একটা খুব সুন্দর শ্লোক পাওয়া যায়, এই শ্লোকের মাধ্যমে বোঝা যায় হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য এবং ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কিভাবে এগিয়েছে। শুকদেবের কাছে পরীক্ষিৎ জানতে চাইছেন – *বীর্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ। প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্।।১০/১/৭।* এই যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই স্বয়ং নারায়ণ, আর যত দেহধারী আছে সমস্ত প্রাণীর ভেতরে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত হয়ে সবাইকে তিনি তাঁর অমৃতত্ব ও বীর্য দান করছেন। হে মুনিবর!

সেই মায়া-মনুষ্যধারী ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য রসে পরিপূর্ণ লীলাকথা আমাদের বলুন। এই শরীর কেন চলছে? ভগবান আমাদের শরীরের ভেতরে অন্তর্যামী রূপে আছেন বলেই এই শরীরটা চলছে। তিনি যদি ভেতরে না থাকেন তাহলে এই শরীরটাই একটা জড় পদার্থ রূপে পড়ে থাকবে। এই মানবদেহ যতক্ষণ সজীব আছে ততক্ষণ মানব চেষ্টা করলে মুক্তি লাভ পর্যন্ত করতে পারে। তার মানে, যিনি নারায়ণ, যিনি অমৃতত্ব দিচ্ছেন, তিনি চাইলে আমাদের মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। একদিকে তিনি ভেতরে বসে অমৃতত্ব দিচ্ছেন আবার তিনি সর্বব্যাপী কাল রূপে সবার মুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন। কালের অর্থ হয় সময়। কিন্তু এখানে কাল মানে মৃত্যু, কাল রূপে তিনি সব গ্রাস করে নেন। এটাই ভগবানের লীলা – একদিকে তিনি অন্তর্যামী হয়ে আমাদের অমৃতত্ব দান করছেন তিনিই আবার কাল হয়ে আমাদের গ্রাস করছেন।

পরীক্ষিৎ তখন উত্তরার গর্ভে, সেই সময় অশ্বত্থামা পরীক্ষিতের উপর চালিয়ে দিয়েছিল ব্রহ্মাস্ত্র। যুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাপন্ন হয়ে নিতান্ত কাতর স্বরে বলছেন 'আমাদের বংশ লোপ পেতে চলেছে, হে প্রভু! আপনি রক্ষা করুন'। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাতর অনুরোধে তখন উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে নিজের আবরণ দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের তাপ পরীক্ষিৎ পর্যন্ত যেতে পারছিল না, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের আলোটা দেখতে পারছিল আর বুঝতে পারছে আমাকে একজন রক্ষা করছেন। জন্ম নেওয়ার পর সেই গর্ভস্থ সন্তান সবার মুখের দিকে তাকিয়ে ঈক্ষণ করে বুঝতে চেষ্টা করছিল, কে সেই তিনি যিনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন। জন্মের পর পরীক্ষা বা ঈক্ষণ করছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল পরীক্ষিৎ। সেই পরীক্ষিৎ এখন শুকদেবের কাছে জানতে চাইছেন সেই ভগবানের কি বৈশিষ্ট্য, যিনি ভেতরে থেকে সমস্ত প্রাণীকে অমৃতত্ব আর তাঁর বীর্য প্রদান করছেন আর বাইরে থেকে তিনি মৃত্যু দিচ্ছেন।

এই ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা বললে আরো পরিষ্কার হবে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গলায় ক্যানসার রোগগ্রস্ত হয়ে ঠাকুর শয্যাশায়ী। সেই অবস্থায় একদিন স্বামীজীর গর্ভধারিণী কাশীপুরে এসেছেন ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করতে। বলছেন 'সামনে আইন পরীক্ষা, নরেন একেবারেই পড়াশুনা করছে না, সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়'। শুনে ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন 'নরেন তুই শিগ্‌গিরি বাড়ি যা, বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় মন দে'। নরেনকে নিয়ে তাঁর মা গাড়ি করে যাচ্ছেন আর নরেনকে বলছেন 'দেখলিতো, ঠাকুরও বলছেন তোকে বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনাটা করতে'। নরেন বলছেন 'হ্যাঁ, তিনি চোরকে বলেন চুরি কর আর গৃহস্থকে বলেন জেগে থাক। তা, তিনি সাপ হয়ে কামড়ান আর ওঝা হয়ে ঝাড়েন'। সবটাই তাঁর, ভালোটাও তাঁর মন্দটাও তাঁর। সেই ভগবানের লীলাকথা পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছে শুনতে চাইছেন। পরীক্ষিৎ বলছেন *নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুণ্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে। পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্।।১০/১/১৩।* হে শুকদেব! আমার মৃত্যু আসন্ন। আমি শুধু অন্নই নয় জল পর্যন্ত পরিত্যাগ করে দিয়েছি, তথাপি এই দুঃসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা (যার কারণ আমি মুনির গলায় মৃত সাপ ঝুলিয়ে যে অন্যায় কাজ করেছিলাম) আমাকে সামান্যতম কষ্ট দিচ্ছে না। তার কারণ আমি আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবৎলীলামৃত অবিরাম পান করে চলেছি।

এটাই ভগবানের লীলার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যেটা সাধারণ মানুষ বা কোন দেবতাও পারবে না। অন্যান্য যত জীব আছে, দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, যাই বলুন এরা সবাই শুধু একটা জিনিষই পারে কিন্তু ভগবান দুটো বিপরীত ধর্মী জিনিষ করতে পারেন। প্রাণীর সঙ্গে ভগবানের এটাই পার্থক্য। ভগবান আমাদের জীবনও দিতে পারেন আবার মৃত্যুও দিতে পারেন, কেননা দুটোরই তিনি পারে কিনা। সমুদ্র মন্থনের সময় যখন লক্ষ্মী উঠে এলেন তখন তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন কার কাছে যাবেন। তিনি ঋষি, মুনি, দেবতা সবারই মধ্যে কিছু না কিছু দোষ বা ঘাটতি দেখছেন, আর যখন ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেছেন তখন দেখছেন তাঁর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপই নেই, লক্ষ্মীদেবীকেও তিনি কোন পাত্তাই দিচ্ছেন না। লক্ষ্মী তখন তাঁর আশ্রয় নিলেন। কারণ তিনি এই জগতের সব কিছুর বাইরে। তিনি রাগ আর বিরাগ এই দুটোরই পারে, সেইজন্য তিনি এই দুটোই দিতে পারেন। একটা জিনিষের প্রতি আসক্তি তিনিই দিচ্ছেন আবার সেই জিনিষের প্রতি বৈরাগ্য সেটাও তিনিই দেন।

একটা জিনিষের প্রতি যে প্রবৃত্তি আসে সেটাও তিনি দেন আবার সেই জিনিষ থেকে সরে আসার যে নিবৃত্তি সেটাও তিনিই দেন, কারণ তিনি এই দুটোরই পারে।

শুকদেব তখন বলছেন – *বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি। বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎ পাদসলিলং যথা।।১০/১/১৬।* ভগবানের লীলাকথার ব্যপারে যখন কোন প্রশ্ন করা হয় তখন '*বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎ পাদসলিলং যথা*' – অর্থাৎ যিনি প্রশ্ন করেছেন, যিনি উত্তর দিচ্ছেন আর এর যাঁরা শ্রোতা এই তিনজনই পবিত্র হয়ে যান। বলছেন যেমন গঙ্গার জল আর শালগ্রাম শীলার স্পর্শ দ্বারা সবাই পবিত্র হয়ে যায়, ঠিক সেই রকম নিখিলকলিকলুষহারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরতিকথা প্রশ্নকর্তা, বক্তা আর শ্রোতা এই তিন জনকেই পবিত্র করে।

পুরাণের ট্রাডিশানে একমাত্র নারায়ণই অবতার হয়ে আসেন, শিব অবতার হন না, তিনি সাক্ষাৎ আসেন, আবার অন্য কোন দেবীরাও অবতার হন না। পুরাণের একটা খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, ভগবান নারায়ণকে অবতার হয়ে আসার প্রারম্ভিক কাহিনী সব পুরাণে একই ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। জগতে কারুর একটা সমস্যা হয়, সে তখন সেই সমস্যা নিয়ে ব্রহ্মার কাছে দৌড়ে যাবে, ব্রহ্মা আবার সেটা ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে জানাবেন, তখন সেই সমস্যার সমাধানের জন্য ভগবান অবতরণ করেন। পুরাণে সবচেয়ে বেশী সমস্যা হয় পৃথিবীর। পৃথিবী তখন একটা গরুর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলবে আমি পাপের বোঝা আর বহন করতে পারছি না, আপনি কিছু করুন। তখন ব্রহ্মা আবার যাবেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু তখন বলবেন – ঠিক আছে আমি অবতার রূপ ধারণ করে যাচ্ছি। অধ্যাত্ম রামায়ণেও এই একই কাহিনী। কিন্তু সেখানে বলা হয় রাবণের পাপে সবাই জর্জরিত। তখন ভগবান বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্র রূপে অবতার হয়ে রাবণকে বধ করবেন। এখানে এবার কংসাদিকে বধ করবার জন্য ভগবান স্বয়ং নররূপ ধারণ করে আবির্ভূত হবেন।

এখানেও পৃথিবীর সমস্যা হয়ে গেছে, সে এখন গরুর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে গেছে। এটা জানা যায়না পৃথিবীর যখনই কোন সমস্যা হয় সে কেন সব সময় গরু রূপই ধারণ করে। অধ্যাত্ম রামায়ণেও আমরা এই একই ব্যাপার পাই। যাই হোক সব দেবতা, ব্রহ্মা আর পৃথিবী সবাই ক্ষীর সাগরের তীরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে ভগবানকে পুরুষসুক্তম দিয়ে বন্দনা করা হল। ভগবান তখন তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন 'আমি জানি পৃথিবীতে এই সমস্যা হচ্ছে, আমি যাব পৃথিবীতে, কিন্তু তার আগে দেবতারা যত আছে সবাই তোমরা যদু বংশে গিয়ে জন্ম নাও'। ভগবান আরো বলে দিলেন যে তাঁর প্রিয়তমা লক্ষ্মী তিনি শ্রীরাধা হয়ে সেখানে জন্ম নেবেন আর তাঁর সেবার জন্য অন্য অনেক গোপীরাও যাবেন।

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।।১০/১/২৪। এটা একটা মজার ব্যাপার যাঁরা শ্রীকৃষ্ণলীলার খুব ভক্ত তাঁরা শ্রীরাধাকে লক্ষ্মী রূপেই দেখেন। কিন্তু গুজরাটের দিকে শ্রীরাধাকে লক্ষ্মী রূপে মানা হয় না, ওখানে রুক্মিণীকেই লক্ষ্মী রূপে মানা হয়। কিন্তু যারা ভক্তিমার্গী, বিশেষ করে বৃন্দাবনের ভক্তরা শ্রীরাধাকেই লক্ষ্মীদেবী রূপে মানে। তারপর বলছেন – যিনি শেষনাগ আছেন, তিনি আমার দাদা বলরাম হয়ে জন্ম নেবেন। এখানে খুব সুন্দর একটা বিশ্লেষণ আছে, বলছেন, শেষনাগ হচ্ছেন ভগবানের কলা – *বাসুদেবকলানন্তঃ*। কথামৃতে ঠাকুর প্রায়ই এই প্রশ্ন করছেন 'তোমার কি মনে হয়'? যদি বলা হল অবতার বলে মনে হচ্ছে। তখন আবার জিজ্ঞেস করছেন 'কলা না অংশ'? অনেক ভক্তই কলা আর অংশে গোলমাল করে ফেলেন। কলা আর অংশ ভাগবতের নিজস্ব তত্ত্ব। অংশ বললে ভগবানের যে কোন ভাগ নিয়ে আসা যেতে পারে, এক ভাগ, কি দুই ভাগ, বা পয়েন্ট এক ভাগ, জিরো পয়েন্ট এক ভাগ, পয়েন্ট দুই ভাগ বার তার চাইতে বেশিও হতে পারে। আর কলা হয় ষোলটি, চন্দ্রমার যেমন ষোলটি কলা। যখন কলা বলা হয় তখন তা কখনই শতকরা ছয় ভাগের নীচে যাবে না, এক কলা, দুই কলা, তিন কলা – এখানে এক কলার নীচে হয় না। অংশ অবতারে ছোটও হতে পারে বেশিও হতে পারে, শতকরা নব্বুই ভাগও হতে পারে, কত হবে বলা মুশকিল। কিন্তু কলার ক্ষেত্রে কি হয় একটা ভাগের নীচে সে আর আসবে না। এইখানে যে কলা

বলছেন, মানে কলা অবতার উচ্চতম অবতার। আর অংশ অবতার খুব ছোট। এই ব্যাপারটা অনেকেই গোলমাল করে ফেলে। কিন্তু ভাগবতের এই শ্লোকটা জানা থাকলে বুঝতে অসুবিধা হবে না।

শেষনাগ ছিলেন কলা অবতার। ভগবানের যে অংশ অবতার তিনিও অনন্ত। কেননা ভগবান নিজে যদি অনন্ত হন, তাহলে তাঁর অংশটাও অনন্ত হবে। অনন্তের কোন অংশ হয় না। এটাই অদ্বৈতের মূল তত্ত্ব। আমাদের মন আসলে পুরোপুরি সান্ত, আমরা অনন্ত বলতে বড়জোর সমুদ্র, আকাশকে ভাবব, কিন্তু এগুলোও সান্ত। অনন্তের ভাব পুরো আলাদা। একটা উপমার সাহায্যে এই অনন্তের ভাবকে কিছুটা বোঝান যেতে পারে। মনে করা যাক একটা হোটেল আছে, হোটলের প্রত্যেকটি ঘরে এক, দুই, তিন, চার সব নম্বর দেওয়া আছে, আর এই রকম অনন্ত সংখ্যার ঘর আছে। এইভাবে হোটেলের ঘরের সংখ্যা অনন্ত। আর প্রত্যেকটি ঘরেই লোক আছে। এবার হঠাৎ একজন লোক এসে বলল আমাকে একটা ঘর দিন। এখন তাকে কিভাবে ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে? আমার যদি দশটা ঘর থাকে, এখন দশটা ঘরে দশ জন লোক আছে, আরেক জন লোক এলে তাকে আর জায়গা দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই হোটেলে অনন্ত সংখ্যার ঘর আছে, আর প্রত্যেকটি ঘরে লোক আছে, এখন আরেক জন লোক এলে তাকে ঘর দিতে পারা যাবে কিনা? খুব সহজেই জায়গা দেওয়া যাবে। কিভাবে? এক নম্বরে যে আছে তাকে বলা হবে দুই নম্বর ঘরে চলে যেতে, দুই নম্বর ঘরের লোককে বলবে তিন নম্বর ঘরে চলে যান, তিনকে বলবে চারে চলে যান। এখন এই পুরো সিরিজটা চলতে শুরু করবে। শেষে কোথায় থামবে? কোথাও থামবে না, কেননা ঘরের সংখা অনন্ত। শুধু একজনকেই নয়, যদি অনন্ত সংখ্যায় লোক এসে যায়, তখনও এই ভাবে অনন্ত লোককে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। এই হোটেলের যে মুনাফা হবে, তখন কত মুনাফা হবে? মুনাফাও অনন্ত হবে। যদি লোকসান হয় তাহলে লোকসানও অনন্ত হবে। অনন্ত লোকসানের পর কত মুনাফা থাকবে, মুনাফাও অনন্ত থাকবে। অনন্তের কথা বললেই লোকের মাথা ঘুরে যাবে। এই কারণেই অনন্ত ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারিনা। এই অনন্তকে আমরা ধারণা করতে পারিনা বলেই বিভিন্ন মতবাদের, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়। অনন্তকে আমরা যে মনোভাব নিয়ে দেখব আমাদের আধ্যাত্মিকতার ধারণাও সেইভাবে গঠিত হবে। এখন এই গল্পে একটা অনন্ত সংখ্যার ঘর বিশিষ্ট হোটেলের ব্যবসার কথা বলা হল, যেখানে ক্ষতির পরিমাণ অনন্ত, লাভের পরিমাণ অনন্ত। কত ট্যাক্স ভরতে হয়েছে? অনন্ত ট্যাক্স দিতে হয়েছে। এগুলো শুনলে আমাদের গাঁজাখুরির গল্প বলেই মনে হবে। কিন্তু অনন্তের ব্যাপারে এটাই হয়। যাঁরা অনন্তের এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা ধরতে পারবেন তাঁরাই একমাত্র বলবেন – হ্যাঁ, এটা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব, তাঁরাই অদ্বৈতবাদকে ধরতে পারবেন, তা নাহলে অদ্বৈত তত্ত্ব বোঝা অসম্ভব। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে অনন্তকে এইজন্য কিছুতেই বোঝা যায় না। অনন্তের অংশ অনন্তই হয় সেটা কখনই অংশ হয় না। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলে পূর্ণই থাকবে। অনন্ত থেকে অনন্ত বিয়োগ দিলে কত হবে? অনন্তই হবে শূন্য কখনই হবে না। যদি শূন্য আর অনন্তকে নিয়ে খেলা করা হয় তাহলে যে কোন একটা জিনিষ দিয়ে অন্য যে কোন জিনিষকে প্রমাণ করে দেওয়া যায়। পদার্থ বিজ্ঞানে যখন infinite এসে যায় তখন বিজ্ঞানীরা সব কিছু ওখানেই বন্ধ করে হাত গুটিয়ে নেয়, বলে এর পর আর কোন নিয়ম চলবে না। অনন্তকে ধরা খুব মুশকিল, অঙ্কের বিশারদরাও অনন্তের ব্যাপারে হাত তুলে দেয়। আমাদের বোঝার সহজ ব্যাপার হল অনন্তকে অনন্তের সঙ্গে যোগ করলে অনন্তই থাকবে, আবার অনন্ত থেকে অনন্তকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখনও অনন্তই থাকবে। এই ব্যাপারটাই আমাদের মন মেনে নিতে চায়না, সেইজন্যই আমরা ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝতে বা ধারণা করতে পারিনা। অনন্তের ধারণা না হলে ঈশ্বর তত্ত্বের ধারণাও কোন দিন হবে না।

যাই হোক, ভগবানের এবার পুরো দলবল, শেষনাগ, যোগমায়া, দেবতারা বিভিন্ন জায়গায় অবতরণ করে গেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধ শুধু ভক্তি শাস্ত্রই নয়, ভক্তির পরাকাষ্টা। যাঁরা ভগবানের ভক্তি রসে একেবারে ডুবে থাকতে চান তাঁদের কাছে এই ভাগবত ছাড়া আর অন্য কোন শাস্ত্র নেই, ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা ভাগবতের উপরে আর কোন শাস্ত্র নেই। কিন্তু যাঁরা একেবারে ভক্তি রসে হারিয়ে যেতে চান তাঁদের আগেকার দিনের বিভিন্ন পণ্ডিত ও আচার্যদের দ্বারা রচিত দশম স্কন্ধের ভাষ্য সহ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শুধু এই দশম স্কন্ধ অধ্যয়ন করে যেতে হবে। শ্লোকের এক একটি শব্দকে কত ভাবে অর্থ করা যেতে পারে, এক একটি ছোট্ট

ঘটনাকে কত ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তাই নিয়ে এনারা পাতার পর পাতা শুধু ব্যাখ্যাই দিয়ে গেছেন। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা ভক্তকে গভীর ভাব রাজ্যে পৌঁছে দেবে। এর যে কোন একটা ব্যাখ্যাকে ধ্যানের বিষয় করে ভক্তিমার্গের সাধক ভগবদ্ভক্তির অতিন্দ্রীয় অনুভূতির ভাব রাজ্যে খুব অনায়াসেই বিচরণ করতে পারবেন।

কাহিনী আমাদের সকলেরই মোটামুটি জানা। কংস মথুরার রাজকুমার ছিলেন, তার জ্যাঠতুতো বা খুড়তুতো বোন হলেন দেবকী। বসুদেবের সাথে দেবকীর বিবাহ হয়েছে। বিয়ে করে নববধুকে নিয়ে বসুদেব রথে করে যাচ্ছেন, আর খুব উৎসাহ আনন্দের সাথে সেই রথের সারথি হয়েছে কংস স্বয়ং। সেই সময় আকাশে এক দৈববাণী হল – যে দেবকীকে তুমি এত আদর যত্ন খাতির করে নিয়ে যাচ্ছ, সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই তোমাকে বধ করবে। দৈববাণী শুনেই কংস খুব ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেছে। তখনই কংস রথের গতিমুখ পরিবর্তন করে সোজা গারদে নিয়ে এসে দেবকীকে বধ করবার জন্য বন্দী করে রাখল।

প্রাণীর জন্মের সাথে তার মৃত্যুও জন্ম নেয়

বসুদেব খুব বুদ্ধিমান, সৎ ও ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন। বসুদেব জানতেন কোন প্রকারে এই উপস্থিত কালটুকু পার করে দেওয়াটাই এখন আশু কর্তব্য। ঢিলেমি করার জন্য কংসকে বুঝিয়ে তিনি বলছেন *মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।।১০/১/৩৮।* ‘যিনি জন্ম নেন তাঁর শরীরের সঙ্গেই তাঁর মৃত্যুও জন্ম নেয়। আজ হোক বা একশো বছর পরেই হোক প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত’। আপনি আমি যে জন্ম নিয়েছি, আমাদের মৃত্যুও কিন্তু আমাদের সাথে সাথেই এসেছে। এই শ্লোকটি পড়লেই অবাক হয়ে যেতে হয় – জন্মের সঙ্গে মৃত্যুও জন্ম নিয়েছে। কি চমৎকার একটি উক্ত। মডার্ন বায়োলজিতে বলে জেনেটিকসে যখন কোন সেল জন্ম নেয় তখন ঐ সেলের মধ্যে একটা বিশেষ জিন থাকে যার কাজ আয়ু মাপা। ঐ বিশেষ জিনের আকারটা যেমন যেমন ছোট হতে থাকে ঠিক সেই অনুপাতে মানুষের আয়ুও কমতে থাকে। যে মুহুর্তে জিরোতে এসে গেল তক্ষুণি সে মরে যাবে। আর একটা সেল মরে গেলে সব কটা সেল মরে যাবে। মজার জিনিষ যখন শরীরের জন্ম হয় তখন ঐ জিনটারও জন্ম হয়, আর তার একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে। যেমন যেমন সময় যাবে তেমন তেমন ওর দৈর্ঘ্যও কমতে থাকে। শুরুতে যে সেল ছিল তার যে মাপ ছিল, ধরুন এক আঙুল ছিল সেটা এতদিনে অর্ধেক আঙুল হয়ে গেছে, এখন শরীরে নতুন যে সেল জন্ম নেবে সেটা অর্ধেক আঙুল নিয়ে জন্ম নেবে। তারপর অর্ধেক আঙুল থেকে আরো ছোট হয়ে সিকি ভাগ হয়ে গেল, তখন যে নতুন সেল জন্ম নেবে তার সাইজও সিকি ভাগ হবে। আর যখনই ঐ জিনটা জিরোতে পৌঁছে যাবে তখনই মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। শুধু মানুষই নয়, প্রত্যেক প্রাণীরই এই ভাবে মৃত্যু হবে। টাইম বোমায় যেমন টাইমারটা টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ করে কমতে থাকে, প্রাণীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে বাস্তবে ঠিক তাই হয়।

বসুদেব এটাই বলছেন, তখনকার দিনের লোকেরা তাঁদের সহজাত জ্ঞান থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলেছেন। এনাদের ফিজিক্সের কথা জিজ্ঞেস করুন তাঁরা বলবেন আমরা জানিনা, কিন্তু এখানে ওনারা সোজাসুজি বলে দিলেন শরীরের জন্মের সাথে মৃত্যুও জন্ম নেয়। আজকের দিনে যারা মলিক্যুলার বায়োলজির বিজ্ঞানী তারা আবিষ্কার করলেন যে হ্যাঁ, প্রাণী যখন জন্ম নেয়, তখনই তার জিনের মধ্যে একটা সেলও জন্ম নেয়, আর তার যে নির্দিষ্ট একটা মাপ থাকে সেই মাপটা কমতে থাকে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল কমার হারটা সবার ক্ষেত্রে এক রকম হবে না। মনে করুন ঐ জিনটা এক মিটার লম্বা, প্রথম বছরে এক সেন্টিমিটার করে কমছে। এই হারে কমলে আপনার একশ বছর আয়ু হওয়ার কথা। কখন কখন এমনও হতে পারে কোন বছরে পাঁচ সেন্টিমিটার কমে যাবে, আবার কখন কখন এমনও হবে পাঁচ বছরে এক সেন্টিমিটার কমবে। মানুষ যদি উপোসাদি করে তাহলে কমার হারটা ধীর গতিতে হবে। আবার যে খুব আনন্দে থাকে, অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, তারও কমার হার আস্তে হবে। যাদের আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আর সব সময় উদ্বেগের মধ্যে থাকে তাদের কমার হার খুব দ্রুত গতিতে চলবে। ভোগের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

কেননা চার্চিল অনেক বছর বেঁচেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনার এত বয়স হয়ে গেছে কিন্তু আপনার শরীর এত ফিট থাকার রহস্যটা কি। চার্চিল খুব বিখ্যাত একটা উক্তি করেছিলেন, তিনি বলছেন – আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ডাক্তাররা আমাকে বলেছিল মদ খাবে না আর সিগারেট খাবে না, তাহলে তোমার শরীর ভালো থাকবে, আমি ডাক্তারদের কথা শুনিনি সেইজন্য এত ফিট আছি। চার্চিল প্রচুর মদ খেতেন আর ধূমপান করতেন। এর সঙ্গে তাই ভোগের কোন সম্পর্ক নেই। এর কমার হারটা নির্ধারিত হয় আমাদের মনের আবেগের উপর। মূল কথা হল – জন্মের সঙ্গে মৃত্যুও জন্ম নেয়। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা যাকে বলছেন – physical basis of death, তাকেই ভাগবতে বলছেন spiritual basis of death। কখনো কেন তাড়াতাড়ি কমছে, আবার কখনও কেন আস্তে আস্তে কমছে, এগুলোকে তারা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অনেকে বলবেন তোমার কর্মের উপর নির্ভর করে এর কমা বাড়ার হার নির্ধারিত হয়।

বসুদেব কংসকে জীবের মৃত্যু সম্পর্কিত আরেকটি মতের কথা বলছেন *ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি। যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্মগতিং গতঃ।।১০/১/৪০।* মানুষ যেমন চলার সময় একটি পা জমিতে ঠিকমত রেখে তবেই অপর পা উত্তোলন করে অথবা জোঁক যেমন সামনের দিকটা এগিয়ে দিয়ে একটা আশ্রয় নিয়ে পেছনের আশ্রয়টা ছেড়ে দেয়, ঠিক তেমনি জীবাত্মার যখন শরীরটা ছেড়ে দেওয়ার সময় হয় তখন আরেকটা আশ্রয় অর্থাৎ জীবও নিজ কর্মানুসারে নতুন কোন দেহ ধারণ করে পূর্বের শরীরটা ছেড়ে দেয়। সেই দেহ যে সব সময় মানব শরীর হবে তা নয়, সেটা প্রেতাত্মাও হতে পারে বা দেব শরীর বা বায়ু শরীরও হতে পারে, অর্থাৎ কোন একটা শরীর ধারণ করে নেয়, শুধু যে বাতাস হয়ে থাকে তা নয়। এইজন্য জোঁকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে – *জলৌপবৎ*, যেমন জোঁক আগে সামনের জমিটা ধরে নিয়ে তারপর পেছনের আশ্রয়টা ছাড়ে। জীবাত্মাও ঠিক সেই রকম আগে একটা শরীর না ধরা পর্যন্ত বর্তমান শরীরটাকে ছাড়বে না। পাখি একটা ডাল থেকে উড়ে আরেকটা ডালে গিয়ে বসবে। জীবাত্মার ক্ষেত্রে তা হয় না, জীবাত্মা সব সময় আগে একটা শরীর ধরে নেয়। বৃদ্ধাবস্থায় শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, বিছানায় নিস্তেজ অসার হয়ে পড়ে আছে, তবুও মরতে চায় না, পড়েই আছে, হয়তো কোমাতেই দিনের পর দিন পড়ে আছে, শরীর ছাড়ছেই না। ভাগবতেই এর কারণটা বলে দিচ্ছে, জীবাত্মা ঠিক করতে পারছে না কোন শরীরটা নেবে।

বসুদেব কংসকে বিরাট লম্বা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন। এরকমটি করো না ভাই, সবাই নিজের কর্মের নিয়মে চলছে। অনেক রকম ভাবে কংসকে বসুদেব বোঝাতে চেষ্টা করলেন, নানা রকমের ভয়, ভেদনীতি অবলম্বন করলেন যাতে তার বুদ্ধিভেদ হয়ে যায়, কিন্তু কংস কিছুতেই ছাড়বে না। বসুদেব দেখলেন এখন একটা বিপদ এসেছে। বিপদের ক্ষেত্রে যেটা করা উচিত, তা হল যতটা পারা যায় বিপদের সময়টাকে দূরে ঠেলে দেওয়া। যেমন বলে 'শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্'। এক দুর্বৃত্ত ছিল, তাকে রাজা ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। ফাঁসির হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন তো তার খেলা শেষ। তখন সে রাজাকে বলছে 'রাজামশাই! আপনি যে আমাকে ফাঁসি দিচ্ছেন, আমি কিন্তু সাধারণ লোক নই, আমি ঘোড়াকে উড়তে শিখিয়ে দিতে পারি'। রাজা তখন তার ফাঁসির দিনটা পিছিয়ে দিয়ে বলছে 'আমি তোমাকে ছ'মাস সময় দিচ্ছি, এই ছ'মাসের মধ্যে তুমি আমার এই ঘোড়াকে উড়তে শিখিয়ে দাও, ছ'মাসের মধ্যে যদি তুমি না পার, তাহলে তোমার খেলা শেষ'। ছ'মাসের জন্য সে এখন মুক্ত। তার বন্ধুরা তাকে বলল 'আরে কেন তুমি তোমার মৃত্যুটাকে দেরী করিয়ে দিলে ছয় মাসের জন্য, ঘোড়া কখন কি উড়তে পারে! আর তুমি কি কখন ঘোড়াকে উড়তে শেখাতে পারবে?' তখন সেই লোকটা বন্ধুদের বলছে 'ছয় মাসের মধ্যে অনেক কিছুই হতে পারে, এই রাজাটা মরে যেতে পারে, যদি মরে যায়তো আমি বেঁচে গেলাম, মাঝখানে হয়তো আমারও স্বাভাবিক মৃত্যু এসে যেতে পারে, আর কে জানে যে ঘোড়া উড়তে পারে না, শিখেও তো যেতে পারে'। মানে সব রকমের সম্ভবনা আছে। অশুভ জিনিষকে যতটা পারো পেছনে সরিয়ে দাও, একটু যখন নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পেয়ে গেলে, তারপরে দেখা যাবে। যখন সমস্যার ঝড় ওঠে তখন যতটা পারা যায় সময় পার করে নেওয়া যায়। আমারতো বিনাশের সময় হয়ে গেছে, কিন্তু ঐ মুহূর্তটাকে যতটা আপনি ঠেলবেন ততটা বেঁচে আসার সম্ভবনা বেড়ে যায়। বিভিন্ন

কারণ থাকতে পারে। প্রথমে একটা কালের বিধান আছে, একটা গ্রহের ফের চলছে, ঐ সময়টায় সর্বনাশ হতে পারে, একটু যদি ঠেলে দেওয়া যায় তাহলে ঐ গ্রহের ফেরটা পেরিয়ে যাবে।

যারা বুদ্ধিমান পুরুষ, যতক্ষণ তাদের বুদ্ধি সক্রিয় আর শক্তি সহায় থাকে, ততক্ষণ তাদের উচিত মৃত্যুকে যতটা পারা যায় দূরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা। যত রকম ভাবে পারো মৃত্যুকে সরাতে থাকো। বসুদেবও এই নীতি অবলম্বন করে বললেন 'আমাদের সন্তানদের থেকেই তো তোমার মৃত্যু হবে, দেবকীর থেকে তো তোমার মৃত্যু হবে না, তবে তুমি কেন মিছিমিছি দেবকীকে হত্যা করতে চাইছ। যখন যেমন যেমন দেবকীর সন্তান হবে সেই সন্তানকে তোমার হাতে তুলে দিলেই তো হল'। বসুদেবের এই প্রস্তাব কংসের মনঃপূত হওয়াতে মেনে নিল।

দেবকী আর বসুদেবকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এই নিয়ে একজন মজা করে বলছিল – কংসটা সত্যিই একটা বোকা ছিল, যদি জেলেই রাখলে তাহলে দুজনকে এক ঘরে না রেখে আলাদা রাখলে তো সন্তানই আর হতো না, সব ঝামেল ওখানেই মিটে যেত। পরে ঋষিরা আবার কংসকে গিয়ে বলছে – দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে তোমার মৃত্যু হবে বলছ, কিন্তু কোন দিক থেকে অষ্টম হবে সেই হিসাবটা কি করেছ? সামনের দিকে থেকে অষ্টম, না কি পেছন দিক থেকে অষ্টম? আসল ব্যাপার হল কংসের তখনও পাপ পরিপূর্ণ হয়নি, এখনও যদি কয়েকটা বাচ্চাকে হত্যা না করে দেয় কংসের পাপ পূর্ণ হবে না। এগুলোই পুরাণের বিশেষত্ব। ইতিহাস আর পুরাণের পার্থক্য এখানেই ধরা পড়ে। ইতিহাস সব সময় কাব্যকে আশ্রয় করে চলে। ঠিক ঠিক কাব্য বলতে একমাত্র বাল্মীকি রামায়ণকেই বোঝায়। বাল্মীকি কখনই কোন চরিত্রকে পুরো সাদা বা সম্পূর্ণ কালো রঙে অঙ্কিত করবেন না। পুরাণে এসে এই ব্যাপারটা একেবারে পাল্টে দিয়ে হয় পুরোটাই সাদা নয়তো পুরোটাই কালো রঙে আঁকবেন। সেই কারণে পুরাণকে কখনই সাহিত্যের নিরিখে সম্মান দেওয়া হয় না। সাহিত্য বলতে বাল্মীকি রামায়ণ, এখানে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যেও কিছু দুর্গুণ আছে আবার রাবণের মধ্যে কিছু ভালো গুণও আছে। পুরাণ যাঁকে ভগবান বানিয়ে দেবে তার মত আর ভালো লোক কেউ হবে না, আর তাঁর যিনি বিরোধী তার মত জঘন্য খারাপ লোক দুনিয়াতে আর কেউ নেই। কংসকে তার সাগরেদরা বোঝাচ্ছে তুমি যে দেবকী আর বসুদেবকে এক সঙ্গে কারাগারে রাখবে, আর এদের যে এক এক করে সন্তান হবে, তখন কোন সন্তান এক নম্বর, কে দুই নম্বর আর অষ্টম নম্বরের সন্তান তুমি বুঝবে কি করে? শুনে কংস ভয় পেয়ে ঠিক করে নিল প্রত্যেকটি সন্তানকেই আমি মারব। কিন্তু শুধু মারলেই হবে না, যতটা নৃশংস ভাবে মারা যেতে পারে দেখাতে হবে। পুরাণের এটাই নিয়ম। বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও বর্ণনা করে বলবে না যে রাবণ মানুষকে কেটে কেটে তার মাংস খাচ্ছে। এক জায়গায় রাবণ অবশ্য বলছে সীতা যদি সাত দিনের মধ্যে আমাকে বিবাহ করতে রাজী না হয় তাহলে ওকে কেটে ওর মাংস রান্না করে সকালে আমার ব্রেকফাস্টে দিয়ে দেবে। এটা হল ভয় দেখানোর একটা কাব্যিক বর্ণনা। পুরাণে কখন এই জিনিষ দাঁড়াবে না, সেখানে কুচি কুচি করে কাটার বর্ণনা করা হবে, অর্থাৎ যতটা কালো রঙ ঢালা যেতে পারে ঢালতে থাকবে, যাতে আমাদের মনে ঘৃণার ভাব জাগে। কংসও তাই বাচ্চাগুলো জন্মাচ্ছে আর এক এক করে দুম্ করে দেওয়ালে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলছে। ভিলেনকে যতক্ষণ না কালো রঙ দিতে পারছে ততক্ষণ দৃশ্যটা জমবে না। বাল্মীকি এই জিনিষ কখনই করবেন না। এমনকি ব্যাসদেব তিনিও দুর্যোধন বা দুঃশাসনকে পুরো কালো রঙ দিচ্ছেন না, ধোঁয়াশে করে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তিকালে এই চরিত্রগুলো নিয়ে যখন কিছু সাহিত্য রচনা করা হয়েছে সেখানে আবার পুরোটাই কালো রঙ করে ছেড়ে দিয়েছে। আসলে এদের কারুরই ব্যাসদেব বা বাল্মীকির মত সেই সাহিত্য প্রতিভা নেই। শ্রীকৃষ্ণের মত, শ্রীরামচন্দ্রের মত চরিত্রের মধ্যেও কিছু দোষের বর্ণনা করবেন অথচ তাঁকে মহাপুরুষ বা সুপারম্যানের পর্যায়ে নিয়ে যাবেন, এর জন্য বিরাট প্রতিভার দরকার। এই ধরণের ক্ষমতা বা প্রতিভা সব কবি বা সাহিত্যিকের থাকে না।

নিউ ডিসকভারি বইতে এক জায়গায় আছে, পল ডয়সন যিনি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন, যিনি কিছু দিন স্বামীজীর সঙ্গও করেছিলেন, তিনিও স্বামীজীর কিছু ব্যাপারে নিন্দা

করেছিলেন। যে জিনিষগুলো নিয়ে তিনি স্বামীজীর নিন্দা করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে কারুরই আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু নিন্দা করতে গিয়ে আরও দুচার কথা বাড়িয়ে নিজের তরফে লিখেছেন, সেখানেই আপত্তি করা হয়। সাধারণ মানুষ যখন মহাপুরুষদের খুব কাছ থেকে দেখে তখন তাঁদের কিছু কিছু ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ তাদের কাছে আপত্তিজনক মনে হতে পারে। যেমন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের নামে বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গ না করে একজন নারীকে উপেক্ষা করেছেন, এটি তিনি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এই মন্তব্য শুনে পরে ম্যাক্সমুলার প্রচণ্ড আপত্তি করে বলেছিলেন ব্রহ্মচর্য ধর্ম পালন ভারতবর্ষের উচ্চতম আদর্শ, এই উচ্চতম আদর্শকে নিয়ে প্রতাপচন্দ্রের নিন্দা করা কখনই উচিত নয়। যে কোন মহাপুরুষের কোন না কোন কিছুকে আশ্রয় করে নিন্দুকরা নিন্দা করার অনেক সুযোগ পেয়ে যাবে। কারণ পারফেকশান্ জিনিষটা কখনই কোথাও হয় না। যাঁরা খুব উচ্চমানের প্রতিভাবান সাহিত্যিক বা কবি তাঁরা ওই দোষ বা খুঁতটা দেখিয়েও তাঁকে মহাপুরুষের পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। এই ধরণের কবিদের থেকে যাঁরা একটু নীচের দিকে হন তাঁরা হয় পুরো সাদা নয়তো পুরোটাই কালো রঙে ছুপিয়ে দেবেন। পাঁচশ বছর পরেই হয়তো নাটক লেখা হবে যেখানে ঠাকুর, স্বামীজীকে বিরাট মহাপুরুষ বানাবার জন্য গিরিশ ঘোষ, কালিপদ ঘোষকে পুরোটাই কালো রঙে বর্ণনা করা হবে।

কংসকেও এই রকম এক জঘন্য নৃশংস পুরুষ তৈরী করতে হবে। দেবকীর যখন প্রথম সন্তানের জন্ম হল বসুদেব নিজে এসে কংসের হাতে দিয়ে গেলেন। কংস যতই হোক বসুদেব আর দেবকী তার কুটুম্ব, তারও একটু লজ্জা হল, এটা আমি কি করতে যাচ্ছি। কিন্তু ততক্ষণে তার মন্ত্রীরা তাকে উল্টো বুঝিয়ে দিল – আপনি এসব একদম ভাবতে যাবেন না, আপনি মরে গেলে আমাদেরও নাশ হয়ে যাবে। বড় নেতারা ভোটে হেরে গেলে সেই নেতার কোন সমস্যা হয় না, কিন্তু তার দলের যত ক্যাডারদের অবস্থা সর্বনাশ হয়ে যায়। রাজা মরে গেলে, কিংবা যুদ্ধে হেরে গেলে রাজার সাগরেদ্গুলিকেই আগে সবাই পিটিয়ে মেরে ফেলে।

কংসও এক এক করে দেবকী সন্তান জন্ম নিচ্ছে আর তাদের নৃশংস ভাবে বধ করে যাচ্ছে। ষষ্ঠ গর্ভের সন্তান মারা যাওয়ার পর যখন সপ্তম গর্ভ জন্ম নেবে তখন ভগবান শেষনাগকে, যাঁকে শ্রীঅনন্তনাগ নামেও অভিহিত করা হয়, বললেন – এবার তুমি গিয়ে সপ্তম গর্ভে প্রবিষ্ট হও। ভাগবতের যত বড় বড় পণ্ডিত আছেন তাঁরা সবাই ভাগবতের উপর কলম চালিয়ে নিজের নিজের ভাষ্য দিয়ে গেছেন। এখানেও ভাষ্যকাররা বলছেন, যিনি শেষনাগ তিনি বলছেন 'শ্রীরাম অবতারে আমাকে ছোটভাই লক্ষ্মণ হয়ে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল বলে শুধু জ্যেষ্ঠের আদেশ মেনেই সারা জীবন চলতে হয়েছে, এই অবতারে আমি ভগবানের দাদা হয়ে আসছি, যার ফলে আমার সম্মানটাও বেশী হবে। ভগবান শেষনাগকে পাঠিয়ে দিলেন সপ্তম গর্ভে। অন্য দিকে ভগবান তাঁর যোগমায়াকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রজপুরে বসুদেবের আরেক পত্নী রোহিনীর গর্ভে। এখানে আর কিন্তু লক্ষ্মীর কথা আসছে না, ঈশ্বরের যে মায়া শক্তি, সেই যোগমায়ার কথা বলা হচ্ছে, সেই যোগমায়াকে ভগবান বলছেন 'হে যোগমায়া! তুমি গোকুলে নন্দ বাবার ঘরে রোহিনীর গর্ভে জন্ম নাও, এদিকে দেবকীর গর্ভের আমার জন্ম হবে আর ওদিকে তোমার জন্ম হবে'। পরে অবশ্য দুজনের স্থান বদল করে নেওয়া হবে। তারপরেই ভগবান যোগমায়াকে বলছেন 'এই যে আমাদের মধ্যে স্থান বদল করার গুরু দায়ীত্ব তুমি বহন করবে, যার জন্য পরে তোমার কাছে যে যা প্রার্থনা করবে, তুমি তার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করতে সক্ষম হবে। যারাই তোমাকে ভক্তি করবে, তোমাকে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজা নিবেদন করবে আর *নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভূবি। দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ।। কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ। মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ।।১০/২/১১-১২।* তুমি আমার এই কার্যে সহায়তা করলে বলে পৃথিবীতে মানুষ তোমাকে বিভিন্ন স্থানে পীঠাদি স্থাপন করে দুর্গা, বিজয়া, ভদ্রকালী, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, সারদা, অম্বিকা প্রভৃতি নানা নামে তোমার আবাহন করবে। যদিও ভাগবত ভক্তিগ্রন্থ কিন্তু ঠিক ঠিক শক্তির বর্ণনা এখানেই এসে যাচ্ছে। তন্ত্রে যে শক্তি আরাধনার তত্ত্ব আছে সেই তত্ত্বটাই পুরাণের এখানে এসে মিলে গেল। যোগমায়াকে নিয়ে এসে তন্ত্রকে ভাগবতে মিলিয়ে দেওয়া হল।

এর ঠিক আগে বলছেন – শ্রীকৃষ্ণের ঠিক আগে দেবকীর গর্ভে যে সন্তান আছে, সেই গর্ভকে স্থানান্তরিত করা হবে রোহিনীর গর্ভে, আর তিনি বলরাম হয়ে সেখানে জন্ম নেবেন। এই গর্ভকে দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে স্থানান্তরিত করা হবে বলে ওনার নাম হবে সঙ্কর্ষণ। এই ব্যাপারটা অনেকটা এখনকার টেস্ট টিউব বেবীর মত। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় হাসপাতালে বাচ্চা বদল করে দেয়। কোন মায়ের ছেলে হয়েছে সেই বাচ্চাকে পাল্টে দিয়ে যার মেয়ে হয়েছে তার কাছে রেখে মেয়েটাকে যার ছেলে হয়েছে তার কাছে রেখে দেবে। লিঙ্গ বদল, টেস্ট টিউব বেবী, বাচ্চা বদল সব কিছুর অভিজ্ঞতা সেই প্রাচীন কালেই এনাদের হয়ে গেছিল। তাও কবে? যিশু খ্রীস্টের জন্মের অনেক আগে এগুলো লেখা হয়ে গেছে, তার মানে আরো কত আগে থেকে এসবের অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়ে গেছে। খুবই আশ্চর্যের যে, এই ধরণের জিনিষ যে হতে পারে, তার চিন্তা-ভাবনা আমাদের পূর্বজদের মাথায় অনেক আগেই ছিল।

শেষ পর্যন্ত দেবকীর গর্ভে এখন ভগবান এসে গেছেন। ভগবান এখানে কিন্তু বসুদেবকে মাধ্যম করে এসেছেন। খ্রীশ্চান ট্রাডিশানে যেমন দিব্য আবির্ভাবের ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা হয়নি, বসুদেবের শরীরের মাধ্যমেই এসেছেন। ভাগবতে এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা করা হচ্ছে – *সা দেবকী সর্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে। ভোজেন্দ্রগেহেহগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী।।১০/২/১৯।* যিনি ভগবান, তিনি সারা জগতের নিবাসস্থান, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভগবানেই বাস করে, সেই ভগবান এসে আশ্রয় নিয়েছেন দেবকীর গর্ভে অর্থাৎ দেবকীই এখন সেই ভগবানের নিবাসস্থান, এটাই অতি আশ্চর্যের। মানুষের মনে বিরাটের একটা কল্পনার ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য এই ধরণের কাব্যিক বর্ণনা করা হয়। টেবিলের উপর একটা গ্লাশ আছে, গ্লাশটা বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, সেই বাতাস আবার গ্লাশের মধ্যেও আছে। গ্লাশের ভেতরের বাতাস আর বাইরের বাতাসের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ঠিক তেমনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আকাশতত্ত্ব আছে। সেই আকাশতত্ত্বের মধ্যেই এই গ্লাশ বিদ্যমান, গ্লাশটাও আকাশতত্ত্ব আর এই গ্লাশের মধ্যে যা আছে সেটাও আকাশতত্ত্ব। একদিকে যিনি ভগবান তাঁর মধ্যে সমগ্র জগৎ বিরাজমান, তিনিই আবার দেবকীর গর্ভে আশ্রয় নিয়েছেন। ভগবানের অবতারতত্ত্ব ঠিক এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু আমার আপনার ক্ষেত্রে হবে ভগবান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ রূপে আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন। অন্যান্য অবতারের ক্ষেত্রে কখন কলা কখন অংশ বলা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ভগবান নিজে, মানে পূর্ণাবতার হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন।

‘জ্ঞানখল’ শব্দের তাৎপর্য

এখানে ‘জ্ঞানখল’ শব্দের যে ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হল জ্ঞানী পুরুষ নিজের ভেতরের জ্ঞানকে বাইরে প্রকাশ হতে না দেওয়া। কোন বিষয়ের আপনার হয়তো খুব ভালো জ্ঞান আছে অথচ আপনি সেই জ্ঞানকে বাইরে প্রকাশ করছেন না, আপনি নিজেকে কোথাও আপনার এই জ্ঞান নিয়ে নিজেকে জাহির করছেন না। আপনি তখন হয়ে গেলেন জ্ঞানখল। বিহারে দেখা যায় কেউ হয়তো খুব খেটেখুটে একটা গাড়ি কিনল, গাড়ি কেনার পর গাড়িতে কত রকমের লাইট লাগাবে, ব্রেক মারলে এক রকম আলো জ্বলবে, চললে এক রকম আলো, দাঁড়িয়ে থাকলে এক রকম আলো, কত ঝকমকানি, আর কত রকমের মিউজিক, এক কিলো মিটার দূর থেকেই বোঝা যাবে ওর গাড়িটা আসছে। কিন্তু যারা সত্যিকারের বড়লোক, প্রত্যেক বছর পুরনো গাড়ি বেচে দিয়ে নতুন গাড়ি কেনে, তাদের গাড়িতে এইসব পাঁয়তারা কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না। এই বড়লোকেরা হচ্ছে টাকাখল। তাদের কাছে যে টাকা আছে সেটাকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। জ্ঞানখল হচ্ছে ঠিক তাই। একটু যাদের বিদ্যা বুদ্ধি আছে সে চারিদিকে ফরর্ ফরর্ করে দেখিয়ে বেড়াবে। সে বিজ্ঞান নিয়েও বলছে, রাজনীতি নিয়েও বলছে, শাস্ত্র নিয়েও বলছে, সব বিষয়ে নিজেকে জাহির করে বেড়াবে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী, যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা থাকে তাঁরা কখন মুখ খুলবেনই না, তাঁরাই ঠিক ঠিক জ্ঞানখল হয়ে যান। একেই বলা হয় জ্ঞানখল, জ্ঞান যেটা ভেতরে আছে সেটাকে ঢেকে রাখে, কখনই প্রকাশ হতে দেয় না। যেমন মৌচাকে মধু থাকে, মধু বাইরে থেকে বোঝা যায়না, কিন্তু একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে একটু খোঁচা দিলে

টপ্ টপ্ করে মধু ঝড়তে থাকে। জ্ঞানখলের এই ভাবটি ভাগবতের একেবারে নিজস্ব, কিন্তু খুবই খুব অপূর্ব এবং অনন্য ভাব।

বলছেন দেবকি হলেন ঠিক ঠিক জ্ঞানখল। দেবকীর গর্ভে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মুখের, শরীরের কোন রকমের পরিবর্তন হল না। দেবকীর মধ্যে এমনই শক্তি যে তিনি ভগবানকে গর্ভে ধারণ করার জন্য শরীরে যে দিব্য কান্তিময় ভাবটা প্রস্ফুটিতে হবে সেটাকে পুরো ঢেকে দিয়ে জ্ঞানখল হয়ে গেছেন। শ্রেষ্ঠ বিদ্যাটা নিজের ভেতরে রেখে চাপা দিয়ে দেওয়ার মত, বাইরের কারুকে বুঝতে দেয় না। যেমন একটা কুঁজোর মধ্যে যদি একটা দীপ জ্বালিয়ে রেখে দেওয়া হয় তখন দীপের আলো বাইরে যায় না। কিন্তু কুঁজোর বদলে যদি কোন কাঁচের আবরণের মধ্যে দীপটা রাখা হয় তখন পুরো আলোটাই ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রহ্মা ও দেবতাদিকৃত ভগবানের স্তুতি

আর সেই সময় ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতারা কংসের কারাগারে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভগবানের স্তুতি করতে শুরু করেছেন। *সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে। সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।১০/২/২৬।* বলছেন – হে প্রভু আপনি হচ্ছেন সত্য সঙ্কল্প, মানে আপনি যেটা ভাবেন সেটাই হয়। সেই কারণে সত্যই হচ্ছে আপনাকে প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিবিধ অসত্য অবস্থার মধ্যেও আপনি সত্যরূপেই বিরাজমান। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত বলেই এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য রূপে প্রতিভাসিত। আপনিই সত্যস্বরূপ।

আমরাও বলি ঠাকুর হলেন সত্যস্বরূপ। ঠাকুর বারবার বলছেন সত্যই কলির তপস্যা। ঠাকুরের এই কথা ভাগবতেই বলা হয়েছে, সত্যে অবিচল থেকেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঠাকুরের যখন সত্যের আঁট ছিল তখন এমন ছিল তিনি যেটা বলবেন সেটা তাঁকে করতেই হবে, যদি বলতেন ঝাউতলায় যাবো, বাহ্যে না পেলেও একবার ঘুরে আসবেন। কিন্তু কোন কোন সময় তিনিও ব্যবহারে সত্যের আঁট রাখেননি। বিয়ের সময় শ্রীশ্রীমাকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে গয়না ধার করে এনে কনের সাজে সাজাতে হয়েছিল। মায়ের বাড়ির লোকদের ধারণা ছিল এই গয়নাগুলো শ্রীশ্রীমায়ের শ্বশুড় বাড়ীরই। বিয়ের পর সেই গয়না প্রতিবেশীকে ফেরত দেওয়ার সময় মায়ের শরীর থেকে সেই গয়না ঠাকুর নিজেই খুলেছিলেন। মায়ের বাড়ির লোকেরা বুঝে গেছেন সব গয়না ধার করা। ওনারা যখন রেগেমেগে শ্রীমাকে জয়রামবাটিতে নিয়ে চলে গেলেন, তখন ঠাকুর বলছেন 'নিয়ে যাক না তাতে কি হয়েছে, বিয়েতো আর ফেরত নিয়ে যেতে পারবে না'। মহাভারত এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রেও বলছে বিয়ের সময় মিথ্যে কথা বলা চলে, ঠাকুরও তাই করলেন এবং শাস্ত্রের কথা সিদ্ধ করে দেখালেন। কিভাবে? বিয়ের সময় এই ধরণের জিনিষ করা চলে। কনে বা পাত্র পক্ষ থেকে বলা হয়, হ্যাঁ আমাদের প্রচুর টাকা-পয়সা, গয়না আছে। পরে দেখা গেল কিছুই নেই। শ্রীমায়ের জন্য গয়না ধার করে নিয়ে আসা হল, কোনটাই তাঁদের নয়। আবার ঠাকুরের কাছে কামারপুকুরের মেয়েরা দুপুরে ঈশ্বরীয় লীলা কাহিনী, গান শুনতে আসত। বাড়ির লোকেরা আপত্তি করতে পারে, তাই ঠাকুর তাদের শিখিয়ে দিলেন মেলার নাম করে এখানে আসবে, দুই পয়সা দিয়ে মেলা থেকে হাড়ি কিনবে আর এখানে চলে আসবে। ঠাকুরের যখন সত্যের আঁট ছিল তখন এক রকম, কিন্তু ঐ আঁট নিয়ে জগৎ চলে না। সেইজন্য হচ্ছে সত্য সঙ্কল্প, সত্য সঙ্কল্প মানে – আমি যেটা সঙ্কল্প করলাম সেটাই হবে। ঠাকুর বলছেন মন মুখ এক কর। আবার বলছেন সংসারে সব কাজ করবে কিন্তু জানবে এরা আমার কেউ নয়, এমন ভাবে করবে সবাই যেন ভাবে এরা আমার নিজের লোক। এখানে মন আর মুখতো এক হল না। এগুলোই ধর্মের সূক্ষ্ম গতি।

শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভেই আছেন, এখনো তাঁর জন্ম হয়নি। স্তুতি করে দেবতাদিরা বলছেন – আপনি হলেন মধুর বাণী আর সমদর্শনের প্রবর্তক – মানে কিভাবে মিষ্টি ভাবে কথা বলতে হয়, সমান ভাবে সবাইকে কিভাবে দেখতে হয়, এই ভাবগুলি আপনিই প্রবর্তন করেন। কারুর প্রতি আপনি শত্রু ভাবাপন্ন নন। আর এই সংসার কি? *একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা। সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী*

দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ।। ১০/২/২৭। এই যে সংসার, এটি এক সনাতন বৃক্ষ, গীতাতেও এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে *ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং*। এই বৃক্ষের আশ্রয় এক, মানে প্রকৃতি – মূলটাই প্রকৃতি। এই বৃক্ষের ফল দুটি – সুখ আর দুঃখ। শেকড় তিনটি – সত্ত্ব, রজ ও তম। রস চারটি – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই সংসার বৃক্ষকে পাঁচটি জিনিষ দিয়ে জানা যায় – এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে। এর স্বভাব ছয় রকম – জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় এবং বিনাশ। রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সাতটি ধাতু বৃক্ষের বল্কল, পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বৃক্ষের আটটি শাখা, বৃক্ষের নয়টি কোটর মুখ, কান, নাক, চোখ ইত্যাদি যেগুলিকে নবদ্বার বলা হয়। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় এই দশটি প্রাণ বৃক্ষের দশটি পাতা। এই সংসাররূপ সনাতন বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে – জীব আর পরমাত্মা। হে প্রভু! এই সংসাররূপ বৃক্ষের উৎপত্তির একমাত্র কারণ আপনিই, আর আপনারই অনুগ্রহে এর স্থিতি বা রক্ষা হয়। এইভাবে ব্রহ্মা, শিব ও সমস্ত দেবতারা সাক্ষাৎ ভগবানের স্তুতি করে যাচ্ছেন। এগুলো আর কিছুই না, ঈশ্বরের স্বরূপ কত ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে তারই একটু ঝলক।

বল্লভাচার্য ভক্তিশাস্ত্রে একজন খুব নামকরা দ্বৈতবাদী সাধু ছিলেন। মাধ্বাচার্যরা হলেন এই বল্লভাচার্যেরই পরম্পরা। বল্লাভাচার্য থেকে শুরু করে মাধ্বাচার্যের মত ভাগবত পণ্ডিতরা বলেন ভাগবত পুরাণের প্রত্যেকটি শ্লোকের পনেরো থেকে কুড়ি খানা আলাদা অর্থ করা যায়। এমনিতেই ভাগবতের শ্লোক এত দুর্বোধ্য যে ভাষ্য ছাড়া সংস্কৃতের বড় বড় পণ্ডিতরাও শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারেন না। সেইজন্য পণ্ডিত বলতে ভাগবত পণ্ডিতকেই বোঝায়। ভাগবতের সব থেকে বড় ভাষ্যকার হলেন বল্লভাচার্য। এই অধ্যায়কে পণ্ডিতরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম না বলে বলেন প্রাকট্য। গীতা বা মহাভারতেও বলা হয় ভগবান কখনই জন্ম গ্রহণ করেন না, তিনি প্রকট হন। হিন্দুদের অবতারতত্ত্বকে যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁরা কিছুতেই এই জায়গাটা বুঝতে পারেন না যে, ভগবানের কখন জন্ম হয় না। মজার ব্যাপার হল অন্য ধর্মে ভগবান কখন জন্মই নেন না। যেমন ইসলামে কেউ যদি বলে আল্লা জন্ম নিলেন তাহলে সে খুব বিপদ পড়ে যাবে। ইসলামে এই জিনিষ হতেই পারে না। সেইজন্য মহম্মদকে বলতে হল আমি হলাম পয়গম্বর, আমি আল্লার কথা বলছি। খ্রীশ্চান ধর্মে যিশুকেও বলতে হচ্ছে (Son of God) আমি ঈশ্বরের পুত্র। অনেকে বলেন পিতা পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ঠিকই বলছেন, কিন্তু তিনি ভগবান নন। হিন্দুধর্মে বলছে ভগবান, কিন্তু ভগবানের জন্ম হতে পারে না। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান বলছি, বলার সময় ঠিকই বলা হচ্ছে, এতে কোন ভুল নেই। কিন্তু তার সাথে এটাও বলতে হবে – যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ দেহকে আশ্রয় করে আমাদের সামনে বিরাজ করছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে খুব সহজ কথা, কিন্তু তত্ত্বতঃ ধারণা করা খুব কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, এই ব্যাপারটা একবার যদি আমাদের পরিষ্কার হয়ে যায় তখন অবতারতত্ত্ব, দ্বৈত, অদ্বৈত তত্ত্ব এগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমি কে? আমি অমুক নামধারি একজন ব্যক্তি, আমার অমুক দিনে জন্ম। যিনি মানব দেহধারী রামকৃষ্ণ তাঁর জন্ম হয়েছে, কিন্তু এই জন্মটা ভগবানের জন্ম নয়। কারণ জন্ম তারই হবে যে সীমিত। যে কোন পদার্থের ছয় রকমের বিকার হবে, যাকে বলা হয় ষড়বিকার। ষড়বিকারের প্রথমটা শুরুই হয় জায়তে দিয়ে। তার মানে, যার জন্ম হবে তার মধ্যে বাকি পাঁচটি বিকার থাকবে। যার জন্ম হবে তারই বৃদ্ধি হবে, তারই ক্ষয় হবে আর তারই একদিন বিনাশ হবে। ভগবান যদি জন্ম নিয়ে থাকেন তাহলে ভগবান বড় হবেন, ভগবানের ক্ষয়ও হবে আর একদিন ভগবানেরও নাশ হবে। ভগবানের যদি নাশ হয় তাহলে তিনি আর কি করে ভগবান হবেন! সেইজন্য বলছেন ভগবানের কখন জন্ম হয় না। গীতাও একই কথা বলছে – *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*, এখানে *তত্ত্বতঃ* শব্দটাই গুরুত্বপূর্ণ। এনারা জানতেন ভগবানের জন্ম হয় না, কিন্তু যে জন্মটা আমরা দেখছি, জন্মাবার পর তাঁর যে কর্মগুলো দেখছি, সবই দিব্য। তাঁর জন্ম দিব্য, তাঁর কর্মও দিব্য – এটাকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না। দিব্য জন্ম মানে তিনি আবির্ভূত হন। আমার আপনার ক্ষেত্রে বলা হবে না যে আমি আবির্ভূত হয়েছি। কারণ তিনি সর্বকালে, সর্বব্যাপী, সর্বস্থানে, সর্বদা বিরাজমান, তাঁর আবার জন্ম কি করে হবে! শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মারা গেলেন বললে বলতে হয়

ভগবান জন্ম নিলেন আবার ভগবান মারা গেলেন, এর থেকে হাসির কথা কি হতে পারে! এই জিনিষ দ্বৈতেও দাঁড়াবে না, অদ্বৈতে তো দাঁড়াবেই না। আচার্য শঙ্কর তাই বলছে *দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে*। আচার্য শঙ্কর, যিনি অদ্বৈত বেদান্তের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও ভাষ্যকার, তিনি বলছেন ভগবান জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু *দেহবানিব জাত*, যেন দেহবান হলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান অর্জুনের রথ চালনা করছেন। রথের বাইরে কে আছেন? রথের বাইরেও যদি ভগবানই থাকেন তাহলে ভগবান কি করে অর্জুনের রথ চালাবেন? ঠিক এই কারণেই বলা হয় *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*। আমার মায়া অত্যন্ত গুণময়ী, এই মায়া সবার মাথা একেবারে গুলিয়ে রেখে দেয়। যতই আমরা গীতা, ভাগবত পড়ি, কিছুতেই এই ব্যাপারটাকে তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে দাঁড় করান যাবে না, এখানেই সবাইকে উল্টে ফেলে দেবে। আচার্য নিজে একজন অদ্বৈতী হয়েও বলছেন ভগবান দেবকীর গর্ভে জন্ম নিচ্ছেন। ভগবানের কি কখন জন্ম হয়? কখনই হয় না, সেইজন্য আচার্য বলছেন *দেহবানিব জাত*, যেন তিনি জন্ম নিচ্ছেন। সেইজন্য ভগবানের জন্মকে কখনই জন্ম বলা যাবে না। জন্ম নিচ্ছেন না বলে বলা হয় আবির্ভূত হচ্ছেন।

ভগবান আবির্ভূত হচ্ছেন এটা হল প্রথম দিক, দ্বিতীয় দিক হল ভগবানের আবির্ভাবের আগে জগতের পারিপার্শ্বিক যা কিছু আছে সমস্ত পবিত্র, শুদ্ধ ও শুভ হয়ে যায়। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন রাজা যদি কোন কর্মচারীর উপর প্রসন্ন হয়ে বলেন আমি তোর বাড়ি যাব। রাজা ভালো করেই জানে রাজাকে রাজকীয় ভাবে আপ্যায়ন করার ক্ষমতা তার সাধ্যের বাইরে। সেইজন্য রাজা নিজের লোকদের আগে থাকতে পাঠিয়ে দেন ঘরদোর সব পরিষ্কার করতে, ভালো কার্পেট বিছিয়ে দেবে, ভালো আসবাব, রূপোর গড়গড়া আগে থাকতে পাঠিয়ে দেবে, রাস্তাঘাট সব সাফসুতরো করার জন্য লোক পাঠিয়ে দেবে। সব রাজার বাড়ি থেকেই যাচ্ছে। আমার আপনার কি ক্ষমতা আছে আমাদের কাম, ক্রোধ রিপুগুলো জয় করার? আমাদের সাধ্যই নেই। তিনি যখন কারুকে কৃপা করবেন তখন তার আগে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শনের আগে তার মধ্যে ভগবানের দৈবী সম্পদ আসতে শুরু করে।

ভগবানের আবির্ভাবের জন্য এগুলোই হল প্রস্তুতি। ভগবান যখন সশরীরে এই জগতে আবির্ভূত হবেন তখন তিনি কি করেন? আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে জগতের নয়টি তত্ত্বের কথা বলা হয়, প্রথমে পাঁচটি তত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী তার আগে কাল ও দিশা এবং শেষে মন ও আত্মা এই নয়টি তত্ত্ব। যে কোন জীব এই নটি তত্ত্বের মধ্যে বাধা। ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে এই নয়টি তত্ত্ব শুদ্ধ পবিত্র রূপ ধারণ করে। তন্ত্রশাস্ত্রে বলছে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, সেই অভেদত্ব ভেদ করে শক্তি কালী রূপে দেখা দেন, কালী থেকে মহাকালের জন্ম, মহাকাল থেকে কালের আবির্ভাব। কালের আবির্ভাব হয়ে যাওয়া মানে এবার সৃষ্টি পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। কাল হল measure of events। Measure of events হওয়া মানেই সৃষ্টি শুরু। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের এই গূঢ় তত্ত্ব কথাগুলো ধরতেই পারে না। সেইজন্য জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এই শব্দগুলোই সবাই ব্যবহার করে। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের ভাগবত পণ্ডিত তাঁরা কখনই ভাগবতগ্রন্থ পাঠ করার সময় বলবেন না শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বলবেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য, তিনি প্রকট হয়েছেন। ভগবান সব সময় সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর জন্ম কি করে হবে! কিন্তু তিনি হঠাৎ করে এই রূপে প্রকট হয়ে গেলেন। এই রূপে প্রকট হতে গেলে তাঁর দরকার একটা মায়ের গর্ভ। কিন্তু এর আগে যে তাঁর অস্তিত্ব ছিল না, তা নয়। অন্যান্য ধর্মে যিনি অনন্ত তিনি আবার সান্ত হতে পারেন এই ব্যাপারটা ধারণাই করতে পারে না। ইসলাম ধর্মে অবতারতত্ত্ব নেই, ধারণাও নেই, স্বাভাবিক ভাবে তাই অন্য ধর্মের এই জিনিষগুলো ইসলামের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। খ্রীশ্চান ধর্মে ঈশ্বরের অবতারত্বকে সন্তান রূপে নেবে কিন্তু সরাসরি ঈশ্বর আবির্ভূত হবেন কখনই মানবে না। কিন্তু হিন্দুদের কাছে ভগবান হলেন অসীম ক্ষমতাবান তিনি যেখানে খুশী যখন খুশী প্রকট হয়ে যেতে পারেন। ভাগবতের তিনটে শ্লোকে ভগবানের যখন খুশী যেখানে খুশী প্রকট হওয়ার মুহুর্তে যে রমণীয় কাল উপস্থিত হয় তারই বর্ণনা খুব সহজ সরল ভাবে দেওয়া হয়েছে। এই তিনটে শ্লোক থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুরু হয়।

ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে নয়টি তত্ত্ব শুভগুণ সম্পন্ন হয়ে গেল

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় এসে গেছে। পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন *অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ। যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্।। দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোড়ুগণোদয়ম্। মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা।। নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ। দ্বিজালিকুলসংনাদস্তবকা বনরাজয়ঃ।। ১০/৩/১-৩।* হে পরীক্ষিৎ! এরপর সর্বগুণযুক্ত পরম রমণীয় কাল আবির্ভূত হল। ভগবান যে মুহুর্তে জন্ম নিতে যাচ্ছেন, সেই মুহুর্তের সময়টা অতি শুভক্ষণ। কি শুভ? যত রকমের শুভ গুণ, ভালো গুণ হতে পারে সব গুণ এক সঙ্গে সমবেত ভাবে হাজির হয়ে গেছে। সেই সময়ের নক্ষত্র রোহিণী, আর যত গ্রহ, নক্ষত্র, তারা সব শান্ত ও সৌম্য রূপ ধারণ করল, কোথাও কোন ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব নেই। দিশাগুলি সব স্বচ্ছ ও প্রসন্ন, আকাশ নির্মল, পরিষ্কার, তারাগুলো ঝকমক করছে। পৃথিবীর সব কিছু, যত ছোট বড় গ্রাম, গঞ্জ, ব্রজভূমি, খনি আদি আকরস্থান সব যেন শান্ত ও শুভ ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেছে। সমস্ত নদী নির্মল ও পবিত্র জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, যদিও তখন রাত্রি কিন্তু নদীতে, জলাশয়গুলিতে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। জঙ্গলে যত বৃক্ষাদি ছিল তাতে তক্ষুনি ফুল ফুটে বনভূমিকে শোভিত করে দিল। যদিও রাত তবুও পাখিদের কুজনে আর ভ্রমরের গুঞ্জনে রাত্রির পরিমণ্ডল গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

এই যে তিনটে শ্লোক, এর মূল ভাব হল, ভগবানের আবির্ভাবের মুহুর্তে পৃথিবী, আকাশ, দিশা, প্রকৃতির সব কিছু নির্মল হয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই তিনটে শ্লোক খুবই সাধারণ শ্লোক, কিন্তু ভাষ্যকারদের ভাষ্য সহকারে পাঠ করলে মন যে কখন কিভাবে কত গভীরে ভেতরে টেনে নিয়ে চলে যাবে, বোঝাই যাবে না। ভাগবতের ভাষ্যকাররা কেউ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সংস্কৃতের ডিগ্রীধারী অধ্যাপক ছিলেন না, এনারা সবাই ঋষি, ধ্যানের গভীরে যাঁরা সব সময় ডুবে থাকেন, তাঁরা এই তিন-চারটে শ্লোকের কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন আমরা দেখব। যেমন এক জায়গায় বলছেন – যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় তখন সেই অন্তঃকরণে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। ধ্যান করতে করতে সমস্ত বৃত্তির নাশ হতে হতে যোগীর অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ হয়ে যায় তখন সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা যোগীর ঈশ্বর দর্শন হয়। যোগীদের হৃদয়ে যেভাবে ঈশ্বরের আবির্ভাবের কথা বলা হল এটা হল ব্যষ্টি। সমষ্টিতেও ঠিক সেই একই শুদ্ধিকরণ দরকার। ভগবানের দুটো রূপ – একটা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, যাঁকে আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে দর্শন করি। আরেকটি রূপ হল যিনি স্বয়ং ভগবান তিনি এবার প্রাকট্য হবেন। ভগবান এবার শ্রীকৃষ্ণ রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভুত হতে যাচ্ছেন, ভগবানকে এবার মানুষ রূপে দেখা যাবে। কিন্তু ভগবান যখন তখন যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে আসবেন না। তিনি যেখানে আসবেন সেখানকার সমষ্টি মণ্ডলকেও শুদ্ধ, পবিত্র, নির্মল হতে হবে। তাই যোগীদের মনের মত পৃথিবী ও তার সমষ্টি প্রকৃতির শুদ্ধির অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে। অন্তঃকরণ, মন যেমন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভগবানের আবির্ভাবের জন্য বহিঃপ্রকৃতিও শুদ্ধ রূপ ধারণ করল। প্রকৃতির মধ্যে কি কি আছে – কাল, দিশা, পঞ্চ মহাভূত, মন, আত্মা, এই নয়টি হচ্ছে দ্রব্য। এই নয়টি দ্রব্যের এক একটির নাম করে বলা হয়েছে এরা সবাই খুব শুদ্ধ ও পবিত্র হল।

কাল শুভগুণ সম্পন্ন হল। কাল নিজেকে মনে করে আমি সবার উপরে, কারণ কাল ব্রহ্মাকেও খেয়ে নেয়। কিন্তু কাল কোথাও শুনেছে ভগবান নাকি তারও উপরে, ভগবান নাকি কালাতীত। অন্যান্য ধর্মও ঠিক একই কথা বলছে। ভগবান সব সময় স্থান, কাল ও কার্যের বাইরে। তবে হিন্দুধর্মে ভগবান যে কালেরও পারে এটাকে খুব নাটকীয়ভাবে বলা হয়। কাল সব কিছুকে গ্রাস করে নেয়। কাল যখন জানতে পারল শাস্ত্রে বলে ভগবান নাকি কালেরও পারে এই কথা শোনার পর কাল নাকি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি সব কিছুকে নাশ করি আর এরা বলছে আমার উপরেও নাকি একজন আছে। সেই থেকে কাল ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্র রূপ ধারণ করে সংহার করে বেড়ায়। এগুলি আর কিছুই নয়, কবির কল্পনা। এখন যখন কাল জানতে পারল ভগবান দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ রূপ মানব দেহ ধারণ করে আমারই অধীনে আসছেন, তখন তার আনন্দ আর কে দেখে! কথায় আছে পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। একবার যখন মায়ার জগতে ঢুকে যাবেন তখন সবাইকেই

মায়ার অধীনে চলে আসতে হবে, মায়ার অধীনে আসা মানেই কালের আণ্ডারে তাকে থাকতে হবে। ঠাকুরও বলছেন অবতারও শক্তির আণ্ডারে। এবার ভগবান যা কিছুই করবেন তাঁকে কালের মধ্যেই করতে হবে। সবাই বলবে ভগবান পাঁচ বছর বয়সে এই করেছিলেন, দশ বছরে এই করেছিলেন, এখন ভগবানের সব কিছুকে কাল দিয়ে মাপা হবে। এই খবর জানার পর থেকে তাই কাল বিরাট খুশী হয়ে গেছে, আনন্দে সে ভরপুর হয়ে গেছে। আবার যখন কাল ভাবলো সেই ভগবান তিনিও আমাকে স্বীকার করতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য ভাবে কালের মনটা যেন নরম হয়ে গেল।

দিশা মানে দিক, যত দিশা আছে তারাও ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। দিশারা কেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে? বলে নাকি, কংসের অত্যাচারে দিশাদের সব স্বামীরা বন্দী হয়েছিল। ভগবানের যখন আবির্ভাব হতে যাচ্ছে এবার অবশ্যই আমাদের স্বামীরা মুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের স্বামীদের সাথে মিলন হবে – এই ভেবে দিশাদের খুব আনন্দ। দ্বিতীয় কথা, সংস্কৃতে দিশার আরেকটি অর্থ আশা। যত সৎ পুরুষ আছেন, তাঁদের অভিলাষা এবার পূর্ণ হতে চলেছে, তাঁদের তো একটিই আশা, সর্বগুণসম্পন্ন সর্বাধার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন। বেদের পুরুষসুক্তমে যে বিরাট পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে দিশাকে সেই বিরাটের কর্ণ বলা হচ্ছে। তার মানে, দিক হল ভগবানের কান। এই জিনিষগুলিকে খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই, এগুলো মূলতঃ ধ্যানের বিষয় করার জন্য। দিশারা তাই এখন খুব আনন্দিত, কারণ তারা ভগবানের কান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এবার অনেক দুঃখী, নিপীড়িত মানুষ এসে নানান ধরণের অভিযোগ অনুযোগ করবে, আমাকে সে খুব অত্যাচার করেছিল, আমাকে সে খুব অপমান করেছিল ইত্যাদি বলে। ভগবান এবার সব দুষ্ট লোকদের শেষ করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে দুখীদের যে কথাগুলো আসবে, সব কথা প্রথমে কান দিয়েই আসবে। ভগবানের লীলা শুরু হওয়ার আগে প্রথম যে তথ্য যাবে তা কান দিয়ে যাবে। এই ভেবে দিশারা তাই সবাই খুব আনন্দিত।

তারপরে বলছেন পৃথিবী শান্ত হয়ে গেছে আর খুব আনন্দে পৃথিবীর বুক ভরে উঠেছে এই ভেবে যে তার কত সৌভাগ্য হবে ভগবানের শ্রীচরণ আমার বুকের উপরে এসে পড়বে। পৃথিবীর আশ্রয় ভগবান নিজে কিন্তু এবার পৃথিবী ভগবানের আশ্রয়, কারণ যোগীজনকাঙ্ক্ষিত ভগবানের সেই দুর্লভ চরণকমল আমার বুকে পড়বে। আরেকটা ভাষ্যে বলছেন – বামন অবতারে তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী, কোন কিছুর সঙ্গে ওনার সম্পর্ক ছিল না। পরশুরামের অবতারে তাঁর যা কিছু ছিল সব ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের অবতারে ভগবান পৃথিবীর যে মেয়ে তাকে বিয়ে করে নিলেন, তার মানে পৃথিবী হয়ে গেল ভগবানের শাশুড়ী। এই সব কারণে পৃথিবী কোন অবতারেই ঈশ্বর সান্নিধ্যের নির্মল আনন্দটা ঠিক ভাবে উপভোগ করতে পারেনি। এবারে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে পৃথিবী আনন্দ পাবে, কেননা এই অবতারে শ্রীকৃষ্ণের সাথে লীলা খেলা করার এক দুর্লভ সুযোগ পৃথিবীর কাছে এসে হাজির হচ্ছে। এগুলো সবই ভাষ্য। সহজ কথা হল, ভগবান যখন আসেন তখন সব কিছু শুভ হয়ে যায়। মানুষের ভেতরে যে ভক্তিরসের আবেগ, ঈশ্বরের প্রতি যে অনাবিল ভালোবাসা, সেগুলো যাবে কোথায়, সেই ভালোবাসাকে এইভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

নদীগুলোর কেন আনন্দ হয়েছে? ভগবান যখন শ্রীরামচন্দ্র হয়ে এসেছিলেন তখন তিনি পাহাড়কে তুলে সেতু বন্ধ করেছিলেন। পাহাড় হল নদীদের বাপের বাড়ি। আর সমুদ্র নদীদের শ্বশুড় বাড়ি। গঙ্গার জন্ম পাহাড়ে আর তার শেষ হচ্ছে সমুদ্রে, সমুদ্র হয়ে গেল তার শ্বশুড় বাড়ি। নদী ভাবছে শ্রীরামচন্দ্র আমার বাবাকে তুলে আমার শ্বশুড় বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, কি আনন্দের কথা, শ্রীরামচন্দ্র কত কি করেছেন। যিনি আমাদের বাপের বাড়িকে শ্বশুড় বাড়িতে এনে রেখেছেন তাঁর আগমনে আমাদের আনন্দ হবারই কথা। এগুলো ভারতীয় মানসিকতার একটা বিচিত্র রূপ। গ্রামে গঞ্জে যেখানে ভাগবত কথা হয় সেখানে বেশীর ভাগ মেয়েরাই শ্রোতা হয়ে গিয়ে বসে। যখন ভাগবত কথাকার তত্ত্ব আলোচনা করবেন, সত্ত্ব, রজ ও তম বা পঞ্চ তন্মাত্রের কথা বলবেন তখন এরা ফিসফিস করে বলবে 'কি বলছেরে বাবা'। কিন্তু যখন, নদীর শ্বশুড় বাড়ি, পৃথিবীর লীলা

করবার বাসনা আলোচনা হবে তখন বলবে, এটাই ঠিক ঠিক ধর্ম আলোচনা। ভগবানের কি কাজ? শ্বশুড় বাড়ি আর বাপের বাড়ি এক করে দেওয়া। এবার মনে হবে ভগবান সত্যিকারের একজন ক্ষমতাবান।

হ্রদ, মানে বড় বড় যত জলাশয় আছে সবাই খুব খুশীতে ডগমগ হয়ে গেছে। কেন খুশীতে ভরপুর হয়ে গেছে? বলছেন শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়দমন করতে জলাশয় নামবেন তখন ভগবানের চরণ তাঁদের উপর স্থাপন করবেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে আমরা ধন্য হয়ে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে তারা সবাই কি ভাবে পূজা করবে? তাদের হৃদয়ের পদ্মফুলকে জলে প্রস্ফুটিত করে জলাশয়গুলিকে পদ্মফুলে আচ্ছাদিত করে দেবে।

অগ্নি কি ভেবে খুশী হয়েছে? কংসের অত্যাচারে ব্রাহ্মণরা সব যজ্ঞ বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীর এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, যখনই আসুরিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হবে তখনই সমস্ত রকমের যজ্ঞ ক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হত। আসুরিক শক্তির এটাই প্রথম পরিচয় – কোন পূজা অর্চনা করা যাবে না। এবার স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে তাই অগ্নি খুব খুশী হয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল, আবার যজ্ঞাদি ক্রিয়া শুরু হবে।

এইভাবে মনের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন। যোগীরা যখন সাধনা করেন তখন তাঁরা মনকে নিয়ন্ত্রন করেন। মনের ঠিক ঠিক সঙ্গী হল ইন্দ্রিয় সমুদয়। কঠোপনিষদে মন আর ইন্দ্রিয়কে ঘোড়া আর লাগামের সাথে তুলনা করা হয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলো হল রথের ঘোড়া আর মন হল তার লাগাম। যেখানেই মন সেখানেই ইন্দ্রিয় থাকবে। আমাদের সব কিছুর দুরবস্থার মূলে ইন্দ্রিয়ের সাথে মন সব সময় যুক্ত হয়ে থাকা। যোগীরা মনকে ইন্দ্রিয় থেকে সরিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে লাগিয়ে রাখেন। ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি এই দুটোর সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় মনের দ্বারা। মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা। যাঁরা যোগী, যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে এগোতে চাইছেন তাঁরা সব সময় মনকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, কোন উচ্চতম যোগী আর নিকৃষ্টতম ভোগীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শুধু তফাৎটা হয় মনের ব্যাপারে। যিনি উচ্চতম যোগী তাঁরও মন আছে ইন্দ্রিয় আছে আর বুদ্ধিও আছে, যে নিকৃষ্টতম ভোগী তারও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আছে কিন্তু যোগী তাঁর মনকে ঘুরিয়ে দিয়ে সব সময় বুদ্ধির সাথে যুক্ত করে রেখেছেন আর চরমতম ভোগীর মন ইন্দ্রিয়ের ভোগের মধ্যে নিযুক্ত। মন এখন ভাবছে এই যোগীদের পাল্লায় পড়ে আমার জীবনটা অতীষ্ট হয়ে উঠেছে। যোগীদের শম, দম, নিয়মের অত্যাচারে আমার যারা ঠিক ঠিক সাথী সেই ইন্দ্রিয়গুলির সাথে আমি কোন খেলাই করতে পারছি না। যোগীরা সব সময় আমাকে ঘুরিয়ে বুদ্ধির সাথে লাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু এবার ভগবান আসছেন, ভগবান আসার ফলে আমরা যত গোপাল বালকদের সাথে দুষ্টুমির খেলা করতে পারবো। মন এখন পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যাবে, যত গোয়লিনী আছে তাদের হাড়ি ভাঙবে, মাখন চুরি করবে এই রকম যত বদমাইশি হতে পারে সব করার স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। মনের যত রকমের বদমাইশি, দুষ্টুমি এই শ্রীকৃষ্ণ লীলাতে হতে যাচ্ছে, সেইজন্য মনের কি আনন্দ! এতদিনে আমি একটা পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছি। ভোগীদের যে ইন্দ্রিয়কে নিয়ে বাঁদরামো, বদমাইশি সেগুলো নিয়ে কোন শাস্ত্র লেখা হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে মনের সব বদমাইশি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে ভক্তদের অনুধ্যানের বিষয় হবে। মনের বাঁদরামো, বদমাইশিকে এখন মানুষ পূজা করবে। মনের তাই কি আনন্দ, এখন আমি ইন্দ্রিয়ের সাথে যত খুশী বদমাইশি করতে পারবো, ইন্দ্রিয়গুলো হল গোপাল বালকরা। এদের সাথে দুষ্টুমি, বাঁদরামো করা সত্ত্বেও আমার পূজা করা হবে। এর চাইতে আর কি আনন্দ হতে পারে! সেইজন্য মনের খুব আনন্দ। এতদিন যোগীরা আমাকে নিরোধ করে এসেছে, *যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*, নিরোধ করতে করতে আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছি। এবার আমি স্বাধীন, শুধু আনন্দ আর আনন্দই করব। এই যে আনন্দ, আর মনের পূর্ণ স্বাধীনতা আর তার সাথে মনের এই আনন্দ আর স্বাধীনতাকে নিয়ে ভক্তের অনুধ্যান ও পূজা এটাই তো সমস্ত শাস্ত্রের একটি ব্যতিক্রমি দৃষ্টান্ত।

আমরা এখানে নয়টি তত্ত্বের কয়েকটির ব্যাখ্যা করলাম, এইভাবে বাকি তত্ত্বগুলিও কেন খুশী হল তার বিরাট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা সাধারণতঃ পঞ্চ তত্ত্বই শুনে এসেছি, কিন্তু অনেক সময় এই নয়টি তত্ত্বও

বলা হয়। পঞ্চ তত্ত্বের আগে কাল, দিশা এবং শেষে মন আর আত্মা। ভগবান আবির্ভাব নিতে যাচ্ছেন শুনে এই নয়টি তত্ত্ব শুভ হয়ে গেছে। কেন শুভ হয়ে গেলে তার ব্যাখ্যা এই ভাবে দেওয়া হল। এই ব্যাখ্যার সাথে আমরা একমত কিনা সেটা কোন গুরুত্ব নয়, কিন্তু যিনি এর ভাষ্য দিচ্ছেন তাঁর কাছে এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলছেন ভগবান এবার মানবদেহে প্রকট হতে যাচ্ছেন শুনে কাল শুভ হয়ে গেল। কেন কাল শুভ হয়ে গেল? তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন এই এই কারণে কাল শুভ হয়ে গেল। সেটা আবার এনারা কোথা থেকে নিচ্ছেন? আমাদের পরম্পরা থেকেই নিচ্ছেন। ভাগবতের আরও আগে আগে যে পরম্পরা আছে, সেই পরম্পরার মতে কাল আর ভগবানের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাগবতের পণ্ডিতরা যখন কোথাও ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করেন তখন এই একটা দুটো শ্লোকের উপরেই কয়েকদিন প্রবচন চালিয়ে যাবেন, তখন কাল কে, কালের বাবা কে, সব কিছু নাটকীয় ভাবে উপস্থাপন করতে থাকবেন। এইভাবে ব্যাখ্যা করারও খুব দরকার। আমরা যখনই যুক্তি দিয়ে এগুলোকে বিচার করতে যাব তখন আমাদের মনে নানান ধরণের প্রশ্ন এসে হাজির হবে। কাল কেন পরম শোভন হল? এটাকে ব্যাখ্যা করার দুটো দিক আছে? একটা হল আমাদের মনে প্রশ্ন হবে কাল কেন পরম শোভন হল, তখন এই প্রশ্নই আমার মনকে আন্দোলিত করে দিয়ে ভগবানের ব্যাপারে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেবে। দ্বিতীয় হল ভাব, যাঁরা কৃষ্ণভক্ত তাঁরা এই জিনিষগুলো নিয়ে মনন চিন্তন করতে করতে এতো গভীরে চলে যাবেন যে, ঈশ্বর চিন্তনে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন। এই ধরণের ভাষ্যে পাণ্ডিত্য আর কাব্যিক সৌন্দর্য্যের যুগল সমাবেশ ভক্তের মনকে ভাবরাজ্যের চরমে নিয়ে যায়। এগুলোকে আমাদের খুব যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করার জন্য নয়, ভাষ্যকাররা ধ্যানের বিষয় করার জন্য এই ভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাগবত প্রীতি আর ধ্যানের মানসিকতা যদি না থাকে তাহলে এই ভাষ্যগুলির কোন মূল্যই থাকবে না। একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক জিনিষগুলিকে মানব শরীর দিয়ে একটা মূর্ত রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সাথে একটা মনও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই মনের মধ্যে যে বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে সেটাকেই ভাষ্যকাররা তুলে ধরেছেন।

ভগবান আসছেন কৃষ্ণ পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ এবার কৃষ্ণ পক্ষে মিলে যাবেন এও এক অভিনব আনন্দ। এবারে ভাদ্র মাসে ভগবান কেন এসেছেন তার ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকার বলছেন – ভদ্র মানে কল্যাণকারী, এই মাসের সব কিছুই শুভ, ভালো, সেইজন্য ভগবান ভাদ্র মাসে এসেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে এখন ভাদ্র মাস হয়ে গেছে অপয়া মাস, এই মাসে কোন রকম শুভ কাজ করা হয় না। আসলে ভাদ্র মাসে কেন কোন কাজ করা হয় না? এর কারণ হল, এই মাসে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে তাই এই পুরো মাস অন্য কোন রকম অনুষ্ঠানাদি না করে একমাত্র ভগবানের চিন্তন করো। আমাদের অপয়া মাস দুটি, ভাদ্র আর চৈত্র – ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব আর চৈত্র মাসে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব, যাতে মানুষ মনটা ভগবানের দিকে দেয়, কোন জাগতিক কাজ হাত নিয়ে মনের যাতে বাজে খরচ না হয়ে যায়, তাই বলে দিলেন এই দুটো অপয়া মাস। ভাদ্র মাসে এমনিতে চাষবাশ কিছু হয় না, হাতে কোন কাজ থাকে না, অন্য দিকে আমোদ ফুর্তি না করে ভগবানে মন দাও, তাই বলে দিলেন ভাদ্র মাসে ভালো কিছু করতে নেই। আর অষ্টমী তিথি, মানে মাসের ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়ছে, এদিকেও আছে ওদিকেও আছে, তাই আরও শুভ হয়ে গেল। এদিকে আবার নিশিথ রাত্রে জন্ম। নিশিথ রাত্রি হল যোগীকুলের যোগ সাধনার প্রিয় মুহূর্ত।

এখানে ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি, নিশিথ কাল এগুলো গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল ভাবের। ঠাকুর বলছেন – একজন বাবলা গাছে দেখে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছে। বাবলা গাছ দেখে তার মনে পড়ে গেছে এই বাবলা গাছের ডালে কোদালের বাঁট হবে, সেই কোদাল দিয়ে শ্যামসুন্দরের বাগানে মাটি কোপান হবে, সেই মাটিতে সব্জী চাষ হবে, সেই সব্জী প্রভুর সেবায় লাগবে – এই ভাবতে ভাবতে সে ঈশ্বরীয় ভাবে হারিয়ে গেছে। একটা বাবলা গাছকে দেখে যখন তাঁর ভাব এসে যাচ্ছে, সেখানে আধ্যাত্মিকতা কি উচ্চতায় যেতে পারে আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। ঠাকুরের ভক্ত যাঁরা উত্তরপাড়া, কোন্নগরে থাকে তাঁরা যখন দেখে ৫৪/২ বাস যাচ্ছে তখন তাঁর মনে পড়ে যায় এই বাস বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে যাবে, সেখানে ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের কথা মনে হতেই তাঁর মনে ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই আসবে না। যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁরা তাঁদের ইষ্ট

সম্পর্কিত কোন কিছু সামান্য বিষয়ের কথা মনে পড়লেই ইষ্টের প্রতি ভক্তির আবেশে ঠিক এইভাবেই সম্পূর্ণ হারিয়ে যান। এগুলো কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না, ঠিক এই জিনিষই হয়। যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত, যাঁরা বৈধী ভক্তিকে অতিক্রম করে গেছেন তাঁদের ঠিক এই অবস্থাই হয়। এখানে ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষের কোন দাম নেই, এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের মনে ভগবানের প্রতি ভক্তি, প্রেমের ভাবকে জাগ্রত করে দেওয়া হচ্ছে।

এই রকম বলছেন মধ্য রাত্রে যেখানে ঘন অজ্ঞান অন্ধকার সেখানেই ভগবান দিব্য প্রকাশ রূপে নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন। কাল, নদী, বৃক্ষ, জলাশয়, মধ্য রাত, ভাদ্র মাস, তিথি সব কিছুকেই আধ্যাত্মিকতার ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে। গীতার ভাষ্যতে যেমন আচার্য বলছেন গীতার অর্থকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি এই ভাষ্য রচনা করলাম। এখানে কিন্তু অর্থকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না, ব্যাখ্যা না কর এখানে একটা ভাবকে সৃষ্টি করা হচ্ছে। কাদের জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছে? অতি সাধারণ লোক যারা, যাদের মন সব সময় কামিনী-কাঞ্চনের ভোগে লিপ্ত হয়ে আছে, তাদের মনে একটা ভাব তৈরী করার জন্য এই ধরণের ভাবকে সৃষ্টি করা হচ্ছে। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করছেন, ভগবানের জন্ম হয় না, তিনি প্রকট হন, তাই তাঁর জন্মকে বলছেন প্রাকট্য, তিনি আবির্ভূত হন। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু হচ্ছে। তারপরে বলছেন ভগবানের আবির্ভাবের আগে সব কিছু শুভ ছিল, সব মঙ্গলময় হয়ে গিয়েছিল। কি কি মঙ্গলময় হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, যখন সৃষ্টি হয় তখন তাতে নয়টি তত্ত্ব থাকে। সাংখ্য মতে সৃষ্টির চব্বিশটি তত্ত্বের কথা বলা হয়, প্রথমে প্রকৃতি কিন্তু মূল ব্যাপারটা পঞ্চ তত্ত্বে এসে থেকে যায়। কিন্তু মূল হল প্রকৃতি যেটা সত্ত্ব, রজ ও তম। প্রকৃতির পরেই আসে মহৎ, মহৎ এর পরেই আসে অহঙ্কার আর অহঙ্কার থেকে পাঁচটি তত্ত্বের জন্ম হয়। এই প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার আর পঞ্চ তত্ত্ব এই আটটিই মূল। পঞ্চ তত্ত্ব এসে গেলেই সৃষ্টি শুরু হতে থাকে। এই আটটিই মূল। এই আটটির পর যেগুলো আসে সেগুলো এরই সংমিশ্রণ, এই আটটিই হল স্বতন্ত্র সত্তা। অন্যান্য কিছু কিছু মতে নয়টিকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলা হয়। প্রথমটাকে বলা হয় কাল, তারপর দিশা, পাঁচটি তত্ত্ব, মন ও আত্মা। ভগবানের আবির্ভাব হতে যাচ্ছেন বলে সবাই খুব আনন্দিত। সবারই আনন্দিত হবার কারণ আলাদা আলাদা। আমাদের মনে রাখতে হবে এই ব্যাখ্যাগুলো ভাগবতে কোথাও নেই, এর ব্যাখ্যা করছেন ঋষিতুল্য পণ্ডিতরা। ভাগবত শুধু বলছে এই নয়টি জিনিষ আনন্দে পরিপূর্ণ।

এর সাথে শুকদেব বলছেন *ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ। অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত।।১০/৩/৪।* শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় খুব পবিত্র শীতল বায়ু মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, বায়ু এখন আনন্দে পরিপূর্ণ। কারণ কিছু দিন পরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলা শুরু করতে যাচ্ছেন। লীলা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হবেন, পরিশ্রান্ত হলে তাঁর কপালে স্বেদবিন্দু আসবে, এই স্বেদবিন্দুকে কে শুষ্ক করবে? আমি শীতল বাতাস দিয়ে শুষ্ক করে দেবো। এই ভেবেই বায়ু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এখনই সে শীতল মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে। বল্লভাচার্যের ভাষ্যে বলা হচ্ছে যাঁরাই ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন করতে অভিলাষী, তাঁদের জন্য সব থেকে উৎকৃষ্ট সাধনা হল সেবাযোগ। কর্মযোগ মানেই সেবাযোগ। যাঁরাই ভগবানের দর্শন পেতে চান তাঁদের জন্য সেবাযোগ অত্যন্ত উপযোগী। জগৎসেবার উপর স্বামীজীও খুব জোর দিয়ে গেছেন। জগৎসেবার দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি হবে, চিত্তশুদ্ধি হলে ভগবানের দিকে এগোন সহজ হয়ে যাবে। মানবজাতির সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বায়ু সবারই সেবার দায়ীত্ব নিয়ে নিল। আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো সবই ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা। শ্রীরাম অবতারে বায়ুর ঔরস পুত্র ছিল শ্রীহনুমান। বায়ু বলছেন শ্রীরাম অবতারে আমার সন্তান ভগবানের খুব সেবা করেছিল, আমি কিন্তু ভগবানকে সেবা করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম, কিন্তু এবার আমার কাছে ভগবানকে সেবা করার উত্তম সুযোগ এসেছে। অন্য দিকে কংসের অত্যাচারে সমস্ত যজ্ঞ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন যজ্ঞের সব অগ্নি নিজে থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয় উঠল।

অন্য দিকে আবার *মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমানংসি মুদান্বিতাঃ। মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্।।১০/৩/৭।* ভগবানের আবির্ভাব হচ্ছে শুনে কিঙ্কর আর গন্ধর্বরা মধুর স্বরে গান করতে শুরু

করে দিয়েছেন, সিদ্ধ এবং চারণগণ ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন, বিদ্যাধরীরা অপ্সরাদের সাথে নৃত্যগীত দিয়ে ভগবানের আবির্ভাবকে স্মরণীয় করে তুললেন এবং মুনি ঋষিরা পরিপূর্ণ হৃদয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকলেন। জলভারবাহী মেঘমণ্ডলী সমুদ্রের সমীপে উপস্থিত হয় মন্দ মন্দ গর্জন করতে শুরু করল। বাদল মেঘ বলছে ভগবান সব সময় সমুদ্রেই থাকেন, আমরা সমুদ্রের ধারে কাছে যেতে পারি না, কিন্তু এবার তিনি আমাদের এলাকাতেই আসছেন, তাই এবার আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারবো আর যখন রৌদ্র কিরণ তাঁর উপর তাপ বিকিরণ করবে আমরা তাঁর মাথার উপর আচ্ছাদন তৈরী করে ছায়া দিয়ে তাঁকে শীতলতা প্রদান করতে পারবো। এই ভেবে মেঘেদের মনে খুব আনন্দ হচ্ছে আর তারাও মৃদু মৃদু গর্জন করে চলেছে।

ভগবান রোহিনী নক্ষত্রে জন্ম নেওয়ার ব্যাখ্যা করছেন – ভগবান দেবকীর গর্ভে জন্মে নিতে যাচ্ছেন তাই রোহিনী অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু ভগবান কারুকেই অসন্তুষ্ট রাখতে চান না, ভগবানের আবির্ভাবে সবারই মন যেন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, কারুর মনে যাতে কোন প্রকার ক্ষোভ না হয় তাই তিনি রোহিনীর নামে যে নক্ষত্র আছে সেই রোহিনী নক্ষত্রে জন্ম নেবেন বলে মন স্থির করে নিলেন। তাছাড়া এর আগে তিনি সূর্যবংশে জন্ম নিয়েছিলেন, এবার তিনি চন্দ্র বংশে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। চন্দ্রমার অনেক স্ত্রীর মধ্যে প্রিয় স্ত্রী ছিল রোহিনী, ভগবান চন্দ্র বংশে জন্ম নিতে যাচ্ছেন তাই চন্দ্রমার প্রিয় স্ত্রীর নামে যে নক্ষত্র সেই রোহিনী নক্ষত্রে তিনি জন্ম নেবেন।

এই হল ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বাবস্থা। ভগবান যখন আসেন তখন তিনি নিজেই সব ব্যবস্থা করে নেন এবং জগতের সব কিছুকে শুভ ও মঙ্গলময় করে তোলেন। আমরা এখানে মেনেই চলেছি যে, ভাগবত ব্যাসদেবের রচনা। ব্যাসদেবের এই মূল রচনার উপর বিদ্বজ্জনরা, ঋষিরা যাঁরা এর উপর ভাষ্যাদি রচনা করেছেন তাঁরা কিভাবে একদিকে সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্য দিকে এর অন্তর্নিহিত ভাবকে সযত্নে তুলে এনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভাবকে কিভাবে প্রস্ফুটিতে করেছেন তারই সামান্য আমরা আলোকপাত করলাম।

সূচীপত্র